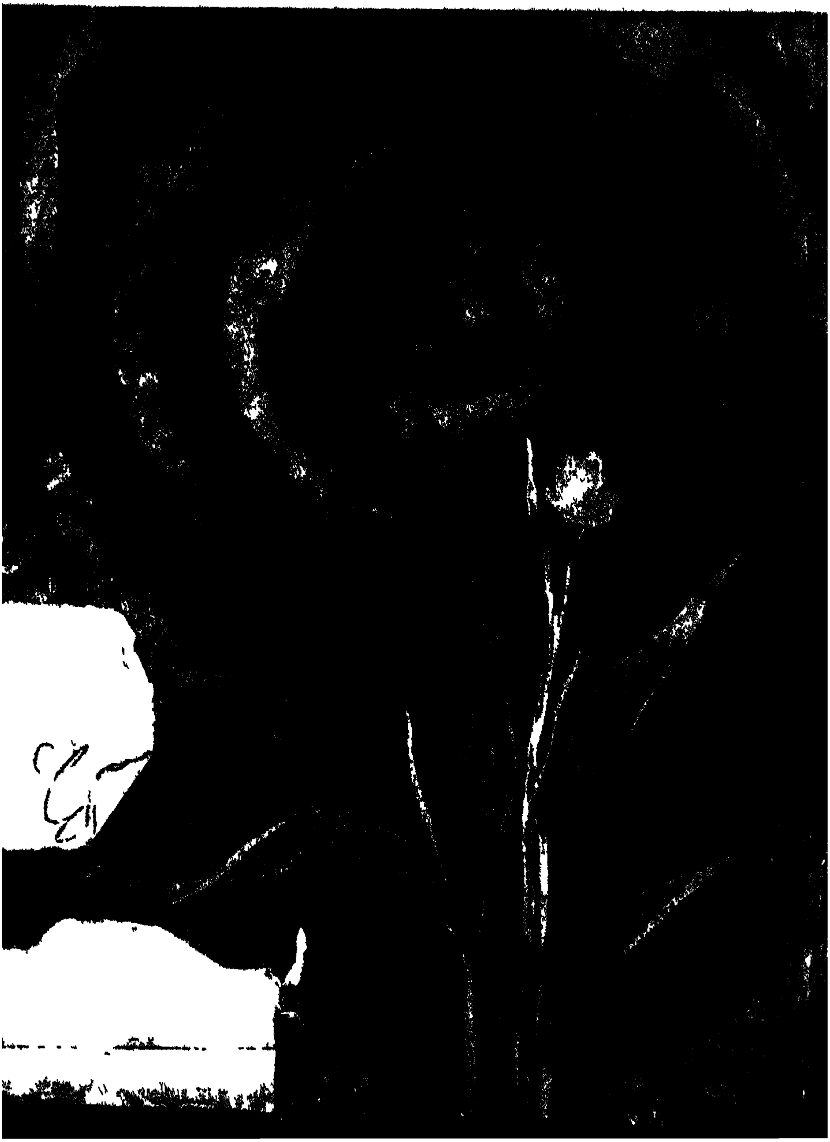
মন্থন

চিত্তরঞ্জন মাইতি



মন্থন

মন্থন

চিত্তরঞ্জন মাইতি

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ :
সুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর :
আর. বি. মণ্ডল
ডি. বি. প্রিণ্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : ৫৫ টাকা
Rupees Fifty five only

বাবা ও মাকে

সাহিত্যক্ষেত্রে অন্য এক শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি আবির্ভূত হয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁর দু'-একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য খ্যাতি-মান প্রতিষ্ঠিত লেখক চিত্তরঞ্জন মাইতির কালানুক্রমিক একটি গ্রন্থ-তালিকা নিচে দেওয়া হল। শিশুসাহিত্য ও অনুবাদ গ্রন্থগুলি এই তালিকায় দেওয়া হল না। সেই সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের নাম-পৃষ্ঠায় যুক্ত হল তাঁর স্বাক্ষর

শৈলপুরী কুমায়ুন	আপন ঘর
কলাভূমি কলিঙ্গ	সাইক্লোন
অগ্নিকন্যা	মহাকালের বন্দর
অনেক বসন্ত দুটি মন	ত্রিবেণী
ভোরের রাগিণী	মরু-মৃগয়া
ডাক্তার জনসনের ডায়েরী	বনপর্ব
রোদ বৃষ্টি ভালবাসা	মেঘ-ময়ূরী
কন্যা কাশ্মীর	নির্জন নির্ঝর
বসন্ত বিলাপ	কালের রাখাল
হিরণ্যগড়ের বধূ	জায়তা
আঁধার পেরিয়ে	অনুরাগিণী
বর্ষা বসন্ত ছুঁয়ে	মন-অরণ্য
রিসেপ্শনিস্ট	অনন্যা
ফরেস্ট বাংলো	শ্রেষ্ঠ গল্প
নির্জনে খেলা	অমৃত নিকেতন
মোহিনী	স্বপ্ন-শিখর
কালের কল্লোল	পদধ্বনি
পরমা	লীলাসঙ্গম
আর্য-অনার্য	নীলাঞ্জনা

প্রকাশকের কথা-

কৈশোরের শ্যামল বনভূমির স্নেহনীড় ছেড়ে যে পাখি এক-একদিন নিঃসীম নীলাকাশে তার ডানা মেলেছিল, সে পাখির পাখায় সোনালী সূর্য মাখিয়ে দিয়েছিল তার রঙ। সেই সোনালী ডানার পাখি একদিন পুষ্পিত বসন্তের বনভূমিতে এসে পৌঁছল। এখানে বনলক্ষ্মীর মত সুধাকণ্ঠী এক বিহগী রাঙা অশোকের ডালে জানাল তাকে আমন্ত্রণ।

যাত্রাপথে যে বিচিত্র জনপদ, নগরী অতিক্রম করে এসেছে সেই সোনালী ডানার পাখি, তারই সুরেলা কণ্ঠে উচ্চারিত এ গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর।

আসলে কৈশোর থেকে পূর্ণ যৌবনে উত্তীর্ণ একটি মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথামালা রচিত হয়েছে এই উপন্যাসে। কত সামাজিক আর রাজনৈতিক ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে সে। কত মনীষীকে অতি নিকট থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তার। কত ভালবাসার অমৃত পাত্র পূর্ণ আর চূর্ণ হয়েছে তার সামনে। কত সাধারণ মানুষকে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখেছে অসাধারণ মহিমায়। বহু চরিত্র, বহু ঘটনা আবর্তিত হয়েছে তার চোখের সামনে। সে আবিষ্ট দর্শকের মত দেখেছে সে সব ছবি, গেঁথে নিয়েছে তার অন্তরের গভীর গহনে।

সমস্ত গ্রন্থখানির সমাপ্তিতে এসে মনে হবে, আশ্চর্য সব আবর্ত রচনা করতে করতে কৈশোর থেকে যৌবন-সীমায় ছুটে এসেছে এক প্রবাহিনী।

আত্মজীবনীর স্পর্শমাখা এই উপন্যাসখানি লেখকের এক অনন্য সৃষ্টি।

প্রথম পর্ব

জানালাটা একটুখানি ফাঁক করতেই শীতের হাওয়া হু হু করে ঢুকে পড়ল। দেখলাম, রোজকার মত দীপাদি মাঠ পেরিয়ে আসছে। গায়ে সেই ফুলছাপওয়ালা খদ্দরের চাদরখানা জড়ানো। ভোরের আলো ফুটেছে, তবে পৌষের কুয়াশাকে ভেদ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

দীপালিকে আমার জানালার পাশ দিয়েই তার কোয়ার্টার্সে যেতে হবে। আমি ততক্ষণে আমার বিছানা পাট করে তুলে জানালা খুলে বসে আছি।

দীপালি আমার জানালার পাশে এসে থমকে দাঁড়াল। রোজকার মত চোখেমুখে সেই মিষ্টি হাসিটুকু ছিল না। আমার দিকে চেয়ে বলল, হাবুলু, বাবাকে গিয়ে বল, সন্ন্যাসীদা মারা গেছে।

দীপালি মাথা নীচু করে চলে গেল, আর আমি পড়ি কি মরি করে ছুটলাম আনন্দ-ভবনের দিকে।

বোর্ডিং-এ আমরা যে ঘরটিতে থাকি তার নাম, গোবর্ধন নিবাস। তার লাগাও ঘরটি অনাথ-আশ্রম। পরে অশ্রু-নীড়, সবশেষে আনন্দ-ভবন। আমাদের বোর্ডিং-এর একটু দূরে আর একখানা আলাদা ঘর ছিল, সেখানে বেশ কয়েকটি ব্রাহ্মণ তনয়কে নিয়ে পণ্ডিতমশাই থাকতেন। ঐ ঘরখানার নাম ছিল ব্রহ্মলোক।

বোর্ডিংএর পাশ দিয়ে একটি সরু খাল বয়ে গেছে। ঐ খালের ওপর বাঁশের সাঁকো। সাঁকো পেরুলেই হেডমাস্টার আনন্দবাবুর কোয়ার্টার্স। ঐ কোয়ার্টার্সেরও একটা নামকরণ হয়েছিল, বাতিঘর। দীপাদির সঙ্গে আনন্দ-বাবুর আর এক মেয়ে ওখানে থাকে। আনন্দবাবু ছেলেদের সঙ্গে বোর্ডিংএর একটি ঘরেই কাটান।

সন্ন্যাসীদার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করতে করতেই আমি আনন্দ-ভবনের দিকে ছুটে গেলাম।

আনন্দবাবু প্রতিদিনের মত সামনে গীতা রেখে পদ্মাসনে বসে পাঠ করছিলেন, তার চারদিকে ঠিক তেমনি ভাবে বসে গীতা পাঠ শুনছিল তাঁরই ঘরের ছেলেরা।

আমরা অনেকেই তখন আনন্দ-ভবনের সামনে জড়ো হয়েছি। সন্ন্যাসীদার খবরটা আবেগের সঙ্গে বলা হয়েছে, কিন্তু ছেলেরা বিচলিত হলেও আনন্দবাবু গীতা পাঠ করেই চললেন।

একসময় সেদিনের জন্য নির্দিষ্ট অধ্যায়ে পৌঁছে বই বন্ধ করে পাশে রাখলেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, দীপা ফিরে এসেছে ?

বললাম, দীপাদি খবরটা নিয়ে এসেছে।

সন্ন্যাসীদা সবাইকে তুমি, তুমি করে কথা বলত। অমনি বলে উঠল, ফুটবল খেলে যখন টাউন ইস্কুলকে হারিয়ে সুধাময় তোমার আলমারিতে কাপখানা এনে তুলল, তখন কেমন লাগছিল? ঐ মাস্টাররাই তো কাণ্ডেন সুধাময়ের কত পিঠ চাপড়ালে গো। বললে, সুধাময়, তুমি আমাদের ইস্কুলের গৌরব বাড়ালে। আর সুধাময়ের দুঃখের সময় তোমরা বলছ ওকে বলি দাও। বলিহারি যাই বাপু তোমাদের।

আনন্দবাবু বললেন, আরে না না, তা কেন হবে। একটু খেটে পড়াশোনা করলে পরের বছর ঠিক বেরিয়ে যাবে।

সন্ন্যাসীদা বললে, ওসব বড় কথা আমি বুঝি না বাবু, ছেলেটা একা একা কেঁদে বেড়াবে, আমি সইতে পারব না।

আনন্দবাবু গুম হয়ে কিছু সময় বসে থেকে বললেন, ঠিক আছে, কাল দেখব।

সন্ন্যাসীদা সাঁকো পেরিয়ে মাঠে নামার আগেই দীপাদি ছুটে এসে তাকে বলে গেল, রেজাল্ট বইতে বাবা সুধাময়ের নামের পাশে টিক্ দিয়ে দিয়েছে।

আমাদের বলে নয়, কারোর দুঃখই সন্ন্যাসীদা সইতে পারত না। মহকুমা স্কুল-টুর্নামেণ্টে আমরা জিতে কাপ পেলাম। টাউন থেকে জোগাড় করা হল, ব্যাণ্ড বাদ্যি। ধুমধাম করে, সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে আমাদের কৃতিত্বের কথা। টাউন স্কুলকে ফাইনালে হারিয়েছি, একি কম কথা। কিন্তু এখানে বাগড়া দিল সন্ন্যাসীদা। কিছুতেই টাউনের ভেতর বাদ্যিবাজনা চলবে না। হেরে গিয়ে বেচারাদের যা অবস্থা, তার ওপরে তোরা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিবি, সে আমি হতে দেব না। টাউনের বাইরে দশ মাইল পথ যেতে হবে। যত খুশি রাস্তায় বাজাতে বাজাতে যাবি।

তাই করতে হল শেষ পর্যন্ত।

জাতীয় বিদ্যালয়ে আনন্দবাবু এলেন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে। সেই থেকে সন্ন্যাসীদা তাঁর সঙ্গী। মাইনর স্কুলে সন্ন্যাসীদা ঘণ্টা বাজাত, ন্যাশনাল স্কুলেও বহাল রইল তার ঘণ্টা বাজানোর কাজ।

আনন্দবাবু সন্ন্যাসীদাকে নাকি নতুন বিদ্যালয়ে একটু উঁচু পদ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সন্ন্যাসীদা সে প্রস্তাবে কোনরকমেই সম্মত হয়নি।

বিষ্ণুপ্রসাদ দেশপ্রেমের উন্মাদনায় প্রায় সর্বস্ব সমর্পণ করে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে ছিল নানা বিভাগ। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা —এই তিন প্রদেশের ছেলেরা এসে সেখানে জড়ো হয়েছিল। ছেলেরা নিজের হাতে চরকায় সুতো কেটে কাপড় বুনত। দেশী পদ্ধতিতে রঙ করত। সাবান তৈরীর কৌশল আয়ত্ত করত। তাছাড়া চাষবাসের জমিও ইস্কুলের নামে লিখে দিয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ। ছেলেরা চাষবাসের কাজও হাতে কলমে শিখত।

আনন্দবাবু সন্ন্যাসীদাকে কুড়ি বিঘে জমির তদারকির ভার দিতে চেয়েছিলেন।

বলেছিলেন, সন্ন্যাসী, এই এতখানি জমির চাষবাসের কাজ তুমি দেখাশোনা কর। পয়সাকড়িও বাড়িয়ে দেব।

কেন আর আমাকে চোর সাজাতে চাও তোমরা!

সন্ন্যাসীদার কথা শুনে হেডমাস্টার আনন্দবাবু থ।

চোর, তার মানে?

সন্ন্যাসীদা বলল, গরীব মানুষ, সামনে সোনার ধানের গাদা। ধান চুরি না করে পারব কেন গো।

হাসলেন আনন্দবাবু। সাধ্যসাধনাও করলেন অনেক, কিন্তু ঐ এক গোঁ সন্ন্যাসীদার, তদারকির কাজ করতে পারব না বাপু। নিজের হাতে ছেলেদের চাষ শেখাব, কিন্তু পাকা ধান ঝাড়াই-মাড়াই, বিক্রি-বাটার ব্যবস্থা তোমাদের।

সেই মালীর কাজেই রয়ে গেল সন্ন্যাসীদা।

আমরা উঁচু ক্লাশে উঠে একদিন কথায় কথায় সন্ন্যাসীদাকে বললাম, এত বড় বংশের ছেলে তুমি, মালীর কাজ করতে মনে মনে কষ্ট পাও না?

সন্ন্যাসীদা জিভ কেটে, গালে হাত ঠেকিয়ে বলল, কি গাধা রে! তোরা এখন পড়ছিস হাইস্কুলে। তোদের বাপ-কাকারা যখন ন্যাশনাল স্কুলে পড়ত তখন তারা শিখত এই ক'টা কথা, আমার জননী, ভারতবর্ষ। আমার ধর্ম দেশকে ভালবাসা। কোন মানুষ ছোট নয়, কোন কাজ ছোট নয়।

একটু থেমে সন্ন্যাসীদা পাল্টা প্রশ্ন করল, হ্যাঁরে গাধা, মালীর কাজ কোন আইনে ছোট?

নিজেই আবার নিজের কথার উত্তর দিতে গিয়ে বলল, ফুল ফোটাই, গন্ধ পাই। দুনিয়ার সেরা গন্ধ তো ফুলই বিলিয়ে দেয় রে। আর ঘণ্টা বাজিয়ে তোদের সাবধান করে দি, সময় চলে যাচ্ছে, কাজ গুছিয়ে নে। এ কাজ জীবন থাকতে আর কারোর হাতে তুলে দিতে পারব না।

সন্ন্যাসীদা তার কথা রেখেছে। মৃত্যুর আগে মালীর কাজ সে আর কারোর হাতে তুলে দেয়নি।

জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্মাদনার যুগ কেটে গেছে। এখন সেই বিদ্যালয়ই সরকারী সাহায্য নিয়ে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। খদ্দরের চাদরের বদলে গায়ে উঠেছে কোট। কিন্তু রূপ বদল হলেও মন বদল তখনও হয়নি। কয়েক মাইল দূরেই সমুদ্র। দিনের কোলাহল রাতের অন্ধকারে নীরব হয়ে এলে মাঝরাতে সমুদ্রের ডাক শোনা যায়। বিরাট বালিয়াড়ি পেরিয়ে বনঝাউয়ের জঙ্গল ছুঁয়ে তিন-চার মাইল এগোলেই সমুদ্র। আছড়ে পড়ছে সে সমুদ্রবালুর জমিনে। সেই সমুদ্রের ডাক এখনও এ অঞ্চলের মানুষের মনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লবণ আইন অমান্য, অসহযোগ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সে আন্দোলন এখন স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

বিষ্ণুপ্রসাদ ছিলেন সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের। পিতা, পিতামহ ছিলেন দাতা, কিন্তু দোস্তি ছিল তাঁদের সাদা চামড়ার শাসকদের সঙ্গে। ম্যাজিস্ট্রেট,

কমিশনার আসতে চাইলে দশ মাইল দূর থেকে নিজেদের ফিটন গাড়ি পাঠিয়ে ছোট্ট গ্রামের মধ্যে আনা হত। বিশাল তাঁবুর ঘর তৈরী করা হত অতিথিদের থাকবার জন্য। সেই তাঁবু-গৃহটির নাম ছিল ড্রেসনা মঞ্জিল। দোতলা ঘর। আট দশখানা পিপুলির রঙিন নক্সা করা সুসজ্জিত কক্ষ। খানাপিনা, সে এক এলাহি ব্যাপার।

কিন্তু কৈশোরেই বিষ্ণুপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ক্ষুদিরামের। আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায় বিষ্ণুপ্রসাদের কিশোর মন। দেশপ্রেমের সেই প্রথম দীক্ষা। তারপর অর্ধনগ্ন ভারতপথিক গান্ধীজীর ডাকে সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে আসেন বিষ্ণুপ্রসাদ। গড়ে তোলেন জাতীয় বিদ্যালয়। কলকাতা থেকে চলে আসেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। কে সেই ভগীরথ, যে গ্রাম-বাংলার বুকে গঙ্গাকে আহ্বান করে এনে সুপ্ত মানুষদের মৃতসঞ্জীবনী সুধা দান করছে! প্রফুল্লচন্দ্র গ্রামে এসে বিষ্ণুপ্রসাদকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে যান। আচার্যদেবের সঙ্গে এসেছিলেন চারণ-কবি মুকুন্দদাস। ক'দিন গ্রাম-বাংলার মানুষের মনে মুকুন্দদাসের উদাত্ত কণ্ঠের গান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরেছিল।

মহাত্মাজীর পরমভক্ত আনন্দবাবু মহানন্দে ছাত্রদের দেশের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে লেগে গেলেন। গলায় ঝুলছে হারমোনিয়াম। পেছনে ছেলের দল। আনন্দবাবু গাইছেন, ছেলেরাও গাইছে—

'বেত মেরে কি মা ভোলাবে
আমরা কি মার সেই ছেলে—
মাগো যায় যেন জীবন চলে
দেশের কাজে জগৎ মাঝে
বন্দেমাতরম্ বলে।'

আনন্দ, শুধু আনন্দ! উদ্দাম এক ভাবের স্রোত বয়ে চলল ছাত্রদের মনে।

এক সময় কিছুকালের জন্য সে স্রোত স্তিমিত হল। উত্তাল একটা ঢেউ তটভূমিতে আছড়ে পড়ার পর কিছু সময়ের বিরতি। আনন্দবাবু গীতার মধ্যে আত্মানুসন্ধানে লেগে গেলেন।

আমাদের বোর্ডিং-এর প্রতিটি রুমের নামকরণ করেছিল আনন্দবাবুর বড় মেয়ে দীপাদি। দীপাদিরা দু'বোন। দীপান্বিতা আর চন্দ্রপ্রভা। উঁচু ক্লাশে উঠে সন্ন্যাসীদার কাছ থেকে জেনেছিলাম, আনন্দবাবু আসলে বিয়েই করেননি। এ দুটি তাঁর বন্ধুর মেয়ে। প্রথম জীবনে কলকাতায় বন্ধুর সঙ্গে একই ভাড়া বাড়িতে থেকে চাকরি করতেন। এক সময় বন্ধু আর বন্ধুপত্নী ছোট্ট দুটি মেয়েকে আনন্দবাবুর কাছে রেখে গঙ্গাসাগরে সেবাকার্য পরিচালনার জন্য যান। ফেরার পথে সাগরে নৌকোডুবিতে পঁচিশজনের সলিল সমাধি হয়। আনন্দবাবুর বন্ধু সস্ত্রীক সেই অঘটনের বলি হন। সেই থেকে আনন্দবাবুই বুকে করে মানুষ করতে থাকেন বন্ধুর দুই মেয়েকে। বাইরের প্রায় সকলেই জানে, ওরা আনন্দবাবুর মা-মরা দুটি মেয়ে। দীপাদি আর চন্দ্রাদি শিশুকাল

থেকে আনন্দবাবুকে বাবা বলে ডেকে এসেছে।

আনন্দবাবু মেয়েদের কোনো স্কুল কলেজে পড়াননি। বাড়িতে নিজে পড়িয়েছেন। উপযুক্ত মাস্টারমশাইদের রেখে সবরকম বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলেছেন।

দীপাদিকে স্কুলের সব ছেলেরাই ভালবাসে। ছেলেদের নাটকে রিহার্সেল দেওয়ার কাজ দীপাদির। রাত জেগে সরস্বতী পুজোর প্যাণ্ডেল সাজানোর কাজেও তার উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। এদিকে চন্দ্রাদির গানের গলাটি চমৎকার। স্বদেশী মিটিং-এ চন্দ্রাদির গলায়, 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা' গানটি যারা শুনত তারা আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ত। এমন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুলের বহু দেশাত্মবোধক গান গেয়ে চন্দ্রাদি আসর মাৎ করতে পারত।

গ্রামে গ্রামে নারী সংগঠনের কাজ করত দীপাদি। হাতের নানারকম কাজ শেখাত মেয়েদের, আবার সেই কাজ নিয়ে ছুটির সময় স্কুলের ঘরগুলোতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করত।

গ্রাম গ্রামান্তের লোকেরা দলে দলে আসত সেই প্রদর্শনী দেখতে। তারা সমর্থ্য মত নারী সমিতির স্বদেশী জিনিস কিনে নিয়ে যেত।

দীপাদির মাথায় নতুন নতুন অনেক খেয়ালখুশীর খেলা চলত। এই যেমন বোর্ডিং-এর রুমগুলোর নামকরণ।

গোবর্ধনদা বারপাঁচেক ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেও যখন স্কুলের মায়া ছেড়ে বাইরে যেতে চাইল না তখন হেডমাস্টারমশাই তাকে স্কুল ছাড়িয়ে বোর্ডিং-এর কাজে বহাল করলেন। বোর্ডিং-এ ছেলেদের দেখাশোনার কিছুটা দায়িত্ব দিলেন তার ওপর। বাজার হাট করা, ছেলেদের কাছ থেকে খরচার টাকা আদায় করা, সব ভারই ছিল তার ওপর।

যে রুমটাতে গোবর্ধনদা থাকত, সে রুমের পরিসর ছিল সবচেয়ে বড়। সে রুমে অনেকগুলো ছেলে একসঙ্গে থাকত। গোবর্ধনদা তাদের তদারকির ভারপ্রাপ্ত ছিল।

দীপাদি সেই রুমের নামকরণ করেছিল, 'গোবর্ধন-নিবাস'। দীপাদি কৌতুক করে বলত, এ ঘরটায় অনেকগুলো গরু একসঙ্গে থাকে। আমরা দীপাদির কথায় খুব মজা পেতাম। গোবর্ধনদা দীপাদির মন্তব্য শুনে বলত, ওর মাথাটা ভেঙে গোবর বার করব এবার।

অঙ্কের মাস্টারমশাই অনাথবাবু। খোঁড়া মানুষ, কিন্তু সিঁড়িভাঙা অঙ্ক কষাতেন অবলীলায়। গোবর্ধনদার রাগ ছিল অনাথবাবুর ওপর। বেচারা প্রতিবারই অঙ্কে ফেল করত আর অনাথবাবু বলতেন, গুরুকুলের কুলাঙ্গার।

তাই বোডিং-এ থাকবার জন্য যেসব ছেলেরা আসত, তাদের ভেতর কানা, খোঁড়া দেখলেই গোবর্ধনদা তাদের অনাথবাবুর রুমে চালান করে দিত।

দীপাদি অনাথবাবুর রুমের নামকরণ করেছিল, 'অনাথ-আশ্রম'। একদিন আমাদের সামনেই দীপাদি গোবর্ধনদাকে বলল, আচ্ছা গোবর্ধনদা, অঙ্কে তিরিশটা নম্বর তোলা কি এতই কঠিন?

গোবর্ধনদা অমনি বলল, তুই বিশ্বাস কর, অঙ্ক কষতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

কেন বল তো? একটু মন বসাতে পারলেই দেখবে, জলের মত সব সহজ হয়ে গেছে।

গোবর্ধনদার জবাব, তবে শোন, তোদের ঐ অনাথবাবু যেদিন বলল, চৌবাচ্চার একটা নল দিয়ে এই পরিমাণ জল ঢুকছে এক ঘণ্টায়, আর ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘণ্টায় এই পরিমাণ জল, তাহলে কতক্ষণে চৌবাচ্চা খালি হবে।

আমি বলেছিলাম, স্যার জলের অপচয় ভাল নয়, ফুটোটা আগে বন্ধ করা দরকার। অমনি তেড়ে মারতে এলেন। বললেন, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি।

আর একবার সেই বিখ্যাত বাঁদরের অঙ্কটি ক্লাশে কষতে দিলেন। একটা বাঁদরকে তেলমাখানো বাঁশে ওঠানো হচ্ছে। সে অনেক পরিশ্রমে আঁচড়ে কামড়ে কয়েক ফুট উঠেই পিছলে নেমে আসছে অনেকখানি। প্রতিবারে তার ওঠা-নামার নির্দিষ্ট যোগ বিয়োগের হিসেব আর সময়ের হিসেব থেকে দেখাতে হবে কয়েক গজ লম্বা বাঁশের মাথায় উঠতে তার কত সময় লাগবে।

ছেলেরা অনেকেই অঙ্কটা করে নিয়ে গিয়ে অনাথবাবুকে দেখাল। শুধু হেরম্ব ছাড়া ভুল করল সকলে। শেষ খেপে বাঁদরটা উঠে আর নামেনি। ঐ হিসেব মেলাতে পারেনি ছেলেরা।

অনাথবাবুর এবার চোখ পড়ল আমার ওপর। বললেন, কি রে হাঁদারাম, খাতা দেখালি না? নিয়ে আয় এখানে, দেখি কি করেছিস।

গা মোড়া দি কিন্তু উঠি না। আরে উঠব কি, খাতার পাতা তো সাদা।

শেষে টেবিলের ওপর তিন তিনবার বেতের বাড়ি মেরে শাসাতে অনাথ-বাবুর কাছে সাদা খাতা নিয়ে উঠে যেতে হল।

অঙ্ক করিসনি কেন?

বললাম, পশুপাখির ওপর যে কোনো রকম নিষ্ঠুরতা পাপ বলে হেডমাস্টারমশাই বলেছেন।

অনাথবাবু বললেন, ঠিক তো। তার সঙ্গে অঙ্ক কষার কি সম্পর্ক?

এবার তেড়ে বললাম, নেই কি রকম! এই যে নিরীহ বাঁদরটা আঁচড়ে কামড়ে উঠছে আর পড়ছে এতে ওর কোনো কষ্ট হচ্ছে না? বাঁশে তেল মাখিয়ে, বেচারাকে উঠিয়ে যারা মজা লুঠছে তারা নিষ্ঠুর নয়?

হো হো করে হেসে উঠলেন অনাথবাবু, আমি কিন্তু গম্ভীর হয়ে রইলাম।

হাসি থামলে অনাথবাবু বললেন, রতনে রতন চেনে। বাঁদরের দুঃখ তুই ছাড়া কে বুঝবে বল?

যে কথা হচ্ছিল তাই বলি। দীপাদির মাথা থেকে বোর্ডিং-এর রুমগুলোর বেশ মজার মজার নামকরণ হয়েছিল। 'গোবর্ধন নিবাস' আর 'অনাথ-আশ্রমের' পরেই 'অশ্রু-নীড়'। অশ্রুনির্ঝর পাণ্ডামশায় ছিলেন সেই ঘরের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। পাণ্ডামশায় অত্যন্ত বদরাগী মানুষ ছিলেন। সব সময় তাঁর হাতে

ছোট একটা ডাণ্ডা থাকত। কি স্কুলে কি বোর্ডিং-এ তিনি পড়া না পারলে ছেলেদের আঙুলের গাঁটে গাঁটে ঐ ডাণ্ডার পরীক্ষা চালাতেন। ছেলেদের চোখে জল না আসা পর্যন্ত ছাড়তেন না। তাই দীপাদি ওঁর ঘরের নামকরণ করেছিলেন 'অশ্রু-নীড়'।

আমি যখন পাঠশালায় পড়তাম তখন পাণ্ডামশাই ছিলেন সেই পাঠশালার পণ্ডিতমশাই। পরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিষ্ণুপ্রসাদই নিচের ক্লাশের ছেলেদের ভূগোল পড়াবার জন্য ওঁকে নিযুক্ত করেন।

পাণ্ডামশায় ভূগোলে বেশ পণ্ডিত ছিলেন। পাঠশালায় বৃত্তি পরীক্ষা দেবার জন্য আমরা তৈরী হচ্ছি। জমিদারবাড়ির কাছারীর একটি কোঠাঘরে তাঁর পাঠশালা বসত। একবেলা ওবেলা দুবেলা। রোদ ডুবু ডুবু হলে সামনের সব্জি বাগানে হলুদ ঝিঙের ফুল ফুটত। অমনি শুরু হয়ে যেত নামতা পড়া। সর্দার পড়ুয়া নামতা ডাকত, আমরা গলা ফাটিয়ে সেটা উচ্চারণ করতাম আর শ্লেটে লিখে পরক্ষণেই মুছে ফেলতাম। এটাই ছিল আমাদের পদ্ধতি।

বৃত্তি পরীক্ষার্থীরা রাতেও রেহাই পেত না। আমরা যে যার বাড়িতে ঠিক সন্ধ্যের মুখে খেয়ে নিয়ে ঘণ্টাদুয়েক ঘুমুতে পেতাম। তারপর বগলদাবায় বই পুরে নিয়ে হেরিকেন দোলাতে দোলাতে পাঠশালায় পেঁছতাম। তখন সবে মাত্র জমিদারবাড়িতে নৈশ-ভোজের প্রথম ঘণ্টাটি বাজত। চার পঙ্‌ক্তি পাত পড়ত আর চারবার ঘণ্টা বাজত।

প্রথম ব্যাচে খেত পড়ুয়া ছেলেরা। বাড়ির এবং স্কুলের। স্কুলের যেসব ছেলে বোর্ডিং-এ জায়গা পেত অথচ খাবার খরচ যোগাবার সামর্থ্য ছিল না তারা বিষ্ণুপ্রসাদের এলাহি ভোজের পাতায় জায়গা পেত। দ্বিতীয় ঘণ্টায় ছেলেদের পড়াবার জন্য নিযুক্ত মাস্টারমশাই, আত্মীয়স্বজন ও বাবুরা খেতেন। তৃতীয়বারে অন্দরমহলে মহিলারা আর বাইরের দালানে নায়েব গোমস্তারা খেতেন। সবশেষে বারটায় ঘণ্টা পড়লে কাজের লোকেরা খেতে বসত।

জমিদারবাড়ির আনাজপত্র আসত বাবুর-বাজার থেকে। প্রতিষ্ঠিত বাসুলী মন্দিরের চারদিকে বসত বাজার। সপ্তাহে দুদিন। বেশ বড় হাট।

বাজারের শুরুতেই প্রতি দোকান থেকে জমিদারবাড়ির লোকজন তোলা তুলত। মন্দিরের দালানে বিপুল আনাজপত্র জমে উঠত। ঐ তরিতরকারি দিয়েই সমাধা হতো প্রতিদিনের যজ্ঞিবাড়ির কাজ।

বৃত্তি পরীক্ষার সময় একটি মাস রাত জেগে ছেলেরা পণ্ডিতমশায়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হতো। অঙ্ক কষা আর ভূগোল পড়া চলত।

মাস্টারমশাইদের খাবার জন্যে যখন ঘণ্টা পড়ত তখন পণ্ডিতমশাই বলতেন, চল, আমার সঙ্গে খেয়ে আসবি।

প্রায় সকলে গেলেও আমি যেতাম না। বাড়ি থেকে বারণ ছিল। আমরা এক পরিবারের লোক ছিলাম, তাই। আমাদের বাড়ি থেকে লোক এসে ঐ সময় রাতের খাবার খেতে ডেকে নিয়ে যেত।

আগেই বলেছি, পণ্ডিতমশাই ভূগোলে ছিলেন টনটনে। প্রায় প্রতিবার

বৃত্তি পরীক্ষায় ভূগোলের একটি প্রশ্ন আসত। সেটি, শিয়ালদা থেকে দার্জিলিং যাত্রার পথে কি কি স্টেশান পড়ে। এটি মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষকেরা জিজ্ঞেস করতেন।

আমার ওপর পণ্ডিতমশাই অনেক আশা রাখতেন, কিন্তু আমার নিজের ওপর কোনো আস্থাই ছিল না। তার প্রধান কারণ অতি দুর্বল ছিল আমার স্মৃতিশক্তি।

পরীক্ষা দিতে গেলাম পাশের গ্রামে একটি কেন্দ্রে। ক'দিন পরীক্ষা ভালই হল। শেষদিনে ভূগোলের মৌখিক পরীক্ষা। বহু ছাত্র একটা ঘেরা জায়গার ভেতর বসে আছি। একে একে ডাক পড়ছে সামনের খড়ে ছাওয়া একটি পাঠশালার ভেতর থেকে। সেখানেই পরীক্ষকরা বসে আছেন।

এক সময় আমার ডাক পড়তেই আমি উঠে গেলাম। ঘরে ঢোকার আগে দু'তিনটে সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে যেতে হয়। সেই ধাপ পেরুতে গিয়ে এতক্ষণ মনে মনে আওড়ানো স্টেশানগুলো স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে কোথায় যেন উড়ে গেল।

আর্সবি তো আয়, সেই কলকাতা থেকে দার্জিলিং। বলতে হবে প্রতিটি স্টেশানের নাম। দু'চারটে সিধে বলার পর গুবলেট হয়ে গেল সব। উদোর পিণ্ডি চেপে গেল বুদোর ঘাড়ে। অতি অল্প সময়ের ভেতরেই আমার ভূগোল-বিদ্যের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল। পরীক্ষকরাও ছুটি দিয়ে দিলেন অচিরে।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এসেছি, দেখি পণ্ডিতমশাই নীচে দাঁড়িয়ে।

কি রকম পরীক্ষা দিলি?

মিথ্যে করে বললাম, খুব ভাল।

এরপর সিঁড়িতে পা ফেলতে গিয়ে দেখি দুটো পা-ই শূন্যে। আমার কানের দুপাশে দু'হাত চেপে পণ্ডিতমশাই একেবারে শূন্যে তুলে আমাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

পরে জেনেছিলাম, পণ্ডিতমশাই লুকিয়ে পেছনের জানালা দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্রটির কৃতিত্ব উঁকি মেরে দেখছিলেন। যখন জানলেন তাঁর সব স্বপ্নই ভেঙে গেল তখন ঐ ছাত্রটিকে আর আস্তা রাখা কেন। তাই সবার সামনেই তুলে আছাড় মারলেন। ইনিই আমাদের 'অশ্রু-নীড়ের' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশ্রুনির্ঝর পাণ্ডা মহাশয়। দীপাদি যে নামকরণে কতখানি দড় তা এর থেকেই আমি মর্মে মর্মে বুঝেছিলাম।

অশ্রু-নীড়ের পরেই আনন্দ-ভবন। এখানে হেডমাস্টার আনন্দমোহন কয়েকটি ছেলের সঙ্গে থাকেন। প্রতি রোমকূপ তাঁর স্বদেশীমন্ত্রে উদ্দীপ্ত। তাছাড়া গীতার আদর্শ তাঁর ধ্যানজ্ঞান। গীতার নির্দেশমত তিনি ফলের ভাবনা না রেখে কাজ করে যান। এদিকে কিন্তু গোবর্ধনদার সজাগ দৃষ্টি। বোর্ডিংয়ে ভর্তি হবার পরে ছেলেরা কে কোন্ ঘরে যাবে সে ব্যবস্থার ভার গোবর্ধনদার ওপর। যে সব ছেলে মোটামুটি সত্যবাদী, ধর্মভীরু বলে

গোবর্ধনদা মনে করে তাদের অবলীলায় পাঠিয়ে দেয় আনন্দ-ভবনে। এ ব্যাপারে গোবর্ধনদার নির্বাচনে বড় একটা ভুল হতে দেখিনি।

একবার তো আনন্দ-ভবনের কৃপাসিন্ধু নামে একটি ছেলেকে নিয়ে হৈ-হৈ পড়ে গেল।

স্কুল ছুটির পর ফুট করে কোথায় যে সে চলে যেত তার হদিস পাওয়া যেত না। দু-চারদিন এমনি হল। কেউ ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখেনি। এক সন্ধ্যায় দেখা গেল, সে বোর্ডিংয়ের প্রেয়ারে হাজির নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার খোঁজে লোক পাঠান হল। ঘণ্টাখানেক এদিক-ওদিক খোঁজার পর কাজের লোকটি ফিরে এসে বলল, কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি তার।

তখন পরীক্ষার সময় নয় যে ফেল করে গা ঢাকা দেবে। বছরের মাঝামাঝি একটা সময়। পড়াশোনার সঙ্গে চলেছে খেলাধুলা। প্রবল গরমে গায়ে ঘামাচি-মারা বৃষ্টি হঠাৎ হঠাৎ নেমে আসছে চড়বড়িয়ে। ফুটবলের মাঠ ভিজে গিয়ে গোলকিপারের মত আঁকড়ে ধরছে বল। জলে, কাদায়, খেলোয়াড়ে সে এক দারুণরকম জাবনা তৈরী হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা কাদা মেখে মাঠ থেকে সোজা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে স্কুলের সামনের পুকুরে।

কৃপাসিন্ধুদা খেলতে না নামলেও প্রতিদিনই প্রায় দর্শকের ভীড়ে হাজির থাকত। কিন্তু ক'দিনই কোথায় যে গা ঢাকা দিচ্ছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না।

হেডমাস্টারমশাই ভাবনায় পড়ে গেলেন। বড় বড় ছেলেদের ডেকে বললেন, তোরা একটু খুঁজে দেখত ছেলেটা গেল কোথায়। অমনি টর্চ আর হেরিকেন নিয়ে ছেলেরা বেরিয়ে গেল বিভিন্ন দিকে। গাঁয়ের ভেতর খুঁজল। বন-বাদাড় চিরে ঢুঁড়ল। তারপর সবাই একসময় ফিরল, পাত্তা নেই।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, কাল ভোরবেলা তোমরা কেউ চলে যাও কৃপাসিন্ধুর বাড়ি। দেখে এসো সে বাড়ি চলে গেছে কি না।

খাওয়া-দাওয়ার পরে চাঁদ উঠল। সবাই ঢুকল বিছানার ভেতর। সারাদিন হুটোপুটির পর বিছানাতে পড়ামাত্রই ঘুম এসে যেত। আমার বাড়ি কাছে হলেও আমি বছরখানেক বোর্ডিংয়েই ছিলাম। চকবাড়িতে জমির তদারকিতে থাকতেন বিধবা মা। আর দাদারা থাকত মামার বাড়িতে।

সে রাতে বিছানায় শুয়েও কৃপাসিন্ধুদার কথা ভেবে ঘুম এল না চোখে। হঠাৎ পাশের বিছানা থেকে ফিস ফিস করে গোবর্ধনদা বললে, হাবুলা, আমার সঙ্গে যাবি এক জায়গায়?

গোবর্ধনদাকে 'কোথায়' বলে প্রশ্ন করতে নেই। তাই বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল।

বোর্ডিংয়ের পেছন দিয়ে আমরা পুবের মাঠে গিয়ে পড়লাম। গোবর্ধনদা মাঠ ভেঙে চলছে, আমি তার পেছন পেছন। জোছনা ছড়িয়ে পড়েছে সারা মাঠে। একটা ধেড়ে ইঁদুর আলোর গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ি কি মরি ছুট লাগাল। হয়ত সাপ-টাপ কিছুর আগমন টের পেয়ে থাকবে। মাঠের প্রায় মাঝ বরাবর ঝিকন বাউড়ির পুকুর। এই পুকুরপাড়ে এতখানি রাতে একমাত্র

গোবর্ধনদা ছাড়া বুঝি আর কারো সাহস হত না আসতে। উত্তরপাড়ে একটা বিশাল বটগাছের তলায় শ্মশান। রাজ্যের কাক বাস করে ঐ গাছে। সারাদিন আশপাশের গাঁ ঘুরে সন্ধ্যায় এখানে জড়ো হয়। গাছতলায় প্রথমে তাদের বিচারসভা বসে। সে এক দেখার মত জিনিস। দলে দলে কাক সারি দিয়ে দুদিকে বসে যায়। মাঝখানে চার-পাঁচজন বিচারক। একেবারে মধ্যিখানে বাদী-বিবাদী পক্ষের দুজন।

কখনো বিচারকদের, কখনো বা দুই দলের প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে তাদের। কে কার খাবার কেড়ে নিয়েছে, কে নিয়মকানুন ভেঙেছে কাক সমাজের, তারই বিচারসভা। শেষে শাস্তি ঘোষণা, এবং আত্মরক্ষায় সচেষ্ট আসামীকে তাড়া করা। শত শত কাকের ঠোকরে অপরাধীর পালক ছিঁড়ে দেওয়া।

এই ঝিকন বাউড়ির পুকুরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বেশ একটি বেদনার পাকে জড়ানো। আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের স্কুলের জানালা দিয়ে ঐ পুকুরটি চোখে পড়ে। অবশ্য বেশখানিক দূর থেকেই দেখা যায়।

এক গ্রীষ্মের সকালে ক্লাশ চলছে, হঠাৎ দেখি দুটো লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠের মাঝ দিয়ে ছুটে আসছে। তারা স্কুলের দিকেই আসছিল। মাস্টার-মশায়েরও চোখ পড়েছে ততক্ষণে। ওদের দৌড়ের ভেতরে যে একটা আতঙ্ক আছে তা বুঝতে আমাদের মত ছোটদেরও অসুবিধে হচ্ছিল না।

অল্প সময়ের ভেতরেই ওরা স্কুলের মাঠে এসে পৌঁছল। ততক্ষণে বিভিন্ন ক্লাশের ছেলে ও মাস্টারমশাইরা স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে পূর্বদিকের দালানে দাঁড়িয়ে গেছেন।

লোক দুটো হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, ঝিকন বাউড়ির পুকুরের ধারে একটা লাশ পড়ে আছে। ভোরবেলা কেউ কেটে ফেলে রেখে গেছে।

কথাটা শোনামাত্র স্কুল ভেঙে সবাই ছুটল পুকুরের দিকে। আমরাও ছুটতে ছুটতে গেলাম। বুক ঢিপঢিপ করছিল।

বড় বড় ছেলেরা এবং মাস্টারমশাইদের ভেতর কেউ কেউ মানুষটাকে চিনতে পারলেন। সে অঞ্চলের নামকরা ডাকাত হাড় শেখ। বিশাল বপু, মহা শক্তিমান।

পরে শুনেছিলাম, আনন্দবাবুর দেশপ্রেমের বক্তৃতা শুনে হাড় শেখ হাপুস নয়নে কেঁদেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে মিটিং শেষ হলে হেডমাস্টারমশায়ের পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, জীবনে অনেক পাপ করেছি মাস্টারবাবু, আজ আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি আমি আর এ জীবনে ও কাজ করব না।

ওর দলের লোকই ওকে ঘিরে টাঙি দিয়ে কুপিয়ে মেরেছিল। ধরা পড়েছিল পুরো দলটা। তারা পুলিসের কাছে স্বীকার করেছিল, হাড় শেখকে খুন করা হয়েছিল, দলের কাজ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য।

সেদিন সবার উঁকি দিয়ে দেখা হয়ে গেলে আমিও ঠেলেঠুলে তাকালাম

লোকটির দিকে। কি আশ্চর্য ! এ মুখ যে আমার ভীষণ চেনা।

বিষ্ণুপ্রসাদদের পরিবারে মহাসমারোহে শারদোৎসব হত। একমাস আগে থেকে মেলা বসে যত। ঐ মেলায় দোকান সাজিয়ে বসত নানা জায়গা থেকে আগত ব্যবসায়ীরা।

আমরা যারা স্কুলে যেতাম, স্কুল ছুটি হলেই ছুটতাম মেলায়। আমি প্রায়ই ঘুরতাম মনোহারী দোকানগুলোতে। ছোট বড় নানা রঙের, নানা আকারের কৌটো, দম দেওয়া মোটর গাড়ি, নানা ধরনের খেলনা।

একদিন একটা ছোট্ট টিনের কৌটোর ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। সবুজ আর লাল হলুদে কৌটোটি চিত্রিত। দাম জানতে চাইলে বলল, ছ'পয়সা। আমার জামার পকেটে দুটো পয়সা পড়েছিল। এটা আমার বাতাসা কেনার পয়সা। কিন্তু আর এক আনা বাড়িতে গিয়েও চাইতে পারব না। কৌটো কেনার জন্য বললে আর্জি নাকচ হয়ে যাবে।

আমি লুব্ধ চোখে চেয়েছিলাম কৌটোটার দিকে। শেষ সূর্যের সোনা মাখান সে কৌটো আমার কাছে তখন একতাল সোনার চেয়েও দামী ছিল।

আমি মরিয়া হয়ে দোকানদারকে বললাম, আজ, কাল, পরশু, প্রতিদিন আমি তোমাকে দুটো করে পয়সা দেব, তুমি আমাকে ঐ কৌটোটা দেবে ?

দোকানী ছোট ছেলেটার সঙ্গে অতশত কথা বলতে চাইল না। সে মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল, তার কাছে ধারবাকীর কারবার নেই।

আশপাশে অনেক লোকই ভীড় করে দোকানপাট দেখছিল, কেউবা কেনা-কাটা করছিল। হঠাৎ একটা লোক নীচু হয়ে আমার কানের কাছে বলল, আমি তোমাকে ঐ কৌটোটা দেব, নেবে খোকা ?

আমি চমকে ফিরে দেখি, গোঁফওয়ালা এক বিশাল আকারের লোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটিকে দেখে আমার একটুও ভয় করল না। তার মুখে চোখে এমন একটি স্নেহমাখা ছবি দেখেছিলাম যা আজও ভুলতে পারিনি।

লোকটি আমাকে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার ঐ কথাটা বলল।

আমি পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে বললাম, এটা তুমি রাখ। বাকী চার পয়সা পরশু এখানে এই সময়ে এলে আমি তোমাকে দিয়ে দেব।

লোকটি হেসে বলল, আমি যদি পয়সা না নিয়ে কৌটোটা তোমাকে দিই, তুমি নেবে না ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, তোমাকে পয়সা নিতে হবে।

লোকটি হাত বাড়াতেই আমি ওর হাতে দুটো পয়সা দিয়ে দিলাম।

কৌটো পেয়ে আমি ভীষণ খুশি। কিন্তু দুদিনে দুটো দুটো চারটে পয়সা জমিয়ে যখন দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন লোকটির দেখা নেই। প্রায় সন্ধ্যে অব্দি ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরলাম। পরের দুদিনও গিয়ে পেলাম না।

হঠাৎ বছরখানেক পরে তাকে ঝিকন বাউড়ির পুকুরের ধারে রক্তাক্ত পড়ে

থাকতে দেখে আমি চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না।

এই হল ঝিকন বাউড়ির পুকুরের সঙ্গে আমার স্মৃতির সংযোগ। গোবর্ধনদা পুকুরের ধারে পৌঁছে অমোকে কথা বলতে বারণ করল। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে আলো-আঁধারির ভেতর কি যেন দেখার চেষ্টা করল। এক সময় আমাকে ফিসফিস করে বলল, দেখ তো, বট গাছের গুঁড়ির ওপর কেউ বসে আছে কিনা?

আমি অনেক কসরৎ করে দেখে বললাম, মনে হচ্ছে।

কথাটা মুখ ফুটে বললাম, কিন্তু বুকটা ধড়াস করে উঠল। শ্মশানে কোন অশরীরী আত্মার আবির্ভাব ঘটেনি তো!

গোবর্ধনদা বলল, চল হাবুলা, পা টিপে টিপে যাই। সামনে দিয়ে নয়, পুকুরটা বেড় দিয়ে যাব।

গোবর্ধনদার আদেশ হাইকোর্টের রায়ের মত মাথা পেতে নিতে হয়। ভূতে আচমকা গলা টিপে ধরলেও জানতাম, গোবর্ধনদা পাশে থাকলে উদ্ধার করবেই।

আমরা পায়ে পায়ে পুকুর বেষ্টন করে বটগাছের পেছনে এসে দাঁড়ালাম।

আনুনাসিক একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। স্বরটি শুধু আনুনাসিক নয়, কান্নায় কাতর।

দীনবন্ধু, তুমি কোথায়? দেখা দাও, দেখা দাও প্রভু!

গোবর্ধনদা লাফ দিয়ে মাঠ থেকে পুকুর পাড়ে উঠে পড়ল। আমিও তার দেখাদেখি তাই করলাম। এবার মোটা মোটা শেকড় ডিঙিয়ে গুঁড়ির কাছে পৌঁছে কৃপাসিন্ধুদার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে গাছের তলা থেকে তুলতে তুলতে গোবর্ধনদা বলল, বের করছি তোর দীনবন্ধু, ব্যাটা পেহ্লাদ সেজেছে। চল বোর্ডিং-এ।

কি যেন গুঁই গুঁই করে বলতে চেষ্টা করল কৃপাসিন্ধুদা। এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে গোবর্ধনদা বলল, চোপ।

তারপর হাত পাকড়ে ধরে কৃপাসিন্ধুদাকে প্রায় বগলে পুরে টানতে টানতে নিয়ে চলল বোর্ডিং-এর দিকে।

মাঝরাতে বোর্ডিংএ যেন উৎসব লেগে গেল কৃপাসিন্ধুদাকে ফিরে পেয়ে।

আনন্দবাবুর নির্দেশে কেউ কৃপাসিন্ধুদাকে কোনরকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করল না।

পরের দিন সংস্কৃত ক্লাশে ভূতভাবন পণ্ডিতমশাই নাকি বলেছিলেন, যে-ই দীনবন্ধু, সে-ই তো কৃপাসিন্ধু রে। হয়, হয়, ভগবানেরও আত্মবিস্মৃতি ঘটে। আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জানলেই তো সব জানা হয়ে গেল।

এই পণ্ডিতমশাই আমাদের বোর্ডিং থেকে একটু দূরে একখানা ঘরে কয়েকজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কুমারকে নিয়ে থাকতেন। কিছু গাছপালা ছিল ঘরটির চারদিকে। গৃহ-সংলগ্ন রন্ধনশালায় প্রতিদিন পালাক্রমে একজন করে করে ছাত্র রান্নার কাজে নিযুক্ত থাকত।

এই ঘরখানিই দীপাদির নামকরণে 'ব্রহ্মলোকে' পরিণত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণদের ভোজন লোলুপতার অনেক কাহিনী আমাদের শ্রুত এবং পঠিত। কিন্তু আমাদের ভূতভাবন পণ্ডিতমশাই নিষ্ঠার সঙ্গে জাতি ধর্মের বিধান মেনে চলতেন, লোভের কাছে কখনো সংস্কারকে বলি দিতেন না।

একবার পণ্ডিতমশাই কথার ছলে সম্পাদক বিষ্ণুপ্রসাদকে বলেছিলেন, শুনেছি, আপনার সব্জি বাগানে মণ মণ কুমড়ো ফলে।

বিষ্ণুপ্রসাদ হেসে বলেছিলেন, পাঠিয়ে দেব আপনার সেবার জন্য।

না না, আমি নিজে গিয়েই নির্বাচন করে আনব।

তাহলে একদিন আসুন আপনার বালখিল্যদের নিয়ে আমার বাড়ি। ঐখানে ভোজনাদি সমাধা করে পছন্দমত কুমড়ো বেছে নেবেন।

খুব খুশি হয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন পণ্ডিতমশাই।

নির্দিষ্ট দিনে ব্রহ্মলোকের দ্বাদশটি ছাত্রসহ পণ্ডিতমশাই বসেছেন ভোজনে। স্তূপীকৃত লুচি, ভাজা, ডাল, কুমড়োর ছক্কা ইত্যাদি সাজান।

হঠাৎ পণ্ডিতমশাই অদূরে উপবিষ্ট বিষ্ণুপ্রসাদকে বললেন, এসব পাক কি আপনাদের রাঁধুনি বামুনটি করেছে?

বিষ্ণুপ্রসাদ বললেন, ওর দ্বারা উৎকৃষ্ট তরকারি রান্না করা সম্ভব নয়। বাড়ির মেয়েরাই সকালে স্নানাদি সেরে রান্নাবান্না করেছে।

ঝপ করে সেই শেষ মধ্যাহ্নে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন পণ্ডিতমশাই। বললেন, কিছু মনে করবেন না, অব্রাহ্মণের পাক আমরা স্পর্শ করি না।

ছেলেরা তখন ক্ষুধার্ত। সামনে মিষ্টান্ন, পায়েস, ব্যঞ্জনাদি সাজান। তারা ঠায় বসেই রইল।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার ছেড়ে ওদের তুললেন। যাবার সময় বিষ্ণুপ্রসাদ বললেন, আমি দুঃখিত ভূতভাবনবাবু। এতগুলি ছেলেকে কতক্ষণ অভুক্ত থাকতে হবে, সেই কথা ভেবে আমি অথবা আমার স্ত্রী আহার গ্রহণ করতে পারব না।

ভূতভাবন পণ্ডিতমশাই শিখা নাড়তে নাড়তে বালখিল্য বাহিনীসহ বিদায় নিলেন।

পড়ানোর ব্যাপারে পণ্ডিতমশায়ের খ্যাতি বহুদূর অব্দি ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতি বছর সংস্কৃতে আমাদের স্কুল থেকে একাধিক ছাত্র লেটার পাওয়ার গৌরব অর্জন করত।

পণ্ডিতমশাই বেশ উঁচু দরের অভিনেতা ছিলেন। সংস্কৃতের কোনো গল্প পড়ানোর সময় তিনি ঐ গল্পের ভাববস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন।

একবার সেই বক আর কচ্ছপের গল্পটি পড়াচ্ছিলেন। দুটি বক আর একটি কচ্ছপের ভারী বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল। যে পুকুরে কচ্ছপটি থাকত, সেখানে প্রতিদিন উড়ে আসত দুটো বক। মাছ খেয়ে, গল্পগুজব করে আবার ফিরে যেত সন্ধ্যায়।

একবার প্রচণ্ড খরায় পুকুর শুকিয়ে যেতে লাগল। জেলেরা মাছ, কচ্ছপ,

কাঁকড়া ধরে নেবার কথা বলতে লাগল। সব শুনে সব দেখে কচ্ছপ চিন্তিত হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শে বসল।

অবশেষে ঠিক হল, দূরের একটি গভীর জলাশয়ে বক দুটো বন্ধু কচ্ছপকে নিয়ে যাবে। একটা কাঠির মাঝখানটায় কাপড়ে ধরবে কচ্ছপ, দুটি প্রান্ত ঠোঁটে ধরে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে বক দুটো।

কচ্ছপকে সাবধান করে দেওয়া হল, আকাশে উড়ে যাবার সময় সে যেন কথা না বলে।

সব ঠিক মত হচ্ছিল। বন্ধুকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছিল দুটো বক। হঠাৎ নীচ থেকে একদল রাখালের চেঁচানি শোনা গেল, দেখ দেখ, একটা কচ্ছপকে দুটো বক কেমন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। কচ্ছপটাকে পেলে ওকে পুড়িয়ে খেতাম।

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে গেল কচ্ছপের। বন্ধুদের পরামর্শ ভুলে সে চেঁচিয়ে উঠল, ছাই খা।

বলা তার শেষ হল না। শূন্য থেকে মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হল মাটিতে।

কচ্ছপটি মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর এক ঘটনা ঘটল। পণ্ডিতমশাই চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেলেন। কম্পিত কচ্ছপটির দিকে আঙুল তুলে বলতে লাগলেন, নষ্টবুদ্ধি, বাচাল কোথাকার, কে বলেছিল তোকে কথা বলতে? এখন আগুনে দগ্ধ হয়ে অবিবেচনার খেসারত দে।

সঙ্গে সঙ্গে ঐ হামা দিয়ে বসা অবস্থায় আমাদের ক্লাশের চৈতন্য পালকে বললেন, কি রে তোর চৈতন্য হল? না ঐরকম বাচালতা করে কচ্ছপের মত দগ্ধ হবি?

চৈতন্য ক্লাশে প্রায়ই পড়ার সময় কথা বলত, তাই পণ্ডিতমশায়ের এই সাবধান-বাণী।

চৈতন্য চেঁচিয়ে বলল, পণ্ডিতমশাই, আপনার হাঁটু ছড়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

দেখা গেল খোয়া-ওঠা মেঝেতে চেয়ার থেকে পড়ে যাবার সময় হাঁটুটা ছড়ে গেছে। বাচাল কচ্ছপ আর চৈতন্যকে জ্ঞান দান করতে গিয়ে ওদিকে ভ্রূক্ষেপই ছিল না।

সেই চৈতন্যই ছুটল বাইরে। একরাশ গাঁদাপাতা নিয়ে এসে, রস বার করে চেপে ধরল পণ্ডিতমশায়ের হাঁটুতে।

পণ্ডিতমশাই মেঝেতে বসে মধুর হাসি হেসে চৈতন্যের মাথায় হাত রেখে বললেন, তোর হবে রে হবে. গুরুভক্তি থাকলে বিদ্যে না হয়ে কি পারে।

গোবর্ধনদা দীপাদিকে বলে, নিজের ঘরের নামটা তো খুব ভেবেচিন্তে দিয়েছিস রে, 'বাতিঘর'। হেডমাস্টারমশাই নৌকো আর জাহাজগুলো সঠিক পথের নিশানা দিচ্ছেন, তাই বুঝি এই নাম?

ঠিক ধরেছ গোবর্ধনদা। শুধু তোমার বেলাই বাবা ফেল করল।

না রে, মাস্টারমশাই আমাকেও সঠিক পথ দেখিয়েছেন। উনি আমাকে বার বার ফেলের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

দীপাদি বলল, গোবর্ধনদা, শুধু বাবার দিকে চেয়ে তুমি 'বাতিঘর' নামকরণের ব্যাখ্যাটা করে গেলে, কিন্তু আমাদের দু'বোনের নামের দিকে একবার চেয়ে দেখেছ কি ?

কেন বল তো ? তোদের নামের সঙ্গে 'বাতিঘরের' সম্পর্কটা কি ?

আমি গোবর্ধনদার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। বললাম, দীপাদি ঠিকই বলেছে। বাতিঘরে থাকে একটি উঁচু ঘর যার ওপর আলো দেওয়া হয়। মাস্টারমশায় সেই ঘর আর দীপাদি, চন্দ্রাদি, দু'বোন সেই ঘরের ওপর আলো জেবলে রেখেছে। দীপান্বিতা আর চন্দ্রপ্রভা মাস্টারমশায়ের বাতিঘরের আলো।

দীপাদি আমার পিঠে হাত চাপড়ে বলল, তুই এ বয়সে যেরকম ব্যাখ্যা করলি, ম্যাট্রিকে নিশ্চয়ই লেটার পাবি বাংলায়।

গোবর্ধনদা বলল, ছাই পাবে। কুম্ভকর্ণের মত সন্ধ্যে থেকে ঘুমুলে কেউ লেটার পায় ? ও ভালয় ভালয় পাশটা করলে বাঁচি।

দীপাদি বলল, কি শুনছি রে হাবলু, গোবর্ধনদার কথা শুনে চললে ঠিকই ভাল রেজাল্ট করবি।

গোবর্ধনদা বলল, জানিস দীপা, হাবলোটা দারুণ কবিতা লেখে। শুধু লিখে লিখে নয়, মুখে মুখেও ছড়া বানাতে পারে।

সে কি রে ! তুই তো কোনোদিন আমাকে দেখাসনি ?

লজ্জা পেয়ে বললাম, গোবর্ধনদা ছাড়া আর কাউকে দেখাই নি।

তুই একদিন নিয়ে আসবি আমার কাছে, আমি দেখব। তুই নিজে কিন্তু আমাকে পড়ে শোনাবি।

সাহস পেয়ে বললাম, কালই শোনাব।

বেশ। গোবর্ধনদা, তুমিও এসো।

ঠিক আছে, আসা যাবে।

ভেবেছিলাম, তিনটের ঘণ্টা পড়লে ক্লাশ পালিয়ে চলে আসব। তারপর বোর্ডিং থেকে গোবর্ধনদাকে ডেকে নিয়ে দীপাদির 'বাতিঘরে' চলে যাব। আবার স্কুল ছুটির ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব বোর্ডিং-এ। তাহলে হেডমাস্টারমশাই টের পাবেন না।

কিন্তু ক্লাশেই শুনলাম, হেডমাস্টার আনন্দবাবু পাশের গাঁয়ে স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপারে মিটিং করতে বেরিয়ে যাবেন। তাহলে চন্দ্রাদিও গান গাইতে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। আর আমি অনেকক্ষণ ধরে দীপাদিকে নির্ভয়ে কবিতা শোনাতে পারব।

গোবর্ধনদাকে নিয়ে হাজির হলাম বাতিঘরে। দীপাদি গুড়, নারকেল, মুড়ি দিয়ে বলল, আগে পেট পুজো হোক, তারপর সরস্বতীর পুজো হবে।

স্কুল ছুটির পর ফলারটা বেশ জমল। আমার দরকার ছিল না, কিন্তু গোবর্ধনদা চেয়ে চেয়ে মুড়ি নারকেল খেল।

দীপাদি হেসে বলল, তোমাকে গাছ থেকে নারকেল পেড়ে দিয়ে যেতে হবে কিন্তু। আমার স্টক খালি হয়ে এসেছে।

নারকেল চিবোতে চিবোতে গোবর্ধনদা বলল, তুই কি আমাকে বাঁদর পেয়েছিস? প্রতিবার তোর গাছের নারকেল পেড়ে দিয়ে যেতে হবে?

তুমি বাঁদর হতে যাবে কেন, তুমি তো বীর হনুমান।

খাওয়া শেষ হলে আমি দুরু দুরু বুকে একটি করে কবিতা পড়তে লাগলাম। প্রতিটি কবিতা পড়ার শেষে দীপাদি মন্তব্য করে চলল, তুই এত ভাল কবিতা লিখতে পারিস হাবলু! সত্যি, এ তোর লেখা! মাস্টারমশাইদের কাউকে দেখিয়েছিস?

এমনি নানা ধরনের উচ্ছ্বসিত মন্তব্যের ভেতর দিয়ে কিশোর কবির কবিতা পাঠ শেষ হল।

উত্তেজনায় কাঁপছিল সারা মন। দীপাদির প্রশংসা শুনে মনে হল, আমি বই-এ ছাপার অক্ষরে যে সব কবিদের নাম পড়ি তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন একটা পার্থক্য নেই।

গোবর্ধনদা মন দিয়ে কোন কিছু শুনতে গেলেই চোখ দুটো বন্ধ করে গালে ঠেকনো দিয়ে শুনবে। আমার কবিতা শোনার সময়েও তাই। শেষে মন্তব্য, ছেলেটার হবে।

দীপাদির বাড়ি থেকে ওঠার আগে গোবর্ধনদা বলল, তুই মুখে মুখে দু'একটা ছড়া বানিয়ে দীপাকে শুনিয়ে দে তো। হ্যাঁ, তোর কবিতার খাতাটা আমাকে দে, এখন থেকে ওটা আমার কাছেই থাকবে। তুই ছেলেমানুষ, কোথায় হারিয়ে-টারিয়ে ফেলবি।

অতি যত্নে ঝেড়েঝুড়ে গোবর্ধনদা খাতাখানা মহামূল্য সম্পদের মত বগলে পুরল।

সেসময় খুব কবিগানের ধুম পড়েছিল। দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী কবির লড়াই খুব জমে উঠত। আমি জানতে পারলেই রাতে গোবর্ধনদাকে উত্যক্ত করে ঠেলেঠুলে নিয়ে যেতাম। এটা সম্ভব হত শুধু গোবর্ধন-নিবাসে থাকার জন্য।

ঐ কবির লড়াইয়ের প্রেরণা থেকেই মুখে মুখে কবিতা বাঁধতে শিখেছিলাম। কয়েকটা মিল দেবার পরেই দারুণ একটা প্রেরণা পেলাম মনের মধ্যে। উঠতে বসতে ক্লাশের বন্ধু আর মাস্টারমশাইদের নিয়ে দারুণ সব মজার মজার মিল মাথায় গজিয়ে উঠত।

পণ্ডিতমশাই রেগে গেলেই আমাদের গো-জাতীয় প্রাণী বলে সম্বোধন করতেন।

আমি টিফিন পিরিয়ডে বন্ধুদের সামনে পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে ছড়া বানালাম।

'বলুন বলুন পণ্ডিতমহাশয়—
মনুষ্য যদি 'গৌ-গাবৌ-গাবঃ' হয়,
তাহলে পণ্ডিতমশাই কি ঐ দলে নয়?'

বন্ধুরা মহা খুশী হল। যারা পণ্ডিতমশায়ের বেত খেয়ে প্রতিদিনই প্রায় কাতর হত তারা স্কুল ছুটির পর মাঠ ঘাট পেরিয়ে বাড়ি ফেরার সময় চীৎকার করে এই ছড়াটি বলে বলে যেত। হয়ত কিছুটা মনের ঝাল মিটত এতে।

কিন্তু বিপদ এল অন্যদিকে দিয়ে। একদিন পাশের গ্রাম থেকে স্কুলে আসছিলেন এক মাস্টারমশাই। ছেলেরা আগে আগে চলেছে, তিনি প্রায় নিঃশব্দে পেছনে পেছনে। এমন সময় সেই তিন ছত্র কবিতা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করল একটি ছেলে।

'বলুন বলুন পণ্ডিতমহাশয়—
মনুষ্য যদি 'গৌ-গাবৌ-গাবঃ' হয়,
তাহলে পণ্ডিতমশাই কি ঐ দলে নয়?'

সমবেত গলায় ছেলেরা ধুয়া ধরল,—'নিশ্চয়, নিশ্চয়'।

পরের দিন হৈ-হৈ কাণ্ড। আমাদের ক্লাশের সব ছেলেকে হেডমাস্টার-মশায়ের ঘরে যেতে হল। সেখানে আনন্দবাবুকে ঘিরে পণ্ডিতমশাই এবং আরও দু'চারজন বয়স্ক মাস্টারমশাই বসেছিলেন। সকলের মুখই গম্ভীর।

আনন্দবাবু আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে ছড়া কেটেছিলে তোমরা?

আমরা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কে লিখে দিয়েছে তোমাদের এ কবিতা?

কারো মুখে কথা নেই, সকলেই মুখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পণ্ডিতমশায়ের ধারণা, কোন বয়স্ক ব্যক্তি তাঁকে হেনস্থা করবার জন্যেই এ কাজ করেছে।

হেডমাস্টারমশাই কঠিন সুরে বললেন, চুপ করে থাকলে প্রচণ্ড শাস্তি পেতে হবে কিন্তু। ক্লাশের সমস্ত ছেলেকে আমি ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দেব।

তবুও সকলে চুপ। কেউ আমার নাম বলে দিয়ে আমাকে শাস্তির মুখে ঠেলে দেবে না।

আনন্দবাবুর গলায় এবার অন্য সুর, তোমাদের একতা দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি, কিন্তু অন্যায়ের জন্য আমার ছাত্ররা একতা দেখাবে, এ আমি ভাবতেও পারছি না। এই স্কুল যখন জাতীয় বিদ্যালয় ছিল তখন ছেলেরা সত্যের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারত। তোমরা সামান্য সত্য কথাটুকু বলতে পারছ না! আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। বললাম, আমাকে শাস্তি দিন, এদের কোন দোষ নেই। আমিই কবিতাটা লিখেছি।

এই কবিতাটার মানে কি? আমি তো পুরো অর্থটা বুঝতে পারিনি।

আমি মাথা নীচু করে আছি দেখে বললেন, ভয় নেই, তোমার দ্বিতীয় লাইনটার মানে বুঝিয়ে বল।

মুখ তুলে বললাম, পণ্ডিতমশাই আমাদের খুব সুন্দর করে সবকিছু বুঝিয়ে দেন, কিন্তু এতেও যারা বুঝতে পারে না তাদের উনি কিল মারতে মারতে বলেন, গরুর পাল, আর স্কুল আসা কেন, মাঠে চরে খা

গে যা। তাই…।

বুঝেছি, বুঝেছি। পণ্ডিতমশায়ের কাছে ক্ষমা চাও সবাই। উনি ক্ষমা করে দিলে আমাদের কিছু বলার নেই।

পণ্ডিতমশাই যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠেন তেমনি ফস্ করে নিভে যান। আমরা নত হয়ে হাতজোড় করে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতেই তিনি দারুণ প্রসন্ন হয়ে বললেন, আরে তোদেরকে গরু বললে কি তোরা সত্যি সত্যি গরু হয়ে গেলি নাকি? ওটা একটা কথার কথা। যা, কালকের ধাতুরূপগুলো মুখস্থ কর গে যা। নইলে আবার মাঠে চরতে পাঠাব।

হেডমাস্টারমশাই ভূতভাবন পণ্ডিতমশায়ের কথা শুনে হাসি চাপতে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। আমরা হেডমাস্টারমশায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এ ঘটনাটা ঘটেছিল দীপাদির বাড়ি থেকে কবিতা শুনিয়ে আসার কয়েক-দিন পরে। দীপাদির বাড়িতে সেদিন গোবর্ধনদার আদেশে একটি কবিতা মুখে মুখে রচনা করে শুনিয়েছিলাম। ঐ ভূতভাবন পণ্ডিতমশাইকে নিয়েই।

আমাদের ভূতভাবন পতিতপাবন
গুণের নাইকো সীমা,
ড্যাম কুড়াকুড় ডাড্ডা নাকুড়
দ্রুম্ তা দ্রিমা দ্রিমা,
আ-মরি গুণের নাইকো সীমা।
ওহো হো পিঠ যে গেল দম লাগিল
পড়ছে পিঠে শিল,
নারে না শিল ওটা না
পড়ছে পিঠে কিল
ভূতভাবনের কিল।
আমাদের ভূতভাবন পতিতপাবন
গুণের নাইকো সীমা,
বেজায় আঠাল কিলিয়ে কাঁঠাল
বানিয়ে দিল কিমা।

কবিয়ালদের যেমন শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে অভিনয় করে ছড়া কাটতে দেখেছি, ঠিক তেমনি করে ওদের দুজনের সামনে আমার সদ্য বাঁধা ছড়াটা আবৃত্তি করে শোনালাম।

আবৃত্তি শেষ হলে হৈ-হৈ করে উঠল গোবর্ধনদা। দীপাদি হাঁ হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমি তো ভাবতেই পারছি না, আমাদের হাবুলু এটা মুখে মুখে বানাল।

বললাম, মিছে বলব না দিদি, ক'দিন থেকে মাথায় দু'চারটে লাইন ঘুরছিল, আজ মোটামুটি আস্ত একটা ছড়া বানিয়ে দিলাম।

দীপাদি আর কোন কথা বলল না। ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। আমরা

বসে আছি তো আছি। বেশ কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে আমার হাতে একটা ফাউণ্টেনপেন দিয়ে বলল, তোর পুরস্কার। এটা আমার খুব প্রিয় জিনিস। লণ্ডন থেকে একজন এনে আমাকে উপহার দিয়েছিল। তুই এটা যত্ন করে রেখে দে। তোর কবিতা অসম্ভব ভাল লেগেছে আমার।

ফাউণ্টেনপেন তখন গ্রামে একেবারে দুর্লভ জিনিস। আমাদের এক আত্মীয় কলকাতা থেকে এসেছিলেন। তাঁর কাছে এই অপূর্ব বস্তুটি দেখেছিলাম। আজ দীপাদির কাছ থেকে উপহার পেয়ে ধন্য হয়ে গেলাম।

আমি দীপাদিকে প্রণাম করতে দীপাদি ছোট ভায়ের স্নেহে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

গোবর্ধনদাকে প্রণাম করতে যেতে পা'টা শূন্যে তুলে বলল, ভাল করে ধুলো ঝেড়ে নে।

এই পা তুলে প্রণাম আদায় করার একটা ইতিহাস আছে। একদিন গোবর্ধনদার সঙ্গে আমরা গাঁয়ের রাস্তা ধরে যাচ্ছিলাম এমন সময় আমাদের সামনে একটি দৃশ্য দেখলাম। একটি বৃদ্ধ যাচ্ছিলেন আমাদের আগে আগে। উল্টো দিক থেকে তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন একটি মাঝবয়সী ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধ সামনে পরিচিত ব্রাহ্মণটিকে দেখে হাতজোড় করে নমস্কার করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের নীচু হয়ে প্রণাম করার ক্ষমতা নেই মনে করে ব্রাহ্মণটি দয়াপরবশ হয়ে একটি পা শূন্যে তুলে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো মুছে নিয়ে মাথায় ঠেকালেন।

সেদিন আমরা সারা পথ ওঁদের নিয়ে আলোচনা করছিলাম আর দোষী সাব্যস্ত করেছিলাম দুজনকে।

আমরা দীপাদির বাড়ি থেকে সেদিন ভারী খুশি খুশি মন নিয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু কিছু দিনের ভেতরেই এই ফাউণ্টেনপেনকে কেন্দ্র করে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। এই আকস্মিক অঘটনের জন্য আমি যতটা দায়ী ছিলাম, তার চেয়ে বেশি দায়ী ছিল দীপাদি। আমি জানতাম না দীপাদি কতখানি আবেগপ্রবণ ছিল। এই ফাউন্টেনপেন তাকে যিনি উপহার দিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই দীপাদিকে ভালবেসেই দিয়েছিলেন। কিন্তু দীপাদি সেদিন মুখে মুখে আমার কবিতা রচনার ক্ষমতা দেখে আবেগে ঐ উপহারের জিনিসটি আমাকে দিয়ে দিলে। পরে গোবর্ধনদার কাছ থেকে দীপাদি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জেনেছিলাম। দীপাদি তার বাবার সঙ্গে কখনো কখনো মিটিং-এ যেত। ঐসব মিটিংএ তার বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা নাকি অভিভূত হয়ে পড়ত। দেশের মুক্তির জন্য তার অন্তরের আকুলতা ছড়িয়ে পড়ত শ্রোতাদের অন্তরে।

গোবর্ধনদা নাকি সে সব মিটিংএ দেখেছে, বক্তৃতা শেষে দীপাদি যখন আঁচল পেতে দেশের কাজের জন্য চাঁদা চাইত তখন ঘোমটা পরা গাঁয়ের বউঝিরা তাদের কানের দুল, নাকের নথ খুলে দিয়ে যেত। টাকা পয়সা, সোনা রূপোর গয়না পোঁটলা বেঁধে নিয়ে আসত দীপাদি। তারপর স্বদেশী ফাণ্ডে জমা করে দিত।

যেমন আবেগপ্রবণ তেমনি উদার মন দীপাদির। একপাল পোষ্য আছে তার। পশুপক্ষী আর মনুষ্য। সকালের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতিঘরের উঠোনে কাক, শালিক আর চড়ুইএর আবির্ভাব হয়। দীপাদি বাসি ভাত, কোনদিন বা চালডাল ছড়িয়ে তাদের ভোজের ব্যবস্থা করে দেয়। নুলো আর ভোলা সারা দিন রাত পাহারা দেয় বাতিঘরের চারদিক ঘুরে ঘুরে। তাদের দু'তিন বার ভুরি ভোজের ব্যবস্থা। এক আধ-পাগলা জমাদারনী আছে। সে ঘুরে ঘুরে বাবুদের বাড়ি ময়লা সাফ করে। দুপুর-বেলা মেথর পাড়ায় ফেরার সময় সে বাতিঘরে এসে হাঁক দেবে, ও বড় মা, আমাকে খেতে দে, বড় ভোক পেয়েছে।

রোজ তার জন্যে অনেকখানি ভাত রান্না করে রাখতে হয়।

দীপাদির ওপর জোর করে কথা বলার কেউ নেই। হেডমাস্টার আনন্দবাবু শান্ত স্বভাবের মানুষ। ছাত্রদের ভালবাসেন আপন সন্তানের স্নেহে। কিন্তু কোন অন্যায় করলে তাঁর কাছ থেকে কঠিন শাস্তি পেতে হয়। তখন তাঁর মূর্তি আগুনের মত জ্বলতে থাকে। সেই আনন্দবাবু দীপাদির কাছে শিশুটি হয়ে যান। তাঁর খাওয়া পরা, চলা বলা, রোগ শোক, সবই নিয়ন্ত্রণ করে দীপাদি। তখন দীপাদি আনন্দবাবুর সত্যিকারের মায়ের ভূমিকাটি নেয়।

সেই আমাদের দীপাদি আবেগের বশে তার ছোট ভায়ের মত হাবলু চন্দরকে তার উপহার পাওয়া কলমটি দিয়ে বসল। এতে তার কতখানি ন্যায় কি অন্যায় হল তা বুঝল না সে।

একদিন একটা চিঠি নিয়ে আমাকে যেতে হল বড় বাড়িতে। বিষ্ণুপ্রসাদের জ্ঞাতিগোত্র, আত্মীয়-স্বজন ঐ বাড়িকে কয়েক পুরুষ আগে থেকেই বড় বাড়ি নামে ডাক দিয়ে এসেছে।

দীপাদি চিঠিখানা আমার হাতে দিতে গিয়ে বলল, তুই একবার বড় বাড়িতে নীরজার হাতে এ চিঠিটা দিয়ে আসতে পারবি?

নীরজা জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার দিদি। বিষ্ণুপ্রসাদের সবচেয়ে ছোট মেয়ে। এমন সুদর্শনা সহজে চোখে পড়ে না।

আমি যদিও ও বাড়ির অন্দরমহলে বড় একটা যাই না আজকাল, তবু দীপাদির একটা কাজ করে দেবার আনন্দে বললাম, পারব না কেন, দাও, এখুনি দিয়ে আসছি।

আর কারো হাতে দিবি না কিন্তু।

মাথা নেড়ে বললাম, সে তোমাকে শেখাতে হবে না।

বড়মা যদি জানতে চায় কেন এসেছিস, কি বলবি?

নীরজাদিকে দেখতে এসেছি।

সে কি রে! সত্যি তুই একটা হাব্লা।

কেন, নীরজাদি তো তোমার বন্ধু, তুমি কি জান না নীরজাদি দেখতে কত সুন্দর!

দীপাদি মুখ টিপে হেসে বলল, সে তো আমি জানি, তা বলে তুই একটা

ব্যাটা ছেলে হয়ে শুধু সুন্দরী একটা মেয়েকে দেখতে যাবি? এটা একটা জবাব হল?

তাহলে কি বলতে হবে বড়মাকে, বলে দাও।

দীপাদি কিছু না বলে তার পড়ার ঘরে ঢুকে গেল। একটু পরে বেরিয়ে এল হাতে একখানা বই নিয়ে। আমার হাতে বইটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, এবার বল, বড়মাকে কি বলবি?

বললাম, আর বলে দিতে হবে না।

বল না হাবুলা (দীপাদি ক্ষেপে গেলে হাবলু না বলে গোবর্ধনদার মত হাবুলা বলে)।

টেনে টেনে বললাম, বলব, দীপাদি এই বইটা নীরজাদিকে দিতে বলেছে। কবে বইটা ফিরিয়ে নিতে আসব তাও জেনে যেতে বলেছে।

বইটা ফেরৎ নেবার কথা হঠাৎ তোর মাথায় গজিয়ে উঠল কেন?

সে তুমি বুঝবে না।

বল না হাঁদারাম।

বললাম, বড়মা যদি বলে, বইটা আমাকে দিয়ে যা আমি দিয়ে দেব, নীরু স্নানে গেছে। তখন বড়মার হাতে বইটা ধরিয়ে দিয়ে ফিরতে হবে না? তাইতো নীরজাদির কাছ থেকে বই ফেরতের দিনটা জেনে যাবার কথা জুড়ে দিলাম।

দীপাদি একঝলক হাসি হেসে আমার পিঠে হাত চাপড়ে বলল, তোকে যে হাঁদা বলে সে নিজেই হাঁদারাম।

এরপর গেলাম বড় বাড়িতে। সামনে সানাইঘর। আর তার পাশেই যাত্রার আসর। পুজো-পার্বণে এখানেই যাত্রা অনুষ্ঠান হয় ক'দিন ধরে। পাল্কি করে জ্ঞাতির বাড়ির মেয়েদের আনা হয় যাত্রার আসরে। জাপানী চিকের আড়ালে থেকে মেয়েরা যাত্রা অনুষ্ঠান দেখেন। তাঁদের ওপরে গোলাপজল ছড়ানো হয়। সুদৃশ্য ঝকঝকে ডাবরে সাজা পান এনে পরিবেশন করা হয়। আমরা ছোটবেলা পাল্কিতে মা পিসিমার সঙ্গে এখানে কতবার আসা-যাওয়া করেছি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যখন জাতীয় বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন মুকুন্দদাস (চারণ কবি) দলবল নিয়ে। ক'দিন ধরে স্বদেশী যাত্রার আসর বসেছিল এখানে। বিপুল দর্শকদের নিয়ন্ত্রণ করছিল স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকরা। সে সময় নাকি মেয়েদের আসর থেকে চিকের আড়াল সাময়িক ভাবে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

স্বদেশী উন্মাদনার যুগে বিষ্ণুপ্রসাদ এক সময় পারিবারিক আব্রুপ্রথা তুলে দিয়েছিলেন! বাবুরবাজারে স্বদেশী মিটিং হতো মাঝে মাঝে। এক সময় বিষ্ণুপ্রসাদ বাড়ির মেয়েদের একে একে বাজারে নিয়ে গিয়ে সবার সামনে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করেন।

বড়মা হেঁকে বলেছিলেন, বাড়ির মেয়েরা হেঁটে যাবে না, আসবেও না। তুমি নিয়ে যেতে চাও তো পাল্কিতে নিয়ে যাবে আবার পাল্কিতেই বাড়ি পৌঁছে দেবে।

তাই করেছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ। মশারী ঢাকা পাল্কি থেকে মেয়েরা মিটিং-এর জায়গায় নেমে স্বাধীনতার পক্ষে দু'চার কথা বলল, তারপর ঐ পাল্কির ভেতর টুক করে ঢুকেই প্রস্থান। এতেই নাকি উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে।

দুটো বিশাল আকারের বিলিতি পামগাছ সদরদরজার দু'দিকে দাঁড়িয়ে। দরজার দু'পাশে কাছারিবাড়ি আর দরোয়ানদের থাকার আস্তানা। বাঁদিকে ঘোড়াশালা। ঢুকতে গেলে চোখে পড়ে দেওয়ালের গায়ে পেতলের কাজ করা ঢাল আর আড়াআড়ি দুটো করে তলোয়ার। বিষ্ণুপ্রসাদ পিতার আমলের অনেক আড়ম্বরই ছাঁটকাট করে ফেলেছিলেন। ঢালধারীদের উপযুক্ত অর্থ দিয়ে বিদেয় করলেও ঢাল তলোয়ার যথাস্থানে থেকে গিয়েছিল। রুপোর আশাসোটাধারীকেও বিদেয় নিতে হয়েছিল একদিন।

দ্বিতীয় মহল পেরিয়ে তৃতীয় মহলের দরজায় ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলাম। বুড়ি হরিদাসী পাহারায় বসে।

কে যায় ?

পিতৃপরিচয় দিয়ে বললাম, নীরুদিদির সঙ্গে দেখা করব।

হরিদাসী খ্যানখেনে গলায় মুখী ঝিকে ডেকে বলল, খোকাবাবুকে ছোট দিদিমণির ঘরে পৌঁছে দে।

মুখী ঝি-এর সঙ্গে নিরুদিদির ঘরে পৌঁছে দেখি, একমনে নীরুদি গোলাপী আভার একটা জামায় লেস্ বসাচ্ছে। বড় বড় চোখ দুটো আটকে আছে ছুঁচের ওপর। হলুদেটে সোনার জলে যেন রঙ করা হয়েছে প্রতিমার শরীর। আঙুলগুলো ঠিক কনকচাঁপার মত।

মুখী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁকল, ছোটদিমণি, এনার সঙ্গে কথা বল।

পদ্মের পাপড়ির মত দুটো চোখ মেলে তাকাল নীরুদি। প্রথমে চোখে লাগল বিস্ময়ের ঘোর, তারপর সেই বিস্ময়ের ওপর ফুটে উঠল মিষ্টি হাসির ঝিলিক।

কি মনে করে হাবলুবাবু ? আরে দাঁড়িয়ে কেন ঐ পালঙ্কের ওপরেই বস।

পালঙ্কের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে সামনে শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর পোশাক রেখে সূচি-কর্ম করছিল নীরুদি।

আমি কাজকরা মস্তবড় পালঙ্কখানার এক কোণে বসলাম।

আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নীরুদি বলল, কতদিন পরে তোকে দেখলাম হাবলু। তুই এরই ভেতর অনেক বড় হয়ে গেছিস।

এই তো গত বছর রাসমঞ্চ ভাঙার সময় আমি তোমাকে দেখেছি। রাসদণ্ডটি মাটি থেকে উপড়ে তার মাথার ঐ সাজানো ময়ূরটি তোমাকে কে যেন এনে দিল। তুমি সেটা নিয়ে চলে গেলে।

তুই ছিলি সেখানে ? তোকে কিন্তু আমি একবারও দেখিনি।

দেখবে কি করে; তোমার ঐ চোখ দুটো তো ময়ূরের ওপর ছিল।

ঠিক বলেছিস, ছোটবেলা থেকে আমার ঐ শোলার ময়ূরটার ওপর ভারী লোভ। কলকাতা থেকে আনার পর আমি দেখতাম না। একেবারে রাসমঞ্চে

গিয়ে দেখতাম। তারপর মণ্ড ভাঙা হলে ময়ূরটি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতাম। এখনও তাই করি।

তাহলে তোমার অনেকগুলো জমেছে বল ?

দেখবি, আয়।

দোতলার ওপরেও একতলার মত সারি সারি কাজ করা বিশাল আকারের থাম শ্বেতপাথর বিছানো বারান্দার ছাদটাকে ধরে রেখেছে। নীরুদির পেছনে পেছনে আমি গানের হলঘরটা পেরিয়ে এলাম। সারি সারি বাদ্যযন্ত্র, পোশাক পরে, কেউ বা ফরাসের ওপর শুয়ে, কেউ বা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। যন্ত্রী, গায়ক দুজনেই গরহাজির। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার আগে বিষ্ণুপ্রসাদ পশ্চিমের ওস্তাদদের বাড়িতে রেখে গান শিখতেন। এখন তাঁর কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু নেই।

নীরুদির সঙ্গে সিঁড়ি পেরিয়ে আমি চিলেকোঠায় উঠে এলাম। নামে চিলেকোঠা, কিন্তু তৈরী হয়েছে একটি প্রশস্ত ঘরের আকারে। নীরুদি চাবি খুলে ঢুকে পড়ল। আমাকে বলল, ভেতরে আয়।

আমি একটা আলৌকিক জগতে এসে পড়লাম। কোন্ দিকে তাকাবো বুঝতে পারলাম না। যেদিকে তাকাই সেদিকেই রূপের জগৎ। দেয়াল জুড়ে কাচের পাল্লা লাগানো আলমারির সারি। তার ভেতর কত যে পুতুল তার হিসেব নেই। অন্নপূর্ণা শিবকে ভিক্ষে দিচ্ছেন। সিংহের ওপর বসে আছেন জগদ্ধাত্রী। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ বনে চলেছেন। দশমুণ্ডধারী রাবণ গদা হাতে দাঁড়িয়ে।

আর একটাতে কেষ্টনগরের মাটির পুতুল। বেড়াল মাছ মুখে ছুটছে। মিষ্টির থালা সাজিয়ে বসে আছে ময়রা। আলমারির একটা থাকে সব রকমের ফল সাজানো। কে বলবে মাটির তৈরী! হাতে তুলে খেলেই হয়। অন্য একটাতে যত রকমের তরিতরকারি সাজানো।

পাশের আলমারি ভর্তি বিলিতি পুতুল। সাহেব, মেম। ছাতা মাথায় চলেছে মেমসাহেব। ক্রুশবিদ্ধ যীশু। সাহেব, মেমসাহেব কোমর আর হাত ধরে নাচছে। দু'রকমের মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে।

আরও অজস্র পুতুল, নানা ভাবের নানা রূপের।

নীরুদি বলল, এই দেখ, সেই ময়ূর।

একটা কাঠের পাটাতন দেওয়াল জুড়ে, তার ওপর রাখা হয়েছে সাত-আটটা শোলার ময়ূর। যেমন রঙ, তেমনি কাজ। চোখ ফেরান যায় না। প্রতি বছরই একটু ভিন্ন ধরনের।

আমি মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছি দেখে নীরুদি বলল, নিবি একটা, নে না। যেটা তোর পছন্দ সেটা তুলে নে।

সত্যি, আমি নেব ?

মিথ্যে বলছি নাকি।

একটা ময়ূর প্রায় চোখ বন্ধ করেই তুলে নিলাম। সব ক'টাই স্বপ্নের ময়ূর।

আমরা আবার ফিরে এলাম নীরুদির ঘরে।

এতক্ষণ মেতেছিলাম ময়ূরের ব্যাপারে এখন আসল কথাটা মনে পড়তেই পকেট থেকে দীপাদির চিঠিখানা বের করে দিলাম। বইটা দেবার দরকার ছিল না, কারণ বড়মার মুখোমুখি পড়তে হয়নি

দীপাদিকে বেশ নিবিষ্ট হয়ে চিঠিখানা পড়তে দেখলাম।

ইতিমধ্যে বড়মা ঘরে ঢুকেই আমার দিকে চেয়ে বললেন, কে বাছা ?

নীরুদি আমার পরিচয় দিতে না দিতেই বড়মা বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি, কমলবাবুর ছেলে। কত অল্প বয়সে বিমলা তিন ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছে। ছোটবেলা ও কতবার মা'য়ের সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছে। হ্যাঁ বাবা, তোমার মা কোথায় ?

আমি বড়মাকে প্রণাম করে বললাম, চকবাড়িতে ঠাকুমার কাছে গিয়ে আছে। জমিটমির কি যেন সব ব্যবস্থাপত্র করছে।

তুমি রয়েছ কার কাছে ?

আমি এখন বোর্ডিংয়ে রয়েছি বড়মা।

আজ তোমার নীরুদিদির সঙ্গে এখানে খাওয়াদাওয়া করবে। আমি এখুনি তোমাদের জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বড়মার আচরণ এত স্বাভাবিক, তাঁর কথার জোর এত বেশী যে আমার মত একটা ছেলের পক্ষে না বলা সম্ভব ছিল না।

বড়মা বেরিয়ে গেলে নীরুদি বলল, থেকে যা হাবুলু, আজ তো তোর স্কুল বন্ধ।

ঠিক আছে, এবেলা বড়মার কাছেই খাব, কিন্তু তুমি উত্তরটা লিখে রেখো, আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। অন্য আর একদিন আসতে হবে না।

নীরুদি মিষ্টি মিষ্টি হেসে আমার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, হ্যাঁরে, আমার এখানে আর একবার আসতে হলে তোর খারাপ লাগবে ?

নিজের ভুলটা শুধরে নিয়ে বললাম, না-না, খারাপ লাগবে কেন, তোমার কাছে আসতে পারলে আমার খুব ভাল লাগবে। আমি ঐ উত্তর নেবার জন্যে আবার আসার কথা বলছিলাম।

আমি লিখে রাখব, তুই যখন যাবি তখন তোর হাতে দিয়ে দেব।

বড়মার তত্ত্বাবধানে ভালই জলযোগ হল। পুরনো দিনের অনেক গল্প করলেন। স্বামী বিষ্ণুপ্রসাদের বিচিত্র স্বভাবের গল্প হল।

একবার নাকি বিষ্ণুপ্রসাদ শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন এক অদ্ভুত অবস্থায়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কিরকম !

তোমরা তো জান না তোমার জ্যাঠামশাইকে। যেটা মাথায় ঢুকল সেটা নিয়েই পড়লেন। গান্ধীজী বলেছেন, 'নিজের কাজ নিজে কর। কোন কাজ অসম্মানের নয়।' উনি অমনি বেদ-বাক্যির মত তাই মেনে নিলেন। তখন আমি বাপের বাড়িতে রয়েছি। আমার বড় মেয়ে শৈল সবে জন্মেছে। পাল্কি, মোটর, ট্রেনে করে যেতে হয় আমার বাপের বাড়ি। খবর পাঠান হল এ

বাড়িতে। আমার শাশুড়ী নাতনীর জন্যে এক ট্রাঙ্ক জিনিস বোঝাই করে, বেয়াই-বেয়ানের জন্যে মিষ্টি ইত্যাদি তাতে পুরে ছেলের হাতে পাঠালেন।

চাকরবাকর, গোমস্তা সঙ্গে গেল। ট্রেনে উঠেই ওদের বিদেয় করে দিলেন। ট্রেন থেকে নেমে ভারী ট্রাঙ্কখানা কুলির মাথায় চাপালেন। রেলের কুলি তিন মাইল হেঁটে গাঁয়ের ভেতর যাবে না। তাই চোদ্দ-পনের বছরের একটা ছেলেকে যোগাড় করা হয়েছিল। কিছু পথ হাঁটার পর রোগাপটকা ছেলেটা কোমর বেঁকিয়ে চলতে লাগল। তার অবস্থা দেখে ভারী কষ্ট হল তোমার জ্যাঠার। ছেলেটাকে ডবল মজুরী দিয়ে বিদেয় করলেন। তখনও দু'মাইল পথ হাঁটতে হবে। মুগুর ডাম্বেল ভাঁজা শরীর। হ্যাঁচকা টানে মাথায় তুলে নিলেন ট্রাঙ্ক। গান্ধীজীর বাক্য মনে মনে স্মরণ করে এসে পৌঁছলেন শ্বশুরবাড়ির দরজায়।

এ দৃশ্য আমার বাবাই প্রথম দেখেছিলেন। তিনি কাজের লোকদের না ডেকে নিজেই জামাইয়ের মাথা থেকে ট্রাঙ্ক নামিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কথা চাপা থাকেনি, গাঁয়ের ভেতর দিয়ে মোট বয়ে যাবার দৃশ্য অনেকেরই চোখে পড়েছিল। ঠাট্টা সম্পর্কের ঠাকুমা আর শালীদের অনেক টিপ্পনি শুনতে হয়েছিল ওঁকে।

বললাম, সত্যি, জ্যাঠাবাবুর তুলনাই হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে বড়মা বললেন, কেন, ঐ যে তোমাদের হেডমাস্টার আনন্দবাবু, তাঁরও কি তুলনা হয় নাকি। জীবনটা দেশের কাজে উৎসর্গ করে বসে আছেন। ওঁর কাছে যে ছেলে পড়বে সেই ধন্য হয়ে যাবে। দেশকে সত্যিকারের ভালবাসতে শিখবে। বিন্দু-ঝি এসে জ্যাঠাইমাকে ডেকে নিয়ে গেল। মন্দিরে পুজোয় বসে ঠাকুরমশাই কি যেন একটা উপকরণ পান নি। বিন্দু-ঝি কেবলমাত্র ঠাকুরবাড়ির কাজের জন্যই নিযুক্ত। কিন্তু সংসারের যে কোন খুঁটিনাটিতে জ্যাঠাইমাকে ছাড়া কারো একটি পা-ও চলা অসম্ভব।

দুপুরে নীরুদি আর আমি একসঙ্গে খেতে বসলাম ওপরের দালানে। বোর্ডিংয়ের একঘেয়ে খাবার পর বড়মার রান্না খেয়ে দারুণ ভাল লাগল। খাওয়ার শেষে নীরুদি আর আমি গল্প করতে লাগলাম।

নীরুদি বলল, উত্তরের তিনটে ঘরে আমাদের আত্মীয়রা থাকেন। ওঁদের দেখবার কেউ নেই। বাবার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। ওঁদের দেখাশোনার জন্য মা আছে, তাছাড়া একজন ঝি সারাক্ষণ নিযুক্ত।

এরপর নীরুদি আমাকে নীচে নিয়ে গিয়ে উত্তর দিক আর দক্ষিণ দিকের দুটো ঘর দেখাল। উত্তর দিকের ঘরে চারটি বুড়িকে দেখলাম। দক্ষিণের ঘরে দুটো বুড়ো। এরা সারাজীবন এ বাড়িতে কাজ করেছে। সংসার করতে বলা হয়েছিল কিন্তু এরা করেনি। তাই বুড়োকালে মা এদের এখানে রেখে দিয়েছে। ঝি-চাকরদের ওপর কড়া হুকুম আছে, ওদের যত্ন করে দেখাশোনা করতে হবে। কেমন করে গুছিয়ে কাজ করতে হয় তা ওদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। নতুন ঝি-চাকর বহাল হলে ওদের কাছে গিয়ে কাজের পাঠ নিতে হবে।

পশ্চিমের দুটো প্রান্তে গোশালা আর ঘোড়াশালা। সেখানে মুসলমান সহিসের সঙ্গে অন্য খিদমৎকারও রয়েছে। কিন্তু শুনে আমার অবাক লাগল, গরু বুড়ো হলে তাকে ব্যাপারীর কাছে বেচে দেওয়া হয় না। অক্ষম, অসুস্থ, বুড়ো গরুগুলো অন্য পশুদের মত সমান পরিচর্যা পায়। দুটো হরিণ, দুটো ময়ূর, গোটা চারেক কাকাতুয়া, গোটা কুড়ি লাল সাদা খরগোশ, টিয়ে, ময়না, বুলবুলি আর একঝাঁক পাখি নিয়ে ছোট্ট একটা চিড়িয়াখানা।

দু'চার বছর আগে যখন মায়ের সঙ্গে এসেছিলাম তখন উঁকিঝুঁকি মেরে দেখেছি। এখন নীরুদির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ভাল করে দেখলাম।

ওপরে উঠে এসে নীরুদি বলল, চল, পিসিমার কাছে তোকে নিয়ে যাই। এতক্ষণে খাওয়ার পাট চুকে গেছে।

বললাম, পিসিমা কি এখানেই থাকেন ?

বার বছরে বিধবা হয়ে সেই যে বাপের বাড়িতে রয়ে গেছে আর শ্বশুর-বাড়িমুখো হতে হয়নি। বাবাকে বড় পিসিমাই তো বুকেপিঠে মানুষ করেছে। বাবারও দিদি অন্ত প্রাণ। কোথাও যাওয়ার সময় দিদির পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেওয়া চাই। আবার ফিরে এসে সবার আগে দিদির ঘরে ঢোকা চাই। তাকে সব খবরাখবর দিয়ে তবে অন্য কাজ। ভাইফোঁটার দিন আসিস, দেখবি পিসিমার আদরের ঘটা। এতখানি বুড়ো ভাইকে শুধু ফোঁটা দেওয়া নয়, পাশে বসিয়ে এক এক গ্রাস মুখে তুলে খাওয়াবে। এমনকি নিজের হাতে প্রত্যেকটা কাঁটা বেছে দেবে।

এত বয়সেও পিসিমা কাঁটা দেখতে পান ?

ছোট্ট সরু ছুঁচে সুতো পরিয়ে দিতে পারে একবারের চেষ্টায়।

সত্যি অবাক কাণ্ড !

নীরুদি বলল, আজ তোকে পিসিমার মুখে গল্প শোনাব। তাঁর নিজের বিবাহিত জীবনের ছোট্ট একটুকরো কাহিনী।

বললাম, চল চাই।

চল।

নীরুদি আর আমি পিসিমার ঘরের সামনে এসে হাজির হলাম।

নীরুদি হেঁকে বলল, পিসিমা, কাকে এনেছি দেখ।

এদিকে বারান্দায় আয়। কে এসেছে রে ?

কমলকাকার ছেলে, হাবলু।

আমার অতি ছোটবেলায় বাবা মারা গেছে, সুতরাং বাবার নামটা ঝট করে জ্ঞাতি পিসিমার মনে পড়ার কথা নয়। বৃহৎ গুষ্টির সবার নাম সকলের মনে রাখা সম্ভবও নয়।

পিসিমা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, কমলের ছেলে, নিয়ে আয়, কাছে নিয়ে আয়। আহা, কত অল্প বয়সে কমল চলে গেল।

আমি এগিয়ে গিয়ে রীতি অনুযায়ী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। থুতনি ধরে চুমু খেলেন পিসিমা। বললেন, বস বাবা বস।

বারান্দায় মাদুর পাতা ছিল, আমি আর নীরুদি তার ওপর বসলাম।

হিরন্ময়ীর সঙ্গে ছোটবেলায় তোমাদের বাড়িতে কত খেলেছি। আমরা ছিলাম সমবয়সী। ভারী বন্ধুত্ব ছিল দুজনের। কোনো কোনোদিন রাতে ও আমার এখানে থেকে যেত আবার কোনোদিন আমি ওর কাছে। তোমাদের বাড়ির পঞ্চচূড় মন্দিরে ভোর চারটেতে আরতি হত। কীর্তনিয়ারা কীর্তন গাইত। আমি আর হিরন্ময়ী বিছানা ছেড়ে পা টিপে টিপে নেমে যেতাম নীচে। আরতি শেষ হলে মন্দির প্রদক্ষিণ করে সামনের বকুল গাছের তলায় ফুল কুড়োতাম। কি মিষ্টি যে গন্ধ বকুল ফুলের। ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় সে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। গোলাপ বাগানের পাশের ঘরটা থেকে অবনীকাকার সেতারের আওয়াজ শোনা যেত। হেমন্তকাকা সঙ্গত করতেন। সেসব দিনের কথা কি ভোলা যায়। আজ তাঁদের একজনও আর জীবিত নেই।

আমি নীরুদির পিসিমার স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হয়ে উঠলাম। আমার বড় পিসিমা হিরন্ময়ী যে নীরুদির পিসিমার বন্ধু ছিল তা জানতাম না। আমার মেজ আর ছোট ঠাকুর্দা সেতার, তবলা, গান আর নানা ধরনের শিল্পকর্ম নিয়ে থাকতেন।

পিসিমা এবার বললেন, তোমার বাবা এক নম্বর বাবু ছিল। এইটুকু স্কুলে আসতে, সাজানো সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। না হলে পাল্কিতে। সেই ছোটবেলাতেই ঘোড়াকে আমাদের চারদিকে এলোমেলো ছুটিয়ে ভয় দেখাত।

বললাম, নীরুদি বলছিল, আপনি নাকি ভাল গল্প বলতে পারেন, একটা শোনান না পিসিমা।

নীরুদি অমনি বলল, সেই পিসেমশায়ের গল্পটা বল।

সে তো কতবার শুনেছিস।

হাবলু শোনে নি। ওকে একবার শোনাও।

পিসিমা বললেন, এ আমার মন্দ ভাগ্যের কথা বাবা, শুনতে চাও তো বলছি।

এগারোতে পড়েছি তখন, বিয়ে হয়ে গেল। মস্ত জমিদার আমার শ্বশুর-মশায়, পেল্লাই বাড়ি, লোকজনে জমজমাট। সুন্দরবনে তিন হাজার বিঘে জমি, দেশে তো আছেই। আমার স্বামী শ্বশুরমশায়ের একমাত্র ছেলে। দুটি মেয়ের আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

বিয়ের পর বাবাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই শ্বশুরবাড়ি যাব না। অনেক আদর করে, সোনার মুকুট পরিয়ে, আমার পছন্দের দু'তিনজন ঝিকে সঙ্গে দিয়ে পাঠানো হল। আমি যে খুব তাড়াতাড়ি বাপের বাড়ি ফিরে আসব সে কথাও বোঝানো হল।

সেখানে আদর যত্নের কমতি ছিল না। কিন্তু আমি রোজ কেঁদে ভাসাতাম। মুখে সেই এক বুলি, বাবার কাছে যাব।

আমার এক খুড়শাশুড়ী আমাকে সঙ্গে নিয়ে শুতেন। তিনি বলতেন,

হ্যাঁগো বাপসোহাগী মেয়ে, এটাই তোমার বাড়ি, সারা জীবন এখানেই তোমাকে কাটাতে হবে।

এরই ভেতর এক রাত্তিরে বর এল আমার সঙ্গে কথা বলতে। খুব সুন্দর দেখতে ছিল আমার বর। তখন ঐ সুন্দর দেখার মন বা চোখ কোনোটাই ছিল না। সে আমার কাছাকাছি এলে আমি তাকে বললাম, শুনছেন বিনোদবাবু, আপনার ঐ যে কালো মা না কে যেন, উনি কিন্তু মোটেই লোক ভাল না।

আমার বরটির মুখে হাসি লেগে আছে। বলল, কেন, কালো মা কি বলেছে তোমাকে?

ওর হাসি দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। তবু বললাম, আমাকে নাকি সারা জীবন এখানেই কাটাতে হবে।

আমার বরটি এবার শব্দ করে হেসে উঠল। তারপর বলল, তোমার বুঝি এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না?

বললাম, একটুও না।

এবার বর আমার অনেক কাছে সরে এসে বলল, আমাকে কি তোমার একটুও পছন্দ হয়নি?

রাগে তখন ফুঁসছি, বললাম, না, একটুও না।

নীরুদি ফুটুনি কাটল, সত্যি পিসিমা বরকে কি তোমার একটুও পছন্দ হয়নি?

আরে তখন বরের কিই বা বুঝি, সারা মন জুড়ে সঙ্গীসাথীদের হারাবার হাহাকার। বাবা মাকে চোখের সামনে দেখছি না, মাথা ঘুরছে তাই।

এখন শোন, বর আমার উত্তর শুনে আবার একচোট হেসে নিল। বলল, তাহলে আমি তোমার ঘর থেকে বিদেয় হচ্ছি। পাঠিয়ে দিচ্ছি কালো মাকে।

ও বেরিয়ে যাচ্ছিল দেখে ছুটে গিয়ে পেছন থেকে হ্যাঁচকা টান দিলাম ওর পাঞ্জাবিতে। রাগটা বোধহয় বেশী ছিল, তাই চড়চড় করে ছিঁড়ে গেল সিল্কের পাঞ্জাবিটা। ও কিছু বলল না। শুধু ফিরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে শান্ত চোখে চেয়ে রইল।

অন্যায় করে ফেলেছি জেনে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রবোধ দিতে এল। আমি ওর চুল এলোমেলো করে দিয়ে বুকে দু'চারটে কিল মারলাম। ও উঠতে যাচ্ছিল দেখে ওর হাত টেনে বসিয়ে রাখলাম।

ও শান্ত গলায় বলল, তুমি তো আমাকে ভালবাস না, তাহলে আমি তোমার কাছে বসে থাকব কেন?

বললাম, তোমাকে সারারাত আমার কাছে বসে থাকতে হবে। আমি তোমাকে ছাড়ব না।

চোখে ঢাকা দিয়ে আবার কাঁদতে লাগলাম।

নীরুদি বলল, শেষের কান্নাটা কেন কাঁদলে পিসিমা? কেনই বা শেষটায় পিসেমশাইকে ছাড়তে চাইলে না?

পিসিমা অমনি বললেন, তুই ভারী ফচকে হয়েছিস নীরু।

বলই না পিসিমা ?

সে কি আর এতদিন পরে মনে আছে রে। মানুষটাই চলে গেল।

নীরুদি বলল, আমি বলছি শোন। তুমি মানুষটির ওপর অনেকগুলো অন্যায় পর পর করে গেলে, কিন্তু তিনি তোমাকে কিছু না বলে শান্ত হয়ে রইলেন। তাই ভেতরে ভেতরে তোমার একটা অনুশোচনা হচ্ছিল। তারপর পিসেমশাই যখন কালো মাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার কথা বললেন তখন তুমি ভাবলে, তোমার ঐ বরটি তোমার খুড় শাশুড়ীটির চেয়ে অনেক ভাল। তাই সুন্দর মানুষটাকে কাছে রাখতে চাইলে।

পিসিমা নীরুদির দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

আমি বললাম, পিসিমা, আপনার জীবনের এই গল্পগুলো শুনতে খুব ভাল লাগছে। আপনি পর পর বলে যান।

এরপর শুধু একটি দুঃখের স্মৃতি বাবা। সেবার বাবার কাছে এসে শুনলাম, আমাকে এখন বেশ কিছুদিন শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে না। কথাটা শুনে এত খুশি হলাম যে কি বলব। কিন্তু একসঙ্গে দুজনে এসেছিলাম, এখন একা ও ফিরে যাবে শুনে খুব কষ্ট হল। ওকে এই ঘরটাতে একান্তে পেয়ে বললাম, তুমি চলে যাবে কেন ?

ও হেসে বলল, তুমি আমাকে ভালবাস না বলে।

কে বলেছে তোমাকে ? আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।

সত্যি ?

বললাম, জান, আমি তোমাকে আমার ডল পুতুলটা দিয়ে দিতে পারি। কাউকে ওটা আমি দিই না।

সে প্রলোভনেও কিন্তু তোর পিসেমশাইকে দু'এক দিনের বেশি আটকান গেল না। 'তুমি ডাকলে আবার আসব' বলে চলে গেল।

পিসিমা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এরপর অন্য একটা পর্ব। জমিদার গিরিজাশঙ্করদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক মামলা। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন গিরিজাশঙ্করের জামাই। বাবা তাঁর দৌহিত্র। গিরিজাশঙ্কর এবং আমার ঠাকুমা মারা গেলেন একই সঙ্গে একই দিনে গিরিজাশঙ্করের বাড়িতে বিসূচিকা রোগে। ঠাকুর্দাও ছিলেন সেখানে। মা-হারা ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাড়ি চলে আসেন। এদিকে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর গিরিজাশঙ্কর পুত্র কামনায় দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন, তাঁরও সন্তানাদি ছিল না। পরে এই দ্বিতীয় স্ত্রী একটি দত্তক গ্রহণ করে প্রচার করেন, গিরিজাশঙ্করই পুরোহিতদের সমক্ষে পূজা পাঠের মাধ্যমে গোত্রান্তর করিয়ে দত্তক গ্রহণ করেন।

এই ব্যাপারে, এবং আরও কিছু আইনগত ব্যাপারে দুই পরিবারের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মামলা বাধে। রাধানগরের বিশাল দীঘি এবং সংলগ্ন কয়েক শত বিঘে জমি নিয়ে কয়েকবার উভয়পক্ষের লেঠেলদের মধ্যে লড়াই হয়ে

যায়। নিম্ন কোর্ট এবং হাইকোর্টের রায়ে আমার বাবা রাধানগরের দীঘি ও সম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু মামলা এইখানেই থেমে থাকেনি, প্রিভি কাউনসিল পর্যন্ত গড়ায়। শেষে সে মামলায় বাবারই জয় হয়। আমার বিয়ের সময় এই জয়ের খবরটা আসে। তাই বাবা রাধানগরের দীঘি এবং সংলগ্ন কিছু জমি আমার নামে কয়েক মাসের মধ্যে উইল করে দেয়। বাবার ধারণা হল, আমি পয়মন্ত। পিতৃকুলের মর্যাদা আমারই জন্য রক্ষা পেয়েছে।

এই আনন্দটিকে সম্পূর্ণ করবার জন্য বাবা এক পরিকল্পনা ফেঁদে বসল। একটি ছোট্ট বজরা তৈরি করা হল। ঐ বজরাতে তার মেয়ে জামাই তাদের প্রথম সংসারটি শুরু করবে। বজরাটি ভাসল রাধানগরের দীঘিতে।

আমার স্বামী ছোটবেলা থেকেই সুন্দরবনে যেত শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে। বন্দুক ছোঁড়ায় ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। আমাদের রাধানগরের দীঘির একদিকে হোগলা, শর আর উলুখাগড়ার বন ছিল। ঐ পারে অজস্র বড় বড় গাছ ডালপালা মেলে লতায় পাতায় জড়াজড়ি হয়ে জঙ্গল সৃষ্টি করেছিল। অনেক পাখি ঐসব গাছে বসবাস করত। তাছাড়া বিশেষ ঋতুতে জলচর পাখিরা উড়ে এসে দীঘির অনেকখানি জায়গা জুড়ে ভেসে বেড়াত। এইসব পাখি শিকার করবে বলে বাবার পরিকল্পনায় বিশেষ উৎসাহিত হল আমার স্বামী। আমরা নির্দিষ্ট দিনে কয়েকজন মাঝি আর দাঁড়ীর সঙ্গে কাজের দু'চারজন ঝি চাকর নিয়ে রওনা দিলাম।

প্রথম দিনটা বড় আনন্দে কাটল। আমরা দু'একজন বিশ্বস্ত লোক নিয়ে রইলাম বজরায়। অন্যেরা খড়ের তৈরি টানা চালা ঘরের মধ্যে। রান্নাবান্না, খাওয়া দাওয়া হল ঠিক যেন বনভোজনের মত। আমি দৌড়োদৌড়ি করে সবাইকে সাহায্য করতে লাগলাম। তোর পিসেমশাই বন্দুক ছুঁড়ে উড়ো পাখি শিকার করল। কয়েকটা বালি হাঁস। তারই মাংস রান্না হল। খাওয়া দাওয়ার পরে বজরার ছোট্ট ঘরটিতে বিশ্রাম করলাম। বিকেলে দুজনে অনেকখানি বেড়ালাম। ঝাঁক ঝাঁক হাঁস উড়ে এসে পড়ছিল জলে। পানকৌড়ি কালো ডানা ঝাপটে রুপোর দানার মত জল ছিটিয়ে উড়ে গিয়ে বসল গাছের ডালে। শেষ বেলায় শত শত পাখির ডাকে সারা দীঘি চঞ্চল হয়ে উঠল। সন্ধ্যায় আমরা বেড়িয়ে ফিরলাম। গাছের ফাঁকে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ উঠল।

এই পর্যন্ত বলে পিসিমা একটু থামলেন।

নীরুদি বলল, তুমি যেন কি দেখেছিলে রাতে ?

হ্যাঁ, ঐ পুব দিকের গাছ-গাছালির জটলার মধ্যে দেখেছিলাম। তখন তোর পিসেমশাই বাঁশি বাজাচ্ছিল। কি সুন্দর সে সুর কি বলব। জলের ওপর দিয়ে কেঁপে কেঁপে সে সুর চলে যাচ্ছিল এক পার থেকে অন্য পারে।

আমি পুব দিকে চেয়ে ছিলাম। জলে আমাদের বজরা, একটু দূরেই গাছগাছালির জটলা। হঠাৎ আমার মনে হল, এতক্ষণ গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার যে ছক দেখছিলাম তা কিছুটা বদলে গেল। ঐ আলোর ছক-গুলোর ভেতরে কালো কালো কটা মূর্তির মত দেখলাম। ও বাঁশি বাজাচ্ছিল,

তাই ওকে না ডেকে আমি ছোট্ট ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়ালাম। আমি ঐ ছায়ামূর্তিগুলোকে নড়াচড়া করতে দেখলাম। কিছু পরে ছায়াগুলো সরে গেল। আমি ঘরে এসে ওর বাঁশি থামলে ওকে সে কথা বললাম। ও বাইরে এসে দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু তখন ঐ ছায়াগুলো ছিল না।

তোর পিসেমশাই আমাকে বলল, সুন্দরবনে গিয়ে ও এমনি অনেক আলো ছায়ার খেলা দেখেছে। হাওয়ায় গাছের ডালপাতা নড়ে উঠলে চাঁদের আলোয় এমনি কত কি মনে হয়।

পরের দিন কিন্তু তোর পিসেমশায়ের সঙ্গে আমার একটা মনান্তর ঘটল। সেদিনটা ছিল কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন। হাবলুদের বাড়িতে ওদিন আমাদের সমস্ত জ্ঞাতিদের পাত পড়ত। লক্ষ্মীর মাথার দুদিক থেকে দুটো হাতি শুঁড়ে অমৃত কলস ধরে দাঁড়াত। গজলক্ষ্মীর পুজো হত খুব ধুমধাম করে। আমি সারা রাত থাকতাম ওর বড়পিসি হিরন্ময়ীর কাছে।

হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, তোর পিসেমশায়ের সঙ্গে সেদিন খুব একচোট কথা কাটাকাটি হল। আমি বললাম, লক্ষ্মী পুজোর দিনে শিকার করা চলবে না।

তোর পিসেমশায় বলল, ছাড় তো এসব। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর সবকিছু মানতে গেলে জীবহত্যা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের ভেতর একটি দিনও করা চলবে না।

এরপর অনেকক্ষণ আমার জেদ এবং ওর, জেদ ভাঙানোর জেদ, চলল। তারপরেই কথা বন্ধ। ও সব আয়োজন করেও শিকারে গেল না। পাছে কাজের লোকেরা কিছু ভাবে তাই খাওয়া-দাওয়া করলাম দুজনে। আমার নির্দ্দেশে নিরামিষ রান্নাই হয়েছিল সেদিন। সে রাতে আমরা দুজনেই কেবল রইলাম বজরাতে।

রাতে জাগার কথা হয়েছিল আগে, কিন্তু মনান্তরের পরে দুজনেই বিছানা নিলাম। আমি ঘরের জানালা দিয়ে সেই পুব দিকেই চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের ভেতরেই আমরা চোখে পড়ল, গত রাতে দেখা ছবি। ঠিক যেন গাছের ফাঁকে মানুষের ছায়া নড়ে বেড়াচ্ছে।

আমি ওর সঙ্গে আগে কথা বলব না বলে ওকে আর ঐ দৃশ্য দেখার জন্য ডাকলাম না।

এরপর কখন ঘুম এসে গেল চোখে তা জানতেও পারিনি। হঠাৎ মাঝ রাতে একটা শব্দে আমার গাঢ় ঘুমটা ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে আমি বিছানায় উঠে বসলাম। তোর পিসে পাশে নেই। আমি ঘর ছেড়ে নৌকোর পাটাতনের ওপর ছুটে এলাম।

এই পর্যন্ত বলে কতক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন পিসিমা। নীরুদি কিংবা আমি তাঁকে কোনরকম প্রশ্নই করতে পারলাম না। একসময় পিসিমা নিজেই কথা শুরু করলেন, চারদিক তখন কোজাগরী পূর্ণিমার আলোয় ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ আওয়াজ পেয়ে জলের হাঁসগুলো তরাসে চীৎকার করে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। তোদের পিসেমশাই পুব দিকে মাথা করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে

পাটাতনের ওপর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পোশাক। আমি চীৎকার করে চৈতন্য হারিয়ে তারই পাশে গড়িয়ে পড়লাম।

বজরাটা ডাঙার থেকে বেশ খানিকটা তফাতে থাকলেও কাছির সঙ্গে বাঁধা ছিল। সেই কাছি ধরে লোকজন বজরাটাকে ডাঙায় টেনে ভেড়াল।

আমি মূর্ছা ভেঙে একসময় উঠে বসলাম। তখন সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।

প্রবল ঔৎসুক্যে আমি পিসিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি করে মারা গেলেন পিসেমশাই ?

আজও আমার কাছে সেটা রহস্য হয়ে আছে বাবা। কেউ কেউ বলে, তারা দুটো গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। আমি অনেক ভেবেছি। হয়ত এমনও হতে পারে মোকদ্দমায় হেরে গিয়ে শত্রুপক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারা চরের মুখে আগাম খবর পেয়েছিল আমাদের বজরা-বিহারের। আমি যাদের আলোছায়ার ভেতর দেখেছিলাম তারা হয়ত আমাদের প্রতিপক্ষের লোক। ঘুরে ঘুরে, গাছের আড়ালে আবডালে থেকে সুযোগ খুঁজছিল। তোমাদের পিসেমশায় হয়ত তাদের দেখতে পেয়ে বন্দুক নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ভয় দেখাবার জন্যে শূন্যে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু গাছের আড়াল থেকে ওরা একেবারে ফাঁকায় পেয়ে একটি গুলিতেই তাদের প্রতিশোধের কাজ হাসিল করে নেয়। তাই হয়ত দুটো গুলির আওয়াজ কানে গিয়েছিল আমার লোকজনদের। আবার এও হতে পারে, আমাদের মনোমালিন্যের ফলে উনি এতই আহত হন যে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। নিজেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। কিন্তু আমি আজও ভেবে পাই না, একটি কিশোরীর সঙ্গে পরিণত বুদ্ধির যুবকের সাধারণ মনোমালিন্যের ফলে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।

আমি বললাম, পিসেমশায় যদি আত্মহত্যাই করবেন তাহলে দুবার গুলির শব্দ শোনা গেল কেন ? একবারেই তো যথেষ্ট। পিসিমা বললেন, এমনও হতে পারে, একটি গুলিই ফায়ার হয়েছিল। তার প্রতিধ্বনি উঠেছিল পুব দিকের উঁচু পাড়ে। তাই দুটো গুলির আওয়াজের মত মনে হয়েছিল। আবার আর একটি সম্ভাবনার কথাও আমার মনে হয়েছে। তোমাদের পিসেমশায় রাগ করে নিয়ম ভাঙার জন্যে কোজাগরীর রাতেই পাখিদের লক্ষ্য করে হয়ত প্রথম গুলিটা ছুঁড়েছিল। তারপর দ্বিতীয় গুলিটা নিজের বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়েই করেছে।

সে যাই হোক দীঘির পশ্চিম তীরে গাছ-গাছালির আড়ালে চাঁদটা লাল হয়ে অস্তে গেল। আর পুব দিকে গোলাকার সূর্যটা উঠল লাল হয়ে। সেই রক্তভরা আকাশের তলায় বজরার ওপর পড়ে রইল ওর রক্তমাখা দেহটা। এ ছবি আজও আমার ঘুম কেড়ে নেয় বাবা।

আমরা সেদিন পিসিমার ঘর থেকে বড় কষ্টে বেরিয়ে এসেছিলাম।

নীরুদি বলল, চল, দীপার চিঠির জবাবটা লিখে দি। তোকে তো আবার ফিরতে হবে।

আমি নীরুদির ঘরে বসলাম। নীরুদি চিলে কোঠায় গেল চিঠি লিখতে।

ওখানেই নাকি থাকে তার লেখাপড়ার সাজ-সরঞ্জাম।

কিছুক্ষণ পরে ও নেমে এল। আমার হাত থেকে বইখানা টেনে নিয়ে তার ভেতর চিঠিখানা পুরে আমাকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বইখানা দেখল।

আরে এ যে 'গোরা'।

হাঁ, দীপাদি বইটা সঙ্গে দিয়েছিল। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে যেন আমি বইটা তোমাকে দিতে এসেছি বলে বলি। তার আর দরকার হল না।

খুব দরকার, রেখে যা আমার কাছে, আমি আবার পড়ব। হাঁ, চিঠিটা দে, বইটা যে রেখে দিলাম তা লিখে দি।

চিঠিটা বের করে দিলাম। বইটা নীরুদির টেবিলে রাখলাম।

নীরুদি চিঠি নিয়ে চিলে কোঠায় উঠতে যাচ্ছিল, আমি বললাম, কলমের দরকার? আমার কাছে আছে, দিচ্ছি দাঁড়াও।

নীরুদি বলল, তুই কি কালির দোয়াতও পকেটে নিয়ে ঘুরিস নাকি রে?

আমি পকেট থেকে ফাউণ্টেনপেনটা বের করতে করতে বললাম, তার আর দরকার হবে না। এই নাও, লিখে গেলেই হল।

ফাউনণ্টেনপেনটা হাতে নিয়েই কেমন যেন হয়ে গেল নীরুদি। আমার দিকে চেয়ে বলল, কোথায় পেলি এটা তুই?

বললাম, একজন আমাকে দিয়েছে।

কে দিয়েছে বল না?

এমন ধমকের সুরে কথাটা বলল নীরুদি যে আমার খুব খারাপ লাগল। আমি যেন ওকে কলমটা লিখতে দিয়ে অপরাধ করে ফেলেছি।

বললাম, তোমার বন্ধু দীপাদি আমাকে উপহার দিয়েছে।

তোকে উপহার দিয়েছে।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, চুরি ডাকাতি করে আনিনি আমি। দস্তুর মত কবিতা রচনা করে ওকে শুনিয়ে তবে এটা পেয়েছি।

কলমটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, রাখ তোর কাছে।

গলাটা বেশ গম্ভীর। এবার ঘর থেকে বেরিয়ে চিলে কোঠার দিকে উঠতে লাগল।

আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি মারলাম। দেখি ওপরে উঠতে উঠতে নিজের লেখা চিঠিখানা নীরুদি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল। কি হল রে বাবা, ভাবতে ভাবতে আমি ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নীরুদির নেমে আসার শব্দ পেলাম। ঘরে ঢুকে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, তুই কিছু মনে করিসনি হাবলু, হঠাৎ আমার মাথাটা কি রকম গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

তারপর টেবিলে রাখা বইখানার ভেতর চিঠিটা ঢুকিয়ে বলল, নিয়ে যা।

আমি বললাম, তুমি যে বইটা রাখতে চেয়েছিলে?

দরকার নেই। সময় পেলে আবার আসিস।

এখন গলার স্বর গম্ভীর হলেও কোমল।

বললাম, তোমার কাছে আর আসব না, এলে বড়মার কাছে আসব।

নীরুদি আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল, অমনি দিদির ওপর রাগ হয়ে গেল। তোরা সবাই আমার কাছ থেকে সরে গেলে আমি বাঁচি কি করে বলতো?

কথা বলতে বলতে হঠাৎ চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল নীরুদির। কেন যে এমন ভাবান্তর, আমি কিছুই বুঝলাম না। আমি অমনি বললাম, তোমার কাছেই আসব নীরুদি। তোমার চিলে কোঠার ঐ ময়ূরগুলো আবার আমি দেখব। ছেলেবেলা থেকে ওদের ওপর আমার বড় লোভ।

নীরুদি আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, এ বছর থেকে রাসের ময়ূর তুই নিবি।

সে কি নীরুদি, তোমার এত শখের ময়ূর আমি নিতে যাব কেন!

আমি নিজেই তোকে ভালবেসে দিচ্ছি হাবলু। তুই যাতে ওটা রাসের শেষে পেয়ে যাস সে ব্যবস্থা আমি করে দেব।

বেরিয়ে এলাম বড় বাড়ি থেকে। বাতিঘরে যেতে যেতে কেবলই ভাবছিলাম, নীরুদির হঠাৎ ভাবান্তরের কারণ কি। দীপাদিকে প্রথম চিঠিখানা লিখে তা আবার কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল কেন? দ্বিতীয় চিঠিখানাতেই বা কি লিখল নীরুদি? ফাউনটেনপেনটাই যত গোল বাধালে, কিন্তু কেন?

বোর্ডিং পেরিয়ে বাতিঘরের দিকে যাবার মুখে গোবর্ধনদার গলা পেলাম, এই যে নবাব, সারাদিন ডুব মেরেছিলে কোথায়? অগত্যা গোবর্ধন-নিবাসে যেতে হল। বললাম, দীপাদি বড় বাড়ির নীরুদির কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল, তাই দিতে গিয়ে আটকা পড়ে গেলাম। ও বাড়ির বড়মা কিছুতেই ছাড়লেন না। খেয়ে আসতে হল।

অমনি গলে গেল গোবর্ধনদা, কি খেলি রে? একেবারে সকাল থেকে দুপুর, সব কটা বলে ফেল।

বললাম, চিরতার জল দিয়ে শুরু।

আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা। তুই ওই হাকুচ তেতো জলটা গিললি।

ওখানে গিলতে হয় না গোবর্ধনদা, গেলান হয়। ও বাড়ির নিয়ম। যত বড় অতিথি হোন না কেন, তাঁকেও জলযোগের আগে ওটির স্বাদ নিতে হয়।

এখন বল কি খেলি?

খান পনের চাউস লুচি। সঙ্গে এক জামবাটি আলুর দম। চারটে জিলিপি, চারটে রসগোল্লা। খানিকটা ক্ষীর। শেষে এক চুমকী জল ঢক ঢক করে গিলে পিত্তি রক্ষে হল।

গোবর্ধনদা রসগোল্লার মত চোখ করে বলল, বলিহারি তোর পিত্তি রক্ষে। তারপর?

তারপর আর নাইবা শুনলে। বারোয়ারী কিচেন থেকে দু'রকম ভাজা, সুক্তো, ডাল, কুমড়োর ঘ্যাঁট আর চাটনি এল। এদিকে বাসমতীর ভাত, ঘি লেবু, ডিমের বড়া, মৌরলার চচ্চড়ি, গলদা চিংড়ির মালাইকারি। আর কি চাও?

শোন তবে, আজ ছুটির দিনে আমরা কি খেয়েছি। চারকুচি ঢ্যাঁড়স ভাজা, হলুদ গোলা জলের মত দু'হাতা ডাল। কাটোয়ার বুড়ো শুকনো ডাঁটার চচ্চড়ি। গুলে মাছের অম্বল।

বললাম, যার যেমন কপাল।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তারপর তোর নীরুদি তার বন্ধুর কাছে কি সন্দেশ পাঠাল রে ?

খবর যে পাঠিয়েছে, তুমি জানলে কি করে ?

তুই যে বললি, দীপার চিঠি নিয়ে গিয়েছিলি। চিঠি দিলে উত্তর দেবে না, এও কি হয়। ওরা যে প্রাণের বন্ধু রে।

তুমি জানো বুঝি ?

গোবর্ধনদা বলল, সেই ফ্রক পরা মেয়ে দুটো বাশুলি মন্দিরের চাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি দিব্য চোক্ষে এখনও দেখতে পাচ্ছি। ও দুটো আমাকে কি কম জ্বালিয়েছে।

কি রকম ?

গোবর্ধনদা বালিকা গলার অনুকরণ করে বলল, গোবর্ধনদা, আমাদের সোনামুখি গাছের দুটো ডাব পেড়ে খাওয়াবে ? কাঁচপোকার টিপ এনে দেবে ? রথের মেলায় যাচ্ছ, একরকম দুটো বটুয়া মণি (পয়সা কড়ি রাখার সুন্দর ছোট্ট কাপড়ের ব্যাগ) এনে দেবে ?

পরে বড় হয়ে যখন কাপড় পরতে শুরু করল তখন আরও জ্বালাতন। টাউনে যাচ্ছ, দুটো শাড়ি আনবে একরকম। সব সময় কি জোড়ায় জোড়ায় জিনিস মেলে। একদিন ধমকে বললাম, তোদের জন্যে আমি এক জোড়া যমজ পাত্র খুঁজছি, তাদের হাতে তোদের তুলে দিয়ে তবে আমার নিষ্কৃতি।

ওদের ভেতর দীপাটা একটু বেশি ডানপিটে, নীরু অতটা নয়। তবে এরকম বন্ধুত্ব আমি খুব কম দেখেছি। যেখানে নীরু বেড়াতে গেছে সেখান থেকে সব চেয়ে ভাল জিনিসটা এনেছে দীপার জন্যে। আবার নীরু যখন মাসখানিক জ্বরে ভুগল তখন দীপা সারা রাত জেগে তার সেবা করল।

আমার মনের ভেতর যে কৌতূহল ছিল সেটা এই ফাঁকে বলে ফেললাম। দীপাদিকে লেখা নীরুদির প্রথম চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলা, আমার ফাউনটেনপেনখানা হাতে নিয়ে নীরুদির কেমন যেন হয়ে যাওয়া।

গোবর্ধনদা বলল, দেখি নীরুর চিঠিখানা।

তুমি অন্যের চিঠি পড়বে গোবর্ধনদা।

ওরা কি আমার পর, আর ওদের কোন কথাটাই বা আমার জানতে বাকী।

বই-এর ভেতর থেকে চিঠিখানা বের করে দিলাম। গোবর্ধনদা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে খানিকটা কি ভেবে নিয়ে বলল, এবার বোধহয় ওদের এতদিনের বন্ধুত্বের ভাঙনটা আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কেন গোবর্ধনদা ?

গোবর্ধনদা অমনি নীরুদির চিঠিখানা আমাকে শুনিয়ে পড়তে লাগল।

দীপা,

বন্ধুত্ব হওয়াটা সহজ কিন্তু তাকে রক্ষা করা খুবই কঠিন। একটু দেরীতে হলেও আজ আমার সে উপলব্ধি হয়েছে। তুমি আমার বন্ধুত্ব সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলেছ তার জবাব দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি না। বরং উল্টো প্রশ্নটাই আমি তোমার কাছে তুলতে পারি কিনা একটু ভেবে দেখো! সব শেষে অনিরুদ্ধদার চিঠি পেয়েছি কিনা জানতে চেয়েছ। তার খবর মনে হয় আমার চেয়ে তুমিই জান বেশি। অকারণে আমার কাছে তার খবর জানতে চেয়ে কেন তুমি আমাদের এতদিনের বন্ধুত্বের মাঝখানে আঘাত হানতে চাইছ!

—নীরু

চিঠি পড়া শেষ হলে বললাম, আমি এর কিছুই বুঝলাম না গোবর্ধনদা।

তুই বুঝবি কি করে, তুই কি এসবের কিছু জানিস। তবে শোন, দীপার কাছ থেকে উপহার পাওয়া তোর ঐ ফাউনটেনপেনটাই যত নষ্টের মূল।

কেন গোবর্ধনদা?

আরে এখন তো বুঝতে পারছি অনিরুদ্ধ বিলেত থেকে এসে দীপাকে গোপনে ঐ পেনটা উপহার দিয়েছে। আর নীরু ঐ পেনটা অনিরুদ্ধের কাছে কোনো সময় দেখে থাকবে। আজ তোর কাছে ঐ পেনটা দেখে নীরু নিশ্চয় অবাক হয়ে গিয়েছিল?

ঠিক বলেছ গোবর্ধনদা। আগে একটা চিঠি লিখে আমাকে দিয়েছিল। তারপর একটা কথা যোগ করার জন্যে যেই চিঠিটা নিয়ে আবার পড়ার ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে, অমনি আমি বললাম, এই নাও কলম। আমার কাছে কলমটা দেখেই, আমি কোথায় পেয়েছি জানতে চাইল। সহজ ভাবেই আমি জানিয়ে দিলাম কে আমাকে কলমটা উপহার দিয়েছে। ব্যস, নীরুদির মুখখানা হঠাৎ যেন কি রকম হয়ে গেল। এরপর প্রথম চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দ্বিতীয় আর একখানা চিঠি লিখে আমার হাতে দিলে।

ঠিক ধরেছি আমি। জানিস হাবলা, দুজনের বন্ধুত্বের মাঝখানে যদি তৃতীয়পক্ষ এসে জোটে তাহলে অঘটন একটা ঘটবেই।

বললাম, অনিরুদ্ধদার খুব নাম করেন মাস্টারমশাইরা। খুব নাকি ভাল রেজাল্ট করেছিলেন।

হ্যাঁ, আমরা নীচের ক্লাশগুলোতে একসঙ্গে পড়েছিলাম। ক'বছর ফেল করতে করতে আমি ওর থেকে পিছিয়ে পড়ি। ও ছিল আমাদের স্কুলের সেরা ছেলে।

এখন কি করছেন?

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে ঢুকেছে। উড়িষ্যায় পোস্টেড। কোনো একটা মহকুমার এস. ডি. ও।

নীরুদি আর দীপাদির সঙ্গে জানাশোনা আছে বুঝি?

আরে, নীরুর বাবার সাহায্যেই তো ওর এতটা উন্নতি। অনিরুদ্ধের বাপ-

ঠাকুর্দা বিষ্ণুপ্রসাদদের প্রজা ছিল। জমি ভাগে চাষ করত। অবস্থা একটুও ভাল ছিল না। কিন্তু খুব ছোট থেকে অনিরুদ্ধের পড়াশোনাতে মগজের পরিচয় পাওয়া যায়। কি করে যেন বিষ্ণুপ্রসাদের কানেও খবরটা পেঁছে যায়। অমনি অনিরুদ্ধের সব দায়দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে নেন। তারপর ধাপে ধাপে অনিরুদ্ধ এখন প্রতিষ্ঠার চূড়ায়। ওর বিলেত যাবার খরচ খরচাও শুনেছি বিষ্ণুপ্রসাদই দিয়েছিলেন।

খুব ভাল হয়েছে।

আরে ভাল তো হয়েছে, কিন্তু তার ঠেলা যে অনেক।

কি রকম?

তুই ছেলেমানুষ, বুঝবি না।

বল না গোবর্ধনদা?

কেউ পাশে না থাকলেও গোবর্ধনদা গলা নামিয়ে বলল, এখন বিষ্ণুপ্রসাদের বাড়িতে এই নিয়ে হাঙ্গামা চলেছে। বিষ্ণুপ্রসাদের ইচ্ছে, নীরুর সঙ্গে অনিরুদ্ধের বিয়ে হোক। নীরুরও সেই ইচ্ছে। অনিরুদ্ধ আর নীরুর ভেতর চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও আছে। কিন্তু বেঁকে বসেছেন নীরুর মা।

বড়মা তো খুব ভালমানুষ।

কে না বলছে, তবে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তাঁর গোঁড়ামি আছে। অনিরুদ্ধের বাপ-ঠাকুর্দা কেবল তাঁদের প্রজা বলে নয়, ওরা ভিন্নজাতের মানুষ বলে। বিষ্ণুপ্রসাদ সমাজ মানেন না, তিনি গান্ধীজীর মত আর পথ মেনে চলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে আত্মীয়স্বজন, সমাজ, বন্ধু নিয়ে সংসার করতে হয়। বিষ্ণুপ্রসাদ সংসারের কিছুই দেখেন না। এতবড় স্টেটের সব দায়িত্ব তাঁর স্ত্রী নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এমন কি দেশের কাজ করতে গিয়ে বিষ্ণুপ্রসাদের অগাধ ঋণের ভার তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ধীরে ধীরে ঋণ শোধও করে যাচ্ছেন বলে শুনেছি। তাই ঘরের ভেতরে তাঁরই জোর বেশি। তিনি নাকি বলেছেন, আমি অনিরুদ্ধকে মানুষ করার জন্য টাকা যুগিয়ে গেছি, ওকে জামাই করার জন্যে নয়।

গোবর্ধনদা অনেকগুলো কথা উজাড় করে দিয়ে থামল। আমি বললাম, অনিরুদ্ধদার সঙ্গে নীরুদির সম্পর্কটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু দীপাদির সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা কি রকম?

তুই আবার নীরুকে এসব বলে ফেলবি কোনোদিন।

তোমার মান যাবে এমন কাজ আমি প্রাণ গেলেও করব না।

আমার পিঠ চাপড়ে গোবর্ধনদা বলল, ঐ জন্যে আমি তোকে এত ভালবাসি। ঠিক দেখিস, তোর একদিন উন্নতি হবেই হবে!

কথাবার্তায় ছেদ ফেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল গোবর্ধনদা। আমিও আর কিছু বললাম না।

এক সময় নিজেই বলে উঠল, আমাদের আনন্দবাবুর ছাত্র তো অনিরুদ্ধ, তাই ছাত্র অবস্থা থেকেই হেডমাস্টারমশায়ের কোয়ার্টার্সে ওর যাতায়াত।

তাছাড়া দীপাই বল আর নীরুই বল, আজ যে ওরা ভালভাবে শিক্ষিত হয়েছে, তার মূলে কিন্তু অনিরুদ্ধ। এখানে যখন ছাত্র ছিল তখন দুজনকে পড়িয়েছে, আবার যখন প্রেসিডেন্সীতে পড়ত তখনও ছুটিতে এসে ওদের পড়াশোনার তদারকি করেছে। হীরের টুকরো ছেলে যাকে বলে না, তাই অনিরুদ্ধ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোবর্ধনদা বলল, এই হল আমার দোষ, এক কাহন করে বলতে গিয়ে আসল কথাটা গুবলেট করে ফেলি। হাঁ, দীপাকেও ও চিঠিপত্র লেখে। একটু ভালবাসাটাসার গন্ধও তাতে থাকে। তবে নীরু, অনিরুদ্ধের চিঠির খবর দীপাকে জানালেও দীপা কোনোদিন তার চিঠিপত্রের কথা নীরুকে জানায় নি।

তুমি এসব জানলে কি করে গোবর্ধনদা?

আরে দুটোর টিকি তো আমার কাছে বাঁধা। টোপা কুল, শিলা কুল, করঞ্জা, খেজুর রস, এসব এই শর্মা ছাড়া আর যোগাবে কে। বড় বাড়ি আর ঐ বাতিঘর, দুটোতেই আমার অবাধ যাতায়াত। ওদের সুখ-দুঃখের কথা, মান-অভিমান, কান্নাকাটি সবই আমার কাছে। একজন কারো সামনে মনের কথা তো উজাড় করা চাই, সে আঁস্তাকুড় এই তোদের গোবর্ধনদা।

হা হা করে সে কি অনাবিল হাসি।

বললাম, দীপাদিকে তাহলে আমি চিঠিখানা দিয়ে আসি?

দিবি বইকি, শুধু আমার সঙ্গে তোর দেখা হয়ে যাবার কথাটা বলবি না। আমি একটু পরেই ওখানে যাচ্ছি। তুই থাকবি, এখুনি পালিয়ে আসিস না।

দীপাদিকে চিঠি দিলাম। দীপাদি চিঠি না খুলেই বলল, তুই সেই সাত-সকালে গেছিস, সারাদিন কোথায় টো টো করে ঘুরলি রে?

ভুরিভোজে পড়ে গেলাম দীপাদি। বড়মা ছাড়ল না।

বেশ করেছিস। নীরুদিকে কেমন দেখলি?

ডেঁপোমি করে বললাম, তোমার মত।

বকুনি দিল না দীপাদি। শুধু হেসে বলল, তোর চোখ আছে বলতে হবে। বাইরের চেহারায় তো মিল নেই। তুই তাহলে আমাদের ভেতরটা দেখতে পেয়েছিস?

তোমরা দুজনে একইরকম হেসে কথা বল, তাই বললাম।

তুই এখানে বস, আমি আসছি। তোর জন্যে দুপুরে আমি রান্না করেছিলাম, রাতে সেগুলো খেয়ে আমাকে উদ্ধার করে যাবি। তবে তোর নীরুদির বাড়ির রান্না এখানে পাবি না।

দীপাদি ভেতরে চলে গেল। ফিরে এল যখন, মুখ থমথম। আমার মুখোমুখি বসে বলল, হাবলু, ও বাড়িতে যাবার পর নীরুর সঙ্গে তোর কি কি কথা হয়েছিল বা কি ঘটেছিল তা আমাকে বলবি?

আমি গড়গড় করে সব বলে গেলাম। কলম দেবার আগে এবং কলম দেবার পরে নীরুদির আচার আচরণ, ভাবান্তর, কোনো কিছুই বলতে বাকী রাখলাম না।

সব শুনে দীপাদি রেগে গিয়ে বলল, যত নষ্টের গোড়া হলি, তুই। কে তোকে বাহাদুরী করে নীরুর কাছে পেনটা বের করতে বলেছিল ? তুই ও পেন রাখার অযোগ্য, ফেরৎ দে আমার পেন।

মনে মনে ভীষণ কষ্ট পেলাম। দীপাদিকে বড় বেশি ভাল লাগত, তাই আঘাতটাও ভাল রকমই বাজল। আমি পকেট থেকে পেনটা বের করে দীপাদিকে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে এলাম। দীপাদি প্রায় ঝড়ের বেগে অন্য ঘরে চলে গেল। আমি বোর্ডিং-এ ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

বাইরে পা দিতে গিয়েই দেখি গোবর্ধনদা ঢুকছে।

কি রে এরই মধ্যে বেরিয়ে পড়লি ? আমি না তোকে থাকতে বলেছিলাম।

আমার চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল। বললাম, আর কোনোদিন এ বাড়িতে আসব না।

আমি ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই গোবর্ধনদা খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেলল।

কোথায় যাচ্ছিস ? কি হয়েছে বলবি তো ?

আমার চোখ ছাপিয়ে জল পড়ছে তখন। গোবর্ধনদা আমাকে টেনে একটু আড়ালে নিয়ে গেল।

ধমকের সুরে বলল, বল আমাকে কি হয়েছে ?

বললাম, আমি নীরুদিকে কলমটা দেখিয়েছিলাম বলে দীপাদি ক্ষেপে গিয়ে আমার কাছ থেকে কলম নিয়ে নিয়েছে।

ও এই কথা। ওর ঘাড় দেবে কলম। তুই ব্যাটাছেলে হয়ে প্যান প্যান করে কাঁদিস কি রে !

আমি বললাম, ও কলম আমি আর ছোঁবই না।

সে দেখা যাবে পরে, আগে তো আমার সঙ্গে ওর বোঝাপড়া হোক। তুই এখন বোর্ডিং-এ যা।

আমি সারা বিকেল ঘুরে ঘুরে আমার বাড়ির পেছনের বাগান থেকে পাকা তেঁতুল পেড়ে নুন লঙ্কা গুলিয়ে খেলাম। গুলতি ছুঁড়ে ছাইগাদার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা কুকুরটার ঘুম ভাঙালাম। সে কেঁউ কেঁউ করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লেজ গুটিয়ে পালাল। বেড়ালটা দু'বার ঘা খেয়ে চমকে চমকে উঠল। আততায়ীকে দেখতে না পেয়ে গোঁফ ফুলিয়ে ম্যাও শব্দ তুলে বিরক্তি প্রকাশ করল। খিড়কি পুকুরের হাঁসগুলোকে গুলতি ছুঁড়ে তাড়া করতেই ওরা প্যাঁক প্যাঁক শব্দে শোরগোল তুলে দিলে। হাঁসের মালিকরা দরজা খোলার আগেই আমি সরে পড়লাম।

সন্ধ্যার মুখোমুখি বোর্ডিং-এ হাজির হলাম। আজ আনন্দবাবু গেছেন অঙ্কের মাস্টারমশাই অনাথবাবুর সঙ্গে ছুটি কাটাতে তাঁর বাড়ি। পরের দিন রোববার বলে সব মাস্টারমশাই আর অধিকাংশ ছাত্র বাড়ি চলে গেছে।

আমার প্রতীক্ষায় যেন দাঁড়িয়েছিল গোবর্ধনদা। আমি কাছাকাছি হতেই হাতটা ঝাঁকিয়ে বলল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ গাধা ? আমি তোকে হন্যে হয়ে

খ্ুঁজছি। তিন তিনবার দীপাটা তোকে খ্ুঁজতে ঠেলে ঠেলে পাঠিয়েছে।

দীপাদি আমাকে খ্ুঁজতে পাঠিয়েছে শ্ুনে অবাক হলাম। কেমন যেন একটা আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। কিন্তু ম্ুখ ফ্ুটে তা প্রকাশ করতে পারলাম না। অবাধ্য বলদের মত একদিকে ঘাড়টা বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে বাতিঘরে এনে তুলল গোবর্ধনদা। দাওয়ার ওপরে দাঁড়িয়েছিল দীপাদি। যেন হারানিধি ফিরে পেয়েছে, এমনি ভাবে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর ঢ্ুকল।

দীপাদি আমাকে বিছানায় বসিয়ে নিজে পাশে বসল। হাতটা জড়িয়ে ধরে আমার ম্ুখের ওপর দ্ুটো চোখ পেতে বলল, দেখি হাবল্ুবাব্ু, কতটা রাগ হয়েছে।

আমি বিগলিত তব্ু লজ্জায় ম্ুখটা ফিরিয়ে রইলাম। আর দীপাদি হাত দিয়ে আমার ম্ুখখানা সোজা করে ধরে হাসি ম্ুখে চেয়ে রইল।

কিছ্ুক্ষণের ভেতরেই আমি হেসে ফেললাম। দীপাদি অমনি পাশের ঘরে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এল। আমার পকেটে পেনটা গ্ুঁজে দিয়ে বলল, ভাল করে ধ্ুয়ে কালি ভরে দিয়েছি। এটাতে শ্ুধ্ু কবিতা লিখবি, আর সে কবিতা প্রথমে আমাকে পড়ে শোনাবি।

পেছনে কখন গোবর্ধনদা এসে দাঁড়িয়েছে। সে অমনি বলে উঠল, তা বই কি, পেনটা দিয়ে মাথাটা কিনে নিতে চাইছিস। আমি যে সকাল সন্ধ্যে গর্ু চরানোর মত পেছনে লেগে তবে কবিতার দ্ুধট্ুকু বের করছি, তা আর আমার ভোগে লাগবে না। দীপাদেবীর প্ুজোর আগে উচ্ছ্ুগগ্ু হবে তারপর দেবীর প্রসাদ পাব আমরা।

দীপাদি বলল, আচ্ছা গোবর্ধনদা, তোমাকে আর যে যা বলে বল্ুক, স্বার্থপর অপবাদটি কেউ দেবে না। কিন্তু আজকাল দেখছি তুমি বড় বেশি নিজের কথা ভাবতে শিখেছ।

ঠিক আছে, তোরই কথা রইল। হাবলা তোকেই না হয় আগে তার কবিতা শোনাবে।

সেদিন এমনিভাবে গ্ুমোট কেটে গিয়ে প্রসন্ন একটা হাওয়া বইল। দীপাদি, চন্দ্রাদি, আমি আর গোবর্ধনদা একসঙ্গে বসে রাতের খাবার খেলাম।

বোর্ডিং-এ বিছানায় শ্ুয়ে গোবর্ধনদার কাছে শ্ুনলাম, সমস্যা বড় কঠিন। অনির্ুদ্ধকে দ্ুজনেই চায়। কিন্তু চিঠির ভেতর পরিষ্কার করে সে কথা কেউ লেখে না। ওদিকে অনির্ুদ্ধ দ্ুজনকেই চিঠি লেখে। সে চিঠিতে সোজাস্ুজি প্রেম নিবেদন করে না সে। তবে ইংরেজ কবিদের প্রেমের কোটেশানে ভরা থাকে।

বললাম, ভারী সমস্যা হল তো গোবর্ধনদা। নীর্ুদি, দীপাদি দ্ুজনেই বন্ধ্ু, তারা আবার একটা ছেলেকেই চায়, তাহলে দ্ুজনের বন্ধ্ুত্ব থাকে কি করে!

গোবর্ধনদা বলল, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, দেখছি তুই তো অনেক সমস্যা নিয়ে

মাথা ঘামাতে পারিস রে।

বললাম, ওদের বন্ধুত্ব ভেঙে যাক তা আমি মোটেই চাই না, তার চেয়ে নাই বা হল অনিরুদ্ধদার সঙ্গে ওদের বিয়ে।

এসব তুই বুঝবি না। তবে জেনে রাখ, আগামীকাল দু'বন্ধুর ভেতর অনিরুদ্ধকে নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

আমি সভয়ে বললাম, কি রকম ?

দীপা নীরুর কাছে যাবে। সে তার মনের কথা খুলে বলবে। এমন কি ওকে লেখা অনিরুদ্ধের চিঠিগুলোও সঙ্গে নিয়ে যাবে। নীরুকে সব দেখাবে। এরপর দুজনে বসে ঠিক করবে, অনিরুদ্ধ কার ভাগে পড়বে।

আমার তো বুক কাঁপছে গোবর্ধনদা।

না রে, ফয়সালা হয়ে যাওয়া ভাল। আমি দীপাকে নীরুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব কথা বলতে বলেছি।

ফল কি হল আমাকে তুমি জানাবে তো ?

পরীক্ষা শেষ হোক আগে, তারপর তো রেজাল্ট আউট।

পরের দিন রোববার, সকাল থেকে গোবর্ধনদাকে আর পাওয়া গেল না। বাতিঘরে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল, কিন্তু পাছে গোবর্ধনদার ধমক খেতে হয় তাই গেলাম না।

অনেক রাতে গোবর্ধনদা এল। তখন আমি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিছানা নিয়েছি।

কি রে ঘুমুলি নাকি ?

আমি উত্তেজনায় বিছানার ওপর উঠে বসলাম। বললাম, সারাদিন তোমার দেখা নেই, আমি ভেবে মরছি। খাওয়া হয়নি তোমার ?

হাঁ, দীপার ওখানেই খেলাম। ওকে জোর করে খাবার থালায় বসালাম, নিজেও ওর সঙ্গে খেলাম।

দুরু দুরু বুকে জিজ্ঞেস করলাম, দীপাদির খবর ভাল তো ?

গোবর্ধনদা বলল, খুব ভাল।

আমি উল্লসিত হয়ে বললাম, তাহলে অনিরুদ্ধদার সঙ্গে···।

গোবর্ধনদা মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, না। এখন থেকে দীপার সঙ্গে অনিরুদ্ধের ওসব কোন সম্পর্ক থাকবে না। ধীরে ধীরে দীপা ওর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও বন্ধ করে দেবে।

বেশ দমে গেলাম। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, নীরুদির চেয়ে দীপাদির দিকেই আমার মনের টান বেশী। বললাম, দীপাদি কি হার মেনে নিল ?

ওর হার হবে কেন রে, ওই তো জিতল।

উৎসুক হয়ে বললাম, কি রকম ?

গোবর্ধনদা বেশ জোরের সঙ্গে বলল, নিজের দখল যে বন্ধুর জন্যে ছেড়ে দিতে পারে, তার কি কখনো হার হয়। সব ছেড়ে দিতে পেরেছে বলেই ও সবার

ওপর উঠে গেল।

আমি বললাম, গোবর্ধনদা, নীরুদি আর দীপাদির ভেতর কি কথা হল, তুমি কি আমাকে একটু বলবে?

বলব না কেন। দীপা অনিরুদ্ধের সব চিঠিপত্র ব্যাগে পুরে নিয়ে গিয়েছিল নীরুকে দেখাবে বলে। কিন্তু পথে যেতে যেতে ও নীরুকে কি বলবে কি করবে সব ঠিক করে ফেলল।

তুমি দীপাদিকে কিছু শিখিয়ে দাও নি?

আমি কেন শেখাতে যাব, যার যার নিজের পথ নিজেকেই বেঁধে নিতে হবে। আমি যাবার সময় শুধু বলে দিয়েছিলাম, নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করে সব কাজ করবি। এমন কাজ করবি না যাতে মনের দিক থেকে ছোট হয়ে যাস।

তারপর দীপাদি কি বলল নীরুদিকে?

তার আর অনিরুদ্ধের চিঠিপত্র আদানপ্রদানের কথা খুলে বলল। সেও যে মনের মধ্যে অনিরুদ্ধের জন্য একটা শ্রদ্ধার আসন পেতে রেখেছে সে কথা বলতে ভুলল না। তবে চিঠিতে যে প্রেমের কবিতার উল্লেখ আছে তা আর বলল না। এমনকি অনিরুদ্ধর যে চিঠিগুলো দেখাবে বলে নিয়ে গিয়েছিল তাও দেখাল না।

আমি বললাম, কেন গোবর্ধনদা? দীপাদি ওগুলো দেখিয়ে দিলে নীরুদি বুঝতে পারত অনিরুদ্ধদা দীপাদিকে কতখানি ভালবাসে। তাহলে আপনিই সরে যেত নীরুদি।

না, আসলে নীরুর কাছে পৌঁছনোর আগেই সে স্থির করে ফেলেছিল, অনিরুদ্ধের ওপর তার কোন অধিকারই সে আর রাখবে না। সবই নীরুর হাতে তুলে দেবে। আর চিঠিগুলো না দেখাবার একটা কারণও ছিল।

কি কারণ গোবর্ধনদা?

পরে যদি নীরু আর অনিরুদ্ধের বিয়ে হয় তাহলে দীপাকে লেখা অনিরুদ্ধের প্রেমের কবিতাগুলোর উল্লেখ করে নীরু ওকে আঘাত দিতে পারে। তাতে সংসারের অশান্তি ঘটবে।

ঐ যে তুমি বললে, অনিরুদ্ধদার সঙ্গে দীপাদির চিঠি আদান-প্রদানের কথা নীরুদিকে বলা হয়েছে।

তাতে কি এসে যায়। পরিচিতদের ভেতর চিঠির লেনদেন খুবই স্বাভাবিক। আর সেটা যে প্রেমপত্রই হবে এমন কোন কথা আছে।

তারপর কি হল গোবর্ধনদা?

দীপা অনিরুদ্ধের দেওয়া ফাউনটেনপেনের কথা নীরুকে বলল। ও যেন সেটা চেয়েই নিয়েছিল, এমনিভাবে কথাটা বলল। তারপর হাবুলার কবিতা শুনে সেটা তাকে উপহার দেবার কথাও বলে দিলে।

শেষে কি হল?

দীপা নীরুর হাত ধরে বলল, তুই আমার বন্ধু। আমি কোনকিছুর

বিনিময়েই আমাদের বন্ধুত্ব হারাতে চাই না। অনিরুদ্ধদার সঙ্গে তোর বিয়ে হলে আমি সবচেয়ে খুশী হব।

গোবর্ধনদা কথা বন্ধ করে আমার হাতখানা তার হাতে ছুঁইয়ে বলল, দেখ, দীপার কথা বলতে বলতে কেমন লোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

একটু পরে আবার বলল, নীরুটাও কম যায় না। কতক্ষণ নাকি কোন কথা না বলে দীপার হাতখানা শক্ত করে ধরে বসেছিল। শেষে বলেছিল, জন্ম, মৃত্যু আর বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে—একথা আমি মানি। জানি না, অনিরুদ্ধদার সঙ্গে আমার ভাগ্যের কি বিচার বিধাতা করে রেখেছেন। তবে আমি এটুকু বলতে পারি, এ বিয়ের ব্যাপার আমাদের বন্ধুত্বে কোনদিনই ফাটল ধরাতে পারবে না। কাল আমি দুর্বল মন নিয়ে হাবুলের হাতে তোকে আঘাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। তুই আমাকে ক্ষমা করিস ভাই।

এরপর দু'বন্ধুতে এক থালায় জলখাবার খেয়েছে। বড়মা দুপুরের খাবার খাইয়ে তবে ছেড়েছে।

রাতে দীপাদি তাহলে খেতে চায় নি কেন?

তুই এখন সে সব বুঝবি না হাবুলা। ও নীরুকে ওর সর্বস্ব দান করে এসেছে। তখন মনের উত্তেজনায় যে কাজ করেছে তাতে সে গভীর তৃপ্তিই পেয়েছে। কিন্তু ফিরে আসতে আসতে সবচেয়ে প্রিয়জনকে হারানোর দুঃখ তার বুকখানা ভেঙে দিয়েছে। সে ঘরে এসেই একটা কাগজের নৌকোয় কিছু ফুলের সঙ্গে অনিরুদ্ধের চিঠি ভরে ভাসিয়ে দিয়েছে খালের জলে। খর ভাটায় নদীর দিকে ভেসে গেছে সে চিঠি। আমি যখন সাঁকোটা পেরিয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন ও ঐ কাগজের নৌকোটার দিকে চেয়েছিল। আমি ওর পিঠে হাত রাখতেই ও চমকে ফিরে তাকাল। তারপর তুই ভাবতে পারবি না হাবুলা, কি কান্নাটাই কাঁদল মেয়েটা। ওকে ওর ঘরে নিয়ে গেলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক সান্ত্বনা দিলাম। পরে ওর মুখ থেকে সব কথা শুনলাম।

বললাম, এখন কেমন আছে দীপাদি?

তোর লেখা কবিতার খাতাটা হঠাৎ আগুনে পুড়ে গেলে তোর মনের অবস্থা যেমন হবে, দীপার অবস্থাটাও এখন ঠিক তাই। রাতে ও ঘুমুতে পারবে না। অনিরুদ্ধের টুকরো টুকরো স্মৃতি ওকে তাড়া করে ফিরবে।

তাহলে দীপাদির কি হবে গোবর্ধনদা?

কি আর হবে, কিছুদিন পরে ও সবকিছুই ধীরে ধীরে সহ্য করে নেবে।

পাগলটাগল হয়ে যাবে না তো?

ও পাগল হবার মেয়েই নয়। সদ্য আঘাতটা লেগেছে বলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়েছে। দু'একদিনের ভেতরেই ও সামলে নেবে। দ্বিগুণ উৎসাহে হয়ত লেগে পড়বে স্বদেশীমেলার জিনিসপত্র সংগ্রহের কাজে।

রাতে ঘুমুবার আগে বুড়ো শিবের কাছে প্রার্থনা করলাম, দীপাদির সব কষ্ট দূর করে দাও ঠাকুর।

এই বুড়ো শিবঠাকুরের কথায় আজ মনে পড়ছে আমাদের নীচের ক্লাশের শিক্ষক মহেশ্বর মিশ্রকে। পঞ্চম আর ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। এর ওপরে পড়ানোর অধিকার তাঁর ছিল না। মহেশ্বরবাবুর শত্রুরা বলেন, তিনি নাকি দ্বিতীয় রবার্ট ব্রুশ ছিলেন। সাতবার চেষ্টার পর ম্যাট্রিক পাশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর মিত্ররা বলেন, ওসব বাড়াবাড়ি। বার চারেক চেষ্টার পর ও পাশ করে যায়।

আমরা আরও কমিয়ে ওঁর চেষ্টাকে তিন বারে এনেছিলাম।

বিচিত্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন মহেশ্বর মাস্টারমশাই। বহুকাল আগে দেশে একবার লোনা ছয়লাপি হয় (সামুদ্রিক বন্যা)। ঐ বন্যার স্রোতে বাবা মার কাছ থেকে ছিটকে পড়ে বছর আটেকের একটি ছেলে প্রায় ভাসতে ভাসতে, গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকে এই ভগ্নপ্রায় বুড়ো শিবমন্দিরের দাওয়ায়। আমাদের এক বিধবা জ্ঞাতি মহিলা অসহায় ছেলেটির প্রতিপালনের দায়িত্ব নেন। পরে দরিদ্র মা বাবার সঙ্গে ছেলেটির মিলন ঘটে। কিন্তু ছেলেটি থেকে যায় সম্পন্ন ঐ বিধবা মহিলাটির কাছে। মহিলা নিজের হাতে রামায়ণ নকল করে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের দান করতেন। তিনি ঐ বালকটির মা বাবাকে ব্রাহ্মণ জেনে রামায়ণ দান করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশত রৌপ্য মুদ্রা।

মহা খুশি হয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতি বিদায় নিলেন। বালকটি দুর্দান্ত প্রতাপে বিধবার সংসারে চষে বেড়াতে লাগল। দিনে দিনে ক্ষীর নবনী পুষ্ট কৃষ্ণকায় শরীরখানা হয়ে উঠল জাম্বুবানের মত। ভোজনের ওপর যতখানি আগ্রহ ছিল তার, পরিধেয়ের প্রতি সে আগ্রহ ছিল না। হাঁটুর ওপরে উঠতো তার আটহাতি ধুতিখানা। সম্পূর্ণ খালি গায়ে ঘুরে বেড়াত ছেলেটি। পরে যখন আমাদের স্কুলে শিক্ষকতা করতে আসেন তখন গায়ে একটি উড়নী ব্যবহার করতে দেখেছি।

দরজা দিয়ে মহেশ্বর মাস্টারমশাই ঢুকলেই সারা ক্লাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত। পটলের মত পুরু নীচের ঠোঁটখানা ওপরের দাঁত দিয়ে চেপে, নাটার মত গোল গোল চোখ পাকিয়ে যখন তাকাতেন তখন প্রাণ পাখি খাঁচাছাড়া হত।

তিনি বাংলা ব্যাকরণ আর ভূগোল পড়াতেন। এক একবারে আট থেকে দশ পৃষ্ঠা পড়া দিতেন। সেই পড়া মুখস্ত করে না গেলে বাবা মহেশ্বরের কীল, চড়, গাঁট্টা, কানমলা খেতে হত।

তাঁর কঠিন আদেশ ছিল, আমরা তাঁর পিরিয়াডে যেন বেঞ্চে না বসি। খোয়াওঠা মেঝেতে নীলডাউন হয়ে বসতে হত। হাফ প্যাণ্ট পরা অনাবৃত হাঁটুতে বড় লাগত সেই খোয়ার ধারাল মাথাগুলো। মহেশ্বর মাস্টারমশায়ের ঐ দশ পৃষ্ঠা পড়ার সঠিক উত্তর যে দিতে পারত কেবল সেই পেত বেঞ্চে বসার সুযোগ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র থাকা কালে আমাদের কারো ভাগ্যে একটি দিনের জন্যেও সে সুযোগ ঘটেনি।

এর ওপর আর একটি শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তাঁর। সেটি দৈহিক নয়, পুরোপুরি মানসিক। যার ওপর সে শাস্তির ফরমান জারি হত, সে হতভাগ্য

সাময়িকভাবে হলেও অপমানে অশেষ মানসিক নির্যাতন ভোগ করত।

একটি গাধার টুপি তৈরি করা ছিল তাঁর। যে হতভাগ্যকে তিনি গর্দভ বানাতে চাইতেন, তাকে একটি কঠিন প্রশ্ন করতেন। সে উত্তর দিতে না পারলে অন্য সবাইকে একে একে জিজ্ঞেস করতেন। যে সঠিক উত্তরটি দিতে পারত, তার ওপর ভার পড়ত ঐ প্রথম হতভাগ্যটির মাথায় গাধার টুপি চড়ানোর। তারপর ঐ ছেলেটি মহেশ্বর মাস্টারমশায়ের নির্দেশে ওকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে স্কুলের ঠিক মাঝখানের উঠোনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আসত। সারা স্কুলের ছাত্ররা দেখতে পেত ঐ হতভাগ্যকে। মাথা হেঁট করে, অপমানে জর্জরিত ছেলেটি শুধু চোখের জল ফেলত।

সে সময় কেউ এই শাস্তির প্রতিবাদ করতেন না। সম্ভবত শাস্তির এই বিধানটি সে যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্বীকৃত ছিল।

একদিন আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, মহেশ্বর মাস্টারমশাই ক্লাশে গরহাজির। প্রভাতকালে পরিচ্ছন্ন আকাশে সূর্যদেব দেখা না দিলেও দিতে পারেন কিন্তু মহেশ্বর মিশ্র ক্লাশে আসবেন না, এ হতেই পারে না। তবু সেই অসম্ভব ঘটনাও ঘটল। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, চিকিৎসার জন্য তিনি কলকাতা নামক মহানগরীতে যাত্রা করেছেন।

জীবনে নানা বিষয়ে বহুবার প্রচুর আনন্দ লাভ করেছি, কিন্তু এই সংবাদ শোনার পর সেদিন পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররা যে আনন্দ পেয়েছিল, বোধকরি তার কোন তুলনা কারো সঙ্গেই করা যাবে না।

আমরা ক্লাশ থেকে চাঁদা তুললাম। সেই চাঁদায় শিব পুজোর সমস্ত উপকরণ কেনা হল। বুড়ো শিব মন্দির আমাদের স্কুলের পাশেই। সেই মন্দিরে আমরা পুজো দিলাম।

পুজোর শেষে সারা মন্দির ঘিরে আমরা নত হয়ে বসলাম। করজোড়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম, হে বাবা বুড়ো শিব, মহেশ্বর মাস্টারমশাই যেন আর ফিরে না আসেন। আমাদের প্রার্থনা পূরণ করলে তোমাকে ভাল করে সিদ্ধি খাওয়াব বাবা। কিন্তু আমরা তখন জানতাম না মহেশ্বর মানেই শিব। আর শিবের পুজো করা মানেই মহেশ্বরের পুজো করা। তাই আমাদের ঐকান্তিক শিব-ভক্তির আকর্ষণে মহেশ্বর মাস্টারমশাই অচিরেই আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন। আমরা পঞ্চম আর ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররা নিশ্চিত ভাবে ভেবে নিলাম, এ জীবনে মহেশ্বর মাস্টারমশাইকে এড়িয়ে আর সপ্তম শ্রেণীতে ওঠা সম্ভব হবে না।

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের আমরা মনে মনে ঈর্ষা করতাম, শুধু তারা এই মাস্টারমশায়ের নাগালের বাইরে বেরিয়ে গেছে বলে।

অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন মহেশ্বর মাস্টারমশাই। সেবার ইণ্টার স্কুল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হল মহেশতলা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। মহকুমা শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি স্কুল যোগ দিল সেই প্রতিযোগিতায়। ক্লাশের বিভাগ ছিল না, নির্দিষ্ট কোন কবিতাও ছিল না। প্রতিটি স্কুলের শিক্ষক,

ছাত্র, অভিভাবক এসেছেন তাদের স্কুলের অংশগ্রহণকারীকে উৎসাহিত করতে। বিপুল সমাবেশ। উত্তেজনায় কাঁপছে প্রতিযোগিতার প্রাঙ্গণ।

'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি অন্তত তিনজন প্রতিযোগী আবৃত্তি করে গেল। আবেগে গলা বুজে এল একজনের। দ্বিতীয়জন কান্নায় ভেঙে পড়ল বলার শেষে। তৃতীয়জন আমার পাশেই বসেছিল। সে যখন উঠল তখন পেছন থেকে তার স্কুলের মাস্টারমশাইকে চাপা গলায় বলতে শোনা গেল, গলা কাঁপিয়ে বলবি। শেষকালে কেঁদে ফেলা চাই।

অনুগত ছাত্রটি তাই করল। আবৃত্তি শেষ হওয়া মাত্র সেই মাস্টারমশায়ের কণ্ঠটি শুনতে পেলাম। তিনি তাঁর ছাত্রদের বলছেন, জোরে হাততালি দে। অনেকক্ষণ ধরে দে।

কিন্তু এত কেঁদে-কেটে, এত হাততালি পেয়েও 'পুরাতন ভৃত্য' বিচারকদের কঠিন চিত্ত গলাতে পারল না। 'দুই বিঘে জমি'র উপেনও বাস্তুহারা হয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এল, কিন্তু তার প্রতি নিষ্ঠুর বিচারকেরা বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাল না।

কবিগুরুর ভক্তদের সে আসরে শুধু হাতে বিদায় নিতে হয়েছিল।

একটি হাসির কবিতা আসর মাতিয়ে দিল। উঁচু ক্লাশের একটি ছেলে ভারী চমৎকার অঙ্গভঙ্গী করে, গলার স্বর চড়িয়ে নামিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করে নিল। হৈ-হৈ পড়ে গেল, বাহবা-ধ্বনি উঠল চারদিক থেকে। বিচারকরাও নাড়া খেলেন। প্রথম হল ছেলেটি।

আমাদের স্কুলের ছেলেরাও যোগ দিয়েছিল। পঞ্চম শ্রেণী থেকে আমি ছিলাম। আমাকে বলতে হয়েছিল যতীন্দ্রমোহন বাগচির 'কাজলা দিদি' কবিতাটি। দুঃখের কবিতা হলেও আমি গলা কাঁপাইনি, কিংবা কেঁদে আসর ভাসাইনি। আমাদের মাস্টারমশাই প্রফুল্লবাবু আমাকে সহজ স্বাভাবিক গলায় কবিতাটি আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি বাংলা পড়াতেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর পড়ানো শুনতাম। তিনি স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ব্রতচারী নৃত্যগীত প্রভৃতি পরিচালনা করতেন। খুব কম কথা বলতেন তিনি। যখন বলতেন তখন তাঁর শ্রোতাদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করে রাখতেন।

তাঁর শেখানোর গুণে আমার ভাগ্যে দ্বিতীয় পুরস্কারের শিকেটি ছিঁড়ল।

'বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ঐ
মাগো, আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই?'

একটি অল্পবয়সী বালক তার দিদিকে হারিয়ে বড় কাতর হয়ে পড়েছে। দিদির বড় আদরের স্মৃতিগুলি তার মনে পড়ছে। সে জানে না তার দিদি কোথায় গেছে। সে কেবল খুঁজে ফিরছে আর বার বার তার মাকে বলছে, বল না মা আমার দিদি কোথায়?

এইটুকু মাত্র ভূমিকা করে তিনি এমন চমৎকার গলায় কবিতাটি আবৃত্তি করে গেলেন যা আমার মনে মুহূর্তে গাঁথা হয়ে গেল।

এরপর স্কুলে ফিরে আসতেই বিভিন্ন ক্লাশের ছেলেরা আমাকে খুব তারিফ করতে লাগল।

ক্লাশে ঢুকলেন মহেশ্বর মাস্টারমশাই তিনি আমার কাছে এসে আমাকে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিলেন। বাহবা বাহাদুর, বাহবা।

তারপর সারা ক্লাশকে অবাক করে দিয়ে বললেন, আজ থেকে হাবলু একমাস বেঞ্চে বসবে, পড়া পারুক আর না পারুক। আমাদের স্কুলের মান বাঁচিয়েছে সে।

এরপর ছেলেদের আনন্দসাগরে ভাসিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, আজ তোদের ক্লাশ নেব না।

আমার হাত ধরে টানতে টানতে স্কুলের পেছন দিয়ে আমাকে নিয়ে চললেন বিষ্ণুপ্রসাদের কাছে। তিনি এমনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, আমাকে বার বার বলতে লাগলেন, তুই আমার কাঁধে উঠে বস।

উনি যতবার কথাটা বলেন ততবারই আমি সারা দেহটা নুইয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ি। শেষে বিষ্ণুপ্রসাদের সামনে এসে আমি রক্ষে পাই।

রক্ষে কোথায়। সব সমাচার দানের পর মাস্টারমশায়ের নির্দেশে আমাকে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাতে হয়।

কেবল সেদিনই নয়, কাজলা দিদিকে হারানোর পর থেকেই আমার দুর্ভাগ্যের শুরু। মহেশ্বর মাস্টারমশাই দোতলার একটি ঘরে থাকতেন। সেখান থেকে ছাত্রদের গতিবিধি তাঁর নজরে পড়ত। আমাকে দেখতে পেলেই তিনি উচ্চকণ্ঠে আমার নাম ধরে ডাক দিতেন। ফাঁকা জায়গায় গা ঢাকা দেবার কোনো উপায়ই ছিল না। বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে আমি তাঁর কাছে হাজির হতাম। তিনি যে কোনো একজন পরিচিত লোককে ডেকে নিতেন। এমন কি কাউকে না পাওয়া গেলে ঘরের কাজ করতে যেসব জনমজুর আসত তাদের ডাক দিয়ে জড়ো করতেন। এরপর শুরু হতো আমার কাজ। হাত তুলে কল্পিত বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদকে দেখিয়ে বলতে হতো, 'বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ঐ'।

মহেশ্বর মাস্টারমশায়ের আগ্রহের ঠেলায় প্রখর গ্রীষ্মের জ্বলে যাওয়া আকাশেও আমাকে চাঁদ ওঠাতে হতো।

স্কুলে সরস্বতী পুজোর বড় ধুম লেগেছে। বাংলার মাস্টারমশাই প্রফুল্লবাবুই এ পুজোর কর্ণধার। প্রতি বছর দশমশ্রেণীর ছাত্রদের ওপরেই পুজো পরিচালনার দায়িত্ব থাকে। তাহলেও এরা শুধু দাঁড়ী। হাল ধরে বসে থাকেন প্রফুল্লবাবু। মানুষটির অন্য একটি নাম আছে। আমরা আড়াল আবডাল থেকে তাঁর বন্ধু বান্ধবের মুখে শুনতে পাই। এই যে সাহেব আসছেন, কোথায় চললে সাহেব, যখন আসবে বলে কথা দিয়েছে তখন আধ মিনিটও দেরী হবে না সাহেবের।

প্রফুল্লবাবু সত্যিই সাহেব। সময়নিষ্ঠা, কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা যেন তাঁর

মজ্জায় মিশে আছে। তিনি সাহেবের মত পোশাকটাই শুধু পরেন না। ভোজন, চেয়ার টেবিলে বসে। স্নান, পুকুর থাকতেও তোলা জলে। ব্যবহার করেন বিলিতি সেণ্ট আর সাবান। সন্ধ্যেবেলা তাঁর পড়ার ঘরে বাগান থেকে তোলা গোলাপ সাজান থাকে।

তাঁরা সাত-সাতটি ভাই একই সঙ্গে থাকেন। সাহেব তাঁদের ভেতর সবচেয়ে বড়। তিনি যতক্ষণ বাড়ি থাকেন ততক্ষণ নিঃশব্দে বাড়ির কাজ চলে। একবার বাড়ি ছেড়ে বেরুলেই বাড়িটা হট্টমালার দেশ হয়ে যায়। এতক্ষণের রুদ্ধ বাক্যগুলো বাড়ির প্রতিটি বাসিন্দের মুখ দিয়ে ফোয়ারার মত বেরুতে থাকে। তখন সকলে রান্নাঘরে বৌদির কাছে এসে ভীড় জমায়। প্রত্যেকের নানাবিধ সমস্যা মেটাবার দায় তাঁর। এমনকি বৃদ্ধ শ্বশুরমশায়, যিনি স্কুলের সবচেয়ে প্রবীণ শিক্ষক, তাঁর সুখসুবিধার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন এই বড় পুত্রবধূটি। বিশাল সংসারের যাবতীয় দায়ভার তাঁর। স্কুলের যেসব ছেলে প্রফুল্লবাবুর ভায়েদের সহপাঠী তাদেরও অবাধ যাতায়াত ঐ গৃহে। সময় নেই, অসময় নেই, সবার পাত পড়ছে সেখানে। কলরবে বাড়ি সরগরম।

এই প্রফুল্লবাবুই আমাদের সকল কর্মের কাণ্ডারী। যে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাঁর তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। নাটক, আবৃত্তি, সংগীত, সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ, এমনকি বাৎসরিক এই সরস্বতী পুজোটিও তাঁর সুনিপুণ পরিচালনায় সম্পন্ন হয়।

দীপাদি তাঁর কাছেই বাংলা পড়েছে। একবার যে প্রফুল্লবাবুর পড়ানোর স্বাদ পেয়েছে, বাংলা সাহিত্যের ওপর তার অনুরাগটি একেবারে গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে।

আমি আমার কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে একাধিক নামকরা অধ্যাপকের সান্নিধ্যে এসেছি কিন্তু ঐ ম্যাট্রিক পাশ মাস্টারমশাইটি সাহিত্যের রস যেভাবে মনের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারতেন, সে যাদু আর কারো ভেতরেই খুঁজে পাই নি। এ এমন এক ক্ষমতা যা কর্ণের কবচ কুণ্ডলের মতই সহজাত।

যে কোন সাংস্কৃতিক কাজে তাঁর সহযোগীর ভূমিকায় থাকত দীপাদি। গুরুর ওপর অসীম ভক্তি তার। প্রফুল্লবাবুও পুরোপুরি ভরসা রাখতেন দীপাদির ওপর। যে কোন একটা কাজ একবার বলে দিলেই তাকে সহজে বুঝে নিতে পারত দীপাদি।

সরস্বতীর মূর্তি তৈরী করত ভীম পাত্র। মাস্টারমশায়ের ছাত্র। তিনি তাকে উৎসাহ দিয়ে কাজ করাতেন। কলকাতা থেকে ছোট ছোট সুঠাম সুদর্শন মূর্তি যোগাড় করে নিয়ে যেতেন। ভীম সেই নমুনা দেখে তার নিজের ভাবনাকে আরও সুন্দর করে রূপ দিত। একদিন সরস্বতীর মূর্তি গড়া শেষ হত, পুজোও শেষ হত, কিন্তু ভীমচন্দ্রের কাজ শেষ হত না। মাস্টারমশায়ের প্রেরণা তাকে থামতে দিত না। তৈরী হত নটরাজ, অন্নপূর্ণার ভিক্ষাদান, সিংহের ওপর জগদ্ধাত্রী মূর্তি, মাছের ঝাঁকা মাথায় জেলে, লাঙ্গল কাঁধে কৃষক, মহেঞ্জোদড়োর ষাঁড়, ধ্যানী বুদ্ধ, নর্তকী, রাম সীতা লক্ষ্মণের বনগমন আরও

কত কি। সরকারী উদ্যোগে প্রদর্শনী হলে এইসব মৃৎশিল্পের নমুনা সেখানে দেখান হত।

প্রফুল্লবাবু সাবান তৈরীর পদ্ধতি জানতেন। ঐ সাবান জমিয়ে আর নিপুণ হাতে কেটে তিনি সাবানের অনুপম একটি তাজমহল তৈরী করেন। সেটি একাধিক প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার লাভ করে।

এই প্রফুল্লবাবুকে তাঁর পূর্ণ যৌবনে আমরা দেখেছিলাম স্কুলের সমস্ত আনন্দ উৎসবের মাঝখানে। সারা রাত জেগে হ্যাজাকের আলোয় আমরা সরস্বতী পুজোর তোরণ তৈরী করেছি। ক্যানভাসের ওপর রঙ তুলি দিয়ে আঁকা তোরণ। রঙ, ক্যানভাস, ফ্রেম সবই যোগান দিতেন মাস্টারমশাই। পরিকল্পনাও তাঁর। আমাদের ভেতর যারা ছবি আঁকায় ওস্তাদ ছিল তারা দিনরাত জেগে সেই তোরণ তৈরী করত।

পরে যখন রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব শুরু হল তখন প্রফুল্লবাবুর এক ভাই তাঁরই নির্দেশ মত স্টেজ সাজাতেন। শ্রীরামপুর থেকে তাঁত শিল্পে ডিপ্লোমা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর হাতের তৈরী সূক্ষ্ম তাঁত শিল্পের একটি নিদর্শন রানী এলিজাবেথকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। সে সময় রাজভবন সুসজ্জিত করা হয়েছিল তাঁরই তৈরী অপূর্ব নকশাদার সব বস্ত্রে।

রবীন্দ্রজয়ন্তীর স্টেজ প্রতি বছর নতুন ডিজাইনের কাপড় দিয়ে তৈরী হত। এ বছর ছেলেরা শারদোৎসব করবে, অমনি প্রফুল্লবাবু ডিজাইন দিয়ে দিলেন। নীল ব্যাকগ্রাউণ্ডে এক ঝাঁক সাদা বলাকা উড়ে যাচ্ছে। নীচে আন্দোলিত কাশের বন। তারই ভেতর হাত ধরে ছুটে চলেছে ক'টি ছেলেমেয়ে। সামনে দুপাশে একতারা বাজিয়ে নাচছে বাউল। অন্য বছর ডাকঘর—দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকায়। পেছনে বন পাহাড়ের দৃশ্য। অমলের কাছে রাজার চিঠি নিয়ে ছুটে চলেছে ডাকহরকরা।

নতুন আনন্দ, নতুন উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ত প্রতি বছর।

সরস্বতী পুজোর কথা দিয়েই শুরু হয়েছিল অধ্যায়। আমাদের সরস্বতী পুজোর শেষে একদিন হত ছেলেদের আবৃত্তি আর নাটকের অনুষ্ঠান। অন্য আর একদিন যাত্রা। আমদাবাদের যাত্রার ভারী রমরমা তখন। বিশেষ করে তরণীসেন বধ। সে যাত্রার আসর একদিন বসান চাই।

সরস্বতী পুজোয় সারা ইস্কুলের ছেলেরা খিচুড়ি প্রসাদ পাবে। তারপর দুদিনের উৎসবে খাওয়ার ব্যবস্থা থেকে যাত্রাওয়ালার টাকাকড়ির যোগাড় করতে হবে। ক্লাশে ক্লাশে চাঁদা তোলা হবে, মাস্টারমশাইরাও বাদ যাবেন না। সব শেষে চাল, ডাল, আলু, মূল্যের জন্য ছেলেরা করবে গ্রাম গ্রামান্ত পরিক্রমা।

প্রফুল্লবাবুর সব কাজেই থাকত শিল্পীর হাতের ছোঁয়া। তিনি সব মাস্টার-মশায়ের মত সরস্বতী পুজোর চাঁদা দিতেন, কিন্তু তাঁর দেবার পদ্ধতি ছিল আলাদা। একটি চমৎকার লাল ভেলভেটের বাক্সে সমান ছটি খোপ তৈরী করা। ছটি রুপোর টাকা ছটি খোপে রাখা। পুরনো ময়লা টাকা নয়। দস্তুরমত স্যাকরার দোকান থেকে মেজে আনা ঝকঝকে ছটি টাকা। বাক্সের ওপর লেখা,

'তোমাদের আনন্দ যজ্ঞে যৎকিঞ্চিৎ'।

এই রুচির প্রকাশ ছিল প্রফুল্লবাবুর সব কাজে।

আমাদের ছেলেরা গ্রাম গ্রামান্তরে বেরিয়ে যেত চাল, ডাল, পয়সাকড়ি সংগ্রহের কাজে। দোরে দোরে ভিক্ষা আর সঙ্গে সঙ্গে পুজো দেখা, যাত্রা শোনার নিমন্ত্রণ।

একবার ঘুরতে ঘুরতে আমরা নবম আর দশম শ্রেণীর জনা কুড়ি ছেলে প্রায় মাইল দশেক পাড়ি দিয়ে গিয়েছি আমাদেরই এক বন্ধুর বাড়িতে। রসলপুর নদীর ধারে। ওপারে দরিয়াপুর। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের পরিকল্পনা ক্ষেত্র। আমরা সরস্বতী পুজোর চাঁদা আদায় করে নৌকো পেরিয়ে যাব নবকুমারের সেই নদীর মোহনার দিকে।

বন্ধুটি বাড়ি পৌঁছেই ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বাবাকে তার নাকি বড় ভয়। আমরা এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিয়ে ওর বাবার সামনে দাঁড়ালাম।

কি চাই তোমাদের ?

বেশ রাশভারী মানুষ বলে মনে হল।

আমি মাথা চুলকে বললাম, আজ্ঞে, ইস্কুলের সরস্বতী পুজোয় যাত্রা হবে, সেজন্যে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

একটু থেমে আবার বললাম, সামান্য দু'এক টাকা চাঁদা যদি দেন। খরচ অনেক।

কি বললে, চাঁদা ! একে তো পড়াশোনা উঠে গেছে, তার ওপর রাত জেগে যাত্রা শোনার বাতিক। বেরিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। গেল কোথায় সেই হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়াটা। পরীক্ষায় একবছর ফেল করেছিল, লজ্জা করে না ?

আমরা ভীষণ ক্ষুব্ধ। বন্ধুর বাবা, তাই অপ্রিয় কোন কথা বলতে পারলাম না। পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসছিলাম বাড়ি থেকে।

পেছন থেকে আবার বজ্র গম্ভীর আওয়াজ, বলি, যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। একজন বলল, পেটুয়ার ঘাটের দিকে যাবার ইচ্ছে আছে।

বলিহারি ইচ্ছে। এই দুপুরের ঠা ঠা রোদে দল বেঁধে চললেন সব নদীতে। পা ভেঙে বাড়িতে ফেলে রেখে দিতে হয়। হ্যাঁ শোন, যেখানেই যাও দুপুরবেলা স্নান করে খাওয়া দাওয়া না সেরে কোথাও যেতে পাবে না।

উনি হাঁক দিয়ে কাজের লোককে ডেকে বৈঠকখানায় সতরঞ্চ পাতালেন ! আমরা তাঁর ইঙ্গিতে ওর ওপর বসলাম। কিছুক্ষণ পরে ডাব এল, খেলাম।

একটু পরেই মহাসমারোহে পুকুরে জাল পড়ল। আর বসে থাকা যায় না। আমরাও স্নানের অজুহাতে পুকুরে নামলাম মাছ ধরতে।

সে কি খাওয়ানোর ঘটা। পাশে বসে ধমক দিতে দিতে খাওয়ালেন।

তিন চারখানা মাছ খেয়েই হয়ে গেল। আমরা তোমাদের বয়সে কম্পিটিশান করে মাছ আর মিষ্টি খেতাম। কিচ্ছু হবে না, নাও তো।

গ্রাম থেকে দু'মাইল দূরে ভাল দই মিষ্টির দোকান। সেখান থেকে লোক পাঠিয়ে দই মিষ্টি আনিয়েছেন। তাও খাওয়া হল, যে যা পারলাম।

খাওয়ার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম করা হল। বিদায় নেবার সময় মানুষটির পায়ের ধুলো নিলাম। উনি বললেন, ছুটিছাটা পড়লে চলে এস গোপালের সঙ্গে। আর মনে রেখ, তোমরা আনন্দবাবুর ছাত্র। দেশের কাছে, দশের কাছে তোমাদের অনেক কিছু দেবার আছে। তৈরী হও।

মানুষটিকে বড় ভাল লাগল। তিনি আমাদের কুড়িটি ছেলের জন্য প্রচুর খরচ করলেন, কিন্তু একটি কি দুটি টাকা চাঁদা দিলেন না। অবশ্য আমাদের বন্ধু গোপাল তার পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে দিয়ে বলল, রেখে দে, পিসিমা লুকিয়ে দিয়েছে।

গোপালের মা নেই, বিধবা পিসিমাই সংসারের সবকিছু দেখাশোনা করেন।

সরস্বতী পুজোর দিন উন্মাদনার শেষ নেই। রাতে চুরি করে বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়ি থেকে ফুল সংগ্রহ করা হল। স্তূপীকৃত ফলমূল, ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল। সারারাত ধরে ফল কাটছে দীপাদি, চন্দ্রাদি আর নীরুদি। দুজন কাজের লোকে ঠাকুরবাড়ির নিরামিষ বঁটি নিয়ে এসেছে। মোট পাঁচজনে তৈরি করছে ফলমূলের একটা গিরি গোবর্ধন। বিষ্ণুপ্রসাদের বাড়ি থেকে বিশাল তিনখানা গামলা আর খানছয়েক বারকোশ এসেছে। দু'গামলা বোঁদে, এক গামলা কদমা, আর বারকোশ বোঝাই মতিচুর, নারকেলি সন্দেশ আর বাতাসা। নিমন্ত্রিত যাঁরা আসবেন তাঁদেরই খালি মতিচুর দেওয়া হবে।

পুজো শেষ হল, প্রসাদ বিতরণের পালা। শয়ে শয়ে ছেলে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু নিমন্ত্রিতও এসে পড়েছেন। তাঁরাও দাঁড়িয়ে গেছেন লাইনে। সন্ধ্যায় নিমন্ত্রিতদের লুচি মিষ্টির আয়োজন।

দীপাদিকে কলার পাতায় ফল মিষ্টি সাজিয়ে দিচ্ছে গোবর্ধনদা আর ক্লাশ টেনের দুটো ছেলে। আমি সেগুলোর একটি একটি করে তুলে নিয়ে দীপাদির হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি। একাই দীপাদি ছেলেদের হাতে প্রসাদ তুলে দিচ্ছে। এ নিয়ম অনেককাল ধরে চলে আসছে। ছেলেদের বিশ্বাস, দীপাদির হাত থেকে প্রসাদ নিলে পরীক্ষায় সরস্বতীর কৃপা লাভ করা যাবে।

হঠাৎ প্রসাদের পাতা দীপাদির হাতে ধরিয়ে দিতে গিয়ে দেখি, আগের প্রসাদী পাতাটা এখনও দেওয়া হয়নি। একজন সুদর্শন ভদ্রলোক হেসে দীপাদিকে বলছেন, কই আমার প্রসাদ দাও।

দীপাদি বলল, তুমি বিশিষ্ট অতিথি, তোমার প্রসাদ সন্ধ্যায়। নিয়মটাও ভুলে গেছ?

আমাকে তোমরাই বিশিষ্ট বানিয়ে দিচ্ছ, আমি কিন্তু ছাত্র। অবশ্য প্রাক্তন বলতে পার।

দীপাদি মৃদু হেসে প্রসাদী পাতা ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিয়ে বলল, তুমি

প্রশাসক, বিচারক, তোমার সঙ্গে তো কথায় পেরে উঠব না। আছ তো এখন?

ভদ্রলোক হেসে মাথা কাৎ করল। অর্থাৎ তিনি এখন রয়েছেন।

গোবর্ধনদা এতক্ষণ প্রসাদ সাজিয়ে দেবার কাজে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ তালভঙ্গ হচ্ছে দেখে চোখ তুলে তাকাল। তারপর হুঁম্ করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে জাপটে ধরে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, তুই ব্যাটা কখন এলি?

আমি সেদিকে তাকিয়ে আছি দেখে দীপাদি বলল, হাবলু প্রসাদ দে।

গোবর্ধনদা ছাড়া আমরা যেমন প্রসাদ দিচ্ছিলাম তেমনি দিয়ে চললাম।

ভারী কৌতূহল হচ্ছিল। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ভদ্রলোক কে দীপাদি?

অনিরুদ্ধদা। কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ চলে এসেছে।

এই সেই অনিরুদ্ধদা। আমি কেমন যেন রোমাঞ্চ অনুভব করলাম।

প্রসাদ দিতে দিতে দেখলাম, অনিরুদ্ধদার আসার খবর ছড়িয়ে পড়েছে। একে একে মাস্টারমশাইরা জড়ো হচ্ছেন। অনিরুদ্ধদা তাঁদের অনেককেই মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করছেন। ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবিতে ভারী সুন্দর মানিয়েছে তাকে।

তখন মহকুমা শাসকের মান, ক্ষমতা অনেক বেশি। সেই যুগে একজন এস. ডি. ও. তাঁর স্কুলের মাস্টারমশাইদের লুটিয়ে প্রণাম করছে দেখে আমার বুকখানা ভরে উঠল।

শুনেছিলাম, বেশ কিছুকাল আগে এক ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট এই স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি বাংলায় বলতে এবং পড়তে পারতেন। প্রফুল্লবাবু সেদিন সপ্তম শ্রেণীতে ক্লাশ নিচ্ছিলেন। যেহেতু তিনি কেবলমাত্র ম্যাট্রিক পাশ সেজন্যে নবম, দশম শ্রেণীতে ক্লাশ নেবার আইনত কোনো অধিকার ছিল না তাঁর।

ম্যাজিস্ট্রেট ঢুকে পড়লেন প্রফুল্লবাবুর ক্লাশে। সঙ্গে আনন্দবাবু। ছেলেরা উঠে দাঁড়াল। প্রফুল্লবাবু দাঁড়িয়ে পড়াচ্ছিলেন। তিনি শুধু কথা বন্ধ করে তাকিয়ে রইলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, আপনি পড়াইবেন, আমি শুনিব। এখন আমি আপনার ছাত্র আছি।

প্রফুল্লবাবু আবার পড়াতে শুরু করলেন। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠের অন্তর্গত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অনুচ্ছেদটি।

অসাধারণ দক্ষতায় মন্বন্তর পীড়িত পদচিহ্ন গ্রামের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলে যখন ক্ষণকালের জন্য থামলেন, তখন ক্লাশ শেষের ঘণ্টা বাজাল সন্ন্যাসীদা।

সাহেব মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন, ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি কোনো কথা না বলে হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। লাইব্রেরী ঘরে বসে প্রফুল্লবাবুর পড়ানোর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। যখন শুনলেন, উনি কেবল ম্যাট্রিক পাশ এবং সে কারণে নবম দশম শ্রেণীতে ক্লাশ দেওয়ার নিয়ম নেই, তখন ম্যাজিস্ট্রেট

সাহেব স্পেশাল কেস হিসেবে নবম, দশম শ্রেণীতে প্রফুল্লবাবুর ক্লাশ নেবার ব্যাপারে রেকমেণ্ড করে গেলেন। তাঁর চেষ্টায় এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকে পাকা অর্ডারও এল।

আমরা যখন ইংরাজ তাড়াবার জন্য রব তুলেছি, নিজেদের দেশের প্রশাসকদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছি তখন অনিরুদ্ধদা কি এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে আমাদের চোখের সামনে ধরা দিয়েছেন।

রাত্রে গোবর্ধনদা আর একটি কথা শোনাল। অনিরুদ্ধদাকে নিয়ে গোবর্ধনদা বেড়াতে বেড়াতে পাশের গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। আজ ফুলেশ্বর গ্রামে হাটবার। দু'বন্ধু অনেকদিন পরে একসঙ্গে ঘুরবে, এই মতলব। ঢুকে-ছিলও, হঠাৎ আনাজ বাজারের কাছে এসে দুজনেই থমকে দাঁড়াল। অনিরুদ্ধদা নত হয়ে এক বৃদ্ধ সব্জি বিক্রেতার পায়ের ধুলো নিলেন।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে অনিরুদ্ধদার থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে চুমু খেলেন। বললেন, কিছু জানাসনি তো, কবে এলি। উঠেছিস কোথায়? বাড়ি যাবি কবে?

অনিরুদ্ধদা বললেন, আজই এসেছি। উঠেছি স্কুলে। পরশু যাত্রা শুনে বাড়ি যাব।

বৃদ্ধ এবার খদ্দের সামলাতে লেগে গেলেন।

আমি বললাম, অনিরুদ্ধদা কার পায়ের ধুলো নিলেন গোবর্ধনদা?

আর কার, বাপের।

অনিরুদ্ধদার বাবা এখনও সব্জির দোকান চালান!

দোষটা কোথায়? নিজের হাতে তৈরী সব্জি নিজেই বিক্রি করছেন। ছেলের কাছ থেকে এক পয়সা নেন না। বলেন, তোর অনেক খরচ এখন, তুই রেখে দে তোর টাকা। দরকার হলে আমি ঠিকই চেয়ে নেব। কিন্তু নিজের ঐ কাজ, ছেলের মান যাবে বলে কখনও ছাড়বেন না।

গোবর্ধনদা একটু থেমে বলল, সংসারে এইসব খাঁটি মানুষগুলো বড় কমে আসছে রে।

পরের দিন ছাত্রদের অনুষ্ঠান। আবৃত্তি আর নাটকে ঠাসা প্রোগ্রাম। ইংরাজী, সংস্কৃত আর বাংলা আবৃত্তি। সংস্কৃত স্তোত্রগান, রবীন্দ্র, নজরুল, ডি. এল. রায়ের দেশাত্মবোধক গান। সবশেষে রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটকের অভিনয়।

দারুণ জমে উঠল সমস্ত অনুষ্ঠান। প্রফুল্লবাবু আর দীপাদি রিহার্সেল দেওয়ান থেকে প্রম্‌প্ট করা পর্যন্ত সবই করেছেন একমাস ধরে, তার ফল ফলল। সবাই প্রতিটি অনুষ্ঠানের শেষে হাততালি দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানাল।

সবচেয়ে জমল প্রাক্তন ছাত্র হৃষিকেশদার টিকি-মঙ্গল। মাথায় পরচুলা। বিরাট একটা টিকি মাথা নাড়লেই কেঁদো টিকটিকির মত লাফাচ্ছে। উড়ুনি গায়ে আটহাতি ধুতি পরে দাঁড়িয়ে। দেহের কাঠামোটিতে যেন চামড়াটুকু

সেঁটে দিয়েছেন বিধাতা। মোটা একটা পৈতে জেগে আছে বুকের ওপর।

'ভো ভো কারণ সলিলে কুঁকড়ি সুঁকড়ি
ডিম্বে যেমন হংস,
আহা, ছিল চৈতন চুট্‌কি আদিতে
টিকি হয় যার বংশ।
তারে ব্রহ্মা কহিলা টিকিয়া থাকহ
তাই তারে টিকি কয়,
মগজ আগুন অঙ্গার টিকি,
টিকি সামান্য নয়।
...   .
টিকি-মঙ্গল গাহিবার কালে যে করে বাহির দন্ত,
দন্ত তাহার টিকিবে না, ঠিক বুড়াকালে হবে অন্ত।'

দীর্ঘ টিকি-মঙ্গল কবিতাটি নেচে কুঁদে আবৃত্তি করে গেল হৃষিকেশদা। হাততালি আর প্রশংসায় ফেটে পড়ল আসর।

নাটকের শেষে পুরস্কার দেবার পালা। রাত তখন আটটা। এটি আজকের শেষ অনুষ্ঠান।

স্টেজের ওপর সারি সারি চেয়ার পাতা। সামনে টেবিলের ওপর ফিতেয় বাঁধা বই। বিশিষ্ট অতিথিরা মাস্টারমশাইদের সঙ্গে বসেছেন চেয়ারগুলোতে। মাঝে সভাপতিমশায়ের জন্য চেয়ারটি খালি রাখা আছে। তিনি পুরস্কার বিতরণ করবেন। আনন্দবাবু উঠে বললেন, আমাদের বহু গর্বের ছাত্র শ্রীমান অনিরুদ্ধ দাস আজ হঠাৎ আমাদের মধ্যে এসে পড়েছেন। মহকুমা শাসকের গুরুদায়িত্ব বহন করেও তিনি যে নিজের স্কুলটিকে ভালবেসে চলে এসেছেন এজন্য আমরা শুধু আনন্দিত নয় গর্বিতও। আজ শ্রীমান অনিরুদ্ধকে সভাপতির আসন গ্রহণ করে ছাত্রদের পুরস্কার দানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

অনিরুদ্ধদা উইংস-এর পাশ দিয়ে মঞ্চে ঢুকে সমবেত দর্শকদের নমস্কার করলেন। তারপর বললেন, গুরুর সান্নিধ্যে এলে ছাত্র চিরদিনই ছাত্র। গুরুর সম আসনে বসার কোন অধিকারই তার নেই। একমাত্র গুরুর চরণতলে বসার অধিকারটুকুই তার আছে। আমি এই ফরাস পাতা মঞ্চে আসন গ্রহণ করছি। অবশ্য পুরস্কারগুলি বিতরণ করার যে দায়িত্ব আমার ওপর তিনি অর্পণ করেছেন তা আমি আগে পালন করব।

অনিরুদ্ধদা তাঁর বিনম্র ব্যবহারের জন্য সকলের প্রচুর হাততালি ও সাধুবাদ পেলেন।

হৃষিকেশদা যখন পুরস্কার নিতে এলেন তখন আনন্দ কলরব আর হাততালিতে কেঁপে উঠল সভা। পুরস্কার নিয়ে ফিরে যাবার মুখে চেয়ার থেকে উঠে ভূতভাবন পণ্ডিতমশায় আবেগে হৃষিকেশদাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোকে কত মেরেছি, গো-জাতীয় জীব বলে কত ভর্ৎসনা করেছি, কিছু মনে করিসনে বাবা। আজ বলছি, তুই আমাদের নেপাল হালুইকরের

রস-কদম্ব।

সবাই আমরা পণ্ডিতমশায়ের কথায় হেসে উঠলাম। সেদিন থেকে হৃষিকেশদাকে হাটে মাঠে ঘাটে দেখলেই গোবর্ধনদা বলত, এসো এসো রসকদম্ব।

পরের দিন স্কুল গ্রাউণ্ডে বিরাট সামিয়ানা টাঙান হল। দেখার মত সে সামিয়ানা। বিষ্ণুপ্রসাদের পিতৃদেব পিপুলি থেকে এই সামিয়ানা তৈরী করিয়ে এনেছিলেন। লাল, কালো, হলুদ, সবুজ—এই চার রঙের বড় উজ্জ্বল সব ছবি। একসারি হাতি চলেছে বিরাট চক্রপথে। পরের চক্রটি ঘিরে পাতা ও ফুলের কাজ। পাপড়ি তোলা ফুল। তার পরেরটিতে টিয়ে পাখির সারি। দুটো টিয়ে পাখির মাঝে একটি করে ফুল। এর পরে মৃদঙ্গ-বাদিনীর সারি। দুটি হাঁট ভেঙে মৃদঙ্গে বোল তুলছে। একেবারে মাঝখানে বিশাল এক পদ্ম। সহস্র পাপড়ি জেগে আছে।

সকাল থেকে পাড়া ভেঙে কচি কুঁচোগুলো চড়ুই পাখির মত গ্রাউণ্ডের ধুলো উড়িয়ে হুটোপুটি করছে। এ যেন তাদেরই উৎসব। আমরাও ওদের মত যখন ছিলাম, এমনি হুড়দাঙ্গা করে বেড়িয়েছি। আসরের প্রথম সারিতে সন্ধ্যে থেকে গুঁতোগুঁতি করে বসে যেতাম। অতর্কিতে এর মাথায় টোকা মেরে, ওর পিঠে খোঁচা মেরে সাধু সেজে বসে থাকতাম। যাত্রা শুরু হবার আগেই পণ্ডিতমশায় একটা লম্বা বেত নিয়ে শাসাতেন! চুপ, চুপ, পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব।

তবুও কি হৈ-হুল্লোড় থামে। শেষে যখন কনসার্ট বেজে উঠত তখন সেই প্রচণ্ড সুরের ধাক্কায় আমরা সকলে চুপ।

যাত্রা শুরু হবার প্রথমেই চারদিকে ঘুরে ফিরে সখিদের নাচ। সে সব তেমন মনোহরণ করতে পারত না। আমরা যতটা পারি নাচের আসরের দিকে এগিয়ে যেতাম। নাচ দেখার লোভে নয়। দু-তিনটে রেকাবীতে পাত্র পাত্রীদের জন্য মিছরির টুকরো, কাবাব চিনি আর লবঙ্গ রাখা থাকত। আমরা সেগুলি ঐ সখিদের নাচের ফাঁকে হাত সাফাই করে মুখে পুরতাম।

তারপর কখন বিবেকের গান শুনতে শুনতে হাই উঠত, এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতাম। আবার যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠত তখন চমকে জেগে উঠে হাঁ করে চেয়ে থাকতাম বীরপুঙ্গবদের দিকে। দাঁড়িয়ে, শুয়ে, বসে তলোয়ার ঘোরানর সে কি কসরৎ। তাই দেখে ঘন ঘন হাততালিতে ফেটে পড়ত আসর। আবার যখন করুণরসের কোন অভিনয় হত তখন ঘুমিয়ে পড়তাম। যাত্রা ভাঙলে বাড়ির লোকে এসে তুলে নিয়ে যেত অথবা কাজের লোকের গুঁতো খেয়ে সতরঞ্চ ছেড়ে পালাতে হত।

যদিও সরস্বতী পুজো পরিচালনার দায়িত্ব দশম শ্রেণীর ছাত্রদের তবু নবম শ্রেণীর ছাত্ররা কিছু পরিমাণে এই দায়িত্ব বহন করত। তাই নবম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে আমার ওপর সে দায়িত্ব পড়ল ভীড় সামলানোর। আমরা বেশ কয়েকজন ছেলে বাঁশ দিয়ে ঘেরা আসরের চারদিকে পাহারায় রইলাম।

আমার ডিউটি পড়েছিল মাস্টারমশাইদের বসায় জায়গার ঠিক পেছনে।

বিভীষণ একটা অলম্বুস। রাক্ষস বাড়ির ছেলেদের মতই আকৃতি। তবে প্রকৃতিটা উগ্র নয়। বেশ ঠান্ডা মাথায় বড় ভায়ের সঙ্গে কথা-টথা বলছিল। শেষে ভারী ক্ষেপে উঠে রগচটা রাবণ তার পেটে কোঁৎ করে এক লাথি কষালে। বেচারা বিভীষণ উল্টে পড়ে গেল। রাবণের হাত-পা ছুঁড়ে সে কি আস্ফালন। কুলের কলঙ্ক, রক্ষ বংশের কুলাঙ্গার, দূর-হ আমার চোখের সামনে থেকে। যেখানে নরে বানরে তফাৎ নেই সেখানে গিয়ে লম্ফঝম্প করগে হতচ্ছাড়া।

ফণিভূষণ আমাদের ব্যায়াম শিক্ষক। অত্যন্ত ভাবপ্রবণ তিনি। 'নরে বানরে তফাৎ নেই'—রাবণের এই উক্তিতে তিনি যথেষ্ট অপমানিত বোধ করলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে রাবণকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, অতি দর্পে হত লঙ্কা। তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে বর্বর, বে-আক্কেলে।

এরপর রাবণ আর বিভীষণপুত্র তরণীসেন মুখোমুখি। বছর সতের বয়সের ছেলে। কি রূপ! কে বলবে সেই আবলুসের ছেলে! জ্যেঠামশায়ের ও·।র কি ভক্তি। নত হয়ে নমস্কার করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাবণ সমস্ত রক্ষকুলের দুর্দিনের একটা ভয়াবহ চিত্র এঁকে গেল। একে একে মহাবীর রক্ষ-সেনাপতিদের পতন ঘটছে। বুকের এক একখানা পাঁজর খসে যাচ্ছে দশাননের। আজ আর এমন কেউ সম্বল নেই যাকে সেনাপতির দায়িত্বভার দিয়ে পাঠান যায়।

রাবণ কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে সেনাপতিদের নাম আর পার্ট ভুলে যাচ্ছিল। ফিস্ ফিস্ করে তাকে সমানে প্রম্প্ট করে যাচ্ছিল তরণীসেন। আবার নিজের ডায়লগ যখন বলছিল তখন চোখে মুখে অঙ্গভঙ্গীতে সে কি ওস্তাদি।

মুহূর্তে চেহারায়, কথাবার্তায় সে সমস্ত দর্শকদের মন জয় করে নিল।

পরের সীনে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছে তরণীসেন। সরমা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর বলছে, বাছা আমার, তোর এই চাঁদ মুখখানা না দেখে আমি কেমন করে থাকব বাপ? এ যুদ্ধে সেনাপতি হয়ে গেলে কেউ তো আর ফিরে আসে নারে বাপধন। তুই আমাকে অন্ধ করে দিয়ে যা, তুই আমাকে বধির করে দিয়ে যা। হায়, হায়, হায়, হায়, আমার নয়ন মণি কোথায় যায় গো।

ফণীবাবু হুস্ করে কেঁদে উঠলেন। জয় রাম, জয় রাম, রক্ষা কর তোমার ভক্তে। শত্রু বেশে মহাভক্ত তরণীসেন চলেছে সমরে।

ফণীবাবুর গলাটা চড়ছিল বলে ভূতভাবন পণ্ডিত মশায় তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কিছু বললেন, তারপর আঙুল তুলে আনন্দবাবুর দিকে দেখালেন। অর্থাৎ যা বলবার ধীরে বল। অন্যান্য মাস্টারমশাইদের যাত্রা শোনায় বিঘ্ন ঘটবে।

পরের সীনে রামের বাণে নিহত হল তরণীসেন। তাকে নরবানরে এমন

ঘিরে রাখল যে সে কখন হামা দিয়ে সাজঘরে পালালো তা কেউ জানতে পারল না। যখন সবাই সরে দাঁড়াল তখন দেখা গেল তরণীর কাটা মুণ্ড মাটিতে গড়াচ্ছে। ক্ষীণ কণ্ঠে সেই মুণ্ড রামনাম করছে। অমনি আসর জুড়ে ধ্বনি উঠল, জয় রাম, জয় রাম। পরের দিন শুনেছিলাম মুণ্ডটার সঙ্গে একটা দড়ি কৌশলে বেঁধে তাকে টানা হচ্ছিল। আর অধিকারী মশায় কনসার্ট পার্টির সঙ্গে বসে ক্ষীণ কণ্ঠে রাম নাম করছিলেন।

ফণীবাবুর ওসব কার্যকারণ বের করার সময় কিংবা মনের অবস্থা ছিল না। তিনি তরণীসেন নিহত হওয়ায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

ভূতভাবন পণ্ডিতমশাই বাতের রোগী। তাঁর পরিচর্যা করেন ফণীবাবু। তাই ফণীবাবুর মনোকষ্ট দূর করার নৈতিক দায়িত্ব তাঁর।

শেষ সীনের আগে কনসার্ট পার্টির ভেতর থেকে উঠে দাঁড়ালেন আমাদের পরিবারের বেহালাবাদক মৃত্যুঞ্জয়বাবু। সকলে অবাক। তরণীসেনের মৃত্যু উপলক্ষে তিনি বেহালায় অতি করুণ এক রাগিণী বাজাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে চারদিকে ব্যথার ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ফণীবাবুর কান্না আরও উচ্ছ্বসিত হল।

এদিকে ভূতভাবন পণ্ডিতমশাই বাইরে উঠে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে ফণীবাবুর পিঠ চাপড়াতেই আমি কান পাতলাম।

ওহে ফণী, তুমি অকারণে অশ্রু বিসর্জন কর না। এ নাটক মাত্র। তরণী মরেনি। ও ব্যাটাকে আমি এখুনি সাজঘরে বিড়ি ফুঁকতে দেখে এলাম।

এত আহত বোধকরি ফণীবাবু জীবনে কখনও হননি। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি চললাম ভূতভাবনবাবু। যাত্রা দেখার শখ আমার মিটে গেছে।

কেন, কি হল?

ঐ পুঁচকে একটা ছোঁড়া কিনা বিড়ি ফুঁকছে। আমি আর ওর মুখদর্শন করব না।

ভূতভাবন পণ্ডিতমশাই ফণীবাবুর হাত ধরে টেনে বসাতে বসাতে বললেন, তোমাকে আর ওর মুখদর্শন করতে হবে না। তরণী যুদ্ধে মরেছে। শেষ সীনে আসতে হলে, রাক্ষস নয়, একেবারে ভূত হয়ে তাকে আসতে হবে।

এবার ফণীবাবু তরণীসেনের মৃত্যুর কথায় দুঃখ পেলেন বলে মনে হল না। তিনি তাঁর আসনে বসে পড়লেন।

পরের দিন শোনা গেল, যাত্রার আসরে বেহালা বাজানোর সুযোগটুকু দেবার জন্য মৃত্যুঞ্জয়বাবু যাত্রার পুরো দলটিকে ভোজে আপ্যায়িত করছেন।

গোবর্ধনদা আক্ষেপ করে আমাকে বলল, দেখলি তো, আমি অধিকারীর সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর যোগাযোগটা ঘটিয়ে দিলাম আর নেমন্তন্নের বেলায় এ শর্মা বাদ!

বললাম, না গোবর্ধনদা, তুমি অনিরুদ্ধদার সঙ্গে সকালে যখন বেরিয়ে গেলে তখন মৃত্যুঞ্জয়বাবুদের বক্সী তোমাকে খোঁজ করছিল।

ভাগ্যিস দেখা হয়নি। দীপার ওখানে আমার আর অনিরুদ্ধের

নেমন্তন্ন আছে।

রাতে মুখিয়ে আছি দীপাদি আর অনিরুদ্ধদার খবরটুকু জানার জন্যে। আমাকে আর জিজ্ঞেস করতে হল না, গোবর্ধনদাই শুরু করল, কি রে ঘুমিয়ে পড়েছিস ?

একেবারেই না।

তবে চল, খেলার মাঠের দিকে, একটু ঘুরে ফিরে খাবারগুলো হজম করে আসি।

বেরিয়ে গেলাম। মাঠে বসে গোবর্ধনদা বলল, জানিস, আজ অনিরুদ্ধকে দীপা খুব ঠুকেছে।

সে কি! অনিরুদ্ধদাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে ঠুকেছে। এটা কি রকম হল ?

তুই থাম, নেমন্তন্ন করে বুঝি ঠোকাঠুকি করা যায় না ?

বললাম, কি নিয়ে ঠোকাঠুকি হল গোবর্ধনদা ?

দীপা বলল, ধুতি পাঞ্জাবীতে তোমাকে বেশ মানিয়েছে, কোট প্যাণ্ট পরলে কি রকম দেখায় কে জানে।

মুচকি মুচকি হাসছিল অনিরুদ্ধ। আমি বললাম, কিরে কিছু বলছিস না কেন ?

অনিরুদ্ধ বলল, কোট-প্যাণ্টে আমাকে কেমন মানায় জানতে হলে দীপাকে আমার সঙ্গে আমার কাজের জায়গায় যেতে হয়।

দীপা বলল, শুধু তোমার সাজ দেখতে অ্যান্দূরে যাব ?

কাজ দেখতেও।

সে কাজ যদি আমার ভাল না লাগে তবু দেখতে হবে।

এবার চুপ করে গেল অনিরুদ্ধ। দীপা আবার বলল, তোমার কাজ দেখার জন্য আর কাউকে ডাকনি ?

অনিরুদ্ধ তেমনি মুচকি হেসে চোখ তুলে তাকাল। পরে বলল, যাকে ডাকব, তার আমার কাজের ওপর আস্থা থাকা চাই।

নিশ্চয়ই এমন কেউ আছে, তোমার ডাক তার কাছে ঠিক মত পৌঁছচ্ছে না।

এবার অনিরুদ্ধ উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। দীপার ইঙ্গিতটা অনিরুদ্ধর না ধরবার কথা নয়।

অনিরুদ্ধ চুপ করে আছে দেখে দীপা বলল, নীরুর সঙ্গে তুমি দেখা করনি কেন ?

আমি যে দেখা করিনি তুমি জানলে কি করে ?

ওকে দেখা করা বলে না, নিয়ম রক্ষে বলে।

বড়বাবু নেই, অন্দরমহল আমার অবাধ যাতায়াতের জায়গা নয়।

তোমাকে কি কেউ ওখানে অসম্মান করেছে কোনোদিন ?

আমাকে ওবাড়ি সম্বন্ধে আর কিছু প্রশ্ন কর না দীপা। আমি বড় বাড়ির

কাছে অনেক ঋণে ঋণী। শুধু জেনে রেখ আমি অকৃতজ্ঞ নই।

দীপা বলল, তুমি আমার ওপর রাগ করলে অনিরুদ্ধদা?

না দীপা রাগের প্রশ্ন নয়। আমি শুধু বলতে চাইছি, আজকের অনিরুদ্ধ বিষ্ণুপ্রসাদের সৃষ্টি, তা বলে আমি আমার সীমা পেরিয়ে যাব, এ তো হয় না। সীমায় দাঁড়িয়ে নীরুর সঙ্গে যতটুকু কথা বলা যায় বলেছি। বড়মা মাঝে মাঝে ঘরে এসেছেন, কারণে অকারণে। আমি তাঁর কাছ থেকে মিষ্টি আর খাবার খেয়ে চলে এসেছি। বলতে পার, আর বসে থাকা যায় না বলে চলে আসতে হয়েছে।

আমাকে ভুল বুঝ না অনিরুদ্ধদা। নীরু বড় সেণ্টিমেণ্টাল, কেউ ওকে বোঝে না। ও তোমার দ্বারা আহত হয়নি, ভাগ্যই ওকে নানা দিক থেকে আঘাত করে যাচ্ছে।

এরপর কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল অনিরুদ্ধ, তুমিও তো আজকাল সংক্ষিপ্ত করেছ তোমার চিঠিপত্র।

এবার দীপা ছেলেমানুষের মত বলে উঠল, সত্যি বল তো অনিরুদ্ধদা, শেষ পর্যন্ত আমার চিঠি পড়তে তোমার ধৈর্য থাকে? একেবারে শুকনো ইনফরমেশানে ঠাসা।

তোমার, আমার আর নীরুর ভেতর যে চিঠির আদানপ্রদান তাতে শ্রেষ্ঠ রচনা তোমারই।

অবাক করলে, কি রকম শুনি?

যে দেয়, সে কি বোঝে তার মূল্য।

হেঁয়ালি রাখ, ভারী ইচ্ছে করছে সত্যটা জানতে।

তোমার চিঠি থেকে আমি আমার দেশের সত্য ছবিটা জানতে পাই।

দীপা বলল, যত মিটিং-এর খবরে ঠাসা। দেশের হালচাল, রোগ ব্যাধি, এইসব। কল্পনার ছিটেফোঁটা নেই। জান অনিরুদ্ধদা, অনেক সময় ভগবানের ওপর ভারী ক্ষোভ হয়, কেন তিনি আমাকে এমন আকাট করলেন।

অনিরুদ্ধ হাসল। বলল, ভগবানের ওপর তুমি যত ক্ষোভ জানাও কিন্তু তোমার চিঠি সম্বন্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নেই।

আর একটা কথা জানতে চাইলে সঠিক বলবে?

বেঠিক বলব এটা ভাবলে কি করে?

আচ্ছা বাবা ঠিক আছে। এখন বলতো নীরু কেমন চিঠি লেখে?

ভাল।

এটা কোনো উত্তর হল?

তাহলে খারাপ বলতে হয়।

ওঃ। আমি জানতে চাইছি, নীরুর চিঠিও কি আমার মত রসকষহীন?

তোমার অ্যাসেসমেণ্ট ওর চিঠি সম্বন্ধেও খাটে। ও যেমন সেণ্টিমেণ্টাল ওর চিঠিতেও তেমনি সেণ্টিমেণ্টের ছড়াছড়ি।

এবার সত্যি করে বল, ওর চিঠি পেয়ে তুমি খুশী হও না?

হই না বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে সেটা অন্য এক ধরনের ভাল লাগা। আচ্ছা, এবার আমি তোমাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, আমি জানি তুমি সোজাসুজি উত্তর দেবে। কোনো কিছু অস্পষ্ট করে বলা তোমার অভ্যেসের বাইরে।

বল, কি বলতে চাও?

তোমার ভেতর আমার চিঠির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করে।

চুপ করে হাতের পাতায় থুতনি ঠেকিয়ে নীচের দিকে মুখ করে সেই যে বসে রইল দীপা, আর একটি কথাও বলল না।

কেন গোবর্ধনদা?

বড় হলে বুঝবি গর্দভ, অনেক সময় কিছু না বলে বেশি কথা বলা হয়।

আচ্ছা গোবর্ধনদা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বল।

তুমি পরীক্ষায় ফেল করলে কি করে?

কেন রে?

দীপাদি আর অনিরুদ্ধদার কথাগুলো তুমি পর পর সাজিয়ে হুবহু যে-ভাবে বলে গেলে তাতে সত্যি আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। এ তো ফেল করা ছাত্রের কর্ম নয়।

কপাল রে কপাল। আমার কাছে এসে পড়া বুঝে নিয়ে যেত যারা, তারা ফার্স্ট, সেকেন্ড ডিভিশনে বেরিয়ে গেল। আমি হতভাগা পড়ে রইলাম।

কেন এমনটা হয় ভেবে দেখেছ?

সব জানি রে, কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। আমি সব কোশ্চেনের উত্তর জানি কিন্তু আসল জায়গায় ভগবান আমাকে মেরে রেখেছেন।

কি রকম!

লেখার সময় কচ্ছপের মত চলে আমার হাত। সারা তিন ঘণ্টায় তিনটে প্রশ্নেরও উত্তর লিখতে পারি না।

আমি গোবর্ধনদার হাতখানা টেনে নিয়ে বললাম, এ হাতে তো তুমি হাজারটা কাজ করে বেড়াও, কই হাতের তো কোনো দোষ চোখে পড়ে না।

মোটা কাজ করতে পারি চটপট, কিন্তু ঐ সরু কলমের লেখায় যত গোল।

অনিরুদ্ধদা কি এখন থাকবেন?

না, কালই চলে যাচ্ছে। বিষ্ণুপ্রসাদ অসুস্থ হয়ে কলকাতার হাসপাতালে পড়ে আছেন, অনিরুদ্ধ তাঁর সঙ্গে দেখা করে ঐ পথে কটক চলে যাবে।

আচ্ছা গোবর্ধনদা, নীরুদি অথবা দীপাদি, কার সঙ্গে বিয়ে হবে অনিরুদ্ধদার?

দীপা আর বিয়ে করবে বলে মনে হয় না, ও আনন্দবাবুর সঙ্গে দেশের কাজ নিয়েই মেতে থাকবে। নীরুর সঙ্গে হলেও হতে পারে। বড়মার সংস্কারে বাধলেও বিষ্ণুপ্রসাদের এ বিয়েতে পুরো ইচ্ছে। তবে বিয়ের ব্যাপারে আগাম কিছুই বলা যাবে না।

হঠাৎ স্কুল ছেড়ে কর্মান্তরে চলে গেলেন প্রফুল্লবাবু। আমরা শুধু যে একজন প্রিয় শিক্ষককে হারালাম তা নয়, আমাদের সকল শুভ কর্মের কান্ডারীকেই হারালাম।

নতুন মাস্টারমশাই এলেন, গণপতিবাবু। কয়েক দিনের ভেতরেই উনি ছাত্রদের মন জয় করে নিলেন। ওঁর পড়ানোর পদ্ধতিটাই ছিল ভিন্ন রকম। উনি বই থেকে পড়া দিয়ে বলতেন, তোমরা এটা ভাল করে পড়বে। কি কি প্রশ্ন এর থেকে হতে পারে তা ভেবে আসবে। পরের দিন তোমরাই পর পর আমাকে প্রশ্ন করে যাবে। আমি এক এক করে উত্তর দিয়ে যাব।

আমরা এই পদ্ধতিতে খুব মজা পেয়ে গিয়েছিলাম। যারা ক্লাশে প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় পেত তারাও নির্ভয়ে মাস্টারমশাইকে সামান্য একটি বানান জিজ্ঞেস করে বসত। 'উজ্জ্বল' বানানটা বলুন মাস্টারমশাই।

উনি সন্ধি বিচ্ছেদ করে উজ্জ্বল বানানটি বুঝিয়ে দিলেন। উজ্জ্বলের অর্থ বলে দিলেন। কোথায় কিভাবে প্রয়োগ করলে ভাবটি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তাও বলে দিলেন।

এমনি প্রতিদিন পড়া পড়া খেলা চলত মাস্টারমশায়ের সঙ্গে। ভারী মজার সে খেলা এমনি জমে উঠল যে আমরা মাস্টারমশায়ের ক্লাশে আসতে দুমিনিট দেরী হলেই হাঁকপাঁক করতাম। উঁকিঝুঁকি মারতাম মাস্টারমশাইদের বসার ঘরে।

গণপতিবাবু ছুটি পড়লেই আমাদের কাছেপিঠে ভ্রমণে নিয়ে যেতেন। প্রাচীন বন্দর খেজুরী, তার বাতিঘর, ইংরাজ কর্মচারীদের কবরস্থান, হালাম শা'র পুকুর, হিজলীর মসনদীআলা, আরও কত কি ঘুরে ঘুরে দেখতাম তাঁর সঙ্গে। সে যেন ছুটির দিনগুলিতে আনন্দের বনভোজন।

মাস্টারমশায়ের নখদর্পণে ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা-পঞ্জি। কবে রাজা রামমোহনের বন্ধুরা এই খেজুরী বন্দরে এসে বিলেত যাবার সময় রাজাকে জাহাজে তুলে দিয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের কোন কোন ব্যক্তি খেজুরী নিমক-মহলের তদারকি করতেন। ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফের পরীক্ষা এই খেজুরী বন্দর থেকে কলকাতাতে করা হয়েছিল কত সালে। কাউখালির বাতিঘরের আলো কত সালে শেষ বারের মত জ্বলেছিল। এমনি অজস্র ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তিনি সব সময়েই প্রস্তুত হয়ে থাকতেন।

আর একটি দায়িত্ব তিনি ছেলেদের ওপর চাপিয়েছিলেন। সেটি আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করার চেষ্টা করতাম।

গরমের দিনে গ্রাম বাংলায় চালার খড় উত্তপ্ত হয়ে থাকে। পুকুরে প্রায় জল থাকে না। সেই সময় সামান্য অসাবধানে ঘরে আগুন লাগে। সংলগ্ন পাড়ার অনেকগুলি ঘরই একসঙ্গে আক্রান্ত হয়।

মাস্টারমশাই আমাদের নিয়ে ফায়ার-সার্ভিস নামে একটি ছোট্ট প্রতিষ্ঠান তৈরী করলেন। বেশ কয়েকখানা বালতি, দড়ি, লাঠি, মই ইত্যাদি মজুদ করে

রাখা হল। বড় বড় পিচকিরি আর কয়েকটা টর্চও কেনা হল।

রাতে আমরা কোন দিকে ঘর পোড়ার আগুন দেখতে পেলেই ঘন ঘন হুইসিল বাজিয়ে সবাইকে জাগাতাম। তারপর মাস্টারমশায়ের নেতৃত্বে ঐসব দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে শুরু হত দৌড়। ঠিক জায়গায় পেঁছে আগুন নেভানোর কাজে লেগে যেতাম। সে এক দারুণ উন্মাদনার কাজ।

একবার প্রচণ্ড গরম পড়েছে। আগুনের তেজ অসহ্য। কদিন পরেই গরমের ছুটি পড়বে। দুপুর বেলার ইস্কুল এখন সকালেই বসছে। মাস্টারমশাই এলেন আমাদের ক্লাশে। পড়াশোনা শেষ হলে ছুটির ভেতর কি করব তার নির্দেশ দিচ্ছেন। এমন সময় আমাদের ক্লাশের লক্ষ্মীকান্ত বলল, আমরা পঙ্গু হয়ে গেলাম মাস্টারমশাই।

কেন রে, কি হল?

বালতিতে মরচে পড়ে গেল।

প্রথমে মাস্টারমশাই কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, কি বলছিস তুই।

আজ্ঞে আমাদের দুর্ভাগ্য, এ বছর এখনও ঘরে আগুন লাগল না।

ওর কথা শুনে আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। ও কিন্তু আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। ওর কথায় হাসির কি কারণ থাকতে পারে তা ও বুঝতে পারল না।

মাস্টারমশাই বললেন, হাঁ রে, মানুষের বাড়িতে আগুন লাগলে বুঝি সৌভাগ্যের ব্যাপার? আর আগুন না লাগলেই যত দুর্ভাগ্য।

এতক্ষণে ব্যাপারটা মগজে ঢুকতে লক্ষ্মীকান্ত লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু করল।

মাস্টারমশাই ওকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে বললেন, লক্ষ্মীর উৎসাহটা কিন্তু প্রশংসা করার মত। মানুষের উপকার করার ইচ্ছেটা ওর প্রবল। বেশ, কাল থেকেই একটা কাজে লেগে যা, আমিও থাকব তোদের সঙ্গে।

কি কাজ মাস্টারমশাই?

গ্রামের বেশ কয়েকটি পুকুরে শ্যাওলা জমে আছে, যতগুলো পারিস করে ফেল।

পরের দিন থেকেই আমরা মহা উৎসাহে জঙ্গল, পানার নির্বাসন করতে লেগে গেলাম।

এই মাস্টারমশাইটিকেও আমাদের হারাতে হল। গরমের ছুটির পর এসে শুনলাম, গণপতিবাবু স্কুল ছেড়ে, এমনকি আত্মীয়-স্বজন, বাড়িঘরের মোহ কাটিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন নামক একটি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন।

আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের মাহাত্ম্য তখন এত বুঝিনি। মাস্টারমশাইকে আর কোন দিনও পাওয়া যাবে না, এই ভাবনাতে কাতর হয়ে পড়েছিলাম।

দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলনের ঢেউ চলেছে। হঠাৎ মারা গেলেন বিষ্ণুপ্রসাদ। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন থেকে বিষ্ণুপ্রসাদ অজস্র অর্থ

ব্যয় করেছেন। স্বাধীনতার আন্দোলনেও তাঁর দান কম ছিল না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল বিপুল ঋণের ভার তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর উত্তর-পুরুষদের ওপর।

স্বামীর সমস্ত ঋণ মাথা পেতে নিলেন তাঁর সুযোগ্য স্ত্রী। ধীরে ধীরে পরিশোধ করতে লাগলেন সে ঋণ। অমিতব্যয়িতার অবসান ঘটল। দানের হাত সঙ্কুচিত হল। এখন আর চার প্রস্থ ভোজনের জন্য চারবার ঘণ্টা বাজল না।

নতুন কাজের লোক নিয়োগ বন্ধ রইল, অবশ্য পুরনো চাকরবাকর পেল আগের মত মর্যাদা।

অতি অল্পই ছিল ইস্কুলের ছাত্রদত্ত বেতন। সরকারী সাহায্য ছিল যৎকিঞ্চিৎ। গভর্ণমেণ্টের সুনজরে ছিল না বিষ্ণুপ্রসাদের বিদ্যালয়। কয়েকবার গোরা সৈন্য এসে ঘাঁটি গেড়েছিল স্কুল গ্রাউণ্ডে। মার্চ করে, যুদ্ধের মহড়া দিয়ে চরাচর কাঁপিয়ে তারা মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করার সবরকম চেষ্টা চালিয়েছিল। প্রতি পরিবার থেকে তাদের জন্য মাছ মাংসের ভেট পাঠান হত। প্রতি বাড়ির চরকা ডুবিয়ে রাখা হত জলের মধ্যে।

সৈন্যরা চলে গেলেই শোনা যেত চরকার ঘর্ঘর। আবার শুরু হয়ে যেত হাটে বাজারে পুরোদমে স্বদেশী বক্তৃতা। মানুষ সভা শেষে ইংরাজ তাড়াবার শপথ নিত।

বিষ্ণুপ্রসাদ বিদ্যালয়টির জন্য কিছু ভূমি দান করেছিলেন। তাছাড়া মাঝে মাঝে অর্থকষ্ট হলে তিনি তাঁর জমিদারীর আয় থেকেই সে সঙ্কট মেটাতেন। এখন আনন্দবাবু বিষ্ণুপ্রসাদের স্ত্রীকে বিদ্যালয়ের ব্যাপারে বিব্রত করতে চাইলেন না। তিনি শিক্ষকদের ডেকে বললেন, আপনারা জানেন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয়-বিদ্যালয়ের গৌরব এই স্কুলের সঙ্গে জড়িত। স্বদেশী জিনিসের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার জন্যই আমরা আজও কৃষিবিভাগ, তাঁত বিভাগ প্রভৃতি শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে রেখেছি। কাঠের কাজ, সাবান তৈরীর কাজ, এসবও সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছেলেরা এসব কাজকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে, স্বাবলম্বী হবে, এই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা। আমাদের বিদ্যালয়ে প্রস্তুত জিনিসের চাহিদা যে কিভাবে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে তা আপনারা জানেন। কিন্তু মূলধনের অভাবে আমরা চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিতে পেরে উঠছি না। স্বদেশী মেলায় আপনারা ঘুরে দেখেছেন, কি বিপুল উৎসাহ আর আগ্রহ আমাদের স্কুলের জিনিসগুলোকে ঘিরে। আমরা যারা জাতীয়-বিদ্যালয়ের মানুষ, তারা অর্থ উপার্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিনি, একটা প্রেরণার পেছনেই চলেছি।

একটু থেমে আনন্দবাবু আবার বলতে লাগলেন, আমাদের বিদ্যালয় থেকে আপনারাই সৃষ্টি করেছেন কত কৃতি ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষাবিভাগে, সরকারী প্রশাসনে তারা অনেক উচ্চপদে কাজ করছে। আপনারা জানেন, ব্যবহারিক জীবনে ছাত্রদের এই কৃতিত্বকে আমরা কখনও বড় করে দেখিনি।

তারা এখনও যে তাদের স্কুলকে মনে রেখেছে, তাদের আচরণের ভেতর দিয়ে স্কুলের আদর্শকে তুলে ধরেছে, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া। তারা যে তাদের আদর্শকে পদের গৌরবের ওপরে স্থান দিতে পেরেছে, এখানেই আমাদের জয়, আমাদের পরিশ্রমের পুরস্কার।

আনন্দবাবু চিরদিনই আদর্শবাদী এবং ইমোশনাল। তিনি বলে চললেন, আপনারা যে স্কুলে এখন বসে আছেন এর প্রতিটি ইঁট ছাত্রদের তৈরী। রোদে শুকনো সেই ইঁট তারা নিজেরাই মাথায় করে বয়ে এনেছে। আমরা ছেলেদের সঙ্গে মিলেমিশে সেই ইঁট দিয়ে এ বাড়ি তৈরী করেছি। কাজের মানুষদের পয়সা দেবার মত ক্ষমতা আমাদের ছিল না। তাই যা করেছি, নিজেরাই করেছি। হাড়ভাঙা খাটুনিতেও যে এত আনন্দ থাকতে পারে তা আমরা সেদিন উপলব্ধি করে অভিভূত হয়েছিলাম। চাটাইতে আমরা ছাত্র শিক্ষক সকলে বসে পঠনপাঠন করেছি।

একটু থেমে আবার বললেন, সুদিনে দুর্দিনে যে মানুষটির ধ্যানজ্ঞান ছিল এই বিদ্যালয়, পক্ষীমাতার মত যিনি এই বিদ্যালয়কে আগলে রাখতেন, তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। আমরা তাঁকে হারিয়ে বেশ কিছুটা অসহায় হয়ে পড়েছি। আপনারা জানেন বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহ লাভে আমরা বঞ্চিত। আমার মনোগত ইচ্ছা নয় যে স্কুলের জন্য প্রদত্ত সাহায্য আমরা গ্রহণ করি। কিন্তু নানাদিক বিবেচনা করে ওটুকু আমাদের গিলতে হচ্ছে।

আনন্দবাবু ভাবাবেগে অনেক কথাই বলে যান। মাস্টারমশায়েরা এই দেশভক্ত, আদর্শবাদী মানুষটিকে চেনেন, তাই তাঁরা আনন্দবাবুর সব কথাই শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে অভ্যস্ত।

সবশেষে আনন্দবাবু বললেন, বিষ্ণুপ্রসাদের অকালমৃত্যুতে আমরা বেশ দুর্যোগের ভেতর পড়ে গেছি। আমার বিশ্বাস, আমরা যদি একযোগে কিছু স্বার্থত্যাগ করতে পারি তাহলে এই ঘোরতর দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারব।

আনন্দবাবু থামলে ভূতভাবন পণ্ডিতমশাই বললেন, কিরকম স্বার্থত্যাগ আমাদের করতে হবে তা বলে দিন।

আনন্দবাবু বললেন, ছাত্রদত্ত মাহিনা, জমির ফসলের বাৎসরিক আয় থেকে যেটুকু রোজগার হয়, তা আমরা ভাগ করে নেব মোটামুটি সমানভাবে। এখানে হেডমাস্টার, অ্যাসিস্টেণ্ট হেডমাস্টার, থার্ডমাস্টার বলে আলাদা কিছু ভাগ থাকবে না আজ থেকে।

অঙ্কের মাস্টার অনাথবাবু বললেন, আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন।

আপনাদের সকলের কি একই অভিমত ?

কেউ মাথা নেড়ে, কেউ মুখ ফুটে, কেউ বা হাত নেড়ে সমর্থন জানাল।

এবার আমার আর একটি প্রস্তাব আপনাদের বিবেচনার জন্য রাখছি।

ফণীবাবু বললেন, বলুন।

আনন্দবাবু চৌকাঠের ওপারে অপেক্ষমান গোবর্ধনদাকে ডাক দিয়ে

বললেন, গোবর্ধন, আমার তিন নম্বর ফাইলটা নিয়ে আয়।

ইদানিং হেডমাস্টারমশাই তাঁর পার্সোনাল ফাইলপত্র গোবর্ধনদার কাছেই জিম্মা রাখতেন। বোর্ডিং-এর কাজের ফাঁকে আনন্দবাবুর এটুকু কাজ গোবর্ধনদা হাসিমুখে করে বেড়াত।

দীপাদি বলত, বাবার কাজ করে দিচ্ছ, মাইনে নিচ্ছ না কেন?

ও তুই বুঝবি না। সুদে-আসলে বাড়ছে।

আনন্দবাবুর ডাকে তিন নম্বর ফাইল নিয়ে হাজির হল গোবর্ধনদা। হেডমাস্টারমশাই একটা হিসেব করে রেখেছিলেন ফাইলের ভেতর। সেই হিসেবের কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে লাগলেন।

সেই কাগজে প্রতিটি মাস্টারমশায়ের নামের পাশে তাঁদের পরিবারের লোক-জনের সংখ্যা লেখা ছিল। কাগজটি পড়া শেষ হলে হেডমাস্টারমশাই বললেন, হিসেবে আমার ভুল হতে পারে, ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঠিক সংখ্যা আমি গুলিয়ে ফেলতে পারি। আপনারা এবার সংশোধন করে দিন।

সামান্য সংশোধনের পর হেডমাস্টারমশাই বললেন, পরিবারের মেম্বার অনুযায়ী আপনাদের যদি মাহিনা ভাগ করে দেওয়া যায় তাতে কি কেউ আপত্তি তুলবেন? আর যাদের বাড়িতে শিশুরা রয়েছে তাদের আমরা সামান্য কিছু বেশী দিতে চাই। আমরা কষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু ওদের বেড়ে ওঠার সময় যত কম কষ্ট হয় ততই মঙ্গল।

ফণীবাবু বললেন, হিসেবে আপনার দুই মেয়ে বাদ পড়ল কেন আনন্দবাবু?

কতক্ষণ চুপ করে বসে থেকে শেষে ম্লান হেসে বললেন, আপনারা তো সবই জানেন, তাহলে বলুন আমি কেমন করে মিথ্যের আশ্রয় নি।

তরুণ শিক্ষক ধ্রুব সামন্ত সবে কাজে যোগ দিয়েছেন। তিনি হঠাৎ বললেন, অপরাধ নেবেন না আমার, আমি শুনেছি, আপনার এই বন্ধুকন্যা দুটি অতি অল্প বয়সে মা বাবাকে হারিয়ে আপনাকেই তাদের বাবা বলে জানে। আপনিও সারা জীবন নতুন সংসার রচনা না করে ওদের নিয়েই কাটিয়ে দিলেন। তাহলে শুধু রক্তের সম্পর্ক নেই বলেই কি আপনি ওদের হিসেব থেকে বাদ দিলেন?

ম্লান হাসলেন আনন্দবাবু। বললেন, তুমি আমার সহকর্মী হলেও পুত্রস্থানীয়। তোমার এই বিবেচনায় আমি খুবই আনন্দ পেলাম। তাহলে আমার ঐ মেয়েদের আমি ভাগ থেকে বঞ্চিত করব না। দুজনের জন্য দুটি করে টাকা মাসে মাসে আপনারা আমার খাতে বরাদ্দ করবেন।

অনেকেই তখন বলে উঠলেন, ওদের পুরো ভাগই আপনাকে নিতে হবে।

আনন্দবাবু বললেন, প্রয়োজন হলে নিতাম। দীপা আর চন্দ্রা দুজনেই চরকা কেটে তাঁতে কাপড় তৈরি করিয়ে দেয়। কোনো সভাতে বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে গোবর্ধনই ঐ কাপড় শ্রোতাদের ভেতর বিক্রি করে দেয়। মানুষ এখন মিল

ছেড়ে খদ্দরের শাড়ি ধুতি পরতে চাইছে। তাই বলছিলাম, ওদের যখন একটা আলাদা রোজগার আছে তখন আমি ওদের পুরো পাওনাটা আর নিতে চাইছি না।

ইতিহাস শিক্ষক মৃগেনবাবু বললেন, মাস কয়েক আমার ভাই কলকাতার এক সওদাগরী অফিসে কাজে ঢুকেছে। একজনের লিভ ভেকেন্সীতে। অফিস আশ্বাস দিচ্ছে অ্যাবজর্ব করে নেবে। আপনি লিস্ট থেকে ওর নামটা বাদ দিন।

আনন্দবাবু বললেন, কি করে বাদ দি, যতক্ষণ না পারমানেন্ট হচ্ছে ততক্ষণ ভরসা কি। দু'এক মাসের চাকরি চাকরিই নয়।

মৃগেনবাবু বিনীতভাবে বললেন, তেমন হলে আমি চেয়ে নেব আপনার কাছ থেকে।

ভুবনবাবু নীচের ক্লাশে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পড়ান। অতি বৃদ্ধ, চোখে ছানি পড়েছে। ছেলেরাই পাঠ্য বইখানা তাঁকে পড়ে শোনায়। তিনি তাদের ব্যাখ্যা করে করে বুঝিয়ে দেন।

উঠে দাঁড়ালেন ভুবনবাবু। অমনি আনন্দবাবু বললেন, উঠলেন কেন, আপনি বসেই বলুন।

ভুবনবাবুর সারা শরীরটা কাঁপছিল। তিনি না বসেই বললেন, কদিন হল আমি একটি দৌহিত্র লাভ করেছি আনন্দবাবু। আপনার হিসেবের মধ্যে তাকে ধরা হয় নি।

সকলেই প্রায় চমকে উঠলেন। ভুবনবাবুর স্ত্রী অনেক বয়সে একটি কন্যা-সন্তানের জন্ম দিয়েই মারা যান। পরিণত বয়সে সেই মেয়েকে ভুবনবাবু প্রতিপালন করে বড় করে তোলেন। মেয়েটির স্বাস্থ্য ভাল হলে হবে কি, কালো বলে তাকে কেউ ঘরে তুলে নিতে চাইল না। শেষে বিপত্নীক একজন কিছু টাকা পণ নিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করল। বেশ কিছুকাল ঘর করার পরেও ভুবনবাবুর কন্যার সন্তানাদি হল না। বছরখানিক আগে জামাতাও চোখ বুজল। মেয়ে চলে এল বাবার কাছে। এখন সে পুত্রের জননী!

পাড়াপড়শীরা কানাঘুষোয় বলছে, ছেলে তার বাপের নয়। ভুবনবাবু কাঁপতে কাঁপতে অকপটে সব কথা বলে গেলেন। বৃদ্ধ শেষে যখন ধরা গলায় বললেন, মা আমার বড় দুঃখী, একটা পস্তুমাস চাইল্ডের জন্ম দিয়েছে, তখন তাঁর কোটরাগত চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

আনন্দবাবু উঠে দাঁড়িয়ে আবেগে ভুবনবাবুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পৃথিবীতে একটা মানুষের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, এর চেয়ে বড় পরিচয় তার আর কিসের দরকার। মাকে বলবেন, আমি তার ছেলেকে আশীর্বাদ করে আসব।

আনন্দবাবুর বুকের মধ্যে ভুবনবাবু ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন।

আনন্দবাবু বললেন, আমাদের লিস্টে নতুন একটি মানুষ এ মাস থেকে যুক্ত হল।

চলমান জীবনে কত বাঁক, কত বিস্ময়, কত ছবি। একটা অদৃশ্য স্রোতের টানে শ্যাওলার মত ভেসে চলা। ঘূর্ণিতে পাক খাচ্ছি, বাঁকের কাছে এসে আটকে যাচ্ছি, আবার স্রোতের ধাক্কায় ভেসে চলেছি। এই ভেসে চলাতেই আনন্দ।

গোবর্ধনদার সঙ্গে গল্প করতে করতে জানালা দিয়ে মাঠের দিকে চেয়েছিলাম হঠাৎ দেখি দুটো লোক একটা বাঁশে বাঁধা কাপড়ের দোলনায় কাউকে বয়ে আনছে। বাঁশের দুটো প্রান্ত পাল্কির মত দুজনের কাঁধে। গ্রামের লোক যেমন করে রোগীদের বয়ে নিয়ে যায় দূরের হাসপাতালে।

রোগীই হবে বোধহয়। কি রোগ হতে পারে? মহিলা না পুরুষ? যুবক না বৃদ্ধ? এইসব অনুমানভিত্তিক আলোচনায় মেতেছি দুজনে। হঠাৎ দেখি অতি সাবধানে খালের ওপর বাঁশের সাঁকোটি পেরিয়ে বাতিঘরের দিকে চলে গেল দোলাটা।

আমরা দুজনেই ছুটলাম সেদিকে। যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন ঝোলা নামানো হয়ে গেছে। অতি জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধকে দাওয়ার ওপর ইজিচেয়ারে বসানো হচ্ছে। দীপাদি আর চন্দ্রাদি যুবক বাহক দুটিকে সাহায্য করছে।

কিছু পরে পরিচয় জানা গেল। ইনি বিহারীলাল প্রহরাজ। বিষ্ণুপ্রসাদের বাবার আমলে যে এম. ই. স্কুল ছিল, সেই স্কুলের ইনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এখন বিরানব্বুই বছরের বৃদ্ধ। চোখে দেখেন না, কানে তত ভাল শুনতে পান না। তবে স্মৃতিশক্তি ও কণ্ঠস্বর অটুট আছে। স্ত্রী পুত্র কন্যা কেউ বেঁচে নেই। দুটি নাতি দাদুর অতি অনুগত। তিনখানা গ্রামের ওপারে কলমদানে বাড়ি। অবস্থা এমন নয় যে পাল্কি ভাড়া করে আসে। নাতি দুটি দাদুর বিঘে আটেক জমিতে নিজেরাই চাষবাস করে। দাদুর শেষ ইচ্ছে, একবার নিজের পুরনো কর্মস্থলটা ঘুরে আসে। লোকে হেডমাস্টার আনন্দবাবুর খুব নাম করে, তাই তাঁকে একবার ছুঁয়ে দেখার বড় ইচ্ছে।

দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে যুবক দুটিকে খাতির করে বসাল দীপাদি। তারপর বৃদ্ধকে নত হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল। গোবর্ধনদা, চন্দ্রাদি, আমি পর পর ওঁকে প্রণাম করলাম।

অন্ধ বৃদ্ধ আকুল হয়ে জানতে চাইলেন, আমরা কে?

গোবর্ধনদা একে একে সকলের পরিচয় দিয়ে গেল। উনি কাছে ডেকে ডেকে দাড়ি ধরে সকলকে চুম্বন করলেন। আমার ঠাকুরদাদার কথা বললেন। সহজ সরল অতি সজ্জন ব্যক্তি। কবে নাকি কোটালের সময় আমাদের চর থেকে পারসে, ভেটকি আর গুলে মিলিয়ে পাঁচ মণ মাছ ভারীরা নিয়ে এসেছিল। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি পাঠিয়েও উদ্বৃত্ত। নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হয়েছিল মাস্টারমশাইদের। সে ভোজের কথা এখনও বৃদ্ধ নাকি ভুলতে পারেননি।

গোবর্ধনদা দৌড়ে গিয়ে বোর্ডিং থেকে ডেকে আনলেন হেডমাস্টারমশাইকে। আনন্দবাবু দাওয়ায় উঠেই চটি খুলে বৃদ্ধকে লুটিয়ে প্রণাম

করে বললেন, কি সৌভাগ্য, আপনি আমার কুটিরে আজ পায়ের ধুলো দিয়েছেন।

বিষ্ণুপ্রসাদ গত হয়েছেন শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কি কান্না বৃদ্ধের। বিষ্ণুপ্রসাদের বাড়িতেই দুবেলা তাঁর পাত পড়ত। বালক বিষ্ণুপ্রসাদ তাঁরই সঙ্গে প্রতিদিন আসত স্কুলে।

বৃদ্ধ বললেন, এখানে কত মানুষকে দেখেছি। বিষ্ণুপ্রসাদের আত্মীয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এলেন জাতীয়-বিদ্যালয় উদ্বোধন করতে। সেই শেষবার আমার এখানে আসা। বিশাল কালো দেহটি। বক্তৃতা দেবার সময় মনে হত, আগ্নেয়গিরির আগুন জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। শ্রোতারা এতই অভিভূত হত যে তিনি আদেশ করলে যে কেউ ইংরেজের গুলির সামনে বুক পেতে দিতে পারত। হেম দাস মশায়ের সঙ্গেও ছিল এই পরিবারের আত্মীয়তা। কংগ্রেসের আশুতোষ চৌধুরী মশাইকেও দেখেছি এ-বাড়িতে আসতে। তাছাড়া আমাদের কিশোর বিষ্ণুর প্রথম গুরু ছিল ক্ষুদিরাম।

এবার উত্তেজনায় এতগুলো কথা বলার শেষে ঝিমিয়ে পড়লেন। আনন্দবাবু দীপাদিকে খানিকটা গরম দুধ এনে খাওয়াতে বললেন।

দীপাদি ঘরের ভেতর বিছানা করে দিতে সবাই ধরাধরি করে সেখানে নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধকে শুইয়ে দিল। যুবক দুটি জলযোগ করল।

বৃদ্ধ দুদিন দীপাদির সেবাযত্নে রইলেন। দীপাদির কাছে শুনে অবাক হলাম, এখনও কি অবিশ্বাস্য জ্ঞানের পিপাসা!

হ্যালির ধূমকেতু আবার কবে দেখা দেবে? কেদারনাথ থেকে বদ্রীনাথে যাবার নাকি একটা সোজা পথ আছে বরফের পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। সে পথের সম্বন্ধে কেউ কি কোথাও কিছু লিখেছে?

আনন্দবাবুকে ধরে বললেন, আমি একটা অঙ্ক বলছি, তুমি লেখ বাবা।

আনন্দবাবু কাগজের ওপর লিখলেন। বিহারীলাল বললেন, আমি বড়ই মনোকষ্টে আছি বাবা, এই অঙ্কটির সমাধান আমি আজও করতে পারিনি।

আনন্দবাবু স্কুল থেকে অঙ্কটির সঠিক সমাধান করে এনে বললেন, পাঁচের জায়গায় সাত বসবে মাস্টারমশাই, তবেই সহজে সমাধান হয়ে যাবে।

আনন্দবাবু পর পর অঙ্কের স্টেপগুলো বলে যেতে লাগলেন, গভীর মনোযোগে বিহারীলাল শুনলেন শেষপর্যন্ত। অঙ্কটি মিলে যেতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৃদ্ধের মুখ। তিনি বললেন, এবার বাবা আমার মরেও শান্তি।

আনন্দবাবু বৃদ্ধকে ফেরার সময় ঝোলায় পাঠালেন না। পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে লোকাল বোর্ডের বাঁধ অব্দি হেঁটে গেলেন।

হঠাৎ চন্দ্রাদির বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেল। দীপাদি, গোবর্ধনদাই এর উদ্যোক্তা। হেডমাস্টারমশাই প্রথমে বেঁকে বসেছিলেন। কারণ, দীপাদির বিয়ে হোক আগে, তারপর চন্দ্রাদির বিয়ে। কিন্তু দীপাদি আনন্দবাবুকে বললেন, আমি যদি কোনদিনও বিয়ে না করি তাহলে কি চন্দ্রা আইবুড়ো থেকে যাবে

সারাজীবন ? এ হতে পারে না বাবা।

তুই কি মা একেবারেই বিয়ে করবি না বলে স্থির করে বসে আছিস ?

না, তেমন কোন প্রতিজ্ঞা করে বসে নেই। তবে দেশ স্বাধীন করার ব্রতটা এখন আমার কাছে সবচেয়ে বেশী জরুরী।

আচ্ছা বুঝলাম। এখন বল, কোথায় চন্দ্রার বিয়ের ঠিক করলি ?

ছেলেটি তোমার খুব চেনা বাবা।

আমার চেনা ! আকাশ থেকে পড়লেন আনন্দবাবু।

মিষ্টি হেসে দীপাদি বলল, একেবারে কাছের জনকে মানুষ সহজে দেখতে পায় না।

বল না মা, হেঁয়ালি করিস নে।

তোমাদের স্কুলের নতুন মাস্টার ধ্রুব সামন্ত ছেলেটি কেমন ?

ধ্রুব ! আদর্শবান যুবক। কিন্তু তার কিংবা তার মায়ের কি মত আছে ? চন্দ্রা সভাসমিতিতে স্বদেশী গান গেয়ে বেড়ায়।

সে ভাবনা তোমার নয়। আমরা ধ্রুববাবুর মতামত জেনে নিয়েছি। গোবর্ধনদাকে পাঠিয়েছিলাম ওঁর বাড়ি। সব শুনে ওঁর মা আনন্দে মত দিয়েছেন।

চন্দ্রা মা এখুনি চলে গেলে সভাগুলোতে আমার গানের কি হবে রে ?

তুমি বড় স্বার্থপর বাবা।

না রে ঠিক আছে। আমার জন্যে ওকে চাইনি মা, দেশমায়ের জন্যেই কথাটা বলেছিলাম। তা বুড়ো বয়সে এখন থেকে একলাই গাইব।

বিয়ে হয়ে গেল চন্দ্রাদির।

দীপাদি মফঃস্বল টাউনের বাড়িতে চিঠি লিখে বড়মাকে আনতে পেরেছিল, কিন্তু পারেনি নীরুদিকে আনতে।

নীরু এল না জ্যাঠাইমা, আমি ভাবতেও পারছি না ! সেই কবে মাস ছয়েক আগে একখানা চিঠি এসেছিল, তারপর একেবারে চুপ।

চোখে আঁচল দিলেন বড়মা। আমি তখন দীপাদির পাশে দাঁড়িয়ে।

চেঁচিয়ে উঠল দীপাদি, কি হল নীরুর জ্যাঠাইমা ?

মেয়েটা শুধু প্রাণে বেঁচে আছে মা। জলবসন্তের সঙ্গে গুটিবসন্ত হয়ে ওর এমন মুখখানা একেবারে ছারখার করে দিয়ে গেছে।

বড়মা আঁচলে চোখ মুছলেন। দীপাদি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

বড়মা বললেন, আমারই দোষে হল মা। ঐ সুন্দরী লেখাপড়া জানা মেয়েটিকে নিয়ে আমার গর্বের শেষ ছিল না। ওর বিয়ে হবে এমন বাড়িতে এমন ছেলের সঙ্গে যাকে আমি সকলের সামনে গর্বের সঙ্গে তুলে ধরতে পারব। কিন্তু আড়ালে বিধাতা হেসেছিলেন। তিনি এমন আঘাত করলেন যে আমাকে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে হল।

একটু থেমে আবার বড়মা বললেন, কাল অনেক রাত অব্দি লক্ষ্মীনারায়ণের

মন্দিরে মাথা খুঁড়ে বলেছি, আমার এমন দশা করলে কেন তোমরা? আমি তোমাদের ভোগ না দিয়ে ভুলেও কোনদিন জলগ্রহণ করিনি। যদি অহঙ্কার হয়ে থাকে আমার তাহলে আমাকেই চূর্ণ করতে পারতে। আমার ঐ অভিমানী মেয়েটা কি দোষ করল তোমাদের কাছে, যে তাকে একেবারে সংসার ছাড়া করলে?

বড়মা কথা বলে যাচ্ছিলেন আর তাঁর দু'গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

দীপাদির চোখ ভরা জল। বড়মাকে জড়িয়ে ধরে সে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল।

একটা প্রবল ঝড়ের হাওয়ার মধ্যে উড়ে এল উনিশ শ' বিয়াল্লিশের ডাক। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। হয় দেশের স্বাধীনতা নয় মৃত্যু।

স্কুল কলেজ ছেড়ে ছাত্রেরা নেমে পড়ল রাস্তায়। মিছিলের পর মিছিল চলেছে। ইস্পাত কঠিন হাতগুলো উঠছে নামছে। মুখে সেই অটল প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হচ্ছে, হয় মায়ের মুক্তি, নয় মৃত্যু।

শ্রমিক কৃষকরা কাজ ফেলে এগিয়ে আসছে হাতে কোদাল, গাঁইতি নিয়ে।

তারা খুঁড়ে কেটে দু ফাঁক করে দিচ্ছে সরকারী রাস্তা। অত্যাচারী পুলিসবাহিনী যাতে দ্রুত গাড়ি বোঝাই হয়ে পেরিয়ে যেতে না পারে।

নদীর ওপর চলমান নৌকো, পারাপারের সমস্ত জলযান আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল। নদীর দু'পাড়ে প্রচ্ছন্ন কাছি বেঁধে, কলসী বুকে চেপে তরঙ্গসংকুল রসলপুর পারাপার করল ছেলেরা।

কোথায় প্রথম গুলি চলল? কাঁথির সরষেবেড়িয়ায়। কৃষকরা রুখে দাঁড়িয়েছে, হাতে কাস্তে কোদাল। সামনে পুলিসের উদ্যত বেয়নেট।

কোথাকার মানুষ তোমরা?

'পিছাবনি'। আমরা পিছাবনির মানুষ, পিছাব না। এগিয়ে যাব। হয় মারব, নয় মরব।

কোন্ মহিয়সী দৃঢ় মুষ্ঠিতে পতাকা ধরে মুখোমুখি গুলিতে শহীদ হল? তমলুকের মাতঙ্গিনী।

দীপাদি চলেছে শহরের পথে, হাতে পতাকা, পেছনে অগণিত ছাত্র। বন্দেমাতরম্, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

সামনে এসে দাঁড়াল পুলিসের ভ্যান। আর্মড ফোর্স। পথ ঘিরে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়াল।

দীপাদির সুতীক্ষ্ন কণ্ঠে বেজে উঠল, বন্দেমাতরম্।

পেছনে এস. ডি. ও. সাহেবের গাড়ি। একজন নেমে এল। দীপাদির কাছে এসে বলল, ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।

চারদিকে ধস্তাধস্তি। আকাশ ফাটিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে, মাতৃমন্ত্র।

পুলিসরা দীপাদিকে ঘিরে নিয়ে তুলল তাদের গাড়িতে।

সন্ধ্যায় জেল হাজতে দীপাদির সঙ্গে দেখা করতে এলেন স্বয়ং এস. ডি.

ও. সাহেব।

মুখোমুখি হতেই দীপাদি বলে উঠল, অনিরুদ্ধদা তুমি ! তুমি এখানে।

এস. ডি. ও. বললেন, হাঁ দীপা, আমি এখানেই পোস্টেড। তুমি বস, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

দীপাদি একটা টুলের ওপর বসে পড়ে বলল, বল।

তুমি টুলে বসলে কেন, এই চেয়ারটায় বস।

হাসল দীপাদি। বলল, বহুদিন মাটিতে শুয়ে মশার কামড় খেয়েছি। আমাদের ছেলেরা ভরপেট খেতে পাচ্ছে না। আজই তোমাদের পুলিস আমার চোখের সামনে তাদের মাথায় ডাণ্ডা মেরেছে।

একজন পুলিস অফিসার সেলাম দিয়ে বলল, দু'গাড়ি আন্দোলনকারী এসে পৌঁছেছে। একটা লরিতে সব মৃত, অন্যটায় আহতরা রয়েছে।

এস. ডি. ও. একটু আড়ালে উঠে গেলেন। দীপাদির কানে এসে পৌঁছচ্ছিল কথাগুলো, আমি সবে এসেছি, মিঃ সেনকে জিজ্ঞেস করুন। পেট্রল ঢেলে খড়্গচণ্ডীতে সৎকারের কথা উনি বলেছেন। বেশ তো, তাই করুন। তার আগে আহতদের যত তাড়াতাড়ি পারেন হাসপাতালে নিয়ে যান।

ফিরে এসে আবার বসলেন এস. ডি. ও. সাহেব।

দীপাদি উত্তেজনায় কাঁপছিল এতক্ষণ। এবার নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করল।

কাদের শিকার করে আনল তোমার পুলিস ?

বোধহয় রামনগরের আন্দোলনকারীদের।

হাঁ, এখন বল তোমার কথা।

এস. ডি. ও. বললেন, আমি শুধু তোমাকে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে এই সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে সরে থাকতে বলছি। এতে অস্ত্রহীনদের কোন লাভই হবে না, শুধু রক্তপাত ছাড়া।

বেশ, আর কিছু বলার আছে ?

দীপা, আমি তোমাকে অনেক নিবিড় করে চেনার সুযোগ পেয়েছি। এই জেলখানা কিংবা ঐ সশস্ত্র আন্দোলনের মঞ্চ তোমার জন্যে নয়। তুমি বাইরে থেকে সংগঠনমূলক কাজের মাধ্যমে সমাজকে, নতুন প্রজন্মকে অনেক কিছুই দিয়ে যেতে পারবে।

দীপা বলল, এরপর আর কিছু বলার আছে এস. ডি. ও. সাহেব ?

আমার শেষ কথা দীপা, জেলে বন্দী হয়ে পচে লাভ নেই।

আমিও তো তাই মনে করি।

তাহলে এই বণ্ডটাতে তুমি একটা সই করে দাও, আমি কালই তোমাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নেব।

কতক্ষণ দীপা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তার অনিরুদ্ধদার দিকে। এই তার স্বপ্নের মানুষ।

আবার এস. ডি. ও. সাহেবের গলা, সময় বড় কম দীপা, তোমার আমার

দুজনেরই। আমাদের খুব দ্রুত ডিসিসান নিতে হবে।

অনেক আগেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি এস. ডি. ও. সাহেব। আজ তোমার আমার পথ আর আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার শত্রু আজ তোমার প্রভু। তাই এই মুহূর্তে আমার জন্যে তোমার উৎকণ্ঠা, সহানুভূতি, সবই অর্থহীন। ওপরওয়ালাকে খুশি করবার জন্য তারই হাতে কি আমার মুক্তির জন্য মুচলেখার ঐ কাগজ! দাসত্বের এত প্রবল আকর্ষণ!

কয়েকদিন পরে গোবর্ধনদার মুখে একটি অবাক হবার মত খবর পেলাম। দীপাদির দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। আর দীপাদির সঙ্গে দেখা হবার পরের দিনই অনিরুদ্ধদা চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্ব

চোখের সামনে যা দৃশ্য দেখলাম তা কোনদিন ভোলার নয়। দীর্ঘ দশ বারো মাইল তরঙ্গিত বালির পাহাড়। সমুদ্রে গিয়ে শেষ হয়েছে তার একটি প্রান্ত। আমরা দুবন্ধু দাঁড়িয়েছিলাম বালিয়াড়ির চূড়ায়। সামনে থৈ থৈ সমুদ্র। একরাতে অলৌকিক এক সমুদ্র-নাগিনী। কিন্তু বালির পাহাড়কে স্পর্শ করা মাত্র সে 'তিষ্ঠ' বলে তাকে থামিয়ে দিয়ে কিছুটা গরল শুষে নিয়েছে। তাই সমুদ্রের গ্রাস থেকে বেঁচে গেছে এপারের গ্রামগুলো।

সামনে যতদূর চোখ যায়, ঘরবাড়ি সবুজের চিহ্নমাত্র নেই।

মামাতো ভাই মটকু বলল, হাবলা, নীচে কত জিনিস এসে লেগেছে, চল দেখে আসি।

আমরা বালি ভাঙতে ভাঙতে অনেক নীচে নেমে গেলাম।

ঘরের চালা, কাঠের বাক্স, গাছের ডালপালায় ভরে গেছে বালিয়াড়ির নীচের অংশ। কিন্তু যা দেখে আমরা শিউরে উঠলাম, তা হল, অগুণতি গরু, ছাগল, কুকুর, বেড়ালের মৃতদেহ। তার মাঝে মাঝে আটকে আছে নারীপুরুষের শব।

মটকু চেঁচিয়ে একদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

মা তার দুধের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে জলের মধ্যে তলিয়ে গেছে। কিন্তু অপঘাতে প্রাণ গেলেও হাতের বাঁধন আলগা হয়নি। জলের ঢেউ মা ও ছেলেকে সোনালী বালুর শয্যায় এনে তুলেছে।

মটকু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেই আমি বললাম, চল পালাই। এসব দেখলে মাথা ঘুরে যাবে

আমার কথায় মটকু ফিরল। আমরা অন্ততঃ গোটা দশেক মৃত মানুষকে ভেজা বালির চড়ায় পড়ে থাকতে দেখলাম।

আমরা বালিয়াড়ির চূড়ায় যখন উঠছি তখন দেখলাম কতকগুলো লোক আমাদের পাশ দিয়ে নেমে গেল। এদের হাতে ছুরি, কাটারি আর টাঙি দেখলাম। কে আগে জলের ধারে যাবে, তারই যেন প্রতিযোগিতা চলছিল। আমার মনে হল, মড়ার হদিস পেয়ে এক ঝাঁক শকুনি পাখা মেলে নেমে যাচ্ছে নীচে।

দুপুরে ছোটমামা খবর নিয়ে এল, কয়েক ঘণ্টার ভেতর কতকগুলো লোক নাকি ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। সোনা রুপোর গয়না পেয়েছে মৃত মেয়ে-মানুষদের গা থেকে। ভেজা নোটের তাড়া পেয়েছে অনেকে। বাক্স, প্যাঁটরা ভেঙে লাভ হয়েছে এসব।

দিদিমা কানে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ কর, এসব কথা শুনলেও পাপ।

উঠোন ভর্তি জল ভেঙে উঠে এল মেজমামা। চোখমুখ লাল। উত্তেজনায় কাঁপছে সারা শরীর।

দিদিমা কানের ফুটোতে আটকানো আঙুল দুটো একটুখানি আলগা দিয়ে বলল, কি খবর রে ভুতো ?

শালা শুয়োরের বাচ্চা কি বলেছে জান ?

দিদিমা ধমকে উঠল, আমি কিছু শুনতে চাই না। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে কেউ অন্যের বাপ তুলে গালাগাল করে নাকি। কবরেজমশায় থাকলে তাঁর সামনে তুই মুখ তুলে এসব কথা বলতে পারতিস ?

দাদামশায় নামকরা কবরেজ ছিলেন। শুধু কবরেজিতেই তাঁর খ্যাতি ছিল না, পাঁচ সাতখানা গাঁয়ের লোক তাঁকে মান্য করত। বিচার আচারে তাঁর ডাক পড়ত। তাঁর সিদ্ধান্তই হত চূড়ান্ত।

দিদিমা সেকালের মানুষ, তবু স্বামীকে প্রকাশ্যে কবরেজমশাই বলে ডাকত।

দিদিমার বাপের বাড়ি ছিল ব্রাহ্ম। দুই দিদিরও বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্ম-বাড়িতে। কিন্তু নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে দিদিমা নাকি ঘোরতর হিন্দু-বাড়িতে বউ হয়ে আসে।

সে অনেক কালের অনেক কথা !

এখন দিদিমার ধমক খেয়ে মেজমামা বলল, আমার দোষ হয়েছে মা। তবে তুমি সব কথা শুনলে তোমার মাথারও ঠিক থাকত না।

বল, কি এমন শুনে এলি ?

এস. ডি. ও. রনো সেনের কাছে প্রমথবাবু, ঈশ্বরবাবু, বসন্তবাবুরা গিয়েছিলেন, আমরাও ছিলাম ওঁদের সঙ্গে।

বসন্তবাবু বললেন, বহু মানুষ ডুবে মরেছে সাইক্লোনে। এখনও খড়ের চালা ধরে কিছু কিছু মানুষ সাঁতার কাটছে। আপনাদের সরকারী নৌকাখানা পেলে এখনও অনেক মানুষকে হয়ত বাঁচান যেতে পারে।

এস. ডি. ও. বলল কি জান মা, আগস্টে যখন আন্দোলন করে নৌকাগুলো পুড়িয়েছিল এইসব মানুষ, তখন মনে ছিল না। সরকারকে নদী পেরিয়ে গাঁয়ে ঢুকতে দেব না, অতএব পোড়াও নৌকা। এখন বাঁচতে চাইলে বাঁচাবে কে ?

প্রমথবাবু বললেন, দুটো পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন সেনসাহেব।

আমি মনে করি ওরা এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

ঈশ্বরবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই একদিন করতে হবে সেনসাহেব।

বসন্তবাবু খুব শান্ত গলায় বললেন, আপনি কেবল মহকুমার শাসক নন, রক্ষকও বটে। দয়া করে নৌকাখানা দিয়ে বিপন্নদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন।

লেট দেম ডাই। তাদের মরতে দিন, বলে এস. ডি. ও. কোয়ার্টারের ভেতর ঢুকে গেল।

দিদিমা চোখ কপালে তুলে বললেন, সত্যি !

তোমাকে মিথ্যে বলছি নাকি মা।

দিদিমা সঙ্গে সঙ্গে বলল, তোরা নৌকা ক'খানা বানিয়ে নিতে পারলি না?

কি করে বানাব মা?

কেন, কলাগাছ আর কলসী দিয়ে। এপারে তো কলাগাছগুলো ভেসে যায়নি। ভেলা বেঁধে চারদিকে চারটে কলসী উপুড় করে বেঁধে দে। ওতেই কাজ চলে যাবে।

মেজমামা ক'মাস আগে আন্দোলনে লড়াই করেছে। গুলি বৃষ্টির ভেতর পিছাবনীর কৃষকদের রক্ত গরম করা কথা বলে তাতিয়েছিল।

দিদিমার কথা শুনে বলল, আমি এখুনি যাচ্ছি মা। দারুণ আইডিয়া দিয়েছ।

মেজমামা কলাগাছ আর দলবলের সন্ধানে ছুটল।

সাইক্লোনের পর শুরু হয়ে গেল দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধের হিড়িকে ইস্পাহান কোম্পানী আগেই দেশ থেকে ফসল তুলে নিয়ে মজুদ করেছিল। লোকে ভেবেছিল, সামনে যে ফসল উঠবে তাতেই তারা সামলে নেবে, কিন্তু পুজোর সপ্তমী তিথিতেই আকাশ ভেঙে ঝড়বৃষ্টি নামল, আর সমুদ্র, নদী ফুঁসে উঠে গ্রাস করে নিল গ্রামের পর গ্রাম।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনে পুলিশ যে ঘর পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তার চালা বাঁধতে বাঁধতেই উড়ে গেল ঝড়ে, ভেসে গেল স্রোতের টানে।

সাধারণ মানুষের ঘরে এক মুঠো চাল নেই। ধনীর ভাঁড়ারও তলায় এসে ঠেকেছে। তবু অর্থ আছে যার, উপায় তার অনেক। চোরা বাজার আর ঘুষের দৌলতে সংসারের সাতচুড়োর রথটি অটুট রইল। ভাঙাচোরা রাস্তার ওপর দিয়ে চলতে লাগল গড়গড়িয়ে।

অন্যদিকের ছবি কেবল ছায়া মিছিলের। মানুষের আকার তবু মানুষ নয়। পর্দায় ছায়ানাচের মত। হাতে ভাঁড় অথবা ভাঙা তোবড়ান বাটি। সবাই চলেছে শহরের দিকে। পথের ওপরে মরছে কতক। পুকুরের জল খেয়ে ক্ষিদে দূর করতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলে।

শহরের পথে শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে ফেন দাও, ফেন দাও শব্দ। ইঁট কাঠ পাথরে গড়া ইমারতের দিকে চেয়ে আছে ক্ষুধার্ত শত শত চোখ।

শহরে পুজো দেখব বলে থেকে গেছি মামার বাড়িতে। মাইল কুড়ি পথ পেরিয়ে দেশ থেকে আসতে হয় টাউনে। খেয়া পরাপারের একটা নৌকোও পেয়ে গিয়েছিলাম সে সময়। কিন্তু পরে খবর পেয়েছিলাম, সে নৌকোখানাও সরকার সিপ্ট করে নিয়েছে।

এখন সাইক্লোনের বিপর্যয়ের পর দেশে ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। ইতিমধ্যে মাসখানেক প্রায় কাটিয়ে দিয়েছি মামাবাড়িতে।

দিদিমাকে যাবার কথাটা বলতেই উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তুই একা যাবি কি করে হাবলা! এদিকে শুনছি নদীতে একটাও নৌকো নেই।

বললাম, নৌকো-ঘাট অব্দি যাব, যদি পারাপারের নৌকো পাই তো পেরিয়ে

গেলাম, না হলে নিশ্চয়ই তোমার কাছে ফিরে আসব।

কথার খেলাপ যেন না হয়, এরকম একটা সাবধানবাণী উচ্চারণ করে দিদিমা তার ছোট নাতিটিকে যাবার অনুমতি দিল।

মনে শান্তি নেই। দেশের বাড়িতে কে কেমন আছে জানতে না পেরে মন উদ্বিগ্ন। খুব ভোরবেলা দিদিমাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। এক পুঁটলি মুড়ি আর গোটা বার নারকেল নাড়ু সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল দিদিমা। তারই সদ্ব্যবহার করতে করতে পথ চলছিলাম। পথের ধারে একটি ঘরও আমি অক্ষত দেখিনি। একটি মেয়ে অথবা পুরুষকে পরিষ্কার নতুন কাপড় পরতে দেখিনি। আর এমন কোন ঘরের পাশ দিয়ে যাইনি যেখানে ছোট অভুক্ত ছেলেদের একটানা কান্না ছাড়া হাসির শব্দ শোনা গেছে।

অনেক মাঠ ঘাট পথ জলা পেরিয়ে নদীর ধারে এলাম। সামনে সুনিয়ার গাঙ। এর পরই রসুলপুরের খেয়াঘাট। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সেই রসুলপুর নদী।

সুনিয়ার গাঙে যে খেয়াঘাটটি ছিল তার টঙের চালা উড়ে গেছে। খানিকটা মাটির ঢিবি এককালের একটি ছাউনির অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

ভরা বর্ষা শেষ হয়েছে। মাঠঘাট এমনিতেই পূর্ণ। তার ওপর সাইক্লোনের ধাক্কায় চলাচলের বাঁধ জায়গায় জায়গায় ভেঙে জলের স্রোত বইছে। নদীর বিস্তীর্ণ চরে চাষের জমি ডুবে আছে। মাঝে মাঝে নাশিখালের জালে ঘেরা দু'এক টুকরো ডাঙা। শেয়ালকাঁটার ঝোপ, হোগলা বনের হদিস পাওয়া যাচ্ছে। একটু দূরে ঝোপ জঙ্গলে ঘেরা ডাঙায় একটা খড়ে ছাওয়া চাষ বাড়ি দেখা গেল। সাইক্লোনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, তাই বেঁচে গেছে। একটা হাবুলি গাছে হলুদ আর লাল ফুল ফুটে আছে।

সুনিয়ার গাঙ বয়ে চলেছে। মানুষ জনের পাত্তা নেই, নৌকো তা দূরস্থান। কটা বক জাতীয় পাখি শব্দ করতে করতে উড়ে গেল।

এদিক ওদিক নদীর তীর ধরে কিছু সময় ছুটোছুটি করলাম। মনে ক্ষীণ আশা, যদি নদীর বাঁকে হঠাৎ গুপ্তধন পাবার মত একটা নৌকো মিলে যায়।

না, সে চেষ্টা সফল হল না। একবার মনে হল, নদী সাঁতরে ওপারে যাবার চেষ্টা করলে কেমন হয়। পরক্ষণেই ভয় চেপে ধরল। অবশেষে ফিরে দাঁড়ালাম। সেই পুরানো পথেই পা চালাতে হবে।

হঠাৎ মনে হল, অদূরে ঐ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা খড়ের ঘরটার কাছে গেলে কেমন হয়।

পায়ে পায়ে গেলাম সেদিকে। ডাঙার পাশ দিয়ে নাশিখাল বইছে। তার ওপর মোটা একটা বাঁশ ফেলা। নিশ্চয়ই ঐ পড়ো বাড়িটার ভেতর কোন লোক আছে।

বাঁশের ওপর সাবধানে পা ফেলে ডাঙায় গিয়ে উঠলাম।

উঠোনের গা ঘেঁষে শেয়াল কাঁটার ঝোপ। ফুল ফুটে আছে। ছোট বড় এক ঝাঁক নানা রঙের পোশাক পরা প্রজাপতি শেয়াল কাঁটার ফুল ছুঁয়ে হাবুলি

গাছের ফুলের দিকে উড়ে যাচ্ছে। ইস্কুল ছুটির পর হৈ হৈ করতে করতে যেমন পড়ুয়ারা নাচতে নাচতে ছুটে চলে।

হঠাৎ দেখলাম, একটি বছর দশ বারোর মেয়ে ঐ হুমড়ি খেয়ে পড়া ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রজাপতি ধরার চেষ্টায় মেতে উঠল।

বেশ কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করার পর আমার মুখোমুখি হল। তার চোখেমুখে ভারী একটা অবাক হয়ে যাওয়ার ভাব। বড় মিষ্ট মুখখানা।

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, বাড়িতে বড়রা কেউ আছেন?

মেয়েটি মাথা নেড়ে জানাল, না।

ভাবলাম, পুরুষরা না থাকলেও মেয়েরা হয়ত রয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, মা কোথায়?

মেয়েটি বলল, মা বন্যায় ভেসে গেছে।

ধক্ করে উঠল বুকখানা। ওর মায়ের মৃত্যু নিয়ে আর কথা বলতে পারলাম না।

বাড়িতে তুমি একা আছ? বাবা কোথায়।

বাবা ঐ নদীর ওপারে গেছে। অনেকক্ষণ গেছে, এবার এসে পড়বে।

কথাটা শুনে আমি অনেকখানি আশ্বস্ত হলাম। নিশ্চয় নদী পারাপারের একটা ব্যবস্থা আছে।

বললাম, আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে যাব।

মেয়েটি কোন কথা না বলে একদিকে মাথা কাৎ করল। আমি চালা থেকে বেরিয়ে আসা একটুকরো দাওয়ার ওপর বসলাম।

কি নাম তোমার?

কুমুদিনী মিশ্র। বাবা কুমু বলে ডাকে।

বাবার নাম?

দীননাথ মিশ্র।

ওকে ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে বললাম, সারাদিন কি কর তুমি একা একা?

নদীর চরে, আমাদের সামনের জলায় অনেক পাখি আসে। আমি তাদের সঙ্গে খেলা করি। সকালে আর সন্ধ্যের আগে দু'বার আমি পড়তে বসি। বাবাকে রান্নার কাজে সাহায্য করি।

বাবা পড়ান?

হাঁ। আমার বাবা রসুলপুর ইউ, পি ইস্কুলে মাস্টারমশাই।

তুমি ইস্কুলে যাও না?

ইস্কুলেই তো পড়তাম। ইস্কুল ভেঙে ভেসে গেছে। এখন ইস্কুল বন্ধ।

মেয়েটিকে বয়সের তুলনায় বুদ্ধিমতী বলে মনে হল।

ঐ তো বাবা আসছে।

আমি মেয়েটির আঙুল অনুসরণ করে নদীর দিকে তাকাতেই একটি ডিঙি চোখে পড়ল। দীননাথবাবু ডিঙিটি চালিয়ে নিয়ে আসছেন। এপারে ভেড়ার

পর আমি কিন্তু ডিঙিটাকে আর দেখতে পেলাম না। উঁচু পাড়ের জন্য তা সম্ভব ছিল না।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরও যখন দীননাথবাবুকে নদীর চরে উঠে আসতে দেখলাম না, তখন অবাক লাগল।

মেয়েটির দিকে ফিরে বললাম, কুমু, তোমার বাবা কোথায় গেলেন? দেখতে পাচ্ছি না তো!

কুমু একমুখ মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বলল, ঐ তো বাবা।

পেছন ফিরে দেখি নাশিখালের ভেতর ডিঙিটাকে লগি ঠেলে নিয়ে আসছেন দীননাথবাবু। পরক্ষণেই ঘরের ডান দিকে হোগলা বনের আড়ালে ঢুকে গেলেন।

ডিঙিটি যথাস্থানে বেঁধে রেখে উঠে এলেন দীননাথবাবু। হাতে বেশ কয়েকটা পোঁটলা পুঁটলি।

আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, আপনি!

আমি নত হয়ে নমস্কার করে বললাম, আমাকে 'আপনি' বলবেন না, আপনার চেয়ে আমি অনেক ছোট।

বেশ, কিন্তু তোমাকে তো আমি আগে কখনও দেখিনি।

আমি সদর থেকে আসছি, যাব কাঞ্চননগর।

একটু ভেবে দীননাথবাবু বললেন, কিন্তু পারাপারের নৌকো যে অনেক-দিন বন্ধ তা কি তুমি জান না?

হাঁ, তাও জানি। কাঞ্চননগরে আমার বাড়ি। টাউনে মামার বাড়িতে ছিলাম। যাবার সময় দৈবাৎ একটা নৌকো পেয়ে যাই, এখন ফেরার সময় সেরকম একটা আশা নিয়েই এসেছি।

দীননাথবাবু বললেন, তোমার ভাগ্যটা দেখছি ভাল। বস দাওয়ায়। দুপুরবেলা যাবে কোথায়? এখানে স্নান সেরে একমুঠো যা হোক কিছু খেয়ে নাও। আজ খানিকটা চাল পেয়েছি, রান্না চড়াব। এ কদিন খালি কুমড়োর ঘ্যাঁট খেয়ে আছি।

বন্যার পরে শুরু হয়ে গেছে সারা দেশব্যাপী হাহাকার। এক মুঠো ধান যোগাড় করার অর্থই হল গুপ্তধনের হদিস পাওয়া। তবে বন্যার পলিতে ঘরে ঘরে কুমড়ো ফলছে মণ মণ। আর তাই খেয়ে কোনরকমে প্রাণটা টিকিয়ে রেখেছে মানুষগুলো।

কুমু দীননাথবাবুর সঙ্গে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। আমি দাওয়ার ওপর বসে জলাগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। দুচারটে শালুক ফুটে আছে। জলজ উদ্ভিদ আর ঘাস লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে।

একটু পরেই চাল ফুঁড়ে বুলবুলিয়ে ধোঁয়া উঠল। নাকে এসে লাগছে ধোঁয়ার গন্ধ। দীননাথবাবু রান্না চড়িয়েছেন।

কিছুক্ষণ পরে চবর চবর শব্দ শুনে উঠে দাঁড়ালাম। ঘরের পেছন দিকে

গিয়ে দেখি, দীননাথবাবু জলায় জাল ফেলে মাছ ধরার চেষ্টা করছেন। একটা খলুই হাতে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কুমু।

আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাজের ফাঁকে গল্প করে চললেন দীননাথ-বাবু।

এই জলাটা বন্যার আগে কালো মাছে ভর্তি ছিল। বন্যার জল ঢুকে সবকটাকে ভাসিয়ে টেনে নিয়ে গেছে। কুমুর মা বেঁচে থাকলে বঁড়শি ফেলেই কত মাছ ধরে দিতেন। লোক খাওয়াতে যে কি ভালবাসতেন কি বলব। কাছে-পিঠে গ্রাম নেই তাই আমি রসুলপুর থেকে আমার ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের ডেকে আনতাম। উনি কতরকম রান্না করে খাওয়াতেন। চাঁপানগরে অগস্ত-বাড়ির মেয়ে। অবস্থা পড়ে গেলে কি হবে, বনেদী বাড়ির আচারকানুন যাবে কোথায়। এই তোমার ঘাটমাঝিকে ধরে এনে খাওয়াবেন। গরমের দিনে খেজুরপাতার একটা ছাউনি করে দেওয়া হত। পারাপারের লোকেদের জল তেষ্টা পেলে সেখানে এসে জালাতে রাখা জল খেয়ে যেত। উনি সেখানে বসে জলের সঙ্গে এক টুকরো করে নিজের হাতে তৈরী পাটালি দিতেন।

জাল টেনে ওপরে তুলতে দেখা গেল কয়েকটা মাঝারি আকারের চিংড়ি আর কতকগুলো চুনোচাঁদা উঠে এসেছে।

দীননাথবাবু বললেন, বেলা হল অনেক, এখন যা পাওয়া গেছে তাতেই চলবে।

খেতে বসে সেই স্ত্রীর গল্পতেই ফিরে এলেন দীননাথবাবু।

বড় নরম ছিল কুমুর মায়ের মনটা। প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসার সময় কি কাণ্ড, কি কাণ্ড।

বললাম, কেন, কি হল ?

আরে সে আর বল না। তখন থাকতাম আমাদের গ্রাম পানখাইতে। নতুন বউকে নিয়ে উঠোনে নামল পালকি। সবাই ভীড় করে এসেছে বউ দেখতে। বধূবরণের সময় গুরুজনদের প্রণাম করতে গিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো বেহারাটিকেও প্রণাম করে বসল। বুড়ো তো পড়ি কি মরি করে কোথায় লুকোলো কে জানে, কিন্তু নতুন বউএর শুরু হল বাপান্ত। বামুন পাড়ার বিধেন হল, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

রাতে নতুন বউ আমাকে বলল, আমাকে বাপের বাড়ি রেখে এসো, আমি কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত করব না।

বললাম, বুড়োরা যখন বলছে, নমো বিষ্ণু করে সেরে নাও না, ল্যাঠা চুকে যাক্।

নতুন বউ বলল, বাপের বয়সী বুড়ো মানুষ, কত কষ্ট করে আমাকে কাঁধে বয়ে এনেছে, বেশ করেছি ওকে প্রণাম করেছি। তোমার গুষ্টির সেসব বুড়ো প্রায়শ্চিত্তের বিধেন দিয়েছে, তাদের প্রণাম করেছি ভেবে গা ঘিন ঘিন করছে।

আমি বললাম, সাবাস।

বাবা বেঁচে ছিলেন। পৃথক করে নদীর ধারের এই জমিটুকু দিয়ে বললেন,

কুলাঙ্গার, সমাজে থাকার কোন অধিকার তোমার নেই। জন্ম দিয়ে পৃথিবীতে যখন এনেছি, বঞ্চিত করব না। ওখানে ঐ বউ নিয়ে নিজের মত থাক।

সেই থেকে রয়েছি এখানে। কিন্তু যাঁর জন্যে এখানে নির্বাসন, তিনিই স্বামীকন্যা ছেড়ে চলে গেলেন।

আমি শোকাতুর দীননাথবাবুর সামনে কোন কথা বলতে পারলাম না।

অল্প কটি ভাত, সঙ্গে চারগুণ ঘ্যাঁট, আর তেঁতুল দিয়ে মাছের অম্বল। সে সময় ঐ সামান্য আহারই রাজভোগ।

আবার কথা শুরু করলেন দীননাথবাবু, ওঁর চলে যাওয়াটাও বড় আশ্চর্যের। গোয়াল একটা ছিল উঠোনের ওপারে। তখন ঘূর্ণিঝড় আর বৃষ্টিতে প্রলয় চলছে। উনি অস্থির হয়ে উঠলেন। দুধেলো একটা গাইকে বাচ্চা সমেত গোয়াল থেকে এখানে নিয়ে আসতে গেলেন। আমি তখন চালার বাঁশ আর দড়ি কাটতে ব্যস্ত। ঢেউ এলে চালার ওপর চেপে ভেসে যাব। কিন্তু দড়ি কাটার আগেই প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল। মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর জলে প্রায় ডুবে রইলাম। যেমন আচমকা ঢেউটা এল, তেমনি মুহূর্তে ভেঙে বেরিয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, গোয়ালের চিহ্নমাত্র নেই। সমুদ্রের বানে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমি তখন কোমর জলে দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে বুকফাটা চিৎকার করতে লাগলাম। সেই প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে জানি না সে ডাক তাঁর কানে পৌঁছল কিনা।

খাওয়ার মাঝে কথা বলতে বলতে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন দীননাথবাবু। আমি অন্য প্রসঙ্গে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে বললাম, আজ আপনি ওপারে চালডালের খোঁজে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই।

দীননাথবাবু বললেন, না, অন্য উদ্দেশ্য ছিল। কিছু চাল উপরি পাওনা হিসেবে মিলে গেল।

বললাম, কি রকম?

সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলি।

তখন গরমকাল চলছিল। আমার স্ত্রীরও জলভরা-জালা আর হাতে তৈরী পাটালি নিয়ে সুনিয়ার ঘাটে তৃষ্ণার্ত পারার্থীদের সেবার জন্য বসেছিলেন। এমন সময় এক সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোক, ওপারে যাবার জন্য এসে দাঁড়ালেন। আমার স্ত্রীর এই জলসত্রটি দেখে তিনি এমনি অভিভূত হলেন যে, সেদিন থেকে আমার স্ত্রীকে মা বলে ডাকতে শুরু করলেন। পুজো আর্চায় লোক পাঠিয়ে আমাদের ডেকে নিয়ে যেতেন। সেখানে আমি কিছুকাল আগে কয়েকখানা তালপাতার পুঁথির সন্ধান পাই। মলাটে সিন্দুর, চন্দন লাগিয়ে পুজো হচ্ছিল। তাই ইচ্ছে থাকলেও নিয়ে চলে আসতে পারিনি। আমার বড় কৌতূহল ছিল, ঐ পুঁথিগুলোর ভেতর কি আছে দেখব। বন্যা হয়ে যাবার পর কুমুর মায়ের জন্য বুকের হাহাকার জেগে রইল। অন্যদিকে ভাবনা, বন্যায় কি পুঁথিগুলো ভেসে গেছে? কত মূল্যবান সব পুঁথি। নিজে সবটুকুর পাঠোদ্ধার করতে না পারলে কলকাতায় আমার পিসতুতো দাদার কাছে চলে

যাব। তিনি পুঁথি নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন। দু'জনে একঠাঁই বসে সন তারিখটাও ঠিক করে নেব।

বললাম, পেয়েছেন পুঁথি ?

সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। পুরানো মন্দিরটা হুড়মুড় করে পড়ে গেছে। কিন্তু ঠাকুরের চৌকির তলায় ছিল বলে পুঁথিগুলো বেঁচে গেছে। মন্দিরের ইঁট সরাতে গিয়ে সেগুলোকে পাওয়া যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, ভদ্রলোক সেগুলো আপনাকে দিয়ে দিলেন ?

আমার আগ্রহ দেখে দিয়ে দিলেন। শুধু বললেন, কি করবেন ?

বললাম, সত্যিকারের পুজো করব।

উনি আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বললেন, নিয়ে যান।

বিকেলে নদীর ঘাটে আসার সময় কুমু বলল, আবার এসো কিন্তু হাবুলদা। তোমাকে তেঁতুলের আচার করে খাওয়াব।

হেসে বললাম, পারাপারের পথ, নিশ্চয়ই চলে আসব।

কুমুর মুখে মিষ্টি হাসিটা মেঘের কোলে নরম আলোর ছটার মত ফুটে উঠল।

আমি খালে না উঠে একেবারে খেয়াঘাটে নৌকোতে উঠলাম।

পারে এসে দীননাথবাবুকে প্রণাম করে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

এই কিছুদিন আগে স্বনামধন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একখানি ব্যাকরণ বই এক বিখ্যাত প্রকাশক আমার কাছে নিয়মমাফিক দেখার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সে বইখানি সুনীতিকুমার নিজের হাতে সংশোধন করে রেখে গেছেন। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় দেখলাম, এম, ই (তখন ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত এম, ই স্কুলে পড়ান হত) স্কুলের এক মাস্টারমশাই ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের ব্যাকরণগত একটি প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। গুণগ্রাহী সুনীতিকুমার বইয়ের মার্জিনে পত্র-প্রেরক দীননাথবাবুর নাম ঠিকানা, তারিখ সহ সংশোধনটিও লিখে রেখেছেন। সেদিন আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল।

যাকে দেখে আমার তরুণ চোখ দুটোতে মোহাঞ্জন লেগেছিল সে শুক্লা দশমী তিথির ছোঁয়া লাগা কুমুদিনী। সেদিন সে আমাকে মাত্র কটি কথা উপহার দিয়েছিল, কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে সে কথাগুলো আমার কানের চারদিকে ভ্রমরের মত গুঞ্জন করে ফিরছিল। এই কুমুদিনীর টানেই আমাকে এ পথে বার বার নদী পারাপার করতে হয়েছে। সেই ছাত্রজীবনে কুমুই ছিল আমার পূর্বরাগ আর অনুরাগের নায়িকা।

বাড়িতে ঢোকার আগেই গোবর্ধনদার সঙ্গে দেখা।

গোবর্ধনদার প্রথম-আপ্যায়ন, কি রে হাবুলা, বেঁচে আছিস তো।

বললাম, ভূত কিনা, গায়ে চিমটি কেটে পরীক্ষা করে দেখই না।

পরক্ষণেই বললাম, আমার বাড়ির খবর কিছু জান ?

অবশ্য, অবশ্য। মাসীমা চক থেকে নৌকো করে এসেছিলেন। তোদের চকে দোতলা বাড়িটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। আমবাগানের অনেক ক্ষতি হয়েছে।

গোয়ালে তিরিশটা গরু ছিল, দেওয়াল চাপা পড়ে সাতটা মরেছে। বাগদিপাড়ার লোকজনেরা ঝেঁটিয়ে সব তোর বাড়ি এসে উঠেছিল। মাসীমা ওদের কদিন ধরে খাইয়েছেন। পুকুর থেকে যেসব পোনা মাছ ডাঙায় উঠে এসে পালাবার চেষ্টা করছিল ওরা লাঠি পিটিয়ে ওদের ধরেছে।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে যাবার পর গোবর্ধনদা একটু থামল দেখে আমি বললাম, মা এখন কোথায় ?

মাসীমা আবার চকে চলে গেছেন। তিনি জানেন, তুই মামার বাড়িতেই থাকবি এখন। সামনে কলেজের ছুটি পড়লে আসবি। তোর চিঠি মাসীমা পেয়েছেন।

মন কেমন করল, তাই চলে এলাম।

বেশ করেছিস, তুই আমার কাছে থাক এখন।

চালটাল নাকি পাওয়া যাচ্ছে না ?

সে ভাবনা তোকে করতে হবে না। যার বাড়ি ধান চাল আছে, এই গোবর্ধন গিয়ে দাঁড়ালে থলি ভরে দেবে।

তাই বুঝি।

নয়তো কি ? বন্যার রাতে ঘরবাড়ি পড়ছে, হাহাকার। এই শর্মা জলের স্রোত ঠেলে বাচ্চা-কাচ্চা আগলে সবকটাকে বড় বাড়িতে এনে তুলেছে। তারপর গ্রামে ডাকাত পড়েছিল, সব বাবু তো দরজা জানলা ভেতর থেকে বন্ধ করে কাঁপছে। আমি একা খালি হাতে এগিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। আরে ভাই, কথা বলে তো হাঁ ! বেশ কটি ভদ্রবাড়ির ছেলে ছিল ঐ ডাকাতের দলে। তারা বলল, আমাদের সমুদ্রের ধারের গ্রামগুলো প্রায় সব ধুয়ে মুছে গেছে। যে কটি মানুষ ভেসে যাওয়া গাছপালা, ঘরের চালা ধরে বেঁচেছে তারা এখন অনাহারে রোগে ধুঁকছে, মরছে। তাদের জন্য আমরা খাবার সংগ্রহে বেরিয়েছি। বাধা দিলে, মরিয়া হয়ে লড়াই করে কেড়ে নিতে হবে।

বললাম, আমাদের গ্রামের লোকগুলোকে কোন রকমে বাঁচতে দেবেন তো ?

ওদের একজন বলল, হয় সবাই বাঁচব, নয়তো সবাই মরব।

বললাম, আপনি চারজন শক্তসমর্থ লোক নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন। আর সবাই এখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন।

আমার কথা মত ওরা পাঁচজন এগিয়ে এল।

বললাম, বস্তা এনেছেন তো ?

নৌকা থেকে ক'খানা বস্তা নিয়ে এল ওরা।

বড়মার কাছে গিয়ে বললাম, আপনার বাড়িতে দু'বেলা আটবার ঘণ্টা বাজত। আট পঙ্‌ক্তি লোক খেয়ে যেত এ বাড়িতে। এখন আর ঘণ্টা বাজে না। আজ একশটি লোক আপনার বাড়িতে খাব, ফেরাতে পারবেন না।

ডাকাতপড়ার খবর বড়মার কানে পৌঁছেছিল। দুটি দারোয়ান আর এক বন্দুকধারী তৈরী হয়েই ছিল। বড়মা তাদের খামোকা হাঙ্গামা বাধাতে বারণ করলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, গোলা থেকে বস্তা পনের ধান দিতে

পারি। গাঁয়ে যেন আর ওরা হাঙ্গামা না করে।

ডাকাতের দল মহাখুশী। ধান নিয়ে গেল আর কথা দিয়ে গেল, আর তারা এ গাঁয়ে ডাকাতি করতে আসবে না।

জানিস হাবুলা, ডাকাত চলে যেতে বড়মাকে বলেছিলাম, তুমি এত বস্তা ধান এককথায় দিয়ে দিলে ?

তুই যে খোঁচাটা দিলিরে। ঘণ্টা বাজেনা এখন, লোকও খেয়ে যায় না আগের মত। উনি বেঁচে থাকলে রোজ কত স্বদেশী লোক, ছাত্র মাস্টারমশাইরা খেয়ে যেতেন। এখন প্রায় সব বন্ধ, তাই দিয়ে দিলাম। বন্যায় চারদিকে হাহাকার, উনি থাকলে ভবিষ্যতের কথা না ভেবে একদিনেই ধানের গোলা খুলে দিতেন।

আগস্টের ভারতছাড় আন্দোলনে দীপাদি আবার জেলে গেছে। আমাদের স্কুলের ছাত্রীরাও কেউ কেউ এখন জেলের ভেতরে। হেডমাস্টার আনন্দবাবুর শেষ কথাটি মনে আছে, দেশের ডাকে বেরিয়ে পড়, পরে পড়াশোনার অনেক সময় পাবে।

দীপাদি বাবার আশীর্বাদ চেয়ে পায়ে হাত ছোঁয়াতেই আনন্দবাবু বলেছিলেন, তুই যাচ্ছিস, প্রাণটা ভরে গেল মা। এই দেশটাকে আমরা মা বলে ডাকি। তোরাও তো সেই মায়েরই অংশ। নিজেদের পায়ের বেড়ি নিজেদেরই ভাঙতে হবে মা।

বললাম, হেডমাস্টারমশাই কেমন আছেন গোবর্ধনদা ?

আনন্দবাবুকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। হাটবাজার, চালডালের যোগাড়-যন্ত্র আর পোস্ট অফিস থেকে ইস্কুলের ডাকটা এনে দিয়েই আমি খালাস। নেড়ার মা এখন আমাদের রান্নার কাজটা করে দেয়। আগে আমিই করতাম।

নেড়ার অসুখ করেছিল, কেমন আছে এখন ?

একেবারে ভাল হয়ে গেছে। আর কোনোদিন তাকে রোগে ভুগতে হবে না।

কি রকম ?

ঝড়ের রাতে দেয়াল চাপা পড়ে ভবলীলা সাঙ্গ।

রোগা খাংরা কাঠির মত ছেলেটা। স্কুলের যে কোন অনুষ্ঠানের আগে থেকেই সে হাজির। স্কুলে কখনো পড়েনি তবু স্কুলকে ভালবাসত বড় বেশী। গেট বাঁধার সময় দড়ি ধরা, কাটারিটা এগিয়ে দেওয়া, সবই সে করত। তার জন্যে একটি পয়সা অথবা একমুঠো মুড়িও আশা করত না সে। আমরা তাকে বহুদিন ডেকে খাইয়েছি। নেড়া আর একটা ছোট্ট বাচ্চা কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছিল নেড়ার মা। একটা ঢিবির ওপর চার দেয়াল আর একটা ফুটো ছাউনি মাথার ওপর রেখে পরপারে প্রস্থান করেছিল নেড়ার বাপ। সেই থেকে ডাল কুটো কুড়িয়ে, শাকপাতা সেদ্ধ করে, পাঁচবাড়ি এঁটো বাসন মেজে তিনটে পেট চালাচ্ছিল নেড়ার মা।

নেড়ার অপঘাতে মরার খবর পেয়ে বুকে বড় লাগল। বললাম, বাচ্চাটা কেমন আছে ?

আর বলিস না। খেতে দিতে না পেরে নেড়ার মা তাকে নিয়ে মাঠের

পুকুরে জল খাওয়াবে বলে নেমেছিল। ছেলেটা কোল থেকে ফসকে জলে পড়ে যায়। নেড়ার মা তাকে তুলতে গিয়ে নিজেই তলিয়ে যাচ্ছিল। এক ফোঁটা শক্তি ছিল না গায়ে। ক্ষীণ একটা চীৎকার শুনে মাঠের একটা লোক ছুটে এসে ওকে উদ্ধার করে। ছেলেটাকে সেদিন পাওয়া যায়নি। পরের দিন আপনিই ভেসে উঠেছিল। নেড়ার মার খবর শুনে আনন্দবাবু তাকে রান্নার কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। জানিস, রোজ রাতে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে নেড়ার মা তার স্বামীর ভিটেয় ঘুমুতে যায়। অনেক রাত অব্দি কাঁদে। পাড়ার অনেকেই তার কান্নার শব্দ শুনেছে। আমিও একদিন চুপিচুপি গিয়ে শুনে এসেছি।

বললাম, গোবর্ধনদা, একেই বলে বিধাতার মার। এই দেখ না, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বলতে বলতে কত ছাত্র, কত কিষাণ এগিয়ে গেল গুলির সামনে। শপথ নিল, পিছাবনির মানুষ আমরা পিছাব-নি। কত মরল। সরকারী ট্রাকে তুলে নিয়ে খঙ্গাচণ্ডীর শ্মশানে গণদাহ করা হল পেট্রল ঢেলে। ঘরে আগুন, মেয়েদের টেনে বে-ইজ্জত করা—কি আর বাকী রইল বল?

এত অত্যাচারেও ভগবানের মন ভরল না। বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন সারা দেশটা।

গোবর্ধনদার সঙ্গে বোর্ডিং-এ গেলাম। একটিও ছাত্র নেই, থাকার কথাও নয়। হেডমাস্টার আনন্দবাবু থাকেন তাঁর কোয়ার্টারে। বড় মেয়ে দীপাদিই তাঁর দেখাশোনা করতেন, তিনি এখন জেলে। ছোটমেয়ে চন্দ্রাদি শ্বশুর-বাড়িতে। গোবর্ধনদা বলল, চন্দ্রা বড় জোর বেঁচে গেছে বন্যায়। পুজোর কদিন আগে এসেছিল। মাস্টারমশায়ের কাছে বন্যার পর চন্দ্রার সেকি অবস্থা। বরের জন্যে কান্নাকাটি। সমুদ্রের কাছাকাছি বাড়ি, সে কি আর বেঁচে আছে? অগত্যা হাঁটুজল ভেঙে খবর আনার জন্যে ছুটতে হল এই শর্মাকে। আট মাইল-দূরে থানা পুকুরের ধারে কাতারে কাতারে লোক আশ্রয় নিয়েছে। খুঁজে দেখি, চন্দ্রার বর দাঁড়িয়ে। পুকুরের দিকে চেয়ে আছে। পিঠে চাপড় মেরে বললাম, বউ সেখানে কেঁদে মরছে, আর আপনি মশায় এখানে দিব্যি দাঁড়িয়ে পুকুরের ঢেউ গুনছেন।

আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল চন্দ্রার বর। শুনলাম এক করুণ কাহিনী। অন্ধকার রাতে চালা ধরে জলের স্রোতে ভেসে আসছিল সবাই। প্রথমে ছোট বোনটা হাতছাড়া হয়ে যেতেই মা তাকে ঝাঁপিয়ে ধরতে গিয়ে হারিয়ে গেল। ঘূর্ণি ঝড়ের বেগে তখন চালাটা ছুটে চলেছে জাহাজের গতিতে। পরে গেল ছোট ভাইটা। গোয়ালে কাজ করত একটা ছেলে। দুজনের খুব ভাব ছিল। কাজের লোক আর মালিক বলে কোন তফাৎ ছিল না। সে 'ছোটদা' বলে একটা চীৎকার করে তারই সঙ্গে ভেসে গেল।

ভোরবেলা দেখা গেল, থানা পুকুরের উঁচু পাড়ে বড় বড় গাছগাছালির ফাঁকে চালা এসে ঠেকেছে। আধ চৈতন্য বাপ কিন্তু তখনও বজ্র মুষ্টিতে ধরে আছে চালার একটা বাঁশ।

বুড়ো বাপ প্রায় আধপাগল হয়ে আছে। তাকে ছেড়ে ছেলে আসতে পারছে না। চন্দ্রা সুস্থ আছে জেনে বলল, এখন থাক ওখানে। আমি থাকার একটা ঠাঁই করেই ওকে আনব।

রাতে দুজনে রান্না করলাম। খেতে বসে গল্প করতে করতে অনাথবাবুর প্রসঙ্গ এসে পড়ল। জানলাম, স্কুল থেকে অবসর নেবার পর অনাথবাবু পক্ষাঘাত রোগে একেবারে পঙ্গু হয়ে যান। সংসারে তাঁর কেউ ছিল না। এমন অর্থও ছিল না যাতে একটি লোক রেখে সেবার ব্যবস্থা করা যায়।

গোবর্ধনদা আমৃত্যু অনাথবাবুর সেবা করে মুখাগ্নির কাজটুকুও নিজেই সম্পন্ন করে। ও বিষয় অনাথবাবুই তাকে অনুরোধ করে যান। অবশ্য সে সময় ব্রাহ্মণ-পল্লীতে আন্দোলন হয়েছিল—অব্রাহ্মণ হয়ে কি করে গোবর্ধনদা একজন সদাচারী ব্রাহ্মণের মুখাগ্নি করে। শাস্ত্রীয় মতে শূদ্রের সেবায় বাধা নেই, তা বলে মুখাগ্নি!

অব্রাহ্মণরা একজোটে বিধান দিলেন, পঙ্গু মানুষটিকে জীবিত অবস্থায় যাঁরা একদিনও, পাছে দায়িত্ব নিতে হয় বলে, দেখতে এলেন না, তাদের এ বিষয়ে কথা বলার কোন অধিকার নেই।

গোবর্ধনদাকে অনাথবাবু ঐ বাড়িটুকু দিয়ে যান। বাড়িটা এক সময় বিক্রি করে দিল গোবর্ধনদা। আর বাড়ি বিক্রির সমস্ত টাকা স্কুল কমিটির হাতে তুলে দিল। শর্ত রইল, প্রতি বছর স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় যে ছাত্র অঙ্কে সবচেয়ে বেশী নম্বর পাবে তাকে ঐ টাকার সুদ থেকে 'অনাথবন্ধু' মেডেল দেওয়া হবে। আর বাকি টাকা খরচ করা হবে অঙ্কে মেধাবী একটি দরিদ্র ছাত্রের মাইনে বাবদ।

পরের দিন সকালে উঠেই চলে গেলাম দীপাদিদের বাড়ি।

আনন্দবাবুকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বললেন, কবে এলি?

কাল বিকেলে।

আছিস কোথায়? শুনেছি বৌমা (আমার মা) তো চকে গেছেন।

বোর্ডিংএ গোবর্ধনদার কাছে উঠেছি।

এখানেও থাকতে পারতিস। তবে উঠেছিস যখন থাক গোবর্ধনের কাছে।

একটু থেমে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

হাঁরে হাবুল, কলেজ তো এখন বন্ধ?

হাঁ, মাস্টারমশাই।

সরষেবোড়িয়ায় যখন গুলি চলে তখন তুই তো টাউনেই ছিলি?

মাথা নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

কত মানুষ মারা গেল?

সংখ্যা বলতে পারব না, তবে কয়েকদিন ধরে লরি বোঝাই করে আহত আর মৃতদের হাসপাতালে আনতে দেখেছি।

সব গুলি করে মেরেছে?

সব। হাসপাতালে জায়গা ছিল না, বারান্দা আর উঠোনে ফেলে রাখত। বিছানা জোটেনি। আমরা ছুটোছুটি করে মুখে জল আর খানিকটা করে দুধ ঢেলে দিতাম। গুলি বের করার সময় আরও অনেকে মারা যেত। অচেতন অবস্থাতেও আমরা ওদের মুখ থেকে মার মার আর বন্দেমাতরম্ শব্দ শুনেছি।

পদ্মার খবর জানিস?

পদ্মা গয়াতে গিয়েছিল, সেখানেই মারা গেছে। গত পরশু খবরটা পেয়েছি।

এক আশ্চর্য মেয়ে এই পদ্মা। চাষার বাড়ির বউ। ঘোমটা দিয়ে ঘরের কাজ করত। শাঁখ বাজাত, প্রদীপ জ্বালত। একবার কি চক্করে পড়ে গেল, গাঁয়ের মেয়ে পুরুষের সঙ্গে দারুয়া ময়দানে গেল বীরেন শাসমলের বক্তৃতা শুনতে। শাসমল মশায়ের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে মাথা বিগড়ে গেল গাঁয়ের বউটির। জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত চেহারা। হাতে পতাকা আর মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে যখন পদ্মা কোন প্রসেসানের আগে আগে চলত তখন সত্যিই তাকে মনে হত সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী।

ঘরে ঘরে গিয়ে হাঁক দিয়ে বলত, মায়েরা রেশমী চুড়ি ভেঙে ফেল, পুড়িয়ে ফেল বিলিতি কাপড়।

এরপর দলবল নিয়ে গান শুরু হত, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।'

বাড়ি বাড়ি বউরা জমা হত একটা প্রাঙ্গণে। হাতে থাকত বিলিতি শাড়ি। পদ্মা নিজের হাতে ওদের রেশমী চুড়ি ভাঙত। আগুন জ্বালিয়ে শাড়িগুলো পোড়াত। শেষে বউদের কপালে ঐ কাপড় পোড়ান ছাই দিয়ে জয়তিলক এঁকে দিত। সে এক উন্মাদনা। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে কেঁপে উঠত আকাশ বাতাস।

সেই পদ্মা লবণ আইন ভঙ্গের সময় আলাদা এক ভূমিকা নিয়েছিল।

দারুয়ার ময়দানে প্রতিদিন স্বেচ্ছাসেবকেরা ঢুকছে, মিটিং করছে, কিন্তু লবণ তৈরী করতে পারছে না। তিন মাইল দূরে সমুদ্র, তবু এক ঘটি লবণ জল নিয়ে দারুয়ার ময়দানে ঢোকার উপায় নেই। পুলিশ চেক পোস্ট চারদিক ঘিরে। যেতে পার ময়দানে, তবে আগুন জ্বেলে লবণ তৈরী করা চলবে না।

একটি মেয়েকে দেখা গেল খালি কলসী কাঁখে নিয়ে ওপারের গাঁ থেকে ময়দান পেরিয়ে এপারে আসছে। অমনি হৈ হৈ করে ছুটল সেপাইরা।

কলসীতে লবণ জল তো দূরের কথা, কোন জলই নেই। তবু সেপাইরা জানতে চায়, কোথায় চলেছ খালি কলসী নিয়ে?

মেয়েটি বলে, সরকারী পুকুর থেকে খাবার জল নিয়ে যাবগো বাবুরা। পাড়ায় দুঘর কলেরায় মরেছে, পুকুরের জল সব কাচাকুচিতে নোংরা।

সেপাই বলে, ফেরার পথে কিন্তু আমরা জল পরীক্ষা করে তবে ময়দান দিয়ে যেতে দেব।

তাই হল। মেয়েটি ফেরার সময় সেপাইদের হাতে কলসীর জল ঢেলে দিলে। তারা খেয়ে পরীক্ষা করে রায় দিল, নিয়ে যেতে পার।

দুদিন এমনি পরীক্ষা চলল। তারই ভেতর মেয়েটি ঠোঁটের হাসি আর

চোখের ইশারায় আগুন জেবলে দিলে সেপাইগুলোর বুকে। আর পরীক্ষার নাম করল না ওরা।

তবু মেয়েটি বলে, দেখে নাও বাপু, সন্দেহ ঘুচুক।

আবার বলে, কি করছে ময়দানে ঐ সাদা টুপিওলা মানুষগুলো। যত আকাম, ঘর সংসার নেই নাকি গো?

সেপাইরা বলে, ওসব স্বদেশীওলা, তুমি কি করে চিনবে গো মেয়ে। রোজ আসবে, জল নিয়ে যাবে।

আবার সেই বাঁকা হাসির সঙ্গে চোখ ইশারা।

পঞ্চম দিন মাথায় কলসী নিয়ে সেপাইদের হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল মেয়েটি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বন্দেমাতরম্ আওয়াজ শুনে চমকে উঠল সেপাইরা। ঐ তো ময়দানে ধোঁয়া উঠছে, আগুন জবলছে। নিশ্চয়ই সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করে লবণ আইন ভাঙছে স্বদেশীরা।

বন্দুক নিয়ে চারদিক থেকে তেড়ে গেল দলে দলে পুলিশ।

কেউ ভাগল, কেউ বেদম প্রহার খেল। কাউকে বা ধরে নিয়ে যাওয়া হল হাজতে।

কিন্তু সেপাইদের ব্রহ্মরন্ধ্র জবলে গেল চেনা মেয়েটিকে হাসতে দেখে। সামনে বসে আছে সেই কলসী। জবালন দিয়ে গরম করা হচ্ছে তার জল। কোন ফাঁকে সমুদ্র থেকে এক কলসী জল এনে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। আর মেয়েটি সুযোগ বুঝে সেই জল দারুয়ার ময়দানে কদিনের চেষ্টায় এনে ফেলল।

সেপাইদের ঠকিয়েছে এই মেয়েটা। অফিসারের আদেশে কাছি এনে বট গাছের সঙ্গে বাঁধা হল তাকে। তারপর অনাবৃত করে সেই অপরূপ জগদ্ধাত্রী মূর্তির পিঠে আধ ইঞ্চ গভীর করে বেয়নেট দিয়ে পাঁচটি রেখা টানা হল।

মূর্ছিত, রক্তাক্ত সেই নারী ছ'মাস পরে সুস্থ দেহে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিল।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনে সেই পদ্মা এস. ডি. ও. পুলিশ অফিসারের জীপের সামনে দুহাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে গাড়ি আটকেছে। পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে প্রসেসান।

মিটিংএ দাঁড়িয়ে পদ্মা উর্ধ্ব অঙ্গের বাস খুলে ফেলে তার বেয়নেট দিয়ে ফেঁড়ে দেওয়া পিঠখানা দেখাত, আর বলত, তোরা দেখ, আমি মেয়ে হয়ে যদি এসব সইতে পারি, তাহলে তোরা ঐ গোলামদের বন্দুকের সামনে ভয় পাবি কেন?

সবাই চেঁচিয়ে বলত, আমরা ভয় পাব না মা, ভয় পাব না।

পদ্মাকে আমি একদিন খড়্গচণ্ডীর শ্মশানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখেছিলাম। অমনি ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কাঁদছ কেন মা?

পদ্মা বলেছিল, কাঁদব না? আমার এতগুলো ছেলে মরে গেল, কাঁদব না?

আমি গয়ায় গিয়ে বাছাদের পিণ্ডি দিয়ে আসব।

পদ্মা সত্যিই গয়ায় গিয়েছিল। আমাদের এক প্রফেসার পদ্মাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি পদ্মার হাতে নিজের ঠিকানা লেখা একটা কাগজ দিয়ে বলেছিলেন, এটা কাছে রেখে দাও, কোন রকম দরকার পড়লেই আমাকে জানাবে।

কিছুদিন পরে গয়া থেকে এক ভদ্রলোক স্যারের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠান। টেলিগ্রামে সংবাদ ছিল, পদ্মা, ফল্গু নদীতে অঞ্জলী দেবার সময় হার্টফেল করে মারা গেছে।

দু'তিন দিন বোর্ডিংএ কাটাবার পর হেডমাস্টারমশাই বললেন, গোবর্ধন, হাবুলকে নিয়ে তুই একবার পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি ঘুরে আসতে পারবি? সবার খবর মোটামুটি পেয়েছি। পাইনি কেবল ওঁরই খবরটা। বড় উদ্বিগ্ন আছি।

গোবর্ধনদা বলল, শুনেছি দেশের বাড়িতে তিনি নেই, পুঁটিমারির চরে চাষের কাজ দেখাশোনার জন্যে গিয়ে আটকে পড়েছেন। চারদিকে নদী আর জল। দেশে ফেরা মুশকিল হয়ে পড়েছে।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, ঐ পুঁটিমারিতে গিয়ে কাজ নেই। আমার ধারণা ছিল, উনি দেশেই আছেন।

গোবর্ধনদা বলল, জল অনেক কমে গেছে, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি আর হাবুলা ঠিকই চলে যেতে পারব।

হেডমাস্টারমশাই আমাদের সঙ্গে বেশ খানিকটা চাল আর শুকনো চিঁড়ে গুড় দিয়ে দিলেন। চালটা পণ্ডিতমশায়ের সেবার জন্যে আর বাকীটা আমাদের জন্যে।

পাশের খালে কলার মান্দাস ভাসালাম। এক কলসী জল আর একখানা স্টোভ সঙ্গে নিলাম। একটি আস্ত কলার কাঁদি বড় বাড়ির বড়মার কাছ থেকে সংগ্রহ করা গেল।

গোবর্ধনদার সঙ্গে অচেনা দ্বীপে যাব, এর চেয়ে জীবনে বড় রোমাঞ্চ আর কি আছে।

বাঁশের গজাল ঠুকে মান্দাস টাইট করে বেঁধেছে গোবর্ধনদা। ফাঁক ফোকর রাখেনি কোথাও।

অবশেষে রবিনসন ক্রুশোর নৌকোখানা যাত্রা শুরু করল। লম্বা লগি হাতে সর্ববিদ্যাবিশারদ (কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ছাড়া) গোবর্ধনদা দাঁড়িয়ে। একখানা কাঠের চৌকির ওপর থরে থরে মালপত্র সাজানো। দুটো টর্চ আর একটি হেরিকেন সঙ্গে। গোবর্ধনদার গৃহিণীপনা তারিফ করার মত।

আমি দেখিনি, চৌকির তলায় কখন গোবর্ধনদা একটা জাল রেখেছে। একটা কাঠি চোখে পড়তেই আবিষ্কার করা গেল জালটিকে।

গোবর্ধনদা, জাল।

চাল ফুরলে কি খাবি? জাল থাকলে মাছ ধরে পুড়িয়ে খাওয়া যাবে!

কিন্তু দুটো টর্চ কি হবে তোমার?

একটা পণ্ডিতমশাইকে দিয়ে আসব। বন্যার পর সব গর্ত জলে ডুবে

আছে, সাপগুলো এখন ভাঙা পড়ো বাড়িতে সেঁধিয়েছে। টর্চ একটা কাছে থাকা ভাল।

আচ্ছা গোবর্ধনদা পণ্ডিতমশাই কি আর ফিরবেন না?

কেন ফিরবেন না, ইস্কুল খুললে, পথঘাট চলাচলের মত হলে ফিরবেন।

গোবর্ধনদা একবার নাকি পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে পুঁটিমারির চরে এসেছিল। তাই নদী নালা ঠেঙিয়ে, বহু আঁক-বাঁক পেরিয়ে, ঘূর্ণি এড়িয়ে অবশেষে মান্দাস নিয়ে একেবারে পণ্ডিতমশায়ের বাড়ির খিড়কী দরজায় হাজির।

বাড়ি নয়তো, একটা উট যেন অষ্টবক্র হয়ে বসে আছে।

গোবর্ধনদা হাঁকল, পণ্ডিতমশাই আছেন? সাড়া নেই।

কিছুক্ষণ পরে গিরগিটির মত একটা উলঙ্গ বাচ্চা হামা টানতে টানতে বেরিয়ে এল। পেছনে একটি মেয়ে। শতচ্ছিন্ন, ময়লা কুরকুট্টি একখানা টেনা পরেছে। আমাদের দেখে ফের ঘরে ঢুকে পড়ল। এমন বিস্ময়-বিহ্বল চোখ আমি খুব কম দেখেছি।

ভাঙা একটা দরজার আড়াল থেকে ক্ষীণ গলার এক ধরনের নাকি আওয়াজ ভেসে এল, পণ্ডিতমশাই বিছানায় পড়ে আছেন। অনেকদিন জ্বরে ভুগে সবে দুদিন তেনার জ্বর ছেড়েছে।

গোবর্ধনদা হেঁকে বলল, কথা বলতে পারছেন?

কানের কাছে মুখ নিয়ে গেলে শুনতে পান। দু'একটা কথার উত্তর দেন।

গোবর্ধনদা বলল, আমাদের ওঁর কাছে নিয়ে চল।

মেয়েটি যতদূর সম্ভব নিজেকে ঢেকে ঢুকে আমাদের ঐ ভাঙা ঘরের ভেতর ঢোকাল।

বাঁশের ঠেকো লাগান একটা চালার তলায় মাটির ওপর ছেঁড়া কাঁথা পেতে পণ্ডিতমশাইকে শোয়ান হয়েছে।

গোবর্ধনদার বাজখাঁই গলার আওয়াজ পণ্ডিতমশাই নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন। ফিস ফিস একটা শব্দ উঠল রোগীর বিছানা থেকে। আমরা পণ্ডিতমশায়ের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম।

গোবর্ধনদা বলল, আপনার খোঁজখবর নিতে হেডমাস্টারমশাই আমাদের দুজনকে এখানে পাঠিয়েছেন। কিছু চালও আপনার জন্য দিয়ে দিয়েছেন।

আর কোন কথা নেই। দোর্দণ্ড প্রতাপ মানুষটি দুটি শীর্ণ গাল ভিজিয়ে ফেললেন চোখের জলে। আমরা তাঁর অসহায় অবস্থার দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

কতক্ষণ পরে উনি ইংগিতে গোবর্ধনদাকে আরও কাছে ডাকলেন। আমিও ওঁর কথা শুনব বলে মুখ বাড়ালাম।

ক্ষীণ গলায় বললেন, উনি নিজে কেমন আছেন? দীপা কি এখনও জেলে?

গোবর্ধনদা বলল, হেডমাস্টারমশাই স্কুল আগলে বসে আছেন। যেদিন বন্যা এল, সেদিন সকলেই সেক্রেটারী বিষ্ণুপ্রসাদের কোঠা বাড়িতে আশ্রয় নিল। উনি কিন্তু লাইব্রেরী ঘর আগলে রইলেন। আলমারীর অমন পুরানো

মূল্যবান বইগুলো যদি ভেসে যায়। একসময় বন্যার জল যখন হাঁটু ছাপিয়ে উঠল তখন উনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুই বড় বাড়িতে চলে যা।

আমি বললাম, আপনাকে ছেড়ে এক পাও নড়ব না। দীপা থাকলে সে যা বলত তাই হত। এখন দীপা নেই। আমার ওপর আপনার সেবার ভার দিয়ে গেছে। আপনাকে একা ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না।

আবার চোখের জলে গাল ভাসালেন পণ্ডিতমশাই। কোন কথা বলতে পারলেন না। আমরা তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম।

পাঁচদিন পরে তিনি কতকটা সুস্থ হয়ে আমাদের হাত ধরে বাইরে এসে আকাশ দেখলেন। একটা জলচৌকির ওপর বসে পড়ে ভট্টি কাব্যের শরৎ-বর্ণনা অংশটি অতি ধীরে আবৃত্তি করতে লাগলেন।

আমি বললাম, এটা কলেজে আমাদের পাঠ্য আছে।

উনি থেমে গিয়ে বললেন, কে পড়াচ্ছেন ভট্টিকাব্য ?

কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য।

দুহাত জোড় করে অনুপস্থিত অধ্যাপকের উদ্দেশ্যে নমস্কার নিবেদন করলেন। মুখে বললেন, স্বনামধন্য ব্যক্তি, পণ্ডিত বংশের সন্তান। ওঁর ঠাকুর্দার টোল ছিল। বহু ছাত্র ওখানে কাব্য, ব্যাকরণ পড়তে যেত। ভোর রাত চারটেতে উঠে ব্যাকরণ কৌমুদী মুখস্থ করতে হত। সূর্য ডুবলে সেদিনের মত পড়া বন্ধ।

বললাম, আমি ওঁর বাসায় যাই। উনি আমাকে বড় ভালবাসেন। একদিন আপনার কথা উঠেছিল।

পণ্ডিতমশাই উৎসুক হয়ে উঠলেন, কি রকম ?

বললাম, উনি কথায় কথায় জানতে চাইলেন, তোমাদের স্কুলের পণ্ডিত-মশায়ের নাম কি ?

আমি আপনার নাম বললাম।

উনি বললেন, ওঁর পরিচয় আগেই আমি পেয়েছি।

অবাক হয়ে বললাম, আপনি চেনেন আমাদের পণ্ডিতমশাইকে ?

জান, ছাত্ররাই আমাদের পরিচয়। আমি একবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তোমাদের স্কুলের খাতা দেখেছিলাম। এগারটি ছাত্র সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিল। ঐ স্কুলের পণ্ডিতমশাইকে চিনিয়ে দেবার আর কিছু দরকার আছে কি ?

পণ্ডিতমশাই বললেন, যথার্থ গুণী গুণের কদর করে থাকেন। এবার দেখা হলে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিও।

অধ্যাপক কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্যকে টাউনের সকলেই ঋষিতুল্য ব্যক্তি বলে মনে করেন। তিনি যখন পথ দিয়ে যান তখন তাঁর সমস্ত অবয়ব এবং আচরণের মধ্যে এমন এক সততা ও পবিত্রতার ছাপ থাকে, যা দেখলে আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। বাজারে একটি সামান্য শাকওয়ালীকেও তিনি মা বলে সম্বোধন করেন। তিনি কখনও জিনিসের দর কমানোর চেষ্টা করেন না, যার ফলে সবার

কাছ থেকে তিনি ন্যায্য দামে, এবং সঠিক ওজনে জিনিসটা পেয়ে যান।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বাসাটা একেবারে মেথর পাড়া সংলগ্ন। মাসে অন্ততঃ একটি দিন তিনি মেথর পাড়ার কয়েকজন বন্ধু এবং শিশুকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে আসেন। অধ্যাপক কুঞ্জবিহারীবাবুর স্ত্রী সেদিন অতিথিদের নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ান। ওদের খাওয়া শেষ হলে পাতা তুলতে দেন না। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে এঁটো তোলেন।

কলেজে প্রতিটি ছাত্র সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা। তাদের খাতা দেখে কোথাও প্রশংসার সামান্য কিছু পেলেই তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

নিজের সংগতি কম হলেও টিউশনি করে টাকা রোজগার করাকে তিনি শিক্ষা-নীতির বিরুদ্ধ বলে মনে করেন। তাঁর বিশ্বাস, কলেজ তাঁকে যে টাকা দিচ্ছে তা ছাত্রদের যথাযথ শিক্ষা দানের জন্যেই। তাঁর মতে টিউশনি করার অর্থই হল, কলেজ পিরিয়ডে অধ্যাপনায় ফাঁকি দেওয়া।

আমি কলেজে ঢুকেই কুঞ্জবিহারীবাবুর এইসব গুণের পরিচয় পেয়ে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যাই। পণ্ডিতমশায়ের কাছে সুযোগ পেয়েই আমার নতুন পরিচিত অধ্যাপকের কথা সাত কাহন করে বলতে লাগলাম। উনিও আমার কথা শুনতে শুনতে স্যারের তারিফ করতে লাগলেন।

এক ফাঁকে আমি গোবর্ধনদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা গোবর্ধনদা, আমাদের পণ্ডিতমশাই ব্রাহ্মণ, ছোঁয়াছুঁইর ব্যাপারে কত পিটপিটে তা তো তুমি জান।

জানি বইকি, সেক্রেটারীমশায়ের বাড়ি নেমন্তন্নে খেতে গিয়ে সেবার কি কাণ্ডটাই না করলেন। অব্রাহ্মণে লুচি ভেজেছে শুনেই পাত থেকে উঠে পড়ে সটান বোর্ডিং-এ চলে গেলেন।

তাহলে এখানে কি করে বাগদী মেয়ের হাতে খাচ্ছেন পণ্ডিতমশাই।

আমিও তো দেখে তাজ্জব। দাঁড়া, সময় বুঝে জিজ্ঞেস করব।

খাবার সময় মেয়েটি আমাদের পরিবেশন করছিল। সেই রান্নাবান্না সব করেছে।

হঠাৎ গোবর্ধনদা গলা নামিয়ে বলল, পণ্ডিতমশাই, আপনি বাগদী মেয়ের হাতে খাচ্ছেন জানতে পারলে আপনার সমাজ আপনাকে একঘরে করবে।

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন পণ্ডিতমশাই। থেমে গেল তাঁর খাওয়া।

করুক একঘরে। এখানে যে আমি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছি, তারা কি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, তোরা কত কষ্ট করে এলি, আমার ছেলেরা কি এল ?

গোবর্ধনদা বলল, রাস্তাঘাট সব ডুবে ভেঙে গেছে। নদীতে নৌকো নেই, তাই তারা আসতে পারছে না।

তুই থাম, তোদের সঙ্গে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, তবু তোরা মান্দাস চালিয়ে এ বুড়োটার খবর নিতে তো এলি। জানিস, বড় একটা বিপদ আপদের মুখোমুখি হলেই সমাজের, রক্তের পলকা সম্বন্ধগুলো সব খসে যায়।

আমি বললাম, সে কথা ঠিক পণ্ডিতমশাই।

এই যে দেখ না, এই বাগদী মেয়েটা, আমাকে তার সব দুঃখ ভুলে দিনরাত সেবাযত্নে সারিয়ে তুলল, এ আমার আপন, না আমার ছেলেমেয়েগুলো আপন? জানিস, আমার ক'বিঘে এই চরের জমি চাষ করবে বলে দু'ঘর বাগদী প্রজা এখানে বসিয়েছিলাম। এক ঘরে তিনটে যোয়ান ভাই থাকত, অন্য ঘরে এই মেয়েটা থাকত তার স্বামীর সঙ্গে। বাচ্চাটা এক বছরও হয়নি। ঝড়ের দিন ভোর হতে না হতেই ডিঙি বেয়ে বড় গাঙে মাছ ধরতে গেল। আমার বারণ শুনলে না। সেই যে গেল আর ফিরে এল না।

এত বড় স্বামী হারানোর দুঃখটা বুকে চেপে সে এই বুড়োটার সেবা করে যাচ্ছে। মুখে রাটি নেই। মরাইতে সামান্য যে কটা ধান ছিল, সেই আধভেজা ধানগুলোকে শুকিয়ে তুলেছে। ঢেঁকি ছিল জলের তলায়, জল সরে যেতে সেটাকে ঠিকঠাক করে কিছু ধান ভেনে চাল করেছে। মাছ ধরে, সবজি ফলিয়ে সে আমার খাবারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

আমি দেখেছি, সারাদিন অসুরের মত খেটে রাতে ঘুমুবার আগে ঘাটের পাটে বসে ও কাঁদে। যে মানুষ ফেরেনি তার জন্যে আকুল হয়ে কাঁদে। আবার ভোরবেলা থেকে তার কর্তব্যে ত্রুটি নেই। এরা সাক্ষাৎ ভগবতী। এই মেয়েটাকে আমি মা বলে ডাকি। এর নিজের হাতে তৈরী করে দেওয়া পথ্য আমি অমৃত বলে মাথায় ছুঁইয়ে খাই। সব সংস্কার কেটে গেছে আমার।

আমার আর গোবর্ধনদার মুখে কথা নেই। এ যেন অন্য এক পণ্ডিত-মশাইকে দেখছি।

যেদিন পুঁটিমারির চর থেকে চলে আসি সেদিন পণ্ডিতমশায়ের জন্যে আমাদের কোন ভাবনা ছিল না। আমরা ধরে নিয়েছিলাম, ঐ শতছিন্ন পোশাক পরা বাগদী মেয়েটি আসলে ছদ্মবেশী কোন দেবী। ওঁর আশ্রয়ে থাকলে কারু কিছু অমঙ্গল কোনদিন হতে পারে না।

ধীরে ধীরে অবস্থা সুস্থির হয়ে এল। কলেজ খুলল, আমি চলে এলাম টাউনে।

বালিয়াড়ির ওপর কলেজ। সামনে আমের বাগান। আমরা অফ পিরিয়ডে আমের বাগানে বসে গল্প করতাম। কো-এডুকেশান। মেয়েদেয় সংখ্যা খুবই কম। তবু ছেলেমেয়েতে একসঙ্গে পড়ার আলাদা একটা রোমাঞ্চ আছে।

সুমনা মিত্র তখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। এক বড় মাপের সরকারী অফিসারের মেয়ে। সুদর্শনা তবে গৃহকর্মনিপুণা কিনা জানা ছিল না। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় তার আর একটা গুণের পরিচয় পেয়ে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় সেবার এলেন সভাপতির আসনে আমন্ত্রিত হয়ে। কান্তিমান পুরুষ ও সুবক্তা। দুদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করলেন। আমাদের ক্লাশে পড়ত অমিতাভ, সে নীহার-রঞ্জনের নামকরণ করল বসন্ত-সখা। সত্যি তাঁর বলনে চলনে পুষ্পধনুর অনুরাগ দীপ্ত ছবিটিই ফুটে উঠত। অসাধারণ মজলিশি মানুষ ছিলেন ক্ষিতি-মোহন সেনশাস্ত্রী মশাই। গভীর ধর্মের তত্ত্বকেও শ্রোতাদের মনের মধ্যে সহজ

পথে সঞ্চারিত করে দেবার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল তাঁর। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পৌরোহিত্যের ফাঁকে ব্রাহ্মসমাজে তিনি সংগীত সহযোগে তাঁর ভাষণটি দিতেন। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

হাঁ, সুমনা মিত্রের কথাই বলা হচ্ছিল। নীহাররঞ্জন যেবার সভাপতি সেবার দুটি অনুষ্ঠানে একাধিক গান গাইল সুমনাদি। হৈ হৈ পড়ে গেল সারা কলেজে। রবীন্দ্র-সংগীত যে এমন প্রাণে এসে বাজে সেই প্রথম অনুভব করে রোমাঞ্চিত হলাম। নীহাররঞ্জন তারিফ করে ওর অটোগ্রাফ খাতায় সুললিত ভাষায় কিছু লিখে দিলেন। পরে সেই অটোগ্রাফের খাতাটি আমাদের হাতে হাতে ফিরেছিল।

সুমনাদির ক্লাশে পড়ত তমাল গুহ। তমালদা আধুনিক গানে মাৎ করে দিতেন আসর। নবীন-বরণ অনুষ্ঠানে সেবার গাইলেন শচীনদেব বর্মণের গাওয়া সেই বিখ্যাত গান 'প্রেমের সমাধি তীরে নেমে এল শুভ্র মেঘের দল'। আর যার কোথা। তরুণদের হৃদয় যেন সেই সুরে বিদীর্ণ হয়ে গেল।

দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল সবাই। একদল সুমনাদির শ্রেষ্ঠত্বের সপক্ষে, অন্যদল তমালদার।

সোনালী বালির পাহাড়ের ওপর ছোট ছোট বনঝাউ, সাদা ধবধবে হোস্টেলের দোতলা বাড়ি। পেছনে নীল আকাশ ছোঁয়া তিনটে তাল গাছ। শরতের মেঘ তালগাছের মাথায় এসে থমকে দাঁড়ায়। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় দুধ-সাগরের জোয়ার বয়। তমালদার গলার সুর হোস্টেলের ছাদ থেকে বহুদূর অব্দি ছড়িয়ে পড়ে। 'পদ্মার ঢেউ রে' গানটি গাইবার সময় সত্যিই চাঁদের আলো আর অদূরবর্তী সমুদ্রের হাওয়ার মিলনে ঢেউয়ের ওঠানামা চলতে থাকে।

হোস্টেলের সরস্বতী পুজোয় সুমনাদি ডি. এল. রায়ের গান শুনিয়ে বাজি মাৎ করল। পরে শুনলাম, সুমনাদির পত্রযোগে গোপন অনুরোধের ফলে অফিসার্স ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে তমালদা পনেরখানা গান গেয়ে এসেছেন।

এরপর এম. এ পড়ার সময় কলকাতার রাস্তায় দুজনকে নাকি একসঙ্গে অনেকসময় ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। অনেক পরে খবর পেয়েছিলাম, সুমনাদির বিয়ে হয়েছে এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। তারা সুইডেনে বসবাস করছে স্থায়ীভাবে।

অন্যদিকে তমালদার খবর পাইনি অনেকদিন। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে ওর সেই গোল্ডেন ভয়েস গুনগুনিয়ে উঠত। কেন জানি না একধরনের কষ্ট হত বুকের মধ্যে।

তৃতীয় পর্ব

ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে। টাউন থেকে জেলের ঘড়িতে রাত তিনটে বাজার শব্দ ভেসে এল। আমি ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ির ওপর বসে আছি। দূরে কাছে বুনো জাম, বনঝাউ আর বাদামের ছাড়া ছাড়া জঙ্গল। নিচে বালির প্রান্তরে গাছগাছালির ভেতর ক'ঘর মুসলমানের বাস। ধিক ধিক করে এখানে ওখানে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। মেয়েরা শুকনো পাতাপত্তর জ্বালিয়ে শেষ রাতে ভাত চড়িয়েছে। তিন মাইল দূরে সমুদ্র। নিঝুম রাতে ঢেউ ভাঙার গুম গুম আওয়াজ শোনা যায়। ঐ সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় মুসলমান পাড়ার মরদরা। তাই রোজ শেষ রাতে মেয়েদের ভাত বা খুদ রাঁধতে হয়।

রাতের হাওয়ায় বাদাম ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আমার পেছনে একটি পরিত্যক্ত ছোট মসজিদ বালির পাহাড়ের ভেতর তিনভাগ ডুবে আছে। একটি গোলাচ গাছ মসজিদের গম্বুজে ছাতার মত পাতা মেলে, ডালের ফাঁকে ফাঁকে থোকা থোকা ফুল ফুটিয়েছে।

জায়গাটা ভারী নির্জন। কত রাতে নিশি পাওয়ার মত ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি এখানে। হাওয়ায় জুড়িয়েছি, জ্যোৎস্নার জলে গা ধুয়েছি।

কতদিন পরে এখানে এলাম। নিজের সঙ্গে নিভৃতে খেলার এই একটিমাত্র জায়গা আমার। সন্ধ্যা পার হয়ে দু'প্রহর পরে চাঁদ উঠল। সেই থেকে হাতের পাতায় মাথা রেখে শুয়েছিলাম আকাশের দিকে চেয়ে। আমার চোখের ওপর ফুটে উঠেছিল প্রসারিত ছায়াপথ। আমি অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছিলাম। সেই দুধ-সাদা ছায়াপথ ধরে আমি এগিয়ে চলেছিলাম কতদূর। পথের দুদিকে ফুটে উঠছিল একটি একটি করে নক্ষত্র। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, ঐ নক্ষত্রের ভেতর আমারই চেনা মুখের মিছিল। আমার কৈশোরের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার দিনগুলোকে যাঁরা স্পর্শ করে গেছেন। দেশ-জননীর শৃংখল মোচনে উদ্দীপ্ত-প্রাণ আমাদের হেডমাস্টার আনন্দবাবু। তাঁর পালিতা মেয়ে দীপাদি। গৃহবধূ হয়ে কোনো সংসারের দীপ জ্বালবে না দীপাদি, যতদিন না স্বাধীনতার দীপ জ্বালাতে পারে। ঐ তো সর্বত্যাগী গোবর্ধনদা জ্বল-জ্বল করে জ্বলে উঠছে। সংসারে এমন এক একটি মানুষ থাকে যার কাছে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, একান্ত গোপন কথা গচ্ছিত রাখা যায়। গোবর্ধনদা তেমনি এক মানুষ। আমার স্কুল জীবনে কত মানুষই দেখলাম, কিন্তু গোবর্ধনদা একেবারে তাদের থেকে আলাদা। অতি সাধারণ ফেল করা একটি ছেলে স্কুলকে ভালবেসে কত গভীরভাবে জড়িয়ে ধরতে পারে তারই প্রমাণ গোবর্ধনদা। দিনরাত সেবা করে যাচ্ছে মাস্টারমশাইদের। ধমক দিচ্ছে কম-

বয়সী পড়ুয়াদের, আবার সঙ্গী হয়ে যাচ্ছে তাদের সুখ-দুঃখের। মানুষের দুঃখের কথা ভেবে এমন নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে যেতে পারে কজন। শিক্ষা নয়, সম্পদ নয়, আশ্চর্য এক মহাপ্রাণকে বুকে পুরে রেখেছে গোবর্ধনদা।

অঙ্কের মাস্টার অনাথবাবু তাঁর অনাথ-আশ্রমে বসে অঙ্ক কষিয়ে যেতেন। তাঁর পণ, ছাত্রদের মন থেকে অঙ্কের বিভীষিকাকে তিনি দূর করবেনই।

স্বল্পবাক প্রফুল্লবাবুর শরীর আর মন যেন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান দিয়ে গড়া। স্কুলের মঞ্চসজ্জা, অভিনয় থেকে ক্লাশের পঠন-পাঠন, দৈনন্দিন আচরণ পর্যন্ত সব জায়গাতেই তাঁর রুচির ছাপ। তাঁর কথা বলার রীতি, কোনো কিছু বর্ণনার কৌশল, একেবারেই তাঁর নিজস্ব। শুনতে শুনতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতাম।

পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত গল্প পড়াতে পড়াতে গল্পের পাত্র-পাত্রী হয়ে যেতেন। কখনও কচ্ছপ, কখনও বক, কখনও আবার সিংহ কিংবা শশক। তাঁর অভিনয় এ জীবনে কি ভুলতে পারব, না ভুলতে পারব তাঁর শেষ জীবনের সংস্কারমুক্তি।

ভুলতে পারব না সেই ভয়াবহ বন্যা আর সর্বগ্রাসী মন্বন্তর। অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার জীবনের বর্ষাধোয়া সেই প্রথম কদম ফুল কুমুদিনীর কথা।

জেলখানার ঘড়িতে তিনটে বাজতেই আমার কৈশোর স্মৃতির প্রথম ভাগটা বন্ধ করে উঠে বসেছি বালির বিছানায়। শেষ রাত থেকেই শুরু হয়ে গেছে ভোরের আয়োজন। সমুদ্র তার প্রভাতী বাতাস পাঠাতে শুরু করেছে।

আমি বসে বসে দেখছি প্রকৃতির জেগে ওঠা। আজ সন্ধ্যা থেকেই আমাকে ঘর-ছাড়া করে এখানে এনে তুলেছে, এক 'নিশি-পাওয়া'। এখন বাহার দরিয়ার বাতাস বইছে দমকে দমকে। মনে হয় ভাঙা মসজিদের থেকে অশ্রুত আজানের পবিত্র-ধ্বনি সে বাতাস নিয়ে ছড়িয়ে দেবে চরাচরে।

কত শান্ত, কত নিরুদ্বেগ এইসব রাত্রি। আমি এখন মুসলমান অধ্যুষিত একটা অঞ্চলে বসে আছি। অল্প কিছুদিন আগে আমাকে দেখতে হয়েছে ভয়াবহ দাঙ্গার কয়েকটা দৃশ্য। আর সেই মারামারি হানাহানির তাড়াতেই এসে পড়েছি আবার আমার পুরনো কলেজের আঙিনায়।

আই. এ. পাশ করার পর বন্ধু হৃদিরঞ্জন বলল, এই মফস্বল কলেজে বাংলায় অনার্স নেই। চল কলকাতায় গিয়ে পড়ি।

বললাম, বাসা কোথায় পাই।

ঠিক জুটে যাবে, চল না।

কলকাতায় এসে যখন বাসার সন্ধানে ঘুরছি, তখন একদিন জানতে পারলাম, হরিনাথ দে রোডে রামকৃষ্ণ স্টুডেণ্টস হোমে গণপতি মাস্টারমশাই রয়েছেন। আমি অনেক আশা নিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই এক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

স্বামীজী বললেন, কাকে চাই ?

গণপতিবাবুকে।

তিনি মারা গেছেন।

অত্যন্ত আহত হয়ে বললাম, মারা গেছেন। আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন। বড় শ্রদ্ধা করতাম ওঁকে। কি রোগে মারা গেলেন?

স্বামীজী বল্লেন, সন্ন্যাস রোগে (থ্রমবসিস)।

এবার জানতে চাইলাম, কবে উনি মারা গেলেন?

স্বামীজী একটু ভেবে নিয়ে গণপতি মাস্টারকশায়ের মৃত্যুর তারিখটা বললেন।

আমি অত্যন্ত আঘাত পেলাম। বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে নেমে এলাম।

পেছন থেকে এক ব্রহ্মচারী আমাকে ডেকে বললেন, স্বামীজী আপনাকে ওপরে ডাকছেন।

আমি লজ্জিত হলাম। ওভাবে তাড়াতাড়ি নেমে আসা আমার ঠিক হয়নি। এবার ব্রহ্মচারীজীর পেছন পেছন উঠে এলাম। তিনি আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

বেশ কিছুক্ষণ বসে আছি, মনে শুধু মাস্টারমশায়ের স্মৃতিই ঘুরে ফিরে আসছে।

পায়ের সাড়া পেয়ে তাকালাম। ওদিকের বারান্দা পেরিয়ে গেরুয়া পরা স্বামীজী আসছেন।

সামনে এসে দাঁড়াতেই আমি চমকে উঠলাম। স্বামীজী হাসছেন। গেরুয়া বসনে আমাদের মাস্টারমশাই।

এমন বিস্মিত আমি আর কখনও হইনি।

আপনি!

আমি মারা গেছি বলে মহারাজ বলেছিলেন?

মাথা নাড়লাম।

মাস্টারমশাই হেসে বললেন, উনি ঠিকই বলেছিলেন। সন্ন্যাস নিলে আমাদের পূর্বজন্মের মৃত্যু হয়। আর তুমি যখন জিজ্ঞেস করলে, কি রোগে মারা গেছি, তখন উনি ঠিকই জবাব দিলেন, সন্ন্যাস রোগে। তুমি ভাবলে আমার থ্রমবসিস-এ মৃত্যু হয়েছে। তারপর কবে মারা গেছি জানতে চাইলে উনি আমার সন্ন্যাস নেবার তারিখটি তোমাকে জানিয়ে দিলেন।

কথা আছে, হরিষে বিষাদ, কিন্তু এ হল ঠিক তার উল্টোটি—বিষাদে হরিষ।

এবারে গণপতিবাবুকে আমার বাসা ও কলেজে পড়ার সমস্যার কথা জানালাম। উনি ক'দিন পরে ওনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

ওঁর সঙ্গে দেখা করার আর দরকার হল না। তার আগেই বাসা জুটে গেল। তবে দু'বন্ধু দু-জায়গায়। কারামাইকেল (আর. জি. কর) মেডিকেল কলেজের উল্টোদিকে এক গলিতে রইলাম আমি। ছেলে পড়াই থাকা খাওয়ার বদলে। অ্যাডমিশান নিয়েছি স্কটিশচার্চ কলেজে। বন্ধু হৃদয়ও পড়ছে আমার

সঙ্গে। তবে তার আস্তানাভাগ্য আমার চেয়ে কিছু ভাল। বিডন স্ট্রীটে দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে ঠাঁই হয়েছে। অবশ্য বিনিময় সেই এক, ছেলে পড়ানো।

দয়া করে যাঁরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁদের ছেলেটিকে আমার সাধ্যমত পড়াতে চাই, কিন্তু ছেলে পড়ে কই। সবার চোখের আড়ালে সে কখন পড়ার ঘরে দেয়াল ঘড়ির কাঁটা ছুটিয়ে দেয়। আমি কলেজ যাবার পথ খুঁজে পাই না। তাছাড়া পড়ার মাঝে মাঝে গল্প শোনার বায়না। এসব বজায় রেখেও অঙ্ক কষাতে হয়, ব্যাকরণের সূত্রগুলোকে সহজ করে বুঝিয়ে দিতে হয়। ক্লাশ টাস্ক ছাত্রের বদলে টিউটরই করে দেয়। এক ছেলে, আদরের নাড়ুগোপালটি। মায়ের বকুনি একমাত্র ভরসা, বাবা নিরপেক্ষ, অফিস-অন্ত প্রাণ। মাসীর আদরে আস্ত একটি মর্কট তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যায় বই খুলে বসলেই ঘুম আসে। অমনি কোথা থেকে মাসী উড়ে এসে চিলের মত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যান। অগত্যা আমাকেই তার টাস্কগুলো আলাদা একটা খাতায় করে রেখে দিতে হয়। সকালে উঠে দয়া করে সেইটুকু নিজ হস্তাক্ষরে কপি করে নিয়ে যান।

ছেলের একটি গুণ আছে। সেটি মাসিমার শিক্ষা। পড়ার ঘরে ঢুকেই মাস্টারমশায়ের তড়িঘড়ি পায়ের ধুলো নেওয়া। আমার বারণ, কি পছন্দ অপছন্দের তোয়াক্কাই সে করে না।

আমার মনে একটা দুশ্চিন্তা দানা বেঁধে উঠেছে। পরীক্ষায় বসে ও কেমন করে উত্তর লিখবে! সেখানে তো আমি গিয়ে ওর খাতার পাতায় লিখে দিয়ে আসব না!

এদিকে হৃদয়ের শুনলাম আর এক বিপত্তি। ছেলে একেবারে বুকওয়ার্ম। পারলে বইয়ের পাতা চিবিয়ে গিলে ফেলে। স্কুল পিরিয়ডটুকু ছাড়া সব সময় বই নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে আছে। ক্ষণে ক্ষণে মন থেকে প্রশ্নের বুদবুদ উঠে আসছে। অমনি হৃদয়কে সমাধান করে দিতে হচ্ছে সে সব প্রশ্নের। রাত এগারোটার পর সব টাস্ক সেরে ঘুমুতে যায়। বেচারা হৃদয়ের তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।

একদিন বললাম, হৃদয়, ঘর বদল করে নিই আয়। আমার ছাত্রটিকে পেলে তুই খুশী হবি। পড়ার ব্যাপারে তার কোন মাথা ব্যথাই নেই। আর কারু মাথায় ব্যথা হোক তাও সে আদপেই চায় না।

হৃদয় বলল, সবই তো ভাল, কিন্তু তুই আমার আত্মীয়ের বাড়িতে টিকতে পারবি না।

কেন রে?

শুধু কি ছেলে ঠেঙিয়ে খালাস ভেবেছিস? জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সবই করিয়ে নেয়। বলে কি, তুমি তো আমার ঘরের ছেলে বাবা, কয়লাটা ভেঙে দাও, দু'বালতি জল তুলে দাও রান্নাঘরে, মেসোর সঙ্গে থলেটা নিয়ে বাজারে যাও।

এসব ঠ্যালা সামলে তোর পক্ষে একটা দিনও টে'কা সম্ভব হবে না।

আমি পড়াতে ভালবাসি তাই আমার কপালে বিনে মাহিনার একটা ছাত্র জুটে গেল। পাশেই রেল ইয়ার্ডের ধারে একটা খাটাল। বছর বার বয়েসের একটা চিকণ চেহারার বিহারী ছেলে আসে গলিতে দুধ দিতে। সে আমাদের বাসায় দুধ দিতে আসে সব বাড়িতে দুধ দেওয়ার কাজ শেষ করে। আমি দাওয়ায় বসে আমার ছাত্র বোপদেবকে পড়াই। ঐ বিহারী ছেলেটি তার খালি পাত্রটি নিয়ে দাওয়ার এক কোণায় চুপচাপ বসে থাকে। সে গভীর আগ্রহে হাঁ করে আমার ছেলে পড়ানোর ব্যাপার স্যাপার বোঝার চেষ্টা করে।

একদিন আমি তাকে বললাম, তুই বাংলা শিখবি ?

ও সাগ্রহে মাথা নাড়ল।

সেই থেকে আমি সময় পেলেই ওর ঝোপড়িতে গিয়ে ওকে পড়িয়ে আসতাম। ওর বাবা এ ব্যাপারটাকে বেশ কৌতুকের চোখে দেখত। ওকে শ্লেট, পেনসিল কিনে দিয়েছিলাম। কদিনের ভেতরেই ও স্বরবর্ণ শিখে ফেলল। ওর এতটাই উন্নতি হল যে, আমি বাংলায় গল্প বলে গেলে ও মোটামুটি বুঝতে পারত। প্রশ্ন করত হিন্দিতে। কিন্তু আমি তাকে হিন্দির বদলে বাংলাতেই প্রশ্ন করতে শেখালাম।

ওর বাবা তরুণ মাস্টারটিকে এক গ্লাস করে খাঁটি দুধ খাওয়াতো। আমি ভিখুয়ার জন্যে ছবিওলা গল্পের বই কিনে আনি। এক একটা করে গল্প পড়ে শোনাই আর ভিখুয়া অবাক হয়ে শোনে। ভিখুয়ার মত এমন আগ্রহী পড়ুয়া আমি এর আগে দেখিনি।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে আমি গেলাম ভিখুয়ার ঝোপড়িতে। শেষ-বেলার আলো তালপাতার ফুটো ছাউনি দিয়ে গলে ঝোপড়ির ভেতর সোনার টাকা আধুলি ছড়িয়ে দিয়েছে।

ভিখুয়া আমাকে ঢুকতে দেখে চারপায়ার ওপর উঠে বসল। চারপায়ার নড়বড়ে বাঁশগুলো আর্তনাদ করে উঠল।

বললাম, অবেলায় বিছানায় শুয়েছিলে কেন ?

ভিখুয়া বলল, তার সামান্য বুখার হয়েছিল, এখন তবিয়ৎ ঠিক আছে। সে পড়াশোনা করতে পারবে।

বললাম, কাজ নেই আজ পড়ে। একেবারে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাক, পরশু থেকে পড়া শুরু করে দেব।

ওর মুখ দেখে মনে হল ও মুষড়ে পড়েছে। বললাম, তুমি শুয়ে শুয়ে আরাম কর, আমি কিছুক্ষণ তোমার কাছে থাকব।

ও খুশী হল।

ওকে আমার পাঠশালার বন্ধু মিয়াসাহেবের গল্প বলতে লাগলাম।

ভারী গরীব মিয়াসাহেব। থাকে আমার গাঁয়ের পাশাপাশি একটা গাঁয়ে। বাপ ছেলেবেলাতেই মারা গেছে। দুঃখী মা অন্যের বাড়ি কাজ করে পেট চালায়। ছেলেকে কিন্তু পাঠশালায় পাঠিয়েছে পড়ার জন্যে। মিয়াসাহেব আর

আমি পাশাপাশি চাটাই-এর আসনে বসি। সেই ছোটবেলাতেই হিন্দু মুসলমান যে দুটি আলাদা জাত তা কেউ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিল। এক-ঠাঁই বসা গেলেও যে খাওয়া-দাওয়া করা চলে না সে কথাটা কেমন করে যেন জেনে ফেলেছিলাম। কিন্তু একদিন ছুটির পর দুবন্ধুতে ঠিক করলাম, আমরা জাতটাত মানব না। অমনি একটা পেয়ারা যোগাড় করলাম। মাঠে বসে ঐ একটা পেয়ারাই দুজনে কামড়ে কামড়ে খেলাম।

এরপর একসময় জ্বরে পড়ে আমি স্কুল যেতে পারিনি। মিয়াসাহেব আমাকে দেখতে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠল। সে যখন শুনল যে আমি জ্বরে পড়ে আছি তখন দুটো মুরগীর ডিম যোগাড় করে কোচড়ে বেঁধে নিয়ে এল আমার বাড়ি। মা মিয়াসাহেবের কথা আমার মুখে আগেই শুনেছিল। সেই প্রথম মিয়াসাহেবকে দেখল। আদর করে নিয়ে এল দোতলায় আমার বিছানার পাশে। বন্ধুর ওপর তার টান দেখে মা তাকে আদর করে পাশে বসে মুড়ি মিষ্টি খাওয়াল। যাবার সময় একটা টাকা দিয়ে বলল, তোমার যা খুশি এই টাকা দিয়ে কিনে খেও।

ভিখুয়া বলল, মিয়াসাহেব খুব বড় দোস্ত আছে তোমার। এখনও কি দেশে গেলে দেখা হয় ওর সাথে?

বললাম, না। অনেক বছর কেটে গেছে, তার কোন খবর পাই না। তবে সে এখনও আমার বন্ধু। আমি মনে মনে এখনও তার কথা ভাবি।

ভিখুয়া বলল, মাস্টারসাব তোমরা দুজনেই খুব ভাল আদমী।

আমি খাটিয়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললাম, তুমিও খুব ভাল ভিখুয়া।

ও কি ভেবে আবার বলল, হিন্দু, মুসলমান বলে আলাদা কিছু নেই, না মাস্টারসাব?

আমি বললাম, সবাই মানুষ। যারা বজ্জাত তারাই মানুষের গায়ে জাতের ছাপ মেরে আলাদা করে দেয়।

কয়েকদিন পরেই কলেজে গিয়ে বন্ধুদের মুখে শুনলাম, আগামী কাল নাকি খুব গোলমাল হবে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হতে পারে।

বাসায় ফিরে এসে একই কথা শুনলাম। অফিস থেকে বোপদেবের বাবাও ঐ কথা শুনে এসেছেন।

বেলা দশটা নাগাদ বেলগাছিয়ার দিক থেকে 'আল্লা-হো আকবর' ধ্বনি শোনা গেল। ক্রমে সে আওয়াজ ভয়ংকর হয়ে উঠল। যারা কাছে পিঠে গিয়েছিল, তারা প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকতে লাগল। দুদ্দাড় দরজা বন্ধের আওয়াজ পেতে লাগলাম।

বোপদেবের বাবা দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমরা চিলে কোঠার জানালা দিয়ে গলির দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। নিচে নেমে গিয়ে দরজা না খুলে পাশের জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম। আরে, এ যে ভিখুয়ার

বাবা কড়া নাড়ছে। দরজা খুলে বললাম, একা এসময় পথে ঘোরা ঠিক নয়, ঝোপড়িতে নিজের লোকজনদের কাছে চলে যাও। শুনছ না, বড় রাস্তায় আওয়াজ উঠছে।

রামনিবাস বলল, বাবুজী, ভিখুয়াকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

আমি চমকে উঠে বললাম, কোথায় গেছে ভিখুয়া?

মালুম নেই, তাইতো খুঁজছি। দুধ লিয়ে সেই যে ঝোপড়ি থেকে বেরিয়েছে, আর ফিরে নাই।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, হয়ত ঝোপড়িতে এতক্ষণে ফিরে এসেছে। না হলে ভাবনার কথা। ও ফিরলে আমি যেন খবরটা পাই।

রামনিবাস দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি পা ফেলে বেরিয়ে গেল।

খালপাড়ে মুসলমানরা জমায়েত হয়ে আওয়াজ তুলছিল। সে আওয়াজে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল আগুন।

পুলের ওপারেও মনে হল, কারা সব দল বেঁধে হাজির হয়েছে। তাদের মুখে আওয়াজ উঠল, কালী মাঈকি—জয়।

পুলের দুদিকে মানুষের গর্জন বেড়েই চলল। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি কখনও হইনি, তাই ঘাবড়ে গেলাম।

চিলে কোঠায় আমার পাশে বসে আছে বোপদেব। আমার একখানা হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে। ও মাঝে মাঝেই বলছে, কেন ওখানে এমন চীৎকার করছে মানুষগুলো?

আমি সঠিক কোনো উত্তর দিতে পারছি না। শুধু বলছি, কোনো কিছু নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেধেছে।

রঞ্জনদা, ঐ তো ভিখুয়া ছুটে আসছে।

বড় রাস্তা থেকে নিচের দিকে নেমে এসেছে গলি। ভিখুয়া গলির মুখ থেকে ছুটে আসছে খাটালের দিকে। দুটো হাতে সে চেপে ধরেছে তার পেট। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে ভিখুয়া, ভিখুয়া ডাক পাড়ছে, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ছুটতে ছুটতে ভিখুয়া বুঝি পড়ে যাবে। কাছাকাছি এলে দেখলাম, চোখ দুটো দারুণ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে। আমি লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। পেছন থেকে বোপদেবের বাবা হেঁকে দরজা খুলতে বারণ করলেন। নিচে ততক্ষণে নেমে এসেছি। জানালা দিয়ে ওকে ডাকতে লাগলাম। ও-বাড়ির গা ঘেঁষে দৌড়ে গেল, কিন্তু আমার দিকে ফিরে তাকাল না। ওর খাটো ময়লা কাপড়ে রক্তের মত ছোপ ছোপ দাগ। ও মুহূর্তে চোখের আড়ালে চলে গেল।

আমার সমস্ত শরীরটা কিরকম যেন ঘুলিয়ে উঠল। আমি টলতে টলতে ওপরে উঠে এলাম।

বিকেলে পাশের বাড়ির কেউ চেঁচিয়ে বলল, ভিখুয়া মারা গেছে। হাসপাতালে ওষুধ আনতে গিয়ে পেটে ছুরি খেয়ে খাটালে এসে মরেছে।

আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি। বিছানায় মুখ লুকিয়ে হাউ হাউ

করে কেঁদেছিলাম।

তিনদিন ঘরে বন্দী থেকে অনেক বীভৎস মৃত্যু দেখলাম। রাতে মনে হত, একটা গভীর জঙ্গলে জড়সড় হয়ে বসে আছি। চারদিকে জানোয়ারের ভয়ংকর গর্জন, কামড়াকামড়ি আর আর্ত চীৎকার। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠত বনের এখানে ওখানে।

রেল ইয়ার্ডের কুলি-কামিনরা বড় বড় লাঠি হাতে সারারাত জেগে পাহারা দিত। মাঝে মাঝে দুপক্ষের চীৎকারে কেটে চিরে ফাঁক হয়ে যেত রাতের অন্ধকার।

বাড়ির ছাদে ইটের টুকরো নিয়ে বসে থাকত ঘরের লোকজন। রাতের চীৎকার উত্তাল হয়ে উঠলে মনে হত, ওরা কখন ঝাঁপিয়ে পড়বে। বড় ডেকচিতে গরমজল ফোটান হত উনুনে। প্রাথমিক প্রতিরোধ হিসেবে এইগুলো ছিল গৃহস্থের অস্ত্র।

সব্জি আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল, এখন টান পড়েছে চালে। রাতে বিছানায় শুয়ে শুনতে পেলাম, সতর্ক গৃহস্থের দু'চারটে টুকরো কথা।

বোপদেবের বাবা বলছেন, এই দুঃসময়ে আমি কি করি। নিজেদের খাবারেই টান পড়ছে, একজন উটকো জোয়ান ছেলেকে পুষি কি করে?

বোপদেবের মা শুধু বললেন, আস্তে।

তারপর স্বামী-স্ত্রীতে ফিসফিস করে কি আলোচনা করলেন শোনা গেল না।

মাসিমা সম্ভবত ঐ আলোচনার আসরেই ছিলেন। হঠাৎ তাঁর গলার আওয়াজ শোনা গেল, আমি ছেলেটাকে খাতির করে বেশী বেশী খেতে দি! দিদি-ই তো বলেছিল, ছেলেটা বড় যত্ন নিয়ে বোপদেবকে পড়ায়। ওর খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রেখ।

এ বাড়িতে মাসিমাই সবাইকে খাবার দাবার পরিবেশন করতেন। বোপদেবের মার ওপর ভার ছিল দু'বেলা রান্নার।

ওদের কথা শুনে আমার একটুও রাগ কিংবা দুঃখ হল না। এই অসম্ভব অবস্থায় ওরাই বা চালাবে কি করে, আর আমাকেই বা খাওয়াবে কি।

বিডন স্ট্রীটে পুরসুন্দরী ধর্মশালা। ওখানে একবার কোনোরকমে পৌঁছতে পারলে সাময়িক একটা আস্তানা মিলে যেতে পারে। তাছাড়া ওখানে গেলে হৃদয়ের সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। এ দুর্যোগে সে কেমন আছে কে জানে।

ঘুমের ভেতরেও আমার আঙুলগুলো হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে বোপদেব। জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। শেষ রাতে কিছু সময়ের জন্য হৈ-হল্লা স্তিমিত হয়ে আসে।

কিছু পরে পুবের আকাশে শুকতারাকে জ্বল জ্বল করে জ্বলতে দেখলাম। বোপদেবের হাতটা ছাড়িয়ে নেমে এলাম বিছানা থেকে। ব্যাগের ভেতর আমার বই আর কয়েকটা জামাকাপড় পুরে নিলাম। এরপর ওদের উদ্দেশ্যে মাথা নিচু করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিঃশব্দে নেমে এলাম নিচে।

দরজা খুলে একটা ইট ঠেসান দিয়ে বাইরে থেকে ভেজিয়ে পথে এসে নামলাম। আর জি করের রাস্তা ধরে ওপারে যাওয়া যাবে না। ঘাতক ওঁৎ পেতে আছে বিষাক্ত ছুরি উঁচিয়ে। একমাত্র উপায় নোংরা খাল সাঁতরে পার হওয়া।

আমি খাটালের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। ভিখুয়ার ঝোপড়ির পাশে এসে মিনিটখানিক দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলাম। অভাগা ছেলেটা একদিন মিয়া-সাহেবের উদারতার গল্প শুনে অভিভূত হয়েছিল।

আবার চলতে শুরু করেছি, ঝোপড়ির ভেতর থেকে ডাক উঠল, মাস্টারসাব।

থমকে দাঁড়ালাম। রামনিবাসের গলা।

কোথায় যাচ্ছেন মাস্টারসাব ?

এই খালপাড়ের দিকে।

আমার ঝোপড়ায় একটু বসবেন নাই ?

আমি এগিয়ে যেতেই ও খাটিয়াটা ঘরের ভেতর থেকে টেনে এনে বাইরে পেতে দিল।

আমি বসলাম। দূরে কাছে অনেকেই জেগে আছে। চাপা গলায় কথা বলতে শুনলাম। রাতে ধুনি জ্বালিয়ে যারা পাহারা দিচ্ছিল, তারা নিবন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে পড়ে এখন ঘুমুচ্ছে।

আমি ভিখুয়ার বাবার সঙ্গে কোনো রকম কথা আরম্ভ করতে পারছিলাম না।

রামনিবাসই শুরু করল, মাস্টারজী দেশে ফিরে আমি ভিখুয়ার মাকে কি সমঝাব। ওর মা ওকে আসতে দিবে নাই, আমি জবরদস্তি করে লিয়ে আসলাম।

মনে মনে বললাম, আরও কত ছেলে যে মায়ের কোলে ফিরতে পারবে না, কে জানে।

আমি মাথা নিচু করে বসে আছি দেখে ভিখুয়ার বাবা বলল, আপনি আমার ছেলেকে বহুৎ প্যার করতেন।

বললাম, ওকে শুধু আমি নয়, যে দেখত সেই ভালবাসত। ওর মুখে চোখে দেবতার ছাপ ছিল।

আমাকে দাঙ্গা জমে ওঠার আগে খাল পেরিয়ে যেতে হবে, তাই উঠে দাঁড়ালাম।

রামনিবাস বলল, বাবুসাহেব একটু বসুন। আমি দুধ আনছি। ভিখুয়া থাকলে আপনাকে গেলাস ভরে দুধ খাওয়াতো।

আমি না বলতে পারলাম না। এক গ্লাস দুধ খেয়ে রামনিবাসের ঝোপড়ি ছাড়লাম। চলে আসার আগে বললাম, ভিখুয়া আমার ভাই ছিল, তুমি আমার চাচাজী। আমি আবার সুযোগ পেলে তোমার কাছে আসব।

এ লড়াই কিসকে লিয়ে বাবুজী ?

মালুম নেই চাচা। তবে শুনছি, অনেক মাথাওয়ালা লোক প্ল্যান করে

হিন্দু মুসলমানের ভেতর দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে।

আমরা তো কুছুতে নেই তবে কেন ভিখুয়াকে মারল বাবুজী ?

আমার কাছে কোনো উত্তর ছিল না। আমি রামনিবাস চাচার হাতখানা ধরে বললাম, আমাকে তোমার ব্যাটা বলে মনে করবে। আমি ভিখুয়ার বড় ভাই।

রামনিবাস চাচা আমাকে জড়িয়ে ধরল।

এক সময় বললাম, আমি ওপারে যাচ্ছি চাচা, ওখানে আমার জানাশোনা লোক আছে।

রামনিবাস চাচা প্রায় আঁতকে উঠে বলল, তুমি যাবে কি করে বাবুজী ?

বললাম, ঠিক এই সময়টাতে চারদিক একটু ঠাণ্ডা থাকে। আমি ভেবেছি খাল সাঁতরে পার হয়ে যাব !

রামনিবাস চাচা সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলল, আরে রাম রাম, ঐ পচা নালা কেউ পার হয়। তুমি চল, আমি তোমাকে পুল পার করে দিয়ে আসব। কোই ডর নেই, আমি সাথে আছি।

চাচা আমার কোনো রকম বাধাই শুনল না। কাঁধে মোটা বাঁশের লাঠিখানা তুলে নিয়ে আমার আগে আগে চলল।

চারদিক শ্মশানপুরী। পুবের আকাশে শুকতারার আলো ম্লান করে দিয়ে ফুটে উঠছে ভোরবেলার রঙ। আমরা পুল পেরিয়ে শ্যামবাজার এলাকায় এসে পড়লাম।

আমি বললাম, একটুও আর দেরী কর না চাচা, দাঙ্গা শুরু হবার সময় এসে গেছে। কদিন তাইতো দেখছি।

আমার কথায় কোনো গুরুত্ব দিল না রামনিবাস চাচা। সম্পূর্ণ অন্য কথা পেড়ে বলল, বাবুজী. তোমার কিনে দেওয়া শ্লেটে ভিখুয়া বেটা লিখাপড়ি করেছিল, আমি ওটা রেখে দিয়েছি।

কি আর বলব। দ্বিতীয়বার ওকে ফেরার কথা বলে সাবধান করে দিলাম।

চাচা আমার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, ফির দেখা হবে বেটা। রামজী তোমার ভালা করে।

আমরা দুজনে এবার দুদিকে চললাম।

বড় রাস্তায় না গিয়ে একটা গলিতে ঢুকলাম প্রথমে। আমার বাঁ-দিকে একটা পাঁচিল বরাবর চলে গেছে। ঐ পাঁচিল ধরে আমি বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে এলাম। এবার ডানদিকে একটা চওড়া রাস্তা। ঐ রাস্তা গিয়ে পড়েছে বড় রাস্তায়। ডানদিকের রাস্তাটায় ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারী গাড়ির আওয়াজ পেলাম। বড় রাস্তার কোথাও গাড়িটা এগিয়ে আসছে বলে মনে হল। শুনেছিলাম কার্ফু জারি হয়েছে, আর্মড ফোর্স নেমেছে পথে। দেখলেই গুলি করছে।

আমি পাশেই গাড়িবারান্দাওলা একটা বাড়ির বন্ধ দরজায় পিঠ ঠেসে দাঁড়িয়ে রইলাম। চৌকাঠ একটু বেশি চওড়া আর গভীর ছিল। আমি মোটা-

মুর্তিটি তার গায়ে সিঁটিয়ে থেকে ভাবলাম, কোনো রকমে আত্মগোপন করতে পারা গেছে। কিন্তু ফৌজ নিয়ে গাড়িটা যখন গর্জন করতে করতে বড় রাস্তার ক্রসিং-এ এসে দাঁড়াল তখন আমি তাদের নজরের আওতায় এসে গেছি। অমনি মনে হল, আশু আত্মরক্ষার দরকার। যেই ভাবা সেই কাজ। দৌড়লাম পাঁচিলটার দিকে। তারপর বাঁদিকে বাঁকলেই অন্য রাস্তায় পড়ে যাব, তখন ওরা আর আমার হদিস পাবে না।

পরিকল্পনা মত দৌড়ে আত্মরক্ষার জায়গায় এসে যাওয়া মাত্র পাঁচিলের গায়ে দুটো গুলি এসে লাগল। ইঁটের টুকরো, চুন বালি খসে পড়ল। আর এক মুহূর্ত দেরী হলে ঐ দুটো গুলি আমার পিঠ আর বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম গলির ভেতর একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে। বুকের ওঠানামা, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগল। সেই যে দাঁড়িয়ে-ছিলাম, সেখান থেকে বেরুলাম একেবারে তিনটের কাছাকাছি। পুলের কাছে দাঙ্গার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমি সাহসে ভর করে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে এসে পেঁছিলাম।

প্রায় দোকানই খোলা, শুধু দোকানদার উধাও। লুঠপাত করে যে যার সরে পড়েছে। রাস্তা জুড়ে নানান মাপের বুট, পামসু, চটি, মোজা ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

লুঠেরার দল সরে পড়েছে। বললাম, সবাই কিন্তু সরে পড়তে পারেনি। রাইফেলের গুলিতে গন্ডায় গন্ডায় লাশ হয়ে গেছে। কেউ টেনে পরিষ্কার করেনি। ফুলে বীভৎস, বিশাল আকার হয়ে গেছে। উগ্র গন্ধে পেট গুলিয়ে উঠছে। ঐসব লাশগুলোকে ডিঙিয়ে, পাশ কাটিয়ে তবে পথ চলতে হচ্ছে।

দূর থেকে দেখলাম, হেদুয়ার কাছে আর্মড ফোর্স কর্ডন করে রেখেছে। দু'একজন হাত তুলে যাচ্ছে ওদিকে। আমিও তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওদের দলে ভিড়ে গেলাম। রাইফেলধারীরা আমাদের দিকে তাকাল, কিছু বলল না। আমি সুট সুট করে বিডন স্ট্রীটে ঢুকে পড়লাম। তারপর একেবারে ছাতুবাবুর বাজারের পাশে হৃদয়ের দিদির ডেরায় এসে দরজায় ঘা দিলাম। কেউ খোলে না। শেষে ভেতর থেকে হৃদয়ই নাম জিজ্ঞেস করে দরজা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিলে।

হৃদয়ের জামাইবাবু বোম্বেতে আটকা পড়ে গিয়েছেন। দিদি ভয়ে আধমরা। আমাকে কিছুতেই ধর্মশালায় যেতে দিলেন না।

একান্তে হৃদয়কে ডেকে বললাম, কি করে থাকি বল, চাল ডালের যে সমস্যা।

হৃদয় বলল, সে তোকে ভাবতে হবে না। বর্ধমান থেকে জামাইবাবুর চাষের চাল আর আলু এসেছে। ভাঁড়ার ঘরে বস্তাবন্দী। আর কিছু না পাই, ওতেই ছ'মাস দিব্যি চলে যাবে।

তবুও মন খুঁত খুঁত করে। আমি আর হৃদয় আনাজপাতি কিছু পাওয়া

যায় কিনা এদিক ওদিক ঢ্ঁড়ে ঢ্ঁড়ে দেখি। রাস্তার ধারে দাঁড়াই। পেটের দায়ে চাষাভ্ষো ঝাঁকায় করে সব্জি বয়ে এনেছে, অথবা একটা থলেতে করে ডিম, অমনি সবার সঙ্গে আমরাও হুড়মুড়িয়ে পড়ি। যা পাই তুলে আনি।

মোড়ের মুখে একটা বাড়িতে কয়েকজন দর্জি কাজ করত। দাঙ্গা শুরু হতেই লোকে দেখল দরজাটা হাট করে খোলা। অমনি সবাই ভাবল রাতের অন্ধকারে ওরা গা ঢাকা দিয়েছে। হঠাৎ ভোরবেলা চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। বেরিয়ে দেখি লোক জমে গেছে। কোথায় যেন বাথরুম না জলের ট্যাঙ্কের আড়ালে লুকিয়ে বসেছিল। তারপর বেড়ালে ইঁদুর ধরার মত তাদের নামিয়ে আনল কয়েকটা তাগড়াই চেহারার গুন্ডা। পুলিসে ফোন করে সহৃদয় কেউ খবর দিয়েছিলেন, কিন্তু পুলিসের গাড়ি আসার আগেই ঐ হতভাগ্য কটি প্রাণীর নিশ্বাস শূন্যে মিলিয়ে গেল।

একটি নির্মম দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছিল আমার পুরনো বাসায় থাকার সময়ে। মা ছুটেছে আর. জি. কর হাসপাতাল লক্ষ্য করে। রক্তাক্ত শিশুটি লুটিয়ে পড়ে আছে মায়ের কাঁধে। পরনের কাপড় লুটোচ্ছে মাটিতে, হাহা করে হাসছে আর পেছনে ধাওয়া করছে খুনীর দল।

সেই ছবি, ঠিক সেই ছবিটি বিধাতা আমাকে দেখালেন আর একবার। মা আর মেয়ে পালাচ্ছে। কি করে যেন ধরা পড়ে গেল তারা। অমনি হৈ হৈ করে তাকে ঘিরে ফেলল উত্তেজিত মানুষগুলো। কে যেন ম্যানহোলের ঢাকা খুলছে, জ্যান্ত কবর দিয়ে দেবে।

আমার মাথা ঘুরে গেল। হৃদয় না থাকলে আমি পথেই পড়ে যেতাম। ও আমাকে টানতে টানতে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নিয়ে আসছে, এমন সময় গুলির আওয়াজ পেলাম।

লোকে ভাবল, আর্মড ফোর্সের ফায়ারিং শুরু হয়েছে, অমনি ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তে ঐ দৃশ্যপটে মা আর মেয়ে ছাড়া কেউ রইল না।

আমরা তখন একটা গাড়িবারান্দার থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। মেয়েটা মাকে জড়িয়ে ধরে আছে। মায়ের চোখে দিশেহারার দৃষ্টি। একটা বাড়ির ওপর থেকে কেউ যেন হেঁকে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, হেদোর দিকে দৌড়ে পালা। ওখানে পুলিসের লোক আছে।

মেয়েটি ছুটল সেদিকে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই কেমন করে যেন জানাজানি হয়ে গেল সবকিছু। ঐ গুলির শব্দটা এসেছে এক রিটায়ার্ড আই. সি. এস. অফিসারের বাড়ির ভেতর থেকে। তিনি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ঐ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

আবার জনতা জড়ো হয়ে গেল। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। তাদের সমস্ত ক্রোধটা গিয়ে পড়ল ঐ বাড়িটার ওপর। সবাই তখন ধাক্কাধাক্কি জুড়ে দিলে। ক্রোধে ভেঙে ফেলে আর কি।

হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা। এমন শান্ত সুন্দর চেহারা বড় একটা চোখে পড়ে না। তিনি যেন প্রস্তুত হয়েই এসেছেন!

শান্ত গলায় ভদ্রমহিলা বললেন, ঐ মেয়েটি আমার বাড়িতে থেকেই কাজ করত। হাঙ্গামার ভেতর ভয় পেয়ে নিজেদের মানুষজনের কাছে যাবার জন্য বেরিয়েছিল। ও আমার একটা মেয়ে।

এরপর হাতজোড় করলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, বাবারা, আমি যদি তোমাদের বিচারে দোষী হয়ে থাকি, তাহলে ওর বদলে আমাকেই ম্যানহোলের ভেতর ঢুকিয়ে দাও।

চোখের ওপর দেখলাম, লোকগুলো কথা না বাড়িয়ে সরে পড়ল। ভদ্রমহিলা জনতার শেষ লোকটি চলে না যাওয়া পর্যন্ত তেমনি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন, মুখে আর একটিও শব্দ উচ্চারণ করলেন না।

মাঝে মাঝে হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই বলে আকাশ কাঁপিয়ে মিছিল বেরোয়। কয়েক ঝাঁক গান্ধী টুপির সঙ্গে কয়েকটি ফেউকে মিশে থাকতে দেখা যায়। শান্তি মিছিল চলে গেলে লোকে ভাবে, এবার সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই হল্লা আর গুলির আওয়াজ শোনা যায়। কে যেন রটিয়ে বেড়ায়, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে আবার দাঙ্গা লেগে গেছে।

মানুষ মারার নেশায় যেন মেতে উঠেছে মানুষগুলো। এই মুহূর্তে জীবনযাত্রা যেন তার স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পেল, গাড়ি যাচ্ছে, মানুষ যাচ্ছে, দোকানপাট খুলেছে। পরক্ষণে পথঘাট সুনসান, দোকান তার ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। ইঁট বোঝাই ট্রাকের ওপর যে অন্নহীন কুলিটি বউ ছেলের মুখে এতদিন পরে কিছু তুলে দেবে বলে বেরিয়েছিল, তাকে কারা যেন নামিয়ে নিচ্ছে। মরা মাছের চোখের মত হয়ে গেছে তার দৃষ্টি। মহানগরীর প্রান্তে কোনো এক ঝোপড়ির সংসারে সে আর কোনোদিন ফিরে যাবে না।

হৃদয়ের দিদির বাড়ির ছাদে বসে এইসব ছবি দেখি আর ভাবি। ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা পাই না।

এক দুপুরে স্নানপর্ব সেরেছি সবে, বাইরে কড়া নড়ে উঠল। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই এক যুবক কোনো কিছু না বলে ঢুকে এল ঘরের ভেতর। আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

হৃদয়ের গলা পেলাম, ভুবনদা, সাবাস বলিহারি, কি করে এলে তুমি হোস্টেল থেকে। দিদি তো তোমার জন্যে ভেবে ভেবে আধমরা।

ভাগ্নে সমু ততক্ষণে চেঁচাতে শুরু করেছে, ছোট মামা এসেছে মা, ছোট মামা।

হৃদয়ের দিদি রান্নাঘর থেকে ছুটে এল। ভাইকে জড়িয়ে ধরে কান্না। মুসলিম এলাকার এক হোস্টেলে থেকে সমুর মামা সংলগ্ন মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ারের ছাত্র। রায়ট বাধার পর থেকেই কোনো খবর নেই। ভায়ের ভাবনায় জীর্ণ হয়ে গেছে দিদি। জামাইবাবু কলকাতায় লোকাল গার্জেন। তিনিও এখন কলকাতায় নেই যে খোঁজখবর করবেন। ছোট ভাইটির কি হল তাই ভেবে ঘুম নেই দিদির চোখে।

ভুবনদাকে ঘিরে শোবার ঘরে ভীড় জমে গেল। ভাই বিছানায় বসে, দিদি

তার গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ ছলছল করছে, আনন্দের সজল ছবি।

ভুবনদার মুখে প্রথম কথা, তুমি আমাকে আজ আর দেখতে পেতে না দিদি।

দিদির চোখ দুটো কপালে উঠল। রুদ্ধগলায় কোনো রকমে একটু আওয়াজ বেরুল, কেন রে!

মরে গিয়েছিলাম প্রায়। কেবল আমি নয়, হোস্টেলের পঞ্চান্নজন ছেলে।

আমরা একই সঙ্গে বলে উঠলাম, কি রকম, কি রকম!

লক্ষ্য করে দেখলাম ভুবনদার উদ্ভ্রান্ত অবস্থা তখনও কাটেনি। চোখ মুখে ভয়ের একটা ছাপ পড়ে গেছে।

ভুবনদা যা বলল তা সংক্ষেপে এই রকম ঃ

হোস্টেলে থাকতে থাকতেই ছেলেদের কানে এসেছিল, একটা গোলমাল বেধে উঠতে পারে। কিন্তু সেটাকে ততখানি গুরুত্ব দেয়নি ওরা। তাছাড়া হাসপাতালে রোগীদের পরিচর্যা করাই তাদের কাজ। সেখানে হিন্দু মুসলমান বলে আলাদা কিছু তো নেই। সুতরাং তাদের ওপর হামলা হবেই বা কেন। কিন্তু সব অঙ্ক ভুল হয়ে গেল। গতরাতে একটি তরুণী মেয়ে বোরখা পরে এসে দাঁড়াল হোস্টেল কম্পাউণ্ডে। ঠাকুরকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, ব্রজ ডাক্তারবাবু কোথায়?

ঠাকুর বলল, সাত নম্বরে।

তাঁকে আমার কাছে ডেকে আনো, জরুরী কথা আছে। কেউ যেন আমার এখানে আসার কথা জানতে না পারে।

ঠাকুর ব্রজদাকে ডেকে নিয়ে গেল। ব্রজদা ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র। মেয়েটি ব্রজদার সামনে মুখের ঘোমটা খুলে ফেলল। ব্রজদা তাকে চিনতে পারলেন। এই মেয়েটির বাবা কিছুদিন আগে গাড়িতে অ্যাক্সিডেণ্ট করে হাসপাতালে এসেছিলেন। তখন রোজই মেয়েটা বাবাকে দেখতে আসত। ব্রজদাকে ডিউটিতে থাকতে হতো তাই চেনা পরিচয় হয়ে গিয়েছিল।

মেয়েটি ব্রজদাকে ফিস ফিস করে কি একটা খবর দিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রজদার মুখখানা শুকিয়ে গেল।

শেষে মেয়েটি আরও কিছু বলল, তারপর মুখ ঢেকে যে পথে এসেছিল সেই পথ ধরে চলে গেল। ব্রজদা গত রাতে কাউকে কোনো কথাই বলেননি।

ভোর হতে ঘটনাটা ঘটল। তিরিশ-চল্লিশজন মানুষ ধারাল অস্ত্র নিয়ে হাজির। হোস্টেলের দরজাটি পুরোনো দিনের, তাই বেশ মজবুত। ভেতর থেকে ভালোভাবেই বন্ধ ছিল। ওরা এসে প্রথমে লাথি মারতে লাগল দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে গা হিম করা চীৎকার। জালের ভেতর কতকগুলো মাছ আটকে পড়লে জেলেরা যেমন উল্লসিত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি ওদের উল্লাসের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

দরজা তাড়াতাড়ি না খুললে ছেলেদের পরিণাম যে ভয়ংকর হয়ে উঠবে সে কথা গর্জন তুলে শোনাতে লাগল।

তখন ছেলেদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়ছে।

বেশ খানিকটা সময় কেটে যাবার পর ব্রজদা বলল, তোরা এখানে একসাথে দাঁড়া, আমি দরজা খুলছি।

ছেলেরা বলল, তুমি একা যেও না ব্রজদা, আমরা সকলে একসঙ্গে যাব। মরি তো সবাই একসঙ্গে মরব।

ব্রজদা ছেলেদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে ইঙ্গিত করলেন। সে সময় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কেউ আর দ্বিতীয় কথাটি বলতে সাহস করল না।

ব্রজদা নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন, কিন্তু দু'হাত আগলে দাঁড়ালেন। একটা লোক তার ঝকঝকে ছোরাখানা ঠেকিয়ে রাখল ব্রজদার পেটে।

ব্রজদা বলতে লাগলেন, আমি জানি, আপনারা কিছুক্ষণের ভেতরেই আমাদের শেষ করে ফেলবেন। তার আগে দয়া করে আমার ক'টি কথার জবাব দিন।

খুনীগুলো চেয়ে রইল ব্রজদার মুখের দিকে।

ব্রজদা বলল, আপনাদের এই মুসলিম এরিয়ায় এই একটিমাত্র হাসপাতাল রয়েছে।

দু'একজন মাথা নেড়ে জানাল, কথাটা ঠিক।

ব্রজদা আবার বলল, এই হাসপাতালে এ অঞ্চলের রোগী তো আসেই, তাছাড়া দাঙ্গায় যেসব মুসলমান ঘায়েল হয় তারাও এখানে আসে।

একজন বলল, কথাটা ঠিক।

ব্রজদা বলল, আর আমরাই এদের সেবা যত্নে ভাল করে তুলি।

একটু দূরে থামের আড়ালে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, তাতে হয়েছে কি?

তার হাতে একটা তলোয়ার ছিল। তাকে সবার থেকে অধৈর্য বলে মনে হচ্ছিল। যে কাজে এসেছে সে কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে হাসিল করে চলে যেতে চায়।

লোকটা আড়ালে থাকলেও ব্রজদা এক ঝলকে তাকে চিনতে পারল। কাল রাতে যে মেয়েটি এসেছিল তার বাবা। যাকে অ্যাক্সিডেণ্টের পর নিজের হাতে সেবা করে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি পাঠিয়েছিল ব্রজদা।

এবার ব্রজদা বলল, আমরা না থাকলে আপনাদের আহত মানুষগুলোকে বাঁচাবে কে? আপনারা ভাল করে আমার কথাটা মাথায় নিয়ে ভেবে দেখুন।

ওরা ব্রজদার কথায় বেশ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনায় বসল। শেষে সিদ্ধান্ত হল, রায়টের সময় নিজেদের প্রয়োজনে ওদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

একে একে ওরা চলে গেল। কিছুক্ষণের ভেতরেই ওরা শুনতে পেল গাড়ির আওয়াজ। পুলিসের দুখানা ভ্যান এসে দাঁড়াল হোস্টেলের সামনে। পুলিস ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ব্রজদার কথা হল। ব্রজদা হেঁকে বললেন, কি রে, তোরা থাকবি না যাবি?

আর থাকা, সবাই হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল যে যার অল্পবিস্তর লটবহর নিয়ে।

হোস্টেল থেকে থানায় নেমে কিছুক্ষণের বিরতি, তারপর গাড়ি ধরে যে যার আস্তানায় যাত্রা।

দিদি বলল, কি সাংঘাতিক ব্যাপার, শুনে আমার সারা শরীর হিম হয়ে আসছে।

ভুবনদা বলল, দিদি, মৃত্যু-যন্ত্রণা কাকে বলে তা আমি কয়েক মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম। যখন ওদের হাতে মরতেই হবে এমন একটা অবস্থা এসেছিল তখন তোমাদের মুখগুলোকে চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখলাম। শেষে আমরা সকলেই মনস্থির করে ফেলেছিলাম।

হৃদয় বলল, কি স্থির করেছিলে ভুবনদা ?

মরার আগে অন্তত একজনকে মারব।

হৃদয় এবার বলল, আচ্ছা ভুবনদা, মুসলিম মেয়েটির সঙ্গে কাল রাতে ব্রজদার কি কথা হয়েছিল ?

ব্রজদা মেয়েটির বাবাকে সুস্থ করে তুলেছিল, তাই মেয়েটি আমাদের বিপদের কথা জানতে পেরে আগাম সাবধান করতে এসেছিল। সে বলেছিল, তার বাবাও ঐ দলে রয়েছে। এ ক'দিন শরীরের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছিল তার বাবা, তাই ফোন থাকলেও সে থানায় বিপদের খবরটা দিতে পারেনি। কাল সকালে যখন ঘর ছেড়ে হোস্টেলের দিকে বেরুবে তখনই সে ফোন করে দেবে থানায়। পুলিস ঠিক এসে যাবে হোস্টেলে। কেবল কিছুটা সময় কথা বলে ঠেকিয়ে রাখা।

দিদি বলল, ঐ তোদের প্রাণ বাঁচিয়েছে ভুবন।

ব্রজদাকে ঐ মেয়েটিই তো শিখিয়ে দিয়েছিল, খুনীদের মুখোমুখি কি কথা বলতে হবে।

দিদি নমস্কার করে বলল, এমন বাবার অমন মেয়ে, ভাবাই যায় না।

রাজনীতির কূট চাল বুঝি না। বসে বসে ভাবি, কেন এমন হল ! এতদিনের বন্ধু, একদিনেই কি করে শত্রু হয়ে যায়। পূব-বাংলার মানুষের রক্তে এক মহানদী সৃষ্টি হয়ে গেছে। সেই নদী সাঁতরে তারা কূলে উঠে আসার চেষ্টা করছে। যারা ট্রেনে নিজেদের কোনরকমে ঢুকিয়ে দিতে পেরে নিরাপদ ভেবেছিল, গন্তব্যে পেঁছে দেখা গেল তাদের প্রাণহীন দেহগুলোই শুধু পড়ে আছে।

মানুষের জীবন যে কতখানি মূল্যহীন তার প্রমাণ পেয়েছিলাম তেরশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে, আর একবার পেলাম এই উনিশ'শ ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গায়।

সেদিন পথে ইতিহাসের স্যারের সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, সেদিনের দুর্ভিক্ষ আর আজকের দাঙ্গা, চক্রান্তকারী কিছু মানুষেরই সৃষ্টি। তাদেরই হাতে সমস্ত সামাজিক জীবের বাঁচামরা নির্ভর করছে।

আমি ভাবছি, মানুষ কি তাহলে বিধাতার চেয়েও পরাক্রমশালী।

কলকাতায় দাঙ্গার প্রবল স্রোতে ভাটার একটুখানি টান ধরতেই আত্মীয় স্বজনের খোঁজখবর নিতে বেরিয়ে পড়ল সবাই। আমার কলেজের এক বন্ধু আমাকে নিয়ে চলল তার মাসির খোঁজে। আনোয়ার শা রোডের কাছাকাছি বাড়ি। তিনতলা বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটে মেসো আর মাসি থাকেন। অনেক বয়সে মেসো বিয়ে করেছেন, মাসি নাকি আমার বন্ধুর চেয়ে মাত্র বছর দুয়েকের বড়।

পথে যেতে যেতে বললাম, আনোয়ার শা রোড অঞ্চলটা কিন্তু সুবিধের নয় সুবীর।

বন্ধু বলল, রাখ তো, এখন আর দাঙ্গা হাঙ্গামা নেই কলকাতায়। দেখছিস না আজ কদিন ধরে কলকাতার সব অঞ্চলেই লোকে বাসে-ট্রামে যাতায়াত করছে।

বললাম, বেরিয়েছি যখন যাবই। তবে সাবধান থাকতে হবে। এদিকে সেদিকে চোরাগোপ্তা দু'চারটে চলছে এখনও।

বন্ধু বলল, আমি তো সঙ্গে আছি, ভয় কি তোর।

আমি মনে মনে হাসলাম। বিপদ এলে সুবীর আমাকে বাঁচাবে কি করে তাই ভেবে হাসি পেল।

বিকেল চারটে নাগাদ পৌঁছলাম মাসির ফ্ল্যাটে। একতলা, দোতলা পেরিয়ে তিনতলাতে উঠে এলাম। কড়া নাড়ার শব্দ পেয়েই দরজা খুলে দিল মাসি।

আরে সুবু তুই!

মাসির চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

সুবীর বলল, মাসি, রঞ্জন, আমার ক্লাশ ফ্রেন্ড।

মাসি বলল, এসো এসো।

সুবীর আবার বলল, মেসোমশাই কই?

তিনি সেই যে মধুপুরে সুটিং করতে গিয়ে আটকে পড়েছেন, এখনও কলকাতায় ফেরেননি। ওঁর জন্য বড় চিন্তায় আছি সুবু।

মাসি আমাদের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। সুবুর দিকে চেয়ে বলল, আমার ঘরে ডিম নেই যে তোদের ভেজে দি, মিষ্টি মুখ করাই। তোরা টাকা নিয়ে যা। বাজার কাল থেকে খুলেছে। ডিম, মিষ্টি যা পাস নিয়ে আসবি। আমার জন্যেও কিছু বাজার করে আন। এ কদিন যা কষ্টে কেটেছে আমার।

সত্যি মাসি তুমি একলা কি করে কাটালে গো!

সে আর বলিস না। গোলমালের আঁচ পেয়ে একতলা দোতলার সবাই ভাগল। পাশে গোয়ালারা থাকে, ওদের ভরসায় আমি থেকে গেলাম। কলকাতায় কার বাড়ি গিয়ে উঠব বল?

সুবু বলল, সাহস দেখালে বটে।

মাসি বলল, এই দাঙ্গার ভেতরে আমার দিনগুলো যে কি করে কেটেছে তা যদি শুনিস তাহলে তোদের ভিরমি লেগে যাবে।

সুবুর গলায় সভয় কৌতূহল, কি রকম ?

মাসি বলল, আগে খাবার-দাবার নিয়ে আয়। খেতে খেতে শুনবি এখন।

কয়েক দিনের মত ডাল, ডিম, আলু ইত্যাদি মাসির জন্যে কিনে আনলাম আমরা। মুড়ি মাখা হল। ডিম ভাজার কুচি, কাঁচা লংকাসহ মেশান হল মুড়িতে। একটা কানা-উঁচু বড় থালায় খাবারগুলো রেখে আমরা তিনজনে একসঙ্গে খেতে বসলাম।

দু'এক মুঠো মুখে তুলে মাসি বলল, মকবুলকে চিনিস তো ?

সুবু বলল, মেসোর সিনেমা ইউনিটের খাস বেয়ারা, তাকে চিনব না। সুটিং দেখতে এলে ঐ তো কেক, লেমনেড খাওয়ায়।

ভাবতে পারিস, সাতদিন ঐ মকবুলকে এ বাড়িতে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম।

খাওয়া ভুলে আমরা মাসির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

হাঁ হয়ে গেছে আমাদের মুখ। সুবু বলল, সত্যি বলছ।

বিশ্বাস কর, আজ ভোর রাতে ও তোর মেসোর ধুতি পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে গেছে।

সুবু জমিয়ে বসে বলল, একেবারে গোড়া থেকে ঘটনাটা বলে যাও শুনি।

মাসি বলল, তোর মেসো মধুপুর যাবার সময় মকবুলকে আমার বাজার হাট করে দেবার ভার দিয়ে যায়। তাছাড়া পেছনে গোয়ালাদের খাটাল থেকে ও আমার দুধটাও এনে দিয়ে যেত।

দাঙ্গা একটা হতে পারে, এ খবর ও-ই আমাকে দিল। ওর বস্তির সকলেই এ খবরটা আগেভাগেই নাকি পেয়ে গেছে।

ও সন্ধ্যার আগে একটা থলেতে কিছু বাজারহাট করে নিয়ে আমাকে দিতে এল। বলল, বউদি কটা দিন কেমন কাটে দেখি, তারপর আসব।

আমি দাঙ্গার কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, দাঙ্গাটাঙ্গা কি সব বলছ তুমি আবার, আমি একা মানুষ কি করব তাহলে ?

ও বলল, আমিও কি ছাই বুঝি নাকি কেন এসব দাঙ্গা। তবে কানে এল তাই তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি। একদম বাইরে বেরিও না, ছুরি ছোরা চলতে পারে। যাদবপুরের দিকে শুনছি চোরাগোপ্তায় দুচারটে ঘায়েল হয়েছে।

আমি সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, কি হবে মকবুল ?

মকবুল বলল, তোমাদের একতলা, দোতলা বোধহয় জেনে গেছে খবরটা। নিচে তালাবন্ধ দেখলাম। দোতলার বাবু তো বউ আর মেয়ে নিয়ে বাস স্টপের দিকে ছুটেছে।

ও একটু থেমে বলল, তুমি ভাল করে চারদিক বন্ধ করে থেকো, আমি সবদিক দেখে ঠিক চলে আসব। কোন ভয় নেই।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা নেমে এল। হঠাৎ পেছনের গোয়ালা বস্তি থেকে 'মার দিয়া রে, মার দিয়া রে' বলে গোয়ালারা চেঁচিয়ে উঠল। তারপর হৈ হৈ করে হাঁক ছেড়ে বড় বড় লাঠি হাতে ছুটোছুটি শুরু করে দিলে।

আমি আর মকবুল তখন পেছনের ঐ জানালাটা থেকে উঁকি দিয়ে দেখছি। এমন সময় আনোয়ার শা রোডের দিক থেকে হাঁক উঠল, 'আল্লা হো আকবর'।

মকবুল সেই অবস্থায় বেরিয়ে যেতে চাইল। আমি বাধা দিয়ে বললাম, ক্ষেপেছ, দাঙ্গার ভেতর পথ দিয়ে যাবে কি করে। মারা পড়বে যে।

মনে হল ও ভীষণ হকচকিয়ে গেছে। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমার বউটা ভেবে ভেবে মরে যাবে বউদি।

আমি বললাম, আগে তো তুমি নিজে বাঁচ।

নিচে সদর দরজা হাট হয়ে খোলা ছিল। আমি ওকে বন্ধ করতে না পাঠিয়ে নিজে নেমে বন্ধ করে দিয়ে এলাম। এক ঝলক দেখে বুঝলাম, চারদিকে দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে গেছে। 'কালী মাঈকি জয়' রব উঠলেই ওদিকে 'আল্লাহো আকবর' আওয়াজ উঠছে।

মকবুল বেচারা থতমত খেয়ে একটা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ নিচে দরজা ধাক্কানোর শব্দ পেলাম। মনে হল, একতলা অথবা দোতলায় কেউ এসেছে। শব্দ মকবুলও শুনেছিল। ভয়ে তার মুখচোখের চেহারা কেমন যেন হয়ে গেল।

আমি দোতলায় নেমে গেছি তখন। এবার দরজায় যে ধাক্কা পড়ল তা ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের বলে মনে হল না। আমি আবার উঠে এলাম ওপরে। আমার স্নানের ঘরটা দেখেছিস একেবারে সামনে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলে যে কোনো লোকেরই চোখে পড়বে। সাধারণতঃ স্নানের ঘরটার দরজা ভেজিয়ে রাখা হয়।

আমি মকবুলকে সেই স্নানের ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম। দুটো পাল্লাই খোলা রইল। ওকে দেয়াল ঘেঁষে একটা পাল্লার আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম।

সুবীর বলল, পুরো দরজাটা খুলে ওকে পাল্লার আড়ালে লুকিয়ে রাখলে কেন? তুমি তো রান্নাঘর অথবা ভাঁড়ারে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে রাখতে পারতে?

শোন না সবটুকু। আমি গিয়ে দরজা খুলতেই এক দঙ্গল লোক লাঠি আর লোহার রড নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।

একজন বলল, লোকটাকে আমি নিজের চোখে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি।

আর একজন আমাকে বলল, কোনো একটা লোক এখানে এসে ঢুকেছে?

বললাম, আমার বাড়িতে ঘণ্টাখানেক আগে একটা লোক এসেছিল, সে তো কখন বেরিয়ে গেছে।

ওরা কিন্তু আমার কথায় পুরো বিশ্বাস করল না। কয়েকজন দুদ্দাড় করে ওপরে উঠে গেল। আমিও ওদের পেছন পেছন ওপরে উঠে এলাম। খোলা স্নানের ঘর। কয়েক ধাপ নিচ থেকেই চোখে পড়ছিল। ওরা ওদিকে আর ভাল করে তাকিয়েও দেখল না। ঢুকে গেল আমার ঘরে। খাটের তলা থেকে বারান্দা

সবই দেখল।

শেষে ভাঁড়ার আর রান্নাঘরের চাবি চেয়ে নিয়ে খুলে ফেলল। উঁকি ঝুঁকি মেরে কারু সন্ধান না পেয়ে দুপদাপ নেমে গেল নিচে। আমিও ওদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে নিচের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলাম।

সুবীর বলল, দারুণ বুদ্ধি খাটিয়েছ তো মাসি! স্নানের ঘরের দরজাটি খোলা রেখে ধোঁকা দিয়েছ দাঙ্গাবাজদের। তারা ভাবতেও পারেনি যে ঘর খোলা রেখে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে।

মাসি বলল, কিন্তু ভেবে দেখ আমার অবস্থা, এতবড় বিল্ডিংখানা খাঁ খাঁ করছে, আর আমি একজন জোয়ান মানুষের সঙ্গে একই ফ্ল্যাটে রয়েছি। আমার তখন ভয়ে প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

ও রাতে ঐ বারান্দায় শুয়ে থাকত। দিনের বেলা গোয়ালা দুধ দিয়ে যেত। তার মুখে দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর পেতাম। সেসময় মকবুলকে স্নানের ঘরে পাঠিয়ে দিতাম।

মকবুল শেষদিকে বড় কাতর হয়ে পড়েছিল। নিজের প্রাণের ভয়ের সঙ্গে বউ ছেলের জন্যে ভাবনা। রাতে আমার শোবার ঘর থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়ে দেখতাম। ও অনেক সময় হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকত।

ক'দিন আগের একটা ঘটনায় আমি মানুষটাকে চিনতে পারলাম।

সেদিন রাতে রাস্তার সবকটা আলো নিভে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকার। এমনকি গোয়ালাদের বস্তিতেও আলো জ্বলছে না। ওদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা শুনে মনে মনে কিছুটা সাহস পেতাম, কিন্তু সেদিন কোনো-দিকে কোনো সাড়া নেই। আমি রান্নাঘরে মোমবাতির আলোয় দুজনের মত চালডাল ফোটাচ্ছি। বুকের ভেতর ভয়ের পোকাটা গুরগুর করছে। মনে হচ্ছে কারু গরম শ্বাস এসে লাগছে আমার পিঠে। হঠাৎ চমকে উঠছি। মনে হচ্ছে পেছন থেকে মকবুল অথবা অন্য কেউ এখুনি একটা ধারাল ছুরি চালিয়ে আমার পিঠ আর বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে।

সুবীর বলল, বলিহারি তোমার সাহস, কি করে যে একা এই বাড়িতে থাকতে পারলে তা ভেবে আমারই হৃৎকম্প হতে শুরু করেছে।

মাসি বলল, তারপর শোন না। খিচুড়িটা সবে নামিয়েছি, এমন সময় অন্ধকার ফুঁড়ে 'আল্লা হো আকবর' শব্দ ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সেই অন্ধকারেই হুড়দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। গোয়ালাদের অনেকেই নাকি আগেভাগে আঁচ পেয়েছিল, তারা সময়মত সরে পড়েছিল অন্য জায়গায়। দু'চারজন যারা ছিল তাদের হুঙ্কার আর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। আশপাশে যারা ঘর খোলা রেখে পালিয়েছিল তাদের প্রায় সবকিছুই লুঠ হয়ে গেল।

অন্ধকারে আমি কতকগুলো টর্চের ঝলক দেখলাম।

আমি তখন কলাপাতার মত কাঁপছি। যদি দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে তাহলে আজই আমার শেষ। ওরা লুঠতরাজ আর দাঙ্গার পর গোয়ালাদের ঝোপড়ি-গুলোতে আগুন ধরিয়ে দিল। আমি সেই আগুনের আলোয় ওদের ভয়ংকর

মুখ আর দৌড়োদৌড়ি দেখলাম।

এদিকে ফ্ল্যাটের ভেতর মকবুল একবার এদিক একবার ওদিক করছে। এমন সময় আমার ঘরের সামনে বড় রাস্তার ওপর ওদের আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মকবুল সিঁড়ি ডিঙিয়ে নিচে নেমে গেল। আতঙ্কে তখন আমার বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে। এইবার দরজা খুলে মকবুল ওদের ওপরে ডেকে আনবে। তারপরের কথা আর ভাবতে পারছিলাম না।

একসময় অনেকদূরে ওদের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। ভাবলাম, মকবুল হয়ত ওদের সঙ্গে মিশে চলে গেছে। দয়া করে আমাকে প্রাণে মারতে হয়ত ওর বেধেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একা মকবুলকে আমি আমার সামনে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। শুধু চেয়ে রইলাম, কোনো কথা বলতে পারলাম না।

মকবুল বলল, বৌদি যেতে পারলাম না। একবার দরজা খুলে বেরিয়ে যাব বলে ভাবলাম, কিন্তু দরজা খোলা পেলেই ওরা ঢুকে এসে তোমার ইজ্জৎ নষ্ট করত।

একটু থেমে মকবুল কাতর গলায় বলল, আমার বউ, বেটা ভাল আছে তো বউদি।

আমি মকবুলকে বললাম, মকবুল তুমি আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের মত। আমি রোজ ভগবানকে ডাকার সময় তোমার বউ বেটার জন্য প্রার্থনা করি। তুমি এতবড় মনের মানুষ, তোমার কখনো কোনো ক্ষতি আল্লা করতে পারেন না।

সুবীর বলল, মাসি, অদ্ভুত তোমার অভিজ্ঞতা।

মাসি বলল, এখন একা আছি এই শূন্যপুরীতে। কিন্তু বিশ্বাস কর, সব ভয় ভাবনা আমার চলে গেছে।

নিচে জোর কড়া নাড়ার শব্দ শুনে আমরা দুজনে নেমে গেলাম।

সুবীর বলল, এখনও দিব্যি বেলা আছে আর লোক চলাচল করছে, ভয়ের কিছু নেই নিশ্চয়।

আমি বললাম, তবু সাবধানের মার নেই। ঐ যে খোলা হুড়কোটা নিয়ে আমি দাঁড়াচ্ছি, তুই খোল।

দরজা খুলতে দেখা গেল এক ভদ্রলোক, সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে। ওঁরা ওপরে উঠে গেলেন।

আমরা দরজা বন্ধ করে ওঁদের পেছন পেছন উঠে এলাম। ততক্ষণে দোতলার তালা খুলে ফেলেছেন ভদ্রলোক। আমরা পাশ কাটিয়ে উঠে যেতে যেতে শুনতে পেলাম, ভদ্রলোক বলছেন, রক্ষেকালী রক্ষে করেছেন নমিতা। লুঠ তো লুঠ, বিছানার চাদরটি পর্যন্ত কুঁচকোয়নি।

আমরা উঠে এসে মাসিকে বললাম, মাভৈঃ, তোমার দোতলার বাসিন্দেরা বহাল তবিয়তে ফিরে এলেন।

মাসি শুনে বলল, আমি বেঁচে আছি কিনা হন্তদন্ত হয়ে নমিতাদি দেখতে এলেন বলে।

সুবীর বলল, ওঁরা যখন গিয়েছিলেন তখন কি তোমার খোঁজখবর নিয়েছিলেন ?

মাসি মাথা নেড়ে বলল, ধারে কাছেও আসেননি। উটকো ঝামেলা কে বইতে চায় বল ?

সিঁড়িতে পায়ের সাড়া পেয়ে আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দোতলার মেয়েটি বলল, তুমি কি এখানেই ছিলে মাসি ?

আমার জায়গা বলতে তো এই একটি, কোথায় আর যাব বল। তোরা সব ভাল ছিলি তো ?

মেয়েটি ঘরে ঢুকে এসে মাসির খাটে জমিয়ে বসল। আমরা পায়ে পায়ে বারান্দায় গিয়ে রাস্তা দেখতে লাগলাম। কান কিন্তু রইল ঘরের ভেতরে।

মেয়েটি বলল, কেমন ছিলাম ? ভয়ে ক'রাত ঘুমুতে পারিনি। প্রাণ-ফাটানো চীৎকার আর হল্লা শুনতে শুনতে আমাদের প্রাণ তো খাঁচা-ছাড়া হবার যোগাড়।

মাসি একবারও জিজ্ঞেস করল না ওরা কোন অঞ্চলে ছিল। মেয়েটা সারাক্ষণ একাই বক বক করে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে যেতে লাগল।

সুবীর ফিস ফিস করে বলল, ঘরে খই ফুটছে।

বললাম, খইয়ের গায়ে ধানের খোসাও লেগে আছে বেশ কিছু।

এবার মা ঢুকলেন রঙ্গমঞ্চে। সত্যি ভদ্রমহিলা একেবারে যেন থিয়েটারের স্টেজে অ্যাক্টিং জুড়ে দিলেন। সারা ঘরে পায়চারি করতে করতে ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতার বর্ণনা। পাঁচিলের ওপর দিয়ে ডিটেক্টিভ ছুটেছে। দুর্বৃত্তদের ঝাঁক ঝাঁক গুলি কান মাথা ঘেঁষে সুঁই সুঁই বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পাঁচিল টপকানোর পর দেখা গেল বাহাদুর ডিটেক্টিভের গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি।

মাসির নমিতাদি লোমহর্ষক বর্ণনা শেষে বললেন, কেমন করে যে বেঁচে গেলাম, তা ভেবে কূলকিনারা পাই না।

শেষে হঠাৎ যেন একটা কথার কথা মনে পড়ে যেতে বললেন, তুমি কি পুরো দাঙ্গাটা এখানে থেকেই দেখলে ?

মাসি বলল, যতটুকু দেখা যায়।

রথীনবাবু মধুপুর থেকে আসেন নি ?

না।

তুমি কি বলতে চাও রায়টের দিনগুলো একাই এই বাড়িতে তুমি কাটিয়েছ।

মেয়ে অমনি মাকে আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, বোধহয় মাসির ঐ আত্মীয়রা এখানে ছিল।

মাসি হেসে আমাদের ঘরের ভেতর ডাকলেন। তারপর ভদ্রমহিলাকে বললেন, এরা আমার বড় দিদির ছেলে। এরাই তো আমার কাছে ছিল।

ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, তাই বল। একজন মেয়েছেলে আর কতটা সাহস ধরতে পারে। যাকগে, কোনো ঝামেলায় যে পড়নি এতেই রক্ষে।

দেশ থেকে মায়ের চিঠি এল, তোমার ভাবনায় অস্থির। মুখে অন্ন ওঠে না, চোখে ঘুম নেই। কলকাতার পাট তুলে চলে এসো। আগের কলেজে তোমার গোবর্ধনদা ভর্তির ব্যাপারে সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।

শেষের সংযোজন—আমাকে এত যন্ত্রণা না দিলে কি নয়?

কলেজের এক বন্ধুর বাড়ির ঠিকানায় আমার চিঠিপত্র আসত। প্রথম যখন বাসার ব্যবস্থা করতে পারিনি তখন এই বন্ধুর ঠিকানাটাই ব্যবহার করতাম। সেই থেকে ঐ ব্যবস্থাই বহাল আছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার পর আমি ওদের বাড়ি গিয়ে মায়ের চিঠি পাই। সেখানে গিয়ে আমাকে একটি দুঃখের খবরও শুনতে হয়।

বন্ধু রণবীরদের কাপড়ের দোকান ছিল চিৎপুরে। ওদের বাড়ি পূর্ব-বাংলায়। ওরা ছিল সাহা পরিবারের লোক। কলকাতার বাড়িতে রণবীর তার মা বাবা আর ছোট বোনের সঙ্গে থাকত। দেশে পুজোর সময় সবাই মিলে চলে যেত। বাড়ির পুজো, বেশ ধুমধাম করেই নাকি হতো।

এবার গিয়ে ভয়ংকর দাঙ্গার ভেতর পড়ে যায়। ক'দিন হল ফিরে এসেছে সবাই। বাড়ি ভর্তি লোক। কাকা, জ্যেঠারা সপরিবারে প্রায় একবস্ত্রে চলে এসেছেন, কেবল আসেনি একজন। সে রণবীরের কিশোরী বোন সোমা। তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ধূর্ত দালালরা রাতের অন্ধকারে। অনেক টাকার বিনিময়ে দালালরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ওদের সবাইকে শিয়ালদাগামী ট্রেনে তুলে দেবে। তুলেও দিয়েছিল রাতের অন্ধকারে গাদাগাদি মানুষের ভীড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদের মত বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন ছাড়ল। কিন্তু সোমাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কখন মেয়েটাকে ওরা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে চলে গেছে।

রণবীরের কাছে খবরটা শুনে অদ্ভুত এক বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম কতক্ষণ। কেবল চোখের ওপর ভেসে উঠতে লাগল সোমার মুখখানা।

আমি যখনই চিঠির খোঁজে রণবীরের বাড়ি গেছি সোমা এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। মুখে হাসি ফুটিয়ে মাথা নেড়ে বলেছে, চিঠি আসেনি, চিঠি আসেনি।

ওর হাসি ভরা মুখ আর কথা বলার ভঙ্গীতে বোঝা যেত, দেশ থেকে আমার চিঠি এসেছে।

ও আমার চিঠি ঘরের ভেতর থেকে এনে দু'আঙুলে তুলে ধরে বলত, আগে বল কার চিঠি?

চিঠি?

ঠিকানার কাছে ও হাতের আড়াল দিয়ে রাখত।

আমি কোন একটা নাম অনুমান করে বললেই ও বলত, চিঠি খুলে ঠিক

ঠিক বল। সত্যি বলবে কিন্তু।

কখনও ভুল আবার কখনও ঠিক হত। ও অমনি হাত পেতে বলত, পিয়নের পাওনাটা দাও হাবুলদা।

বন্ধুরা সবাই জানত আমার ডাক নাম।

বলতাম, কি খাবে বল, আমি এনে দেব?

ও অমনি বলত, এখন পাওনাগুলো জমা থাক, পরে একসঙ্গে চেয়ে নেব।

সেই হাসি মুখ, কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যে প্রবেশের মুহূর্তে আশ্চর্য রহস্যে ভরা দৃষ্টি, সে কি ভোলা যায়। কতদিন মাসিমা না থাকলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসার জন্য পা তুলেছি, ও ছুটে এসে আমার হাত ধরে বলেছে, মা নেই বলে কি তুমি শুধু মুখে ফিরে যাবে হাবুলদা?

তারপর হঠাৎ ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে বলেছে, যাও তোমাকে খেতে হবে না।

বলতে বলতে কিশোরী মেয়েটির ঠোঁট ফুলেছে, চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে।

সেই মেঘ রোদ্দুরের খেলা আর আমি দেখতে পাব না, এ কথা ভাবতে গিয়ে গভীর দুঃখে ভরে উঠল আমার মন।

সে এখন কোথায় আছে, কেমন আছে, এ কথা ভাবতে গেলে মনের যেটুকু শক্তির দরকার, তা তখন আমার ভেতর ছিল না। তাই সেই বিষাদ সংবাদ আর মায়ের চিঠিখানা নিয়ে আমি সেদিন রণবীরের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিলাম।

কলকাতার কলেজে সবেমাত্র এসেছি, তাই এখান থেকে চলে যাবার ব্যাপারে শেকড়ে টান পড়ার কথাই ওঠে না। কেবল বাংলার স্যার সুধীর দাশগুপ্তের কথা মনে হয়। তিনি নিজস্ব বাঙাল ভাষা ছাড়া ভাগীরথী তীরের ভাষায় কথা বলতেন না। এমনকি পড়ানোর সময়েও ঐ ভাষাই ব্যবহার করতেন। প্রথম প্রথম আমাদের মত পশ্চিমবঙ্গীয়দের একটু অসুবিধেই হত, কিন্তু হঠাৎ একটা আকর্ষণে পড়ে গেলাম।

রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের প্রবন্ধগুলি আমাদের পাঠ্য ছিল। অধ্যাপক দাশগুপ্ত ক্লাশে ঢুকেই কুমারসম্ভব প্রবন্ধটি পড়াতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পড়ানোর পর থেমে গিয়ে কুমারসম্ভবের মূল ঘটনাটি সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলেন।

দু'একজন দু'চার কথা বলল। উনি ক্লাশ ছেড়ে উঠে গিয়ে কালিদাসের সংস্কৃতে লেখা কুমারসম্ভব নিয়ে এলেন। মূল সংস্কৃত বইটি পড়তে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা। জমে উঠল ক্লাশ।

এই ক্লাশটি ছেড়ে আসতে হবে ভেবে দুঃখ পেলাম মনে মনে, তবু ছেড়ে আসতে হল।

আবার আমার সেই পুরোনো কলেজ, পরিচিত পরিবেশ আর বন্ধুবান্ধব।

ফিরে এসে দুঃখের চেয়ে আনন্দ হল বেশী। কিন্তু একটি অসুবিধের সহজ সমাধান করে উঠতে পারলাম না এখনও। কতদিন আর বন্ধুবান্ধবের

বাড়ি ঢুকে একই বিছানায় রাতের আশ্রয় নেওয়া যায় ? তাই আমার ভবঘুরে স্বভাবের সঙ্গে তাল রেখে কোন কোন রাতে পালিয়ে আসি এখানে। খোলা আকাশের নিচে সোনালী বালির নরম বিছানাকে মনে হয় আরব্য রজনীর কোন খলিফার শয্যা।

অবশেষে বাসা-সমস্যা সমাধানের একটা আলো দেখা গেল।

আমাদের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন কৃপানাথ কর্মকার। গোয়ার একটি কলেজে প্রিন্সিপালের কাজ করতেন। হঠাৎ দেশের জন্য মন কেমন করল। বহু দিন বিদেশবাসী ছিলেন, চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলেন স্বভূমি স্বদেশে।

তখন গোয়া ছিল পর্তুগীজ অধিকারে।

উনি গোয়ার দুর্গগুলোর প্রাচীন ইতিহাস এমনভাবে বর্ণনা করতেন যা আমরা চোখের সামনে দেখতে পেতাম। অবরুদ্ধ দুর্গ, রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে অগ্নিময় গোলার উল্কার মত উড়ে চলা, আর্ত চীৎকার তুলে হ্রেষাধ্বনি, সমুদ্রের প্রস্তর আকীর্ণ বেলাভূমিতে সগর্জনে ভেঙে পড়া। এমনি বর্ণময় চিত্র ভাষায় ফুটিয়ে তুলতেন।

সেণ্ট জেভিয়ার্সের মরদেহ কয়েক শ'বছর পরেও কিভাবে অটুট অবস্থায় রক্ষিত আছে তার বর্ণনা দিতেন। ভক্তির আতিশয্যে কোন মহিলা তাঁর পদ-চুম্বন করার কালে একটি অঙ্গুলি দাঁতে কেটে মুখে পুরে নিয়ে পালিয়েছিলেন, সে ঘটনা বলার সময় আমরা কেউ বা ভক্তিতে আপ্লুত, আবার কেউ বা ঘৃণায় সংকুচিত হতাম।

অধ্যাপক কর্মকার গোয়ার কৃষিজীবিদের কর্মধারা ও তাদের বীজ বোনা, ফসল তোলার গান ইত্যাদি সম্বন্ধে কত কথাই না বলতেন। তিনি গাইতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর সংগ্রহ থেকে পড়ে শোনাতেন।

আমরা, ইতিহাসের ছাত্রেরা তাঁকে পেয়ে বড় উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম।

কৃপানাথ কর্মকারের নামটি সত্যিই সার্থক ছিল। তিনি একদিকে ছিলেন কর্মবীর অন্যদিকে ছিলেন দয়ালু। আমাদের টাউনে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তিনি আচার্যের অভিভাষণ দিতেন। দুস্থ ছেলেরা যাতে টাউনে থেকে লেখাপড়া করতে পারে সেজন্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংলগ্ন জমিতে একটি ছাত্রাবাসের পত্তন করলেন। ছাত্রাবাসে স্থান পাবার জন্যে আবেদন করতে হল। উনি আবেদন পত্রগুলি পরীক্ষার পর আমাকে সবার শেষে ইণ্টারভিউতে ডাক দিলেন।

একখানা ঘরে উনি একাই বসেছিলেন। আমাকে বসতে বলে প্রথমেই উনি প্রশ্ন করলেন, তোমার বাবা যখন মারা যান তখন তোমার বয়স কত ?

শুনেছি, এক বছর।

এবার আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, তোমার বাবা খুব খেয়ালী ছিল। বাড়ির সংলগ্ন স্কুলেও প্রতিদিন একটা সাজ পরানো সাদা ঘোড়ায় চড়ে আসত। আমার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। ইংরাজী বই পড়ত লাল পেন্সিলের

দাগ দিয়ে। আমি ওর কাছ থেকে একসময় কিছু বই চেয়ে নিয়ে পড়েছিলাম।

উনি বলে যাচ্ছিলেন, আমি শুনছিলাম।

উনি আবার বললেন, তোমার ঠাকুর্দার নাম নিশ্চয়ই তুমি জান, কিন্তু তোমার ঠাকুর্দার মায়ের নাম বোধহয় তুমি জান না?

আমি আমার পূর্ববর্তী দশ পুরুষ পর্যন্ত নাম ছোট ঠাকুর্দার কল্যাণে মনে রাখতে পেরেছিলাম কিন্তু ঠাকুরমার নামের আগে একটি মাত্র মহিলার নাম ছাড়া আর কারু নাম জানতাম না। সেই মহিলার নাম মল্লিকা দেবী। নবম পুরুষের আগে কুর্শিনামাতে তাঁর ও তাঁর দুই সন্তানের নাম পাওয়া যাচ্ছে। তিনি দুটি সন্তানের হাত ধরে কোথা থেকে যে এসেছিলেন কেউ জানে না।

ওঁর প্রশ্নের জবাবে বললাম, ঠাকুর্দার মায়ের নাম তো আমার জানা নেই।

উনি আমাকে আরও বিস্ময়ের ভেতর ফেলে দিয়ে বললেন, তোমার ঠাকুর্দার বাবার নাম ছিল শিবপ্রসাদ। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রাধাপ্যারী।

একটু থেমে বললেন, এই দয়াবতী মহিলার নাম আমি আমার মায়ের মুখে শুনেছি।

আমি চুপ করে আছি দেখে তিনি বললেন, তোমার বাবার নাম আর দেশের বাড়ির ঠিকানা দেখেই বুঝেছিলাম, রাধাপ্যারীর বাড়ির ছেলে তুমি। তোমাদের অবস্থা বিপর্যয়ের কথা আমি গোয়া থেকে ফিরে এসে শুনেছিলাম।

আমি কোনো কথা না বলে তাঁর দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

তিনি এবার বললেন, তোমাকে একটা সীট অবশ্যই আমি দেব, কারণ তোমাদের পরিবারের কাছে, বিশেষ করে রাধাপ্যারী দেবীর কাছে আমার একটা ঋণ আছে। সে ঋণ শোধের সামান্য সুযোগ আজ পেয়েছি।

আমার কাছে সব ব্যাপারটাই কেমন হেঁয়ালী ঠেকছিল। ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আমার আর কিছু বক্তব্য ছিল না।

উনি আবার বললেন, এতকাল এ কথা আমি আমার স্ত্রী কিংবা ছেলে-মেয়েদের কাছে বলিনি। আজ তোমাকে মুখোমুখি পেয়ে না বলে পারছি না।

আমার বাবা চিরদিনই এক অসুস্থ অক্ষম মানুষ ছিলেন। মা এমন গরীব ছিলেন যে কাঠ কুড়িয়ে ঘুঁটে বিক্রি করে কোনো রকমে দুজনের সংসার চালাতেন। একদিন তোমাদের পেছনের বাগানে মা শুকনো কাঠের টুকরো কুড়োতে ঢুকলেন। ঠিক সেই সময় রাধাপ্যারী খিড়কীর ঘাটে স্নানে নামছিলেন। দুটি কাজের মেয়ে ছিল সঙ্গে। মা পুকুরের ওপার থেকে একবার তাকালেন। একেবারে দু'হাতওয়ালা দুর্গা প্রতিমা!

হঠাৎ কাজের মেয়েদের চোখ পড়ল মায়ের ওপর। ফল কিংবা শাকসব্জি চুরি করতে এসেছে কেউ মনে করে একটা মেয়ে তেড়ে এল। মাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল গিন্নিমার কাছে।

উনি ধমক দিলেন ঝিকে। বললেন, কখনও কারু গায়ে হাত দিতে আমি যেন আর না দেখি।

মাকে আদর করে কাছে ডাকলেন। মায়ের চোখে তখন জল। গিন্নিমা

মায়ের পরিচয় নিলেন। মাঠের ওপারের গাঁয়ে বাড়ি জেনে বললেন, তুমি রোজ এসো আমার কাছে। আমার বউমা তোমার বয়সী হবে। তার কাজে তুমি কিছু সাহায্য কর।

আদর করে বললেন, তোমার মুখখানা ভারী মিষ্টি।

সেই থেকে আমার দুঃখী মা রাধাপ্যারীর আশ্রয়ে বড় মর্যাদার সঙ্গে ছিলেন।

আমার জন্মের দিনটিতেও আমার অভাবী মা তোমাদের বাড়ি কাজে গিয়েছিলেন। সেদিন পিঠের আয়োজন চলছিল। পিঠে খাবার খুব ইচ্ছে ছিল মার। সন্ধ্যের সময় প্রসব যন্ত্রণা শুরু হল। সামান্য কাজের মেয়েটির সঙ্গে নিজের বউমার তফাৎ দেখলেন না রাধাপ্যারী। ঘরে পাল্‌কি আর দুজন বেহারা মজুদ থাকত। তিনি পাল্‌কিতে করে খিড়কির দিক দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন মাকে। অভিজ্ঞ এক ঝিকেও সঙ্গে দিয়ে দিলেন, যে ধাইয়ের কাজ করতে জানে। আর একথালা পিঠে নিজের হাতে পাল্‌কিতে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, খেতে খেতে যাও মা, কোনো ভয় নেই। আমি আশীর্বাদ করছি।

গরীবের ছেলে বলে সবাই ঘৃণা করত। আমি পাশ দিয়ে গেলেই পাড়ার বাবুভায়ারা মন্তব্য করত, এই যে বিদ্যের জাহাজ চলেছে। জজিয়তি করবে।

আমি চুপচাপ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতাম। শেষে ধিক্কার এল মনে। বাড়ি থেকে শহরে চলে এলাম। মা আর রাধাপ্যারী দুজনেই গত হলেন এক বছর অন্তরে। মারা যাবার আগে রাধাপ্যারীর সঙ্গে আর একবার মাত্র আমার দেখা হয়েছিল। তখন আমি মাতৃহারা। ম্যাট্রিকুলেশানে বৃত্তি পাবার পর ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উনি এক বাড়ি লোকের সামনে রুপোর থালা বের করে আমাকে খাওয়ালেন। চলে আসার সময় প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই একটি সোনার গিনি আমার হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, আমার নাতির সঙ্গে তোমার কোনো তফাৎ নেই। তুমি বিদ্বান হবে, একদিন সবার পূজ্য হবে।

এতক্ষণ কথা বলে একেবারে থেমে গেলেন কৃপানাথবাবু। চুপচাপ বসে হয়তো রাধাপ্যারীকে স্মরণ করতে লাগলেন।

এক সময় মুখ তুলে বললেন, তুমি এখন চলে যাও, সোমবার বেডিং ইত্যাদি নিয়ে একেবারে হোস্টেলে চলে এস।

আমি দরজার কাছ পর্যন্ত গেছি, আবার ডাকলেন। ফিরে দাঁড়াতেই দেখি তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমি কাছে যেতেই বললেন, এই তোমার প্রপিতামহীর আশীর্বাদের গিনি। তোমাকে দেখাব বলেই আজ সঙ্গে এনেছি। জান, কতদিন আমি অন্নের অভাবে কর্পোরেশানের জল খেয়ে কাটিয়েছি। একখানা বই কেনার পয়সার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছি, তবু রাধাপ্যারীর আশীর্বাদের এই গিনি বিক্রি করে দাতার অমর্যাদা করিনি।

হাবুল, হাবুল বলে পেছন থেকে কে যেন আমাকে ডাকল। আমি তখন টাউনের ভেতর দিয়ে খালপুলের কাছে এসে পেঁছিছি। এই পুলের কাছে

নানারকম নৌকো এসে ভেড়ে। বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ থেকে টাউনে আসে মালপত্র। মাঝিমাল্লা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দু'চার দিনের জন্য টাউনের প্রান্তে বাসা বাড়িগুলিতে আশ্রয় নেয়। টাউনের ঐ অংশে বহুকাল থেকে একটি পতিতাপল্লী রয়েছে। পথ দিয়ে চলার সময় পতিতাপল্লীর ভেতর থেকে ভেসে আসা গানের সুর শোনা যায়। শহরের দোকানদার, মাঝিমাল্লা থেকে বাবুভায়া, অনেকেরই যাতায়াত আছে ঐ পল্লীতে। আমি ঐ অংশটুকু পেরিয়ে এসে পুলে উঠি। ওখানে দাঁড়িয়ে নৌকোগুলোর আসা-যাওয়া লক্ষ্য করি। তারপর এক সময় পুল পেরিয়ে কলেজের পথ ধরি।

পেছন থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে দেখে আমি ফিরে তাকালাম। বেশ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে আমি আহ্বানকারীকে আবিষ্কার করতে পারলাম।

পথের ধার থেকেই বালি আর মাটিতে মেশা একটি উঁচু ঢিবি শহরের একপ্রান্ত ঘেঁষে অনেক দূর অব্দি চলে গেছে। ঐ ঢিবির এক ঢালে পতিতপল্লী। বিচ্ছিন্ন একখানা টালির বাড়ি ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একটি শিরিষগাছ বাড়িটার বেশ কিছু অংশ ঢেকে রেখেছে। ঐ শিরিষগাছের তলায় দাঁড়িয়ে একজন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এগিয়ে গেলাম। চিনতে পারলাম একটু দূর থেকেই। আমাদের আই. এ. ক্লাসের বন্ধু ইউসুফ। যদিও আমাদের থেকে বয়সে কিছু বড়। একবার ফেল করেছিল টেস্ট পরীক্ষায়। তিন সাবজেক্টে ফেল বলে প্রিন্সিপ্যাল অ্যালাউ করেননি। আর একবার খোদ ফাইনালে পাশ করতে পারেনি। আমরা তাই ইউসুফকে ধরে ফেলেছিলাম।

ফেল করে ইউসুফের কোনো বিকার ছিল না। সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ির ছেলে ছিল সে। যিনিই ইউসুফের নামকরণ করুন না কেন তিনি যে সার্থক নামকরণকারী এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ইউসুফের অর্থই হল নয়নাভিরাম। এমন সুদর্শন যুবক আমার তরুণ বয়সে আমি খুব কমই দেখেছি। তখনই মুখে তার সুন্দর চাপ দাড়ি। নাক মুখ ধারাল। চোখ দুটি ভাবে ভরা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। বাঁশের বাঁশিতে সে যখন সুর তুলত তখন শ্রোতাদের মনে হত তারা যেন অন্য কোনো লোকে চলে গেছে। কলেজের ফাংশানে ইউসুফের জন্য অনেকখানি সময় নির্ধারিত ছিল। সে কতক্ষণ বাঁশি বাজাবে তা তার মর্জির ওপর ছেড়ে দেওয়া হত। আমি ইউসুফের দারুণ ভক্ত ছিলাম।

ইউসুফ শিরিষ গাছের তলা থেকে হাতের নির্দেশে জানিয়ে দিলে কোনো শর্টকার্ট পথ ধরে আমি তার কাছে উঠে যেতে পারি।

আমি অল্প চেষ্টায় ঢিবির ওপর উঠে তার কাছে চলে গেলাম।

আমার হাতটা ধরে ও তার ঘরের ভেতর নিয়ে যেতে যেতে বলল, তুই অমন মাথা নীচু করে পুলের দিকে যাচ্ছিলি কেন?

বললাম, এমনি।

ও হেসে বলল, পাড়াটা অভিজাত নয়, তাই না রে ?

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, ও আমার মনের খবর পেল কি করে। মুখে বললাম, দূর, ওসব ভাবতে যাব কোন দুঃখে।

জানিস না, মানুষ এদের কি ঘেন্নাই না করে। আচ্ছা, তোর কি মনে হয় এদের ঘেন্না করা উচিত ?

মানুষকে ঘৃণা করার কথা আমি তো ভাবতেই পারি না। তবে পথের ভালমন্দ নিয়ে বিচার চলতে পারে।

ওর ঘরে এলাম। একখানা থাকার ঘর, কিন্তু বেশ ছিমছাম।

বস।

আমি ওর খাটের ওপর বসতে গিয়ে বললাম, তুই নিজেই ঘরখানা এমন ঝকঝকে করে রেখেছিস ?

না রে, আর একজন করে দিয়ে যায়।

ঠিকে ঝি ?

না, সে ঝি-টি নয়, খুব ভাল একজন।

আমি ওসব নিয়ে অকারণ কৌতূহল দেখালাম না।

ও কিন্তু ঐ কথার খেই ধরে আরও কিছুক্ষণ সেই অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রশংসা করে গেল। সে নাকি ওর ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে রেখে যায়। রান্নাবান্না ও নিজেই করে নেয়, তবে দরকার পড়লে হোটেল থেকে ওই খাবার এনে দেবার ব্যবস্থা করে।

আমি সেদিন ইউসুফের কাছে প্রথম নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ করা 'ওমর-খৈয়াম' বইটি দেখলাম। যেমন ছন্দ তেমনি ছবি। একেবারে মশগুল হয়ে গেলাম।

সাকি দ্রাক্ষারসে পেয়ালা ভরে দিচ্ছে আর কবি নতজানু হয়ে বসে পাত্রটি ধরে আছেন। ছবি যেন কথা বলে উঠল। অমনি কথার ছবিও ফুটে উঠল—

'দাও সিরাজি পাত্র ভরে,
সাকি আমার এই অধরে,
যাক্ অতীতের অনুতাপ আর—
ভবিষ্যতের ভাবনা মরে।'

ইউসুফ আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে বলল, আমি এই বইয়ের কয়েকটা কবিতার সুর দিয়েছি, শুনবি ?

আমি খুব উৎসাহিত হয়ে শুনতে চাইলাম।

ও বাঁশিতে বাজিয়ে শোনাল। যেটা বাজাল, সেটা আগে আমাকে আবৃত্তি করতে বলল।

সেদিন আমি ওর সুর দেবার ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবের সঙ্গে সুর এমন একাকার হয়ে মিশে যেতে পারে, সেই আমি প্রথম অনুভব করলাম। অবশ্য আমি আগে কোনো গান নিয়ে এমন করে ভাবিনি।

ওর বাঁশি থামলে ভেজান দরজাটা বাইরের থেকে একটু ফাঁক হল।

ইউসুফ সেদিকে তাকিয়ে বলল, চলে এসো। ও হাবুল, আমার বন্ধু, একসঙ্গে পড়ি কলেজে।

মেয়েটি ঢুকল। শ্যামলা রঙ, ভারী আকর্ষণীয় মুখশ্রী। থুতনীর কাছে একটা জড়ুল। আমার দিকে তাকিয়ে ও মিষ্টি করে হাসল।

ইউসুফ হঠাৎ বলে উঠল, সাবধান, শবনমের প্রেমে পড়ে যাস না যেন।

আমি কোথায় নিজেকে লুকবো ভেবে পেলাম না। গ্রামের ছেলে, এসেছি টাউনে পড়াশোনা করতে। প্রেমের হাওয়া প্রথম বসন্তের আগমনের মত ছোঁয়া দিয়ে গেলেও, পুষ্পিত বসন্তের প্রলাপ তখন শুরু হয়নি। কোনো এক অপরিচিতা যুবতীর সামনে এ ধরনের কথা ভাবাই যায় না।

আমি সঙ্কোচে, লজ্জায় নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। শুধু চোখের কোণে দেখলাম, যুবতীর মুখে তখনও হাসিটুকু লেগে আছে।

ইউসুফ কি একটা ইসারা করতেই মেয়েটি বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ফেটে পড়লাম, তোর কিরকম আক্কেল ইউসুফ, মেয়েটির সামনে আমাকে বে-ইজ্জত করলি!

ইউসুফ অবলীলায় জানলা দিয়ে তার আঙুলখানা বাড়িয়ে বললে, ঐ পাড়ার মেয়ে। ওদের কাছে আবার লজ্জা কি রে।

আমি এবার স্তম্ভিত হলাম। ইউসুফ পতিতা পল্লীর একটি যুবতীকে ঘরে ঢুকিয়েছে! মুখে অবশ্য কিছু বললাম না। মেয়েটির যে মুখশ্রী আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, মুহূর্তে সেই সস্মিত মুখখানা ম্লান হয়ে উঠল।

কিছু পরে আবার ঘরে এসে ঢুকল মেয়েটি। আমি ওর দিকে আর তাকাতে পারলাম না।

মেয়েটি সম্ভবত আমার মানসিক অবস্থা আঁচ করে নিয়েছিল, তাই ইউসুফকে লক্ষ্য করে বলল, তোমার জন্যে এই রইল কচুরি, আলুর দম। তোমার বন্ধুর জন্যে কাঁচ শশা আর কলা রেখে গেলাম। ফল অশুদ্ধ হবে না।

শবনম বেরিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে ভীষণ একটা কষ্ট এল মনে। এমন সুন্দর একটি মেয়ে কি করে পতিতার জীবনযাত্রাকে গ্রহণ করে নেয়।

পরে আর একদিন ইউসুফের সঙ্গে শবনমের বিষয়ে কথা হয়েছিল।

তুই শবনমকে কি করে জানলি? কাজের মেয়ে খুঁজতে গিয়ে ওকে পেয়ে গেলি বুঝি?

একদম না। ক'দিন জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম, এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাবার মত অবস্থা ছিল না। ও এ পথ দিয়ে বাজারে যাবার সময় আমার গোঙানি শুনে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েছিল। ওষুধ পথ্য এনে খাইয়েছে, সেবা করে গেছে সমানে।

ভাল হয়ে উঠলাম। ও ধীরে ধীরে সরে যাবার আয়োজন করল। আমি বললাম, সেটি হবে না শিশিরকণা। এখানে নিজের ইচ্ছেয় আসা গেলেও নিজের খুশিমত যাওয়া যায় না।

তোর সামনে যেমন মুখ টিপে হেসেছিল, তেমনি আমার সামনেও সেদিন

হেসে বলেছিল, তুমি কি আমাকে বেঁধে রেখে দেবে নাকি গো নবাবজাদা ?

বললাম, দরকার হলে বাঁধতে হবে বৈকি। তুমি ঐ পাড়ার মেয়ে হয়ে আমার মুখে জল আর পথ্য দিয়েছ। তোমাকে বাগে যখন পেয়েছি, সহজে ছেড়ে দেব ভেবেছ ?

বিশ্বাস কর ভাই, ওর মুখখানা কালো হয়ে গেল। ম্লান মুখে বলল, কাজটা যখন হয়ে গেছে তখন তো আর তা ফেরানো যাবে না, তুমি বরং একটা প্রায়শ্চিত্ত করে নিও। পতিতার স্পর্শের পাপটা চলে যাবে।

বললাম, তুমি আমার মস্ত ক্ষতি করেছ, আমিও তোমাকে ছাড়ব না। তোমারও একটা ক্ষতি আমি করে ছাড়ব।

ও চমকে আমার দিকে তাকাতেই আমি বললাম, না, না, ভয় পেও না, আমি তোমার নামটাই শুধু পালটে দেব। তোমার নাম শিশিরকণা, এবার থেকে আমি ডাকব শবনম বলে। শবনমের মানেও শিশির। আর ঐ নামটা ধরে আর কেউ নয়, শুধু আমিই ডাকব।

ওর মুখে আবার হাসি ফুটল, সেই টেপা হাসি। বলল, এ যে শাপে বর হল দেখছি। একটা নাম ছিল, পেয়ে গেলাম আর একটা।

বললাম, এবার থেকে তোমার কাজের ফাঁকে একটুখানি এসে আমার সংসারটা সামলে দিয়ে যেও।

বলল কি জানিস ? শুনুন মশাই, আমার সংসারটা অনেক বড়। বহু নর-নারায়ণের পদধূলি পড়ে। তাঁদের সেবাযত্ন করে যেটুকু সময় পাব, সেই ফাঁকটুকুতে তোমার কাজ সেরে দেবার চেষ্টা করব। ঘড়ি ধরে হবে না কিন্তু।

সেই থেকে ও আমার ঘরের প্রায় সব কাজটাই করে দিয়ে যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, রান্নাবান্না ?

তাও করে দেয় আজকাল। অবশ্য একবেলা। ওতেই আমি দুবেলার কাজ চালিয়ে নি।

বললাম, আজ উঠি ভাই।

আর একদিন আসিস।

নিশ্চয়ই আসব, আর সেদিন তোর বাঁশি শুনে যাব।

তাহলে এক কাজ করিস, রোববার দেখে আসবি। আমাকে মুখে মুখে ইতিহাসের ইম্পর্ট্যাণ্ট কোশ্চেনগুলোর উত্তর বলে দিবি। আমি তোকে সব শেষে বাঁশি শোনাব। শবনম তোর জন্যে ফল এনে দেবে।

বললাম, লজ্জা দিসনে ভাই, আমি শবনমের আনা কচুরি আলুরদমই তোর সঙ্গে বসে খাব।

ইউসুফ বলল, তোফা রাঁধে মেয়েটা। একদিন ওর হাতের রান্না খাইয়ে দেব তোকে।

দরজা ঠেলে বাইরে আসতে আসতে বললাম, ভেবে নেব, সে দিনটা আমাদের পিকনিক।

ও বলল, কথাটা শুনলে সব চেয়ে খুশী হবে শবনম।

এরপর মাঝে মাঝে ইউসুফের কাছে যেতাম। পড়াশোনা, খাওয়া-দাওয়া সবই চলত। মাঝে মাঝে শবনমের দেখা পাওয়া যেত। ঐ পতিতালয়ের একটা মেয়ে এমন আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে কি করে কথা বলে যায়, তাই ভেবে আমি অবাক হয়ে যেতাম। সত্যি, আমার অগোচরেই মেয়েটা তখন তার কথার যাদুতে আমাকে প্রায় মোহগ্রস্ত করে ফেলেছিল।

ইউসুফকে দেখে আমার মনেই হতো না হিন্দু মুসলমানের ভেতর এতবড় একটা রায়ট হয়ে গেছে। এখনও সে আগুন ধিক ধিক করে জ্বলছে এখানে ওখানে।

কিছু কাল আগে গান্ধীজী এসেছিলেন। দূর গ্রাম-গ্রামান্তে তাঁর আসার খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন দিক থেকে মানুষ আসছিল মিছিল করে। টাউনের পথঘাট, গলিঘুঁজি, শহরতলির রাস্তাঘাট মানুষে মানুষে ছয়লাপ।

শহরের মাঝখানে বিশাল ময়দান। সেখানে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল। জনসমুদ্র। মাঝখানে উঁচু বেদী। আমরা কলেজের ছাত্ররা ভলানটিয়ারের কাজ করছি। গোলমাল ঠেলাঠেলি সামলাচ্ছি।

হঠাৎ দেখা গেল খালি গায়ে একটি মানুষ দুটি মহিলার কাঁধে ভর রেখে নেমে আসছে উঁচু থেকে নিচে ময়দান লক্ষ্য করে।

গান্ধীজী কি জয় এই ধ্বনি তরঙ্গের মত আছড়ে পড়ল চতুর্দিকে।

ইউসুফ আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে ফিস ফিস করে বলল, দেখছিস, মানুষটির ডাইনে বাঁয়ে হুঁশ নেই। পথের দিকে চোখ রেখে কেমন হেঁটে আসছে দেখ। হাজার হাজার মানুষ যাঁকে দেখবার জন্যে পাগল, সে মানুষটির কোনোদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই।

গান্ধীজী মঞ্চে উঠে বসামাত্র বিশাল জনসমুদ্র একেবারে নিশ্চুপ।

ট্যাঁক থেকে ঘড়িটা হাতে তুলে একবার দেখলেন। তারপর অনুত্তেজিত গলায় বক্তৃতা শুরু করলেন। স্বাভাবিক ভাবে যেন কথা বলে যাচ্ছেন, অথচ মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে।

সহজ কথার এত শক্তি সেদিনই প্রথম অনুভব করলাম।

মেথরপাড়া ভেঙে এসেছিল গান্ধীজীর বক্তৃতা শুনতে। ফেরার পথে তারা গান্ধীজী কত বড় মানুষ সে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল।

বেলা পড়ে আসছিল। আমাকে ইউসুফ তার ডেরায় ধরে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি দরজা খোলা, তবে ভেতর থেকে ভেজিয়ে রাখা হয়েছে।

ইউসুফ বলল, শবনম মনে হয় কাজে এসেছে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা তো ও বড় একটা আসে না।

ভেজানো দরজা ঠেলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। শবনম জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের বস্তির দিকে চেয়েছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে ও হঠাৎ আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে ফিরে দাঁড়াল।

অবাক হয়ে দেখলাম, ওর চোখ দুটো লাল হয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক-খানি চোখের জল না ঝরালে এমন হাল হয় না চোখ মুখের।

ও তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল। ইউসুফ বলল, তুমি কি এখন রান্না করতে বসবে নাকি? তোমার কাজ নেই?

ও একটু থেমে দাঁড়াল। বলল, সকালে তো খাবে না বলে চলে গেলে, এ বেলাও উপোস দেবে নাকি?

উপোস দেব কেন, বাজার থেকে খাবার আনিয়ে খেলেই হবে।

এবার ইউসুফের কথার কোনো জবাব দিল না শবনাম। সে রান্নাঘরে গিয়েই ঢুকল।

আমরা খাটে বসে গল্প করতে লাগলাম। আজকের সভা, হাজার হাজার লোকের ঔৎসুক্য, গান্ধীজীর স্পষ্ট অথচ অনুত্তেজিত গলার ভাষণ, হরিজনদের উৎসাহ, উত্তেজনা—এ সবকিছু নিয়ে আমাদের আলোচনা চলতে লাগল।

আমি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিলাম, শবনাম রান্নার ফাঁকে ফাঁকে কান খাড়া করে আমাদের কথা শুনছে।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠেছিল। শবনমের নিশিবাসরের অতিথিরা ফিরে যাবে মনে করেই বোধকরি ইউসুফ বলে উঠল, আর দেরী কর না শবনম তোমার লোকসান হয়ে যাবে।

ভাত ফুটছিল। ও হাঁটুতে গাল ঠেকিয়ে বসে উনুনের দিকে চেয়েছিল। ইউসুফের কথায় ও সোজা হয়ে উঠে বসল। বাঁ হাতে শুকনো ডালগুলো উনুনে ঠেলে দিতেই আগুনের শিখা ঝলক দিয়ে উঠল। শবনমের মুখখানা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

ও আমাদের দিকে ফিরে বলল, ভাল আবার হল করে যে নতুন করে লোকসান বইতে হবে? সারা জীবনটাই তো আমাদের লোকসান।

আমি প্রসঙ্গ পালটে বললাম, আজ ময়দানে মস্তবড় সভা হয়েছিল, লোকজন যেতে দেখনি?

শবনম বলল, তিনদিন রথযাত্রা চলেছে, আজ নিজের চোখে ঠাকুর দেখলাম।

ইউসুফ বলল, সভায় গিয়েছিলে?

শবনম দেখেছি বাঁধুনি দিয়ে কথা বলে। সে বলল, পাপের শরীরে একটু পুণ্যির ছোঁয়া নিয়ে এলাম।

ইউসুফের আবার প্রশ্ন, তোমাদের পাড়ার সকলে গিয়েছিল?

তা জানি না, তবে আমি ঘোমটা মুড়ি দিয়ে আদালতের একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে তেনাকে যেতে দেখেছি।

কেমন দেখলে?

কি করে বলি বল? নরকের কীটের চোখে ঠাকুর দেবতাকে কি দেখা যায়। খুব লোভ হচ্ছিল, পায়ের ধুলো মাথায় নি। তা দূর থেকে হাত জোড় করে মাথায় ঠেকালাম।

ইউসুফ হঠাৎ বলে উঠল, আজ থেকে তাহলে তোমার ব্যবসায়ে ইতি টানলে, কি বল?

বোধহয় কথাটার নিষ্ঠুর ধার শবনমকে আঘাত করল। সে হঠাৎ করে কোনো জবাব দিতে পারল না। একসময় নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, পেটের কান্না কি করে থামাই আমীর। দেহ নষ্টের ব্যবসা চালাতে হয় দেহটাকেই রাখবার জন্য।

ও রান্না সেরে চলে গেল। মুখে একটুকরো ম্লান হাসি, চোখে জল।

ও চলে গেলে আমি ইউসুফকে বললাম, তোকে বুঝি শবনম আমীর বলে ডাকে?

ও মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, শবনম কিন্তু অতি সাধারণ বাড়ির মেয়ে বলে মনে হয় না। ওর কথাবার্তা ভাবভঙ্গী একটু অন্যরকম।

ইউসুফ বলল, লক্ষ্য করেছিস, আমরা যখন ঘরে ঢুকি তখন ও কাঁদছিল।

দেখেছি, কিন্তু কেন?

ইউসুফ বলল, ও সভা থেকে আগেভাগে ফিরে এসেছে। নিজের বস্তিতে ঢুকতে মন চায়নি, তাই এখানে পালিয়ে এসেছে।

কিন্তু কাঁদছিল কেন?

ও ওদের বস্তির দিকে চেয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিল, আর কাঁদছিল। হয়ত ভাবছিল, ও আর কোনোদিন ঐ অন্ধকার গুহাটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

জানিস, আমার মনে হয় শবনম মনে মনে তার এই কাজের জন্য ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে।

খুব ঠিক, কিন্তু কি করারই বা আছে বল?

এরপর একটু কি ভেবে নিয়ে বলল, এমনিতে দম বন্ধ আবহাওয়ায় থাকে, আজ হঠাৎ বিশুদ্ধ একটা হাওয়া মনে লাগতেই চোখের জল ঝরে পড়েছে?

একদিন ইউসুফ আমাকে না খাইয়ে ছাড়ল না। খাওয়ার শেষে একটা উপরি পাওনা মিলল। ও বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে সারা পথ বাঁশি বাজাতে বাজাতে আমাকে আস্তানায় পেঁছে দিয়ে এল।

বাঁশিতে সেদিন বাজছিল সদ্য সভায় গাওয়া একটি গানের সুর:

'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম
সবকো সুমতি দে ভগবান···।'

সন্ধ্যায় ইউসুফের ডেরা থেকে বেরিয়ে বাজারের রাস্তা ধরে ফিরছিলাম। পথে দেখা হয়ে গেল কলেজের বন্ধু বিভূতি আর সমরের সঙ্গে। ওরা একসঙ্গে বলে উঠল, কোথায় ছিলি, তোকে কতক্ষণ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমি বললাম, কি ব্যাপার?

বিভূতি বলল, কালই গান্ধীজী স্বেচ্ছাসেবীদের পরিদর্শনে আসবেন। আমরা তাঁকে গার্ড অব অনার দেব।

বললাম, সবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিস?

সন্তোষ বলল, সবাইকে দরকার নেই। আমরা যে কজন নেতাজী

বাহিনীতে প্যারেড শিখেছিলাম কেবল তারাই থাকব। ইতিমধ্যে পঁচিশ জনকে বলা হয়ে গেছে। মোট জমা তিরিশ হলেই চলবে।

আমরা তিনজনে ঘুরে ঘুরে তিরিশ জনকে যোগাড় করে ফেললাম।

পরের দিন সকাল সাতটায় হাজির হলাম নির্দিষ্ট জায়গায়। সমর আমাদের লিডার। সে গান্ধীজীর উপস্থিতিতে সমস্ত প্যারেডটা পরিচালনা করল।

গান্ধীজীর মুখ দেখে মনে হল, তিনি খুশী হয়েছেন।

আমি সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার শরীরটা তখন বেশ রোগাই ছিল। এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এমন শরীর নিয়ে কাজ করবে কি করে? শরীরে জোর চাই।

কথাটা গান্ধীজীর কানে গিয়েছিল, তিনি বললেন, শরীর ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে, মনের জোরটাই আসল। তবেই নিতে পারবে ইস্পাতের মত কঠিন সংকল্প।

গান্ধীজীর শেষের কথাটি সারাজীবন সংকল্পবাণী হয়ে গাঁথা রইল আমার মনের মধ্যে।

গান্ধীজী সেদিন স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে আরও কিছু কথা বলে চলে গেলেন।

কাঁথিতে গান্ধীজীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সহোদর বিপিন শাসমল মহাশয়ের বাড়িতে। আমরা কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী তাঁর কাছাকাছি যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমি লক্ষ্য করতাম, সমস্ত উদ্যোগের ভেতর গান্ধীজীর সহজ, নিরুদ্বিগ্ন একটা মন কাজ করে যেত।

সকালের দিকে বাড়ির লনে একখানা খাটিয়ার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে তিনি সান-বাথ নিতেন। সে সময় পাতলা কাদা নিয়ে প্রাকৃতিক চিকিৎসাও চলত। কপালে আর পেটে কাদার প্রলেপ। তার ওপর ফেলা থাকত দু'টুকরো সাদা পরিষ্কার ন্যাকড়া।

সেই অবস্থায় তাঁকে ঘিরে ডিস্ট্রিক্ট কনফারেন্স চলত। কখনো বা মহিলা সমিতির বৈঠক। সাংবাদিকরা লনে বসে প্রতিটি প্রশ্নোত্তর নোট করে যেতেন।

আশ্চর্য! গান্ধীজী একেবারে নিরুদ্বিগ্ন। উত্তর দিচ্ছেন তেমনি চিৎ হয়ে শুয়ে ভারী সহজ গলায়।

শুনেছি, সব কিছুতে তাঁর লেবু খাবার বাতিক ছিল। শাকপাতা সেদ্ধতেও তিনি লেবু নিংড়ে খেতেন।

সে সময় তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রিয় ছাগলটিও গিয়েছিল। সেই সৌভাগ্যবতী ছাগীর মুখদর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়নি।

গান্ধীজীর কোমর থেকে একটি ঘড়ি ঝুলত। উনি যখন চলতেন, তখন সেটি বিশেষভাবে চোখে পড়ত। শুনেছি কাঁথি থেকে যাবার পরে তাঁর সেই বিখ্যাত ঘড়িটি চুরি যায়। সেই অনুজ্জ্বল ঘড়িটি কোন চোরকে প্রলুব্ধ

করতে পারে, এ আমার মনে হয়নি। সম্ভবত কোন মহৎ চোরেরই এই কীর্তি। তিনি তাঁর মূল্যবান দর্শনীয় সামগ্রীর ভেতর সেটি রেখে দেবার জন্যেই এ কাজ করেছিলেন।

কাঁথি ছেড়ে চলে যাবার আগের সন্ধ্যায় কলেজের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা হয়।

আমরা কয়েকজন নির্বাচিত হলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। বিপিন-বাবুর বাড়ির সংলগ্ন একটি পরিচ্ছন্ন কুটীরে গান্ধীজী বসেছিলেন। সামনে প্রশস্ত একটি জলচৌকি। সেই জলচৌকির দু'প্রান্তে দু'জন খাতা কলম নিয়ে বসেছিলেন। শুনলাম, তাঁদের একজন সুশীলা নায়ার, অন্যজন প্যারীলাল।

আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একদিকে বসেছিলেন।

গান্ধীজীকে নত নমস্কারে অভিবাদন জানাতেই তিনি আমাদের দিকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

আমরা বসতেই তিনি বললেন, এখন বল, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আমি হিন্দি কি ইংরাজীতে দেব।

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, ইংরাজীতে।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র স্থির হয়ে বসে রইলেন গান্ধীজী। পরক্ষণে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হিন্দি আমাদের দেশের ভাষা, অধিকাংশ জনতার ভাষা, সেটা তোমরা বুঝতে পারবে না, শিখে নিতে চেষ্টা করবে না, এটা লজ্জার বিষয়।

হঠাৎ আমার মাথায় কতকগুলো কথা গজগজ করে উঠল। আমি পরিবেশ, পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই নির্বোধের মত বলে ফেললাম, আমাদের যে সব হিন্দি শেখার কথা আপনি বললেন, তেমনি ভারতের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ভাষা হিসেবে বাংলাটাও হিন্দিভাষীদের শেখা দরকার। সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি বলুন?

আমার সামনে যে সব মাননীয় ব্যক্তিরা গান্ধীজীর পাশাপাশি বসেছিলেন, তাঁদের চোখ থেকে তখন ভর্ৎসনার আগুন ঝরছে। জ্ঞানে অজ্ঞানে যাই হোক আমি তো তীরটি ছুঁড়ে বসে আছি, এখন আর তাকে ফেরাব কি করে।

গান্ধীজীর দিকে তাকিয়ে দেখি মুখে কোনরকম ভাবান্তর নেই। তিনি জলচৌকির ড্রয়ার খুলে কি যেন খুঁজতে লাগলেন।

একটু পরেই বের করে আনলেন একখানা খাতা। সেই খাতার সাদা দিকটা আমাদের দিকে উল্টে ধরে রইলেন।

আমরা দেখলাম, খাতার পাতায় নতুন শিক্ষার্থীর হাতে লেখা বাংলা শব্দ —অজ, আম, ইঁট।

খাতা নামাতেই দেখি গান্ধীজীর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আমি মাথা নত করে বললাম, আপনি অনুগ্রহ করে হিন্দিতে বলুন, আমরা নিশ্চয়ই বুঝে নিতে পারব।

ইউসুফ ছাড়া আর দুটি বন্ধু আমার মনের ওপর দারুণ প্রভাব

ফেলেছিল। হৃদয় আর তিমির। হৃদয় জাত-কবি। কলকাতা থেকে আমার চলে আসার ঠিক পরেই সে ওখানকার পাট গ‌ুটিয়ে চলে এসেছে। অফ পিরিয়ডে কলেজের সামনে আমবাগানে ঘোরে। জোছনা রাতে আমাকে টেনে নিয়ে যায় হোস্টেলের পেছনের বালিয়াড়িতে। বনঝাউয়ের ভেতর দিয়ে পায়ের গোছ বালিতে ডুবিয়ে আমরা গভীর একটা খাদের পাশে এসে দাঁড়াই। তারপর বসে পড়ে সর্‌সর্‌ করে নিচে নেমে যেতে থাকি। চমৎকার একটা শিহরন খেলে যায় শরীরের ভেতর দিয়ে।

নিচে বসে দেখি বালি থেকে চুইয়ে ওঠা খানিকটা জল চক চক করছে সামনে। র‌ুপসী চাঁদ যেন তার নিভৃত সাজঘরের আয়নায় নিজেকে স্থির চোখে দেখছে।

হৃদয়, হাতের আঙ‌ুলে জলের ওপর আলপনা আঁকে। অমনি চাঁদের বীণায় র‌ুপোলী তারের ঝংকার ওঠে।

ক'দিন আগে হৃদয় আমাকে একটা কবিতা শ‌ুনিয়েছে। গদ্য ছন্দে লেখা কবিতা। সেখানেও জলের ব‌ুকে আঙ‌ুল দিয়ে গড়া আলপনার কথা। সে জল কিন্তু মর‌ুদ্যানের জলের মত স্থির নয়। বয়ে চলা র‌ুপনারায়ণের জল।

হৃদয় যখন প্রতিদিনের কাজের ভেতর থাকে তখন সে ভারী হ‌ুঁশিয়ার আর সচেতন। কিন্তু হঠাৎ সম‌ুদ্র থেকে হ‌ুহ‌ু করে ভেসে আসা একটা হাওয়া, চাঁদের পেয়ালা থেকে উপচে পড়া র‌ুপোলী জ্যোৎস্না, পথের ওপর ককিয়ে কেঁদে ওঠা একটা শিশ‌ু তাকে কেমন যেন বিপন্ন আর উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। তার সে সময়ের মনের যন্ত্রণা কবিতার ভাষায় ম‌ুক্তি পেতে চায়।

হৃদয় আর কাউকে কবিতা শোনাতে চায় না, শ‌ুধ‌ু আমি তার একান্ত নির্জনের নির্বাচিত শ্রোতা।

তিমির, জন্ম-যাযাবর। তার হৃদয়ের কবিতা, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।'

অবস্থাপন্ন বাবার বংশে আলো জ্বালাবার একমাত্র সলতে সে।

তিমির ইতিমধ্যেই তিনটে কলেজ ঘ‌ুরে এসেছে। বিষ্ণ‌ুপ‌ুর, মেদিনীপ‌ুর আর কলকাতার বিদ্যাসাগর। সব জায়গাতেই মেয়াদ দ‌ু'তিন মাস। ইণ্টার-মিডিয়েট থেকে বি. এ. ফার্স্ট ইয়ারের ভেতর তিন কলেজের ছাপ পড়েছে তার বিদ্যাস্থানে। সবচেয়ে যেটা আকর্ষণের সেটা হল, তিমিরের অনর্গল কথা বলে যাবার অসাধারণ ক্ষমতা। আবার কথাগ‌ুলোর ভেতর টেনে রাখবার ম‌ুখরোচক মশলা প‌ুরে দেয় সে।

অভিনয় আর গানে জ‌ুড়ি নেই তার। লম্বা চোখা চেহারার তর‌ুণ। ইউস‌ুফ ছাড়া ওর সঙ্গে র‌ুপের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার মত দ্বিতীয় কেউ ছিল না। কিন্তু হলে কি হবে, নাটকের বই ঢ‌ুঁড়ে ঢ‌ুঁড়ে ও ব‌ুড়োর পার্টটি ঠিক খ‌ুঁজে নেবে। গলা ভেঙে কাঁপিয়ে, মাথা নেড়ে, কোমর বেঁকিয়ে, কাৎ হয়ে সহ-অভিনেতার দিকে তাকিয়ে সে কি অভিনয়! নায়কের পার্ট নৈব নৈব চ। কলেজের মেয়েরা ওকে পাকড়াও করল, এবার দত্তায় নরেন হতে হবে।

ও মজা করে বলল, বিজয়াকে দেখি আগে।

সংকোচে সরে দাঁড়াল কয়েকজন।

ইণ্টারমিডিয়েটের ফাইনাল দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিল কাবেরী। দেখতে ভাল, চটপটে। বলল, এই যে তিমিরদা, তোমার সামনেই বিজয়া।

তিমির অমনি গেয়ে উঠল, 'কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা ?' শোন কাবেরী, আমার ছেলের সঙ্গেই হবে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ।

সবাই হৈ হৈ করে উঠল, সে কি রকম ?

বুঝলে না! নাটকে আমি হব রাসবিহারী। কাবেরী যদি হয় বিজয়া তাহলে আমার ছেলে বিলাসের বাগ্‌দত্তা হতে হবে ওকে।

আমাদের ক্লাসের সন্ধ্যা বলল, তুমি কি কোনো কালেই নায়ক হবে না তিমির ? প্রতিজ্ঞা ?

আবার গান গেয়ে উঠল তিমির—

'আমি তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ,
সুরেরই বাঁধনে।'

সন্ধ্যা বলল, সবেতেই তোমার ইয়ার্কি। খালি এড়িয়ে যাবার ফন্দী।

আর যাকে এড়াই না কেন, তোমাকে তো এড়াতে পারব না সখি। তোমার সঙ্গেই তো আমি মিশে রয়েছি। সন্ধ্যার অঙ্গেই তো তিমিরের ছোঁয়া।

তিমিরের শেষ কথাটাতে সন্ধ্যা খুব লজ্জা পেয়ে গেল।

শুক্তি বলল, তোর মুখে যদি কোন আগল থাকে।

শুক্তি বয়েসে আমাদের চেয়ে খানিক বড়। সবাইকে তুই তুকারি করে ও।

তিমির অমনি বুড়োর গলায় বলল, ঠানদি, তুমি যদি নায়িকা হও তাহলে আমি নায়ক হতে রাজি আছি।

শুক্তি বলল, দায় পড়েছে তোর নায়িকা হতে, আমার বুড়ো গোকুলে বাড়ছে।

আমরা সবাই একচোট হেসে নিলাম।

দীপন বলল, শুক্তি সত্যি বল, এবার নিয়ে কবার ছেলে দেখতে বসলি ?

শুক্তি বলল, আমি কি দেখব রে, বিয়ের ব্যাপারে দেখাটা তো তোদের একচেটিয়া।

লাইব্রেরীর দিক থেকে পূর্ণিমার উদয় হল। পূর্ণিমা শুক্তির শেষ উক্তিটা শুনেছিল। সে বলল, এ বিষয়ে আমি শুক্তির সঙ্গে একমত। ছেলেরাই মেয়ে দেখতে আসে। তবে শুক্তির বেলা ব্যাপারটা একটু আলাদা।

নিশানাথ বলল, কি রকম ?

পূর্ণিমার মন্তব্য, শুক্তিও ছেলে দেখে।

তুই থাম।—শুক্তির সরোষ প্রত্যুত্তর।

বিশ্বাস কর তোদের মিথ্যে বলছি না, ওর নিজের মুখেই শোন না। অ্যাই শুক্তি, বল না, লজ্জা কি।

শুক্তি একমুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, আমায় আবার লজ্জা পেতে কবে

দেখলি। হাঁ, তবে ছেলের বাড়ি থেকে যখন দেখতে আসে তখন আমি লজ্জাবতী হয়ে যাই।

পূর্ণিমা বলল, তুই পুরো কনে দেখার ব্যাপারটা একবার ডেমনস্ট্রেশান দিয়ে দেখা না শুক্তি।

এসব ব্যাপারে শুক্তির কোন সংকোচ নেই। সে মুখখানাতে লজ্জা লজ্জা ভাব ফুটিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে এসে কনে দেখার আসরে থমকে দাঁড়াল। দুটো হাত জোড় করে মাথা নামিয়ে নমস্কার করল সবার উদ্দেশ্যে। তারপর বালির জমিনে বসে পড়ে বলল, কি রে তিমির, তুই বরের বাপ সাজবি তো?

তিমির বলল, ঠিক আছে। মা, তোমার নামটি কি?

কুমারী শুক্তি সরকার।

বরের বাপ তিমির বলল, তা বেশ, তা বেশ, নামটি খাসা।

দীপন বলল, কুমারী আবার কেন?

শুক্তি অমনি বলল, তুই জানিস না, ন্যাড়া নামটা বরের বাপের কানে খট করে লাগতে পারে। তাই একটা মুকুট পরিয়ে দিলাম।

তিমির বলল, তা, নামের মানেটা বলতে পারবে নিশ্চয়ই?

ঝিনুক। যেটাকে চিরে আপনারা মুক্তো সংগ্রহ করেন।

রূপা বলল, শেষের বাক্যটাও তুই বলিস নাকি রে?

বলি, তবে ওদের শুনিয়ে নয়, মনে মনে। আমি দুটোই বলব, তার ভেতর কোনটা প্রকাশ্যে আর কোনটা স্বগত সেটা তোরাই বুঝে নিবি।

তিমির বলল, এত বাগড়া দিস কেন বল তো? বরের বাপকে সোজাসুজি কটা প্রশ্ন করতে দিবি তো?

আমি বললাম, একদম কথা না, খালি বরের বাপ আর সুশ্রী, মধ্যমবর্ণা, গৃহকর্মনিপুণা পাত্রী মুখোমুখি।

রূপা বলল, বরও কোন প্রশ্ন করতে পারবে না?

না, পিতা, খুল্লতাত, মাতুল বর্তমানে তার ভূমিকা মূক বধিরের।

তিমির প্রশ্ন শুরু করল, তা কদ্দূর লেখাপড়া করেছ মা?

মিনমিনে গলায় শুক্তি বলল, ম্যাট্রিক পাশ।

দীপন, মেয়ের বাপের ভূমিকায় নেমে পড়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, পাশ করে সবে কলেজে ঢুকেছে।

তিমির বলল, তা বেশ, তা বেশ, তবে আমার বাড়িতে গেলে তো পড়াটি ছাড়তে হবে মা। উনি আবার বাড়ির বউদের পড়াশোনা পছন্দ করেন না।

শুক্তি আরও ঘাড় গুঁজে নিচের দিকে চেয়ে রইল। মুখে বলল, পেটে বিদ্যে থাকলে তো বিদ্যের কদর বুঝবেন।

বরের বাপের এবারের প্রশ্ন, রান্নাবান্নায় মা লক্ষ্মীর আগ্রহ-টাগ্রহ কি রকম?

মেয়ের বাপের ভূমিকায় দীপন বলল, আজই পরীক্ষা হয়ে যাবে ঘোষমশাই। মেয়ের হাতের রান্না খেয়ে যাবেন। আজ সব রান্নাটাই ও নিজে করেছে।

শুক্তি স্বগত বলল, মিছে কথা। দুঘটি জল মায়ের হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া, পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে দেওয়া যদি রান্না হয় তাহলে ওটুকু আমি অবশ্যই করেছি।

তিমির বলল, আপনার মেয়ে দেখছি, বহু গুণে গুণী।

দীপন বলল, নিজের মুখে কি বলব, ঘরের বউ হয়ে গেলে বুঝবেন।

শুক্তি স্বগত বলল, বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল।

দীপন আবার বলল, রঙটা সামান্য একটু চাপা, এই যা। নইলে মা আমার যে বাড়িতে যাবে লক্ষ্মী বারো মাস বাঁধা থাকবেন সেখানে।

শুক্তির স্বগতোক্তি, শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না বাবা। কালো মেয়ের যখন জন্ম দিয়েছ তখন ট্যাঁকের সব ক'টা কড়িই খসাতে হবে। দরকার হলে ঘটিবাটি, বাড়ি জমিও বেচতে হবে। ঐ যে বসে আছেন ভেজা বেড়ালটি, বাপের সুপুত্তুর, কড়ি গুণে নেবার ব্যাপারে ওঁর জুড়ি নেই। পণ নেবার সময় সবাই পিতৃভক্ত।

দীপন আকাশের দিকে দুহাত তুলে সখেদে বলল, ভগবান, এই কি তোমার বিচার? পূর্ণিমার গায়ে দুধ ঢাললে আর সন্ধ্যার গায়ে মাখিয়ে দিলে ভুষো কালি।

সন্ধ্যা ফোঁস করে উঠল, মোটেও না। হাঁরে পূর্ণিমা, আমার কি ভুষো কালির মত রঙ?

তুই ছাড় ত দীপনের কথা।

দীপন অমনি বলল, দিলি তো মাটি করে। বিশ্বের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ভূমিকায় ঈশ্বরের কাছে আর্জি জানাচ্ছি আমি আর তুই কিনা কালো রঙের সামান্য হেরফের নিয়ে কান্না জুড়ে দিলি।

শুক্তি বালি ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল।

আর সিটিং দিতে পারি না বাপু।

লজিকের স্যার ক্লাশ ছেড়ে যেতে যেতে বললেন, কিসের মিটিং হচ্ছে তোমাদের?

তিমির বলল, অ্যানুয়াল সোসালের নাটক নিয়ে স্যার।

খুব ভেবে চিন্তে নাটক নির্বাচন করবে।

তিমির বলল, তাই করছি স্যার।

প্রফেসার পি. কে. সি. চলে যেতেই শুক্তি বলল, হাবুল, তুই একটা নাটক লেখ, আমরা সবাই মিলে অভিনয় করব। নাম দিবি পাত্রীদায়। পিতৃদায়, মাতৃদায়ের মত। শেষে তোর ঐ বিশবার পাত্র পক্ষের সামনে পরীক্ষা দিয়ে ফেল করা মেয়েটাকে গলায় দড়ি দিয়ে লটকে দিবি। এরপর সমাজের উৎসাহী যুবকরা তার লাশটা বয়ে নিয়ে যাবে। তারপর চাঁদা তুলে ঘটা করে তার শ্রাদ্ধ করবে সমাজের মুরুব্বিরা।

দীপন বলল, মেয়েটার শ্রাদ্ধ বাসরে ওরা গলা ছেড়ে বলবে, এমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে কশ্চিনকালেও ওদের চোখে পড়েনি। সোনা, একদম কষ্টি পাথরে

ভারত স্বাধীন হল। সারা রাত বন্ধুরা সকলে মিলে পাখির মত ডানা মেলে ঘুরে বেড়ালাম। আমরা নিশ্বাস নিচ্ছি স্বাধীন দেশে, এ যে বিশ্বাস করতে পারছি না। আনন্দে চোখ ফেটে জল আসছে। এক একবার চীৎকার করে উঠছি, বন্দেমাতরম, ভারত মাতাকি—জয়। আশে পাশে সর্বত্র, যে যেখানে আছে, তাদের গলায় বেজে উঠছে সেই ধ্বনি।

হৃদয় বলল, চল, আমরা জুনপুটে সমুদ্রের জল ছুঁয়ে আসি।

লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে কত মানুষ ছুটে গেছে সমুদ্রের দিকে। লবণাম্বুরাশি আমার। এর থেকে আমি তৈরী করব আমার শ্রেষ্ঠ আস্বাদনের উপাদান।

কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে তাদের। সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠেছে। তারপর এসেছে বিয়াল্লিশের সেই অগ্নিঝরা দিন। বন্দুকের নলের মুখে আগুন, মানুষের বুকে তাজা রক্তের আলপনা।

আমরা গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে এলাম সমুদ্রের ধারে। শুক্তি, সন্ধ্যা, পূর্ণিমা, হৃদয়, তিমির আর আমি। এই ছজন চলে এসেছি দল ছেড়ে। আজ মেয়ে বলে বাড়ি ফেরার তাগিদ নেই। ঐ তিনটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে হাতে হাত বেঁধে এসেছি। নিবিড় বাঁধনে বাঁধা পড়েছি আমরা। স্বাধীন দেশের উত্তাপ অনুভব করছি পরস্পরের হাতে হাত রেখে।

তিমির গেয়ে উঠল—

'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে
কি সঙ্গীত ভেসে আসে।'

তিমিরের ঐ একছত্র গাওয়ার পরেই আমরা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শুক্তি প্রথম এগিয়ে গিয়ে জল ছুঁয়ে বলল, আয়, আজ এই মহাসাগরের জলে ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনীদের তর্পণ করি।

আমরা এগিয়ে গিয়ে জল ছুঁয়ে মনে মনে শহীদদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলাম।

বেশ কিছু সময় ওখানে কাটিয়ে আমরা উঠে এসে বসলাম একটা বালিয়াড়ির ওপর।

এবার গান ধরল সন্ধ্যা। বলতে হল না গাইবার জন্য। প্রাণের আনন্দস্রোতে ভেসে এল সুরের তরণী।

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালবেসে॥
জানিনে তোর ধনরতন আছে কিনা রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥'

এরপর আমরা সকলে মিলে গাইলাম ডি. এল. রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পে

ভরা' গানটি।

এক একটি করে অনেকগুলি গান গাওয়া হল। শেষে গাইলাম উঠে দাঁড়িয়ে—

'আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে দেখা দিলে জননী।'

গান গাওয়া শেষ হলে পূর্ণিমা বলল, ঐ দেখ, ভোর হয়ে আসছে।

চারদিকে ছড়ানো মেঘের ফাঁকে ভোরের আয়োজন চলেছে। আমরা বুক ভরে টেনে নিচ্ছি স্বাধীন দেশের বাতাস। মনে হচ্ছে এ বাতাস আমাদের একেবারে অচেনা, এর স্বাদ, অনুভূতিই আলাদা।

নীলাভ আলো ধীরে ধীরে সাদা হয়ে এল। তার সঙ্গে লাগল লালের ছোঁয়া। মেঘের গায়ে গায়ে ছড়িয়ে পড়ল সে আলো। এবার সমুদ্র তোলপাড় করে মাথা তুলল সূর্য। স্বাধীনতার প্রথম সূর্যোদয়।

সন্ধ্যা বলল, সবাই মিলে এসো আমরা নতুন দিনের সূর্যকে বন্দনা করি।

'জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়।
পূর্বদিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ময় ॥
এসো অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি—
অপহৃত শঙ্কা, অপগত সংশয় ॥
এসো নবজাগ্রত প্রাণ, চির যৌবন জয়গান।
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা জড়ত্বনাশা—
ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয় ॥'

এই গান গাইতে গাইতে আমরা এবার শহরের দিকে ফিরে চললাম।

টাউনে পৌঁছে দেখি, মিছিলের পর মিছিল চলেছে। আনন্দের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। নতুন দিনের আলোয় ঝলমল করছে সকলের মুখ।

আমরা হৈ হৈ করতে করতে মিশে গেলাম একটা মিছিলে।

সন্ধ্যার সময় দেখা হল ইউসুফের সঙ্গে। সে তার ঘরের দরজা ভেজিয়ে বাঁশিতে সুর তুলেছিল।

'তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কালবোশেখীর ঝড় ॥'

আমি দরজা ঠেলে ঢুকতেই থেমে গেল ওর বাঁশিতে তোলা কালবোশেখীর ঝড়।

জানালার ধারে বসেছিল শবনম। সম্ভবত সে-ই ছিল ইউসুফের গানের একমাত্র শ্রোতা। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। কোথাও গেল না। জানালার একটা গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

ইউসুফ বাঁশিটা পাশে রেখে দিয়ে বলল, বস, ছিলি কোথায় এ দুদিন?

বললাম, শুধু টো টো।

শুধু ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিলি ?

গতরাতে তিমির, শুক্তি মিলে আমরা জনাছয়েক গিয়েছিলাম সমুদ্রের ধারে। সারারাত কাটিয়ে ভোরবেলা ফিরেছি।

ইউসুফ বলল, দারুণ খবর। তোর দেখছি বেশ উন্নতি হয়েছে।

কেন, মেয়েরা সঙ্গে ছিল বলে তোর আপত্তি ?

এই দ্যাখ, কি কথায় কি এসে পড়ল। আরে মেয়েদের ব্যাপারে কবে আবার আমি মুখ ফিরিয়ে থেকেছি। তুই তো বড় একটা ঘেঁষিস না, তাই বলছিলাম।

বললাম, কালকের রাতটা ছিল অন্য রাত। কাল মাঝরাত থেকে কারু ঘরে কোনো আগল ছিল না।

বুঝলাম, কি খাবি বল ? শবনম রয়েছে এখনও।

ক্ষিদে পেয়েছে, তুই যা আনবি খাব।

শবনম এতক্ষণে কথা বলল, আমি বাজার থেকে মুড়ি কিনে আনছি। ফিরে এসে পেঁয়াজি আর বেগুনি ভেজে দেব।

শবনম বেরিয়ে যাচ্ছিল। ইউসুফ বলল, তোমার আবার দেরী হয়ে যাবে না ?

ও থমকে দাঁড়াল, তারপর কোনো কথা না বলে নিচে বাজারের দিকে নেমে চলে গেল।

ও চলে যেতেই আমি ইউসুফকে বললাম, বার বার তুই কিন্তু শবনমকে অপমান করছিস।

ও অবাক হয়ে বলল, কি রকম ?

এই যে সন্ধ্যের সময় ওর দেরী হয়ে যাচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করা। বিশেষ করে আমার সামনে তোর এভাবে বলা উচিত হয়নি।

আরে শোন না, আজকাল সন্ধ্যের দিকে ও প্রায়ই এখানে পালিয়ে আসে। আমি জোর করে ওর কুঠিতে পাঠিয়ে দি।

পালিয়ে আসে কেন ?

ও কেঁদে বলে, আমি ও কাজ আর করব না। এখন আমার কি করার আছে বল ? ও যদি ওখান থেকে পালায় তাহলে না খেয়ে মরতে হবে। তাই আমি ওকে ঠেলেঠুলে পাঠাই।

বললাম, শবনমের দুঃখ তুই বুঝতে পারিস, কিন্তু তার সমাধানের চাবি-কাঠি তোর হাতে নেই।

ইউসুফ বলল, তোর আসার আগে ও অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিল আমাকে।

আমি ইউসুফের দিকে চেয়ে রইলাম।

শবনম জানতে চায়, দেশের মুক্তি ঘটলে ওদেরও মুক্তি ঘটবে কিনা ?

কি উত্তর দিলি তুই ?

ইউসুফ কিছুটা ক্ষোভের গলায় বলল, উত্তর কি আমার কাছে আছে, না আমি জবাব দেবার মালিক। দেশ যারা চালাবে তারাই উত্তর দেবে।

বললাম, ঠিক কথা, তবু কিছু একটা উত্তর তো তুই দিয়েছিস ?

ইউসুফ বলল, দিয়েছি একটা, তবে সেটা শবনমকে শান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

একটু থেমে আবার ইউসুফ বলল, আমি ওকে বলেছি, নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখলে একদিন না একদিন তুমি মুক্তি পাবেই।

ও কিছু উত্তর দিয়েছিল?

হ্যাঁ, ও বলেছিল, আমি একটা অসহায় পতিতা মেয়ে, আমি এত শক্তি পাব কোথায়? তবু তুমি যখন বলছ, তখন নিজের শক্তির ওপর ভরসা রেখে অপেক্ষা করে যাব।

বললাম, শবনমকে যত দেখছি, অবাক হচ্ছি। ওকে কিছুতেই একজন পতিতা বলে মেনে নিতে পারছি না।

ইউসুফ বলল, আজ তুই এখানে থাক, শবনমের জীবনের যেটুকু কথা জানতে পেরেছি তা তোকে জানাব।

বললাম, শুনে কি করব বল, যেখানে প্রতিকার করার ক্ষমতা নেই সেখানে শুধুই দুঃখ পেতে হবে।

ও বলল, তবু তোর শুনে রাখা ভাল। তুই আর আমি ছাড়া ওকে বিশ্ব-সুদ্ধ লোকে পতিতা বলেই জানে। আমি একদিন কৌতূহলী হয়ে ওকে অনেকগুলো কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও কোনো সঙ্কোচ বা গোপন না করে সব কথাই আমাকে বলেছিল।

আমি মনে মনে সত্যিই কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ইউসুফকে বললাম, বাসায় একটু কাজ আছে। এখুনি সেটুকু সেরে নিতে হবে। সাড়ে ন'টা নাগাদ আমি এসে যাব।

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছি ইউসুফ আমাকে বাধা দিলে, বাঃ, বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিস! ভেবেছিস তোর খাবারটাও আমি গিলব!

আবার বসে পড়লাম।

সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে।

আমাদের কথার ভেতর শবনম এসে গেল। কলতলায় পা ধুয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। গুছিয়ে নিতে খানিক সময় গেল, তারপর গরম তেলে বেগুনি পড়তেই কলকলিয়ে উঠল।

কিছুক্ষণের ভেতরেই এক থালা তেলেভাজা আর দু'বাটি মুড়ি এসে গেল।

খেতে খেতে বললাম, বাজারের তেলেভাজার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ।

শবনম বলল, এতে তো নতুন কিছু নেই। সেই একই বসন গোলায় ডুবিয়ে ভাজা।

বললাম, এখানে বেসনে কেউ পোস্ত মিশিয়ে ভাজে না।

শবনম মুখ টিপে হাসল। বলল, আমীর, তোমার বন্ধুর দেখছি সবদিকে নজর আছে।

বললাম, বীরভূম, বাঁকুড়াতে পোস্তের চল খুব বেশী। বর্ধমানেও।

হঠাৎ দেখলাম, শবনমের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে।

কারণটা বুঝতে না পেরে আমি ইউসুফের দিকে তাকালাম। ইউসুফের মুখে কোনোরকম ভাবান্তর দেখতে পেলাম না। ও মুখে মুড়ি পুরে চিবুচ্ছে। হাতে আধখানা বেগুনি।

আমি খাওয়া শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালাম। ইউসুফকে বললাম, এখন আসছি।

ইউসুফ মাথা নাড়ল।

আমি শবনমের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার হাতের রান্নায় সত্যিই তার আছে। যা কিছু তৈরী কর সবেতেই স্বাদ লেগে থাকে।

ও এখন স্বাভাবিক হয়েছে। আবার সেই মুখ টেপা হাসি হাসল। আমি বেরিয়ে এলাম।

শুক্তি রাত ন'টাতে আমাদের ক'জনকে পরোটা, মাংস খেতে ডেকেছিল। আমরা হাজির হলাম শুক্তির বাড়িতে, তার পড়ার ঘরে। আটটায় সকলেই জমায়েত হওয়া গেল।

শুক্তি বলল, তোদের ডেকে আমি তো খুব ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম রে।

তিমির বলল, তোর সবেতেই ফ্যাসাদ। পরীক্ষার সময় অসুখ বাধিয়ে ফ্যাসাদ, কনে দেখার বেলা বরের দিকে ট্যারা চোখে তাকিয়ে ফ্যাসাদ।

পূর্ণিমা বলল, বরটাকে শুক্তির আদপেই পছন্দ হয়নি, তাই ট্যারা চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে বাজিমাৎ করলে।

সন্ধ্যা বলল, ভদ্রতা করে নিজে বাতিল করল না, পাত্রপক্ষকে দিয়ে নিজেকে বাতিল করাল।

দীপন বলল, এমন চৌকস পাত্রীকে চিনল না ব্যাটারা। একদিন দেখিস, আসল জহুরি তোকে তুলে নিয়ে যাবে।

শুক্তি অমনি বলল, ফুল চন্দন পড়ুক তোর মুখে।

তিমির বলল, ফুলচন্দন মুখে পড়লে ফয়দা কিছুই হবে না। তার চেয়ে বল, চপ-কাটলেট পড়ুক তোর মুখে।

সন্ধ্যা বলল, আমি বাবাকে বলে দিয়েছি, বিয়ে করব না।

পূর্ণিমা বলল, প্রতিজ্ঞা ক'বার ভাঙলি বল ?

তিমির বলল, সন্ধ্যার বিয়ে না হলে আমরাও কেউ বিয়ে করব না।

শুক্তি বলল, ঐ প্রতিজ্ঞাটি আমার দ্বারা হবে না। বন্ধুর জন্যে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু বিয়ে বরবাদ করা যাবে না।

দীপন বলল, তুই বিয়ে-পাগলা বলেই তোর বর জুটছে না। অত সিটিং দেবার কি আছে, গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। দেখবি, সুট সুট করে চতুর্দোলা চলে এসেছে অন্দরমহল অব্দি।

বললাম, ভাবনার কিছু নেই। পূর্ণিমা, সন্ধ্যা, শুক্লা তিনজনেই পাত্রস্থ হয়ে যাবে।

পূর্ণিমা বলল, তুই কলকাতা থেকে গণৎকারের বিদ্যেটা শিখে এসেছিস নাকি রে ?

তা কেন, আমার মন বলছে।

অমনি শুক্তিরা তিনজনে কানে কানে কি সব ফিসফিস করে বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

মাসিমা ঘরে ঢুকে বললেন, ক্ষিদে পেয়ে গেছে, আগে খেয়ে নাও, তারপর গল্প কর।

দশটার ভেতর খাবার পাট চুকলে আমি আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে পড়লাম। ইউসুফ জেগেই ছিল। সে বাঁশি বাজাচ্ছিল। আমি ঢুকতেই বাঁশিটা রেখে বলল, ওপরে উঠে আসার সময় শবনমের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর ?

কই না তো। সে বুঝি এইমাত্র এখান থেকে গেল ?

না, বেশ কিছুক্ষণ আগে গেছে। ভাবলাম, হয়ত তোর সঙ্গে দেখা করার জন্য গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে !

সবটাই আমার অনুমান হাবুল। আমি আজ ওকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছি। ভাবলাম, ও হয়ত তোকে তার অপমানের কথা বলার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে কোথাও। তুই যে আজ আমার কাছে থাকবি তা ও জেনে গেছে।

আমি ইউসুফের ব্যবহারে অবাক হয়ে গেলাম। ক্ষুব্ধ গলায় বললাম, তুই যে শবনমকে এমন করে তাড়াতে পারিস তা আমার কল্পনাতেও আনতে পারছি না।

মনে হল ইউসুফ অনুতপ্ত। সে তার যন্ত্রণাটুকু ভোলার জন্যেই বাঁশিতে সুর তুলেছিল।

গভীর গলায় সে বলল, আমি যে এতটা নিচে নেমে যাব তা ভাবতে পারিনি ভাই।

বললাম, কি এমন ঘটনা ঘটল এইটুকু সময়ের ভেতর, যাতে তোর মেজাজ বিগড়ে গেল।

ইউসুফ বলল, ও আজ কিছুতেই ওর ডেরায় যেতে চাইছিল না। অনেক বুঝিয়েও ওকে রাজী করাতে পারলাম না। ও খালি বলতে লাগল, আমি রান্নাঘরে না হয় কলতলায় মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকব, ভোর হবার আগেই বেরিয়ে যাব।

তখন বললাম, পার্কে গিয়ে শুয়ে থাক। এখানে রাত কাটালেই লোকের চোখে পড়ে যাবে। সবাই জানে আমি কলেজে পড়ি। প্রিন্সিপালের কানে খবরটা পেঁৗছে যাবে।

কে কার কথা শোনে। কিছুক্ষণ জানালার রেলিং ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। তারপর কাছে সরে এসে বলল, পার্কে একা মেয়েমানুষ পড়ে থাকব, শুধু মানুষ নয়, কুকুর শেয়ালেও তো ছিঁড়ে খেতে পার ?

হাসি পেল, কিছু বললাম না। শবনম কিন্তু আমার মুখের রেখাগুলো দেখে ফেলেছিল। সে বলল, হাসছ, হাস, কিন্তু যা সত্যি তাই বললাম।

আমি কথা ঘোরাবার জন্যে বললাম, আজ হাবুল আমার কাছে শুতে আসবে। দুবন্ধু সারারাত গল্প করব, তার আগে খেতে দাও, খাবার পাটটা চুকিয়ে নি।

ও খেতে দিল, কিন্তু নিজে খেল না। দুপুরে রান্না করে নিজের খাবার নিয়ে ডেরায় চলে যায়। ঐ খাবারে দুবেলা চালিয়ে নেয় ও।

ও খেল না দেখে বললাম, তোমার খাবার নিয়ে যাও, অথবা এখানেই খেয়ে নিয়ে চলে যাও।

ও খেলও না, নিজের ডেরায় গেলও না। আমি খেয়ে মুখ ধুয়ে বসে রইলাম। ও সেই যে রান্নাঘরে থুতনিতে মুখ ঠেকিয়ে বসে আছে, তার আর নড়ন-চড়ন নেই। কি ভাবছে কে জানে।

আমি ওকে অনেক বোঝালাম। হাতে পায়ে ধরতে শুধু বাকি রাখলাম।

ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কোনদিন কি আমি তোমাকে কুপথে টেনেছি?

বললাম, সে প্রশ্নই উঠছে না।

তাহলে তুমি আমাকে তাড়াচ্ছ কেন?

আমি সমাজে বাস করি বলে। সমাজের মানুষ অকথা কুকথা বললে ভাল লাগবে না।

আমি সমাজ ছাড়া তাই তুমি আমাকে ঘেন্না করছ।

তা যদি হত তাহলে তোমার হাতের প্রসাদ খেতাম না। তোমার ছায়াও মাড়াতাম না।

ও বলল, ঠিক আছে, আমি তোমার ঘরের সীমানার বাইরে পড়ে থাকব।

ওর জেদ দেখে আমার মাথায় আগুন চড়ে গেল। বললাম, এ তল্লাটের কোথাও তোমার থাকা চলবে না। তোমার নরকেই তোমাকে থাকতে হবে।

আমার এ ধরনের কথার সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল না। ও ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল। শক্ত হাতে তখন ও জানালার একটা গরাদ ধরে নিজেকে সামলাচ্ছে। আমার সর্বাঙ্গে তখন আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। ধমকের সুরে বললাম, এখুনি বেরোও বাড়ি থেকে।

ওর চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে, একবারও পলক পড়ছে না। মনে হল শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আমি সেই মুহূর্তে আমার রাগের শেষ ধাপে উঠে গেছি। খপ করে ওর হাতখানা ধরে টানতে টানতে ঘরের বাইরে বের করে দিয়ে বললাম, আর এ মুখো হবে না তুমি॥

ভেতরে ঢুকে বালিশের তলা থেকে কতকগুলো টাকা নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, এগুলো তোমার কাজের দাম।

দরজা ওর মুখের সামনে ভেজিয়ে দেবার সময় দেখলাম, ও অন্ধকার থেকে টাকাগুলো কুড়িয়ে নেবার জন্য বসে পড়ল।

ইউসুফকে বললাম, শবনমকে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় না ও তোর ছুঁড়ে দেওয়া টাকা কুড়িয়ে নেবার জন্য বসেছিল।

ইউসুফ বলল, তুই তো টর্চ নিয়ে এলি, কোন নোট দেখতে পেয়েছিস ঢুকতে গিয়ে ?

না, চোখে পড়েনি আমার।

তাহলে ও ঠিকই কুড়িয়ে নিয়ে গেছে।

আমার কেমন সন্দেহ হল। আমি টর্চটা নিয়ে দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। উঁচু ঢিবির সবটাই ঘাসে ভরা। আমি টর্চের আলো ফেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু এক টুকরো ছেঁড়া কাগজও দেখতে পেলাম না।

ফিরে আসছি, ইউসুফ ভেতর থেকে বলল, বড় কষ্টে থাকে, না নিয়ে পারবে কেন। ওকে অপমান করেছি তবু মনে শান্তি ও টাকাটা নিয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকে ইউসুফের বিছানায় নোটগুলো ফেলে দিয়ে বললাম, এগুলো নিশ্চয়ই আমার পকেট থেকে বের করে দিইনি।

টর্চের আলো ফেলে রেখেছি ছড়ানো নোটগুলোর ওপর। মুখ নিচু করে সেদিকে চেয়ে আছে ইউসুফ।

বললাম, তোর ফেলে দেওয়া নোটগুলো ঠিকই কুড়িয়ে নিয়েছিল শবনম, তবে নিয়ে চলে যায়নি। তোর দরজার মাথায় বাইরের দিকে যে ভাঙা কুলুঙ্গীটা রয়েছে তার ভেতর তুলে রেখে গেছে। ফেরার পথে টর্চ পড়তেই দেখতে পেলাম।

বিছানায় পাশাপাশি শুয়েছি। অনেক রাত অব্দি ইউসুফ নিজের ব্যবহারের জন্য আক্ষেপ করতে লাগল।

আমি ওকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বললাম, এ রকম বিবেচনার ভুল মানুষের হয়েই থাকে। তুই যখন অনুতপ্ত হয়েছিস তখন তোর প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে।

ইউসুফ বলল, মেয়েটাকে আমার চেনা উচিত ছিল। ওকি এই নরকে নেমে আসার আগে কম যুদ্ধ করেছে নিজের সঙ্গে।

বললাম, তুই শবনমের সম্বন্ধে কিছু বলার জন্যেই আজ এখানে শুতে বলেছিলি।

ও বলল, মাঝে মাঝে শবনম ওর জীবনের কিছু কিছু কথা আমাকে বলেছে। জানিস হাবুল, ও গরীব ঘরের মেয়ে হলে কি হবে, ওর বাবা ছিলেন ইস্কুল মাস্টার। মা মারা গেলে সাত বছরের মেয়েটিকে বাবাই মানুষ করেন। লেখাপড়া যত্ন করে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু হাল ভেঙে গেলে যেমন হয় নৌকোর অবস্থা তেমনি হয়ে গেল শিশিরকণা, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন।

পনের বছরের মেয়েটার লোভে জুটে গেল অনেক শুভানুধ্যায়ী। দূর সম্পর্কের এক মামা এসে কলকাতায় নিয়ে গেল তাকে। মামার কিছু উদ্দেশ্য ছিল। তার মা পক্ষাঘাতে পঙ্গু। মায়ের সেবার জন্য বিনি মাইনের একটা আয়ার দরকার ছিল।

রাতদিন ভূতের মত খাটিয়ে নিত দুটো ভাতের বিনিময়ে।

তাতেও শিশিরকণার কোন দুঃখ ছিল না। সে রাত জাগত হাতে একখানা বই নিয়ে। গল্প পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেত।

মামাতো ভাইটি সদ্য বিয়ে করেছিল। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনবরত আসা যাওয়া করত। কোন কোন রাতে থেকেও যেত কেউ কেউ।

তাদেরই একজন ওর ওপর হামলা চালাল এক রাতে। লজ্জায় কাউকে কোন কথা বলতে পারল না শিশিরকণা। নতুন বউয়ের ভাই সে। বলতে গেলে তারই ঘাড়ে দোষ চাপাবে সকলে। কিন্তু সে শ্রদ্ধা করত আর ভালবাসত তার মামাতো দাদাটিকে। মানুষ হিসেবে নাকি তার জুড়ি ছিল না। শিশিরকণার ওপর কোন অন্যায় হলে সে প্রতিবাদ করত।

দাদার নতুন কুটুম। কথাটা তার কানে তুললে তুলকালাম বেধে যেতে পারে, তাই চেপে গেল শিশিরকণা।

কিন্তু কিছুদিন যাবার পরেই সে বুঝতে পারল সমস্যা জটিল হয়ে উঠেছে। এখন বলতে গেলে কেউ তার কথা বিশ্বাসই করবে না। তাছাড়া একই বাড়িতে থাকে বলে দাদার ওপর নতুন বউয়ের সন্দেহ ঘনিয়ে উঠতে পারে। মরে গেলেও সে দাদার ওপর মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপাতে দেবে না।

সে একটুকরো চিঠি লিখে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল। চিঠি লিখল তার মামাতো দাদাকে।

শ্রীচরণেষু

দাদা, বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি আমি, তাই তোমাদের এত স্নেহের বাঁধনকেও ছিঁড়ে ফেলে চলে যেতে হচ্ছে। আমার ভাগ্য আমাকে কোনো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে দেবে না। সে কেবলই আমাকে অন্ধকারের ভেতর তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

তোমরা মিথ্যে আমাকে খোঁজার চেষ্টা কর না।

শতকোটি প্রণাম রইল তোমাদের চরণে।

শিশিরকণা।

রাতে এপথ ওপথ পার হতে হতে একসময় এসে পেঁছিল গঙ্গার ঘাটে।

সেই ঘাটের পাটে বসে হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছিল। একটু দূরে ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় নোঙর করা ছিল একটা নৌকো।

শিশিরকণা ভাবছিল, ফিরে যাবার পথ নেই, সামনে এগোবারও পথ নেই। এখন একমাত্র আশ্রয় তার, মা গঙ্গা।

কাঁদছে আর ভাবছে। হঠাৎ দেখল, তার সামনে এসে কখন দাঁড়িয়েছে একটা লোক। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের ভেতর বয়েস। দুধ সাদা চাঁদের আলোয় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল লোকটিকে। ফতুয়া আর একখানা খাটো ধুতি পরেছে।

কোথায় যাবে গো মেয়ে?

লোকটি বেশ মিষ্টি গলায় কথা ক'টি বলল দেখে শিশিরকণা গলে গেল। সে অমনি বলল, যাবার জায়গা নেই, তাই বসে আছি এখানে।

সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল লোকটি, আহা, কত কষ্টে পড়লে তোমার মত এমন একটি মেয়ে এত রাতে গঙ্গার ঘাটে বসে কাঁদে!

শিশিরকণার সেই মুহূর্তে লোকটিকে বড় সজ্জন বলে মনে হল।

লোকটি একটু দূরে বসল।

তুমি নিশ্চয়ই রাগ করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ মেয়ে। আমার তো তাই মনে হচ্ছে। বল তো বাড়িতে পেঁৗছে দিয়ে আসি।

শিশিরকণা বলল, বিশ্বাস করুন আমার বাড়ি নেই। আমার মন্দ ভাগ্য আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

লোকটি নৌকোটার দিকে আঙুল তুলে বলল, ওটা আমারই নৌকো। সুন্দরবনে যাচ্ছি কাঠ আনতে। তুমি যাবে আমার নৌকোয়? রাত ভিতে এ জায়গাটা কিন্তু ভাল নয়। ক'দিন পরে যখন ফিরব তখন যেখানে বলবে সেখানে পেঁৗছে দিয়ে আসব।

শিশিরকণা একটা ঘোরের ভেতর বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। এখন জায়গাটার চারদিকে তাকিয়ে তার গা ছমছম করতে লাগল। সে ভাবল, এখানে বসে থেকে গুন্ডা, বদমায়েসের হাতে পড়ার চেয়ে লোকটির সঙ্গে সুন্দরবনে ঘুরে আসা ভাল।

সেই যে জঙ্গল আর বাঘের দেশে ভাসল শিশিরকণা, ফিরে এল পাঁচ বছর পরে। লোকটাকে সে বুঝতে পারেনি সে রাতে। বাঘের চেয়েও ভয়ংকর যদি কেউ থাকে তাহলে সে দুর্যোধন সাউ।

লাটের নামকরা মহাজন সে। ঘর আছে জঙ্গলের ধারে, তার পাশেই আবাদী জমি। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে পাচার করা আর চোরাই মধু সংগ্রহ করে চালান দেওয়া তার কাজ।

দেশ থেকে কাজের লোকজন নিয়ে যায়। কোনো একটা লোক বাঘের পেটে গেলে দুর্যোধন সাউ বুক চাপড়ে হাহাকার করে। লোকটার জন্যে নয়, টাকার জন্যে। দেশে ফিরে গিয়েই লোকটার বউ-বাচ্চাকে কিছু টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হবে। লোকটা লাভের ঘরে ঢেরা কেটে পুরো লোকসান করে গেল।

শিশিরকণাকে পাঁচ বছর বন্দী থাকতে হয়েছিল সুন্দরবনে। ওর পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দিয়েছিল দুর্যোধন। কোথাও পালাবার উপায় ছিল না। জঙ্গলে ঢুকলে বাঘ আর জলে নামলে কুমীর।

দুর্যোধন সাউ দেশে গেলে পাঁচ-ছ'মাস কাটিয়ে আসত। একবার দেশে গিয়ে আর ফিরে এল না। তার বদলে এল এক ভাই। খবর পাওয়া গেল, দুর্যোধন যেখানে গেছে কোনোদিনও সেখান থেকে কেউ ফিরে আসতে পারেনি।

বুক ভরে মুক্তির একটা হাওয়া টানল শিশিরকণা। আবার ভয় পেল মনে মনে। না জানি নতুন মালিক কি মূর্তি ধরে হাজির হয় তার সামনে।

ক'দিন একই আস্তানায় থেকে শিশিরকণা বুঝল, লোকটা পিঁপড়ের পেছন টিপে মধু বার করতে ওস্তাদ। খোরাকির চাল কমিয়ে, হাটের পয়সা আদ্দেক করে সে যে একটি হাড়কিপটে তা বুঝিয়ে দিলে।

শিশিরকণা ভয়ে ভয়ে ছিল, কিন্তু দেখল, পয়সার খাঁই ছাড়া লোকটার অন্য কোনো বদগুণ নেই। চরিত্র খারাপের অপবাদ তার অতিবড় শত্রুতেও

দিতে পারবে না।

একদিন দুর্যোধনের ভাই শিশিরকণাকে ডেকে বলল, এ লাট দাদা গত হবার পর আমি বেচে দেবার জন্যে খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি। এখানে তোমার থাকাটাকার সুবিধে হবে না। আমি দেশে গোমস্তাকে চিঠি লিখে দিয়েছি, তোমার থাকাখাওয়ার কোথাও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

পাঁচ বছর পরে নৌকো করে ফিরল শিশিরকণা। এক সন্ধ্যায় নৌকো ভিড়ল এই ক্যানেল পাড়ে। একটা মেয়ে নৌকোয় উঠে এসে শিশিরকণাকে টিপেটুপে দেখে তুলে নিয়ে গেল। সেই থেকে শবনমের আস্তানা এই পাড়ায়।

দুর্যোধনের ভাই শিশিরকণাকে তার দাদার সম্পত্তির একটা অংশ ভেবে উপযুক্ত দামে বস্তির মালিকের কাছে বেচে দিয়ে গেল।

বললাম, আগেই তোকে বলেছি ইউসুফ, ও ফালতু নোংরা একটা মেয়ে নয়, ভাগ্যই ওকে টেনে এনেছে।

ইউসুফ বলল, আজ আমি ঝোঁকের মাথায় শবনমকে বড় আঘাত দিয়ে ফেলেছি হাবুল। সেই থেকে মনে শান্তি পাচ্ছি না।

পরের দিন টাউন থেকে দেশের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

প্রায় আঠার, বিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে পেরোতে হবে। শ্রাবণের শেষপর্বে শুরু হয়েছে অঝোর বর্ষণ। চলার পথ কাদায় পিছল। বালিয়াড়ির পথে বর্ষাকালে চলতে ভারী সুবিধে। পায়ে কাদা লাগে না। তাছাড়া বালি, জল শুষে নিয়ে কিছুটা বসে যায়। তাই চলতে গেলে নরম বালি ভাঙতে হয় না। কিন্তু আমি চলেছি বালির এলাকাকে পেছনে ফেলে। প্রথমে বালি আর কাদায় মাখামাখি পথ। তারপরেই শুরু হয়ে গেছে এঁটেল মাটির এলাকা।

বুড়ো আঙুলে কাদা টিপে টিপে চলেছি। হড়কে কাদায় পড়ি পড়ি করেও টাল সামলাচ্ছি। দমকা হাওয়ায় ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি নামল। ছাতা নিয়ে চলার অভ্যেস নেই। তাই বিনা ছাতায় শ্রাবণের আকাশ মাথায় করে চলেছি। পেটা বৃষ্টি এলেই ঢুকে পড়ছি পথের ধারে কোনো ঘরের চালার আড়ালে।

একবার তো জলতেষ্টা পেয়ে গেল।

কেউ আছ বাড়িতে?

দু'একবার হাঁকডাক করতেই হাতখানিক ঘোমটা টেনে এক বউ দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে জানাল, বাড়ির পুরুষমানুষরা কাজে বেরিয়ে গেছে।

একটু খাবার জল দেবে?

বউটি দাওয়ায় একটা পিঁড়ে পেতে দিয়ে গেল। আমার পা ভর্তি কাদা, তাই উঠোনেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

বউটি এক হাতে ঝকঝকে মাজা চুমকিতে জল আর এক হাতে কলাপাতায় একটুকরো পাটালি এনে দাঁড়াল। এটুকু আগুর (আগে) খাই লও বাবা।

কলাপাতায় রাখা পাটালিটুকু হাতে তুলে নিয়ে খেলাম। তারপর চুমকির জলটুকু খেয়ে গ্লাসটা দাওয়ায় রেখে দিলাম।

মাথা নেড়ে বললাম, অনেকটা পথ যেতে হবে, চলি দিদি।

বউটি বলল, কুঁটকে যাব (কোথায় যাবে) ?

গাঙ-সে-পার। অর্থাৎ কিছু দূরে রসলপুর নদীটি পড়বে, তার ওপারের কোনো একটি গ্রাম।

রসলপুরের এপারের ভাষায় অনেক ওড়িয়া শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। গাঙ পেরোলে বদলে গেছে ভাষা।

আমি পথ চলতে চলতে বউটির কথা ভাবতে লাগলাম। একেবারে মা যশোদা। কতই বা বয়েস। আমার চেয়ে দু'এক বছরের বড় হবে কি হবে না। কিন্তু বিয়েটি হয়ে গেলেই উথলে ওঠে মায়ের স্নেহ। তখন বয়স-বিচার নেই। সবই ছেলের মত।

অনেক পথ পেরিয়ে এলাম। কখনো লোকাল বোর্ডের রাস্তা ধরে, কখনো বা কোনো পাড়ার আন্দুল কান্দুল দিয়ে। পথ কমানোর জন্যে মাঠের আল-পথেও নামছি। ধানের গাছ ছনছন করছে। স্বাধীনতার খবর পেয়ে যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

রসলপুরের খেয়াঘাটের দিকে না গিয়ে সুনিয়ার ঘাটের পথে পা বাড়ালাম।

কয়েক বছর আগে সাইক্লোনের পর এই সুনিয়ার খেয়াঘাট পেরিয়েই দেশে ফিরেছিলাম। তখন যুদ্ধের হিড়িকে সরকার শত্রুপক্ষের ভয়ে জলস্থলের সব-রকম যানবাহন সিজ করে নিয়েছিল। ভাগিস রসলপুর ইউ. পি. স্কুলের মাস্টার দীননাথ মিশ্র মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। ধু ধু প্রান্তরে এক-টুকরো জলাজমির ওপর মাথা গোঁজার আস্তানা। স্ত্রী বন্যায় ভেসে গেছেন। তাঁরই লুকোনো ডোঙাটিতে তিনি নদী পার করে দিয়েছিলেন সেদিন। দুর্ভিক্ষের দিন, কোনো সংস্থান নেই, তবু যা ছিল তাই দিয়ে অতিথি সৎকার করেছিলেন তিনি।

কুমু এখন কেমন আছে ? মা-হারা কুমুদিনী। কত বড়টি হয়েছে সে ? সেদিন ওর বাড়ি থেকে চলে আসার সময় নদীর ধার পর্যন্ত এসেছিল কুমু। বলেছিল, আবার এসো কিন্তু হাবুলদা।

ওর মা নদীর ধারে তালপাতায় ছাওয়া একটা টঙের ভেতর বসতেন। গরমের দিনে যারা ঐ পথে নদী পারাপার করত তাদের তিনি তেষ্টা মেটাবার জন্যে পাটালি আর জল দিতেন। কিন্তু ভাগ্যের কি বিচিত্র বিধান, যিনি জল দান করতেন তিনিই চলে গেলেন সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির তলায়।

সুনিয়ার খেয়াঘাট দেখা যাচ্ছে। ঐতো সেই জলার ধারে দীননাথ মিশ্রের ছোট্ট বাড়িখানা। ধু ধু প্রান্তরের কোথাও আর কোনো বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই।

এই মুহূর্তে কুমুকে দেখার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠল।

খেয়াঘাটে ঢুকতে গেলে সিধে রাস্তা ধরতে হয়, আর ডানদিকে জলার পাড় ধরলে কুমুদের বাড়ি হাজির হওয়া যায়।

ঐ দুটো পথ যেখানে ছুঁয়েছে সেখানে কুমুর মায়ের তালপাতার ছাউনি।

যেখান থেকে কুমুর মা গরমের দিনে পারাথীদের জল দান করতেন।

হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। কাছে-পিঠে মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে ঐ তালপাতার ছাউনি। ছুটে গেলাম ছাউনির দিকে। কেনোদিকে না তাকিয়ে ঢুকতে গিয়েই পিছিয়ে এলাম। একটি মেয়ে বসে রয়েছে ঝোপড়ির ভেতরে।

হঠাৎ মেয়েটি ভেতর থেকে তালপাতার একটা পাখিয়া (মাথা থেকে পিঠ ঢেকে কোমরের নিচ অব্দি তৈরী তালপাতার আবরণী) এগিয়ে ধরল আমার দিকে।

আমি পাখিয়া চাপিয়ে বৃষ্টি ঠেকাতে লাগলাম। বৃষ্টিতে চারদিক ঝাপসা হয়ে এল। সে মেয়েটি এত কাছে রয়েছে তবু তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

মেয়েটি ভেতর থেকে কি যেন বলে উঠল। আমি মুখ বাড়িয়ে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মেঘ ডেকে উঠতে কিছুই শোনা গেল না।

কিছুক্ষণ পরে ভেতর থেকে ভেসে আসা শব্দের কিছুটা অর্থবোধ হয়। মেয়েটি আমার কাঁধে ঝোলানো বইয়ের ব্যাগটি ভেতরে রেখে দিতে চাইছে।

আমি হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা ভেতরে চালান করে দিলাম।

পেটা বৃষ্টির ঝাপট কমে এল এক সময়। জলের কুয়াশাও ফিকে হয়ে এল। আমি ঝোপড়ির ভেতর তাকালাম।

মেয়েটিও আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি কাকে দেখছি, পঞ্চদশী একটি মেয়ে না কুমু!

দুজনেই একসঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, কুমু না?

হাবুলদা!

পাখিয়া ঝোপড়ির গায়ে ঠেকিয়ে রেখে আমি হাত বাড়ালাম। ও ব্যাগটা আমার হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিল। মনে করেছিল আমি হাত বাড়িয়ে ব্যাগ চাইছি।

বললাম, এতদিন পরে দেখা হল, তাই তোমার হাত ছুঁয়ে আমার আনন্দটুকু জানাতে চাইছিলাম।

ও ব্যাগটা পাশে রেখে হাত বাড়িয়ে দিলে।

আমি ওর হাত ছুঁয়ে বললাম, তুমি সেই কুমু তো? প্রজাপতি ধরতে এখনও ছুটোছুটি কর?

ও প্রথমে একটু লজ্জা পেল। সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ হয়ে উঠল।

বলল, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তাই, নইলে হলপ করে বলতে পারি তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা না করেই খেয়া পার হয়ে যেতে।

কি করে বুঝলে?

তুমি যদি আমার বাড়ি যেতে তাহলে ডানদিকের রাস্তা ধরে এগোতে। কখনো খেয়াঘাটের দিকে এগিয়ে আসতে না।

হেসে বললাম, এদিকে আমি আসতে চাইনি, ঘূর্ণি বাতাস আর বৃষ্টি আমাকে এখানে তাড়া করে এনেছে। আর ভাগ্যিস এসে পড়েছিলাম, তাই কুমুদিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

আর বলতে হবে না যাও, কত মনে করে রেখেছ সে আমি জানি। আসবে বলে কথা দিয়ে গেলে, আর এলে তিন চার বছর পার করে।

বললাম, কি করছিলে একাটি এখানে বসে ?

আর বল কেন, বাবা বলে, মায়ের রোগ ধরেছে তোকে।

কি রকম ?

মা গরমের দিনে পরের লোকদের নিজের হাতে তৈরী ছোলার একটুকরো পাটালি আর এক ঘটি ঠাণ্ডা জল খেতে দিত।

তুমিও কি তাই করছ ?

গরমের দিনে বাবাকে দিয়ে রসলপুরের হাট থেকে বাতাসা কিনে আনি। ঐ বাতাসা একটুকরো আর জল দি।

এখন কি দিচ্ছ ?

তোমাকে একটু আগে যা দিলাম। বুঝলে না, পাখিয়া। গাঁয়ের গরীব যারা ভিজতে ভিজতে যায় তাদের একটা করে পাখিয়া দি। বর্ষাকালে চাষের কাজে বড় দরকার হয়। ঐ দেখছ না, আগেরবার এসে আমাদের বাড়ির পেছনে যে তালগাছগুলোকে ছোট ছোট দেখে গিয়েছিলে সেগুলো এখন কত বড় হয়েছে। ওর পাতা কেটে পানুদা পাখিয়া তৈরী করে দেয়।

পানুদা কে ? তাঁকে তো আগে দেখিনি।

তাকে আমার বাবা পথ থেকে দুর্ভিক্ষের সময় ধরে এনেছে। পানুদার বউ ছেলে, নাতি-নাতনি সবাই তলিয়ে গেছে বন্যার জলের তলায়। একটা নাতনি ছিল আমার বয়সী। কি করে যে দুজনে বেঁচে গেল ভগবান জানে। তারপর দুর্ভিক্ষ শুরু হলে না খেতে পেয়ে মেয়েটা মরল। পথের ধারে মরা নাতনির পাশে বসে পানুদা কাঁদছিল, বাবা দেখতে পেয়ে মেয়েটার গতি করল। পানুদাকে হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে এসে আমাকে দেখিয়ে বলল, এই তোমার আর একটা নাতনি।

সেই থেকে পানুদা আমাদের কাছে রয়ে গেছে।

কথা শেষ করে ও ঝোপড়ি থেকে নেমে এল রাস্তায়। পাখিয়াগুলো টেনে নামিয়ে বলল, চল হাবুলদা আমার সঙ্গে, আজ তোমার কোনো মতেই বাড়ি যাওয়া হবে না।

কিন্তু আমি যে আজ বাড়িতে পৌঁছব বলে প্ল্যান করে চলেছি।

ও একসঙ্গে তিন চারটে পাখিয়া থাক করে মাথায় চাপিয়ে আমার একটা হাত ধরে টানতে টানতে বলল, তুমি বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবে না ?

নিশ্চয়ই ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাব।

ঠিক তো ?

বাঃ, ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাব বলেই তো রসলপুর দিয়ে না গিয়ে সুনিয়ার রাস্তায় এসেছি।

কুমু ঝপ করে আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে পথের কাদা টিপতে লাগল।

বললাম, দাঁড়ালে যে, যাবে না ?

ঐতো বাড়ি, যাও না তুমি।

কি হল কুমু!

তুমি তো আমার জন্য আসনি, বাবাকেই শুধু দেখতে এসেছ।

হেসে বললাম, মন যাকে দেখতে চায়, মুখে তাকে দেখার কথা বলতে নেই।

কুমু আমার দিকে তাকাল। সুন্দর ফর্সা মুখখানা শ্রাবণের মেঘছায়া পরিবেশে সোনামুখি ডাবের মত চিকণ হয়ে উঠেছে।

ও বলল, বাবার সঙ্গে তুমি দেখা না করে যাবে না তো ?

আগেই তো সে কথা বলেছি কুমু।

ও আমার হাতখানা আবার ধরে বলল, তাহলে আজ তোমার কোথাও যাওয়া হবে না।

কেন ?

বাবা দেশের বাড়িতে গেছে। কাল সকালে ফিরবে। ঠাকুর্দা মারা যাবার পর বাবা দেশের বাড়িতে যাচ্ছে।

তাই বুঝি ? তাহলে তো ভাবনার কথা। আজ ফিরলে তবু দেখা হয়ে যেত।

কুমু বলল, আমি কিন্তু কোনো কথা শুনব না তোমার। আজ আমার বাড়িতে থাকতেই হবে তোমাকে।

বললাম, কথার পাকে পড়ে গেছি, এখন তুমি যা বলবে তাই শুনতে হবে আমাকে।

ভারী খুশী হল কুমু। সে আমাকে পেছল পথে টেনে নিয়ে চলল। আমি পড়তে পড়তে, সামলাতে সামলাতে কুমুর বাড়ির পথ পার হতে লাগলাম।

সেই বছর চারেক আগে এসে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে গিয়েছিলাম। কুমু ঠিক আমাকে মনে রেখেছে। আর কি স্বাভাবিক আচরণ তার! যেন কতদিনের জানাশোনা, দেখা-সাক্ষাৎ।

ঘরে পৌঁছে ও হাঁকডাক শুরু করে দিলে, পানুদা, ও পানুদা, দেখে যাও কে এসেছে।

বুড়ো মতন একটি লোক ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

কুমু বলল, দেখছ কি অমন করে, ও আমার হাবুলদা। খাবার যোগাড় কর।

বললাম, এখন মেঘে আকাশ ছেয়ে থাকলে কি হবে, ভরদুপুর। তোমাদের রান্না নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। তোমরা খেয়ে নাও। আমি পথে দইমুড়ি খেয়েছি।

পানুদা বলল, তা কি হয় দাদা, কুটুম মানুষ না খেয়ে থাকবে আর আমরা খেয়ে নেব! রান্না দুবেলার জন্য করা থাকে, কারুরই কোনো অসুবিধে হবে না।

আমাকে চানের জন্য তেল গামছা এগিয়ে দিল কুমু।

বললাম, শ্রাবণ মাসে ছাতা ছাড়া পথে বেরিয়েছি, স্নানের কি আর বাকী আছে।

কুমু বলল, সে তুমি বোঝ হাবুলদা। স্নান না করলেও হাত পা মুখ ভাল করে ধুয়ে নাও।

বললাম, তুমি যখন স্নানের সাজসরঞ্জাম নিজের হাতে এগিয়ে দিয়েছ তখন আমি আরাম করে স্নানটা সেরেই নি।

আধঘণ্টার ভেতরে কুমু চাটাই পেতে জলের গ্লাস বসিয়ে ভাতের থালা আনলে।

কিছুটা দূরে পানুদাকেও খেতে দেওয়া হয়েছে।

বললাম, কুমু, তুমি না বসলে অতিথি এক গ্রাসও খাবার মুখে তুলবে না কিন্তু।

তোমাদের পরিবেশন শেষ করেই আমি বসব হাবুলদা। তুমি খাওয়া শুরু কর।

আমি বসে রইলাম। বললাম, তোমার যা দেবার আছে সব দিয়ে দাও। পানুদাকেও পরিবেশন শেষ কর। তারপর একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে খাব।

কুমু তাই করল। নিজের খাবার এনে আমার একেবারে পাশটিতে বসল।

বললাম, এত কাছে বসলে তোমার জাত যাবে কিন্তু। আমি খাঁটি শূদ্র, তুমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।

তুমি তো আমার মার কথা শুনেছ হাবুলদা। পালকি থেকে নেমে নতুন বউ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো বেহারাকে প্রণাম করেছিল। ঠাকুরদা প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলে মা মানেনি। তাই মাকে নিয়ে বাবাকে চলে আসতে হল এখানে। সেই মায়ের রক্ত আর তেজ আছে আমার শরীরে। তাছাড়া আমার বাবাও এসব ব্যাপারে খুব উদার।

কচি লাউডগার চচ্চড়ি, বড় কই মাছের তেল ঝাল আর চুনো মাছের অম্বল। খাওয়ার আয়োজন বেশ জম্পেশ। বললাম, এত সব রেঁধে রেখেছ কুমু।

তোমার আসার আগেই রান্না হয়ে গেছে হাবুলদা।

এত মাছ কোথায় পেলে? বিশেষ করে বড় বড় কই মাছগুলো?

ঐ ঝিল থেকে উঠে আসছিল নালার স্রোত বেয়ে। পানুদা মাছ ধরার ওস্তাদ। অনেকগুলো ধরেছে। তার আগে জাল দিয়ে চুনো মাছ ক'টা ধরেছিল।

পানুদা কাছে থাকায় তোমার ভারী সুবিধে হয়ে গেছে।

কুমু হাত নেড়ে পানুদার দিকে চেয়ে বলল, সুবিধে না ছাই, বুড়ো আমাকে জ্বালিয়ে খেল।

দেখি, পানুদা কুমুর কথা শুনে মিঠি মিঠি হাসছে।

কুমু আবার বলল, একেবারে টিকটিকি, সবেতেই টিক টিক। বৃষ্টিতে ভিজো না। সন্ধ্যেতে বেরিও না। আমি তো আছি, খেয়াঘাটে তোমার গিয়ে

কাজ নেই।

এসব দেখে শুনে তোমার বাবা কি বলেন ?

বাবার কথা আর বলো না। বাবা বলে, কুমুর ওপর খবরদারি করার একটা লোক এতদিনে পাওয়া গেছে।

হঠাৎ গল্প করতে করতে খাওয়ার মাঝখানে একবার উঠে পড়ল কুমু।

কি হল, উঠলে যে ?

আসছি।

ঘটির জল ঢেলে হাত মুখ ধুয়ে ও রান্নাঘরে ঢুকল। কিছু পরে থালায় খানিকটা ভাত নিয়ে পানুদার পাতে ঢালতে লাগল।

পানুদা অমনি বলে উঠল, কি করছিস পাগলী, আমি এতগুলো ভাত খেতে পারি ?

খুব পারবে। খেয়াঘাট থেকে দু'চক্কর পাক দিয়ে এলেই খিদে পেয়ে যাবে।

আমাকেও ভাত পরিবেশন করতে এল কুমু। বললাম, যা দিয়েছ তাই তুলতে পারব না, একটি দানাও আর নয়।

কুমু বলল, শহরে থেকে থেকে খিদে মরে গেছে তোমার।

ও থালা নিয়ে ভেতরে চলে গেল। ফিরল বাটি হাতে। বাটিটা আমার সামনে বসিয়ে দিয়ে বলল, এটাতে আর না কর না।

দেখি, আস্ত আর একটি কই মাছ।

বললাম, এরকম আর ক'টি আছে ?

ওবেলাও তোমাকে খাওয়াতে পারব।

বললাম, এমন লোভ দেখালে সব ছেড়ে ছুড়ে এখানেই পড়ে থাকতে হবে।

তুমি থাকবে হাবুলদা। আমার এত কপালও হবে। সেই এসেছিলে, আর এই এলে। এরপর চলে গেলে আর এ মুখো হবে না।

বললাম, নিশ্চয়ই আসব কুমু।

ও তার খাবার আসনে গিয়ে বসল।

প্রথমে যেবার এসেছিলাম সেবার সাইক্লোনে বিধ্বস্ত বাড়ি দেখে গিয়েছিলাম। বালিকা কুমু, বাবা ছাড়া সেই প্রথম বুঝি একজন তরুণ পুরুষের সঙ্গে কথা বলেছিল। সুন্দর ডানা মেলা পাখির মত সে উড়ে বেড়াত এই নির্জন নিবাসে। জলার ধারে ধারে হোগলার বন, সাদা আর ধূসর বক, নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া দু'দশখানা পাল তোলা নৌকো এরাই ছিল ওর সাঁঝ সকালের সঙ্গী। আর ছিল পারাথীরা। ফসল তোলা হয়ে গেলে ওরা মাড়া পথ (পা দিয়ে মাড়িয়ে যে পথ তৈরী হয়) ধরে আসত। ফসলের দিনে আলপথ অথবা লোকাল বোর্ডের ক্ষয়ে যাওয়া রাস্তা ব্যবহার করত। ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেকটা সময় কেটে যেত কুমুর। বাবা দীননাথ মিশ্র সকাল থেকে খেয়া পেরিয়ে যজমানের বাড়ি ছুটতেন। ফিরে এসে বার বছরের মেয়ের হাতে রান্না খেয়ে আবার ক'মাইল ঠেঙিয়ে স্কুলে পেঁছিতেন। বাড়ি ফেরা, যজমানের মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাজ সেরে। ঘরে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে দুটি

মুড়ি মুখে ফেলে এক গ্লাস জল খেতেন। তারপর দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে ডাক দিতেন, আয় মা।

কুমু ভেতর থেকে হেরিকেন লণ্ঠন নিয়ে বাইরে এসে বসত বাবার পাশে। সাহিত্যচয়ন আর ব্যাকরণ কৌমুদীর পাঠ চলত বেশ খানিকটা রাত অব্দি।

বললাম, কুমু, তোমাকে এখন তোমার বাবাই পড়ান তো?

বাবার পড়ানোর পালা প্রায় শেষ। নতুন মাস্টারমশাই এসে পড়ান শনিবার বিকেল আর রোববার সকালে।

কি পড়ছ এখন?

পঞ্চতন্ত্র আর ভট্টিকাব্য শেষ করে এখন চুপ করে বসে আছি। গুরু গেছেন তীর্থ করতে। ফিরে এসে শকুন্তলা ধরবেন। বই কেনা হয়ে গেছে।

এই প্রথম আমি কোনো একটি মেয়ের জন্য মনে মনে যন্ত্রণাবোধ করলাম। ব্যাপারটা হয়ত ভেবে দেখলে অতি সাধারণ, তবু অন্য একজন পুরুষ শকুন্তলা পড়াচ্ছেন কুমুদিনীকে, এ কথা ভাবতেই মন বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। আমাদের পাঠ্য 'প্রাচীন সাহিত্যে' শকুন্তলার সমালোচনা পড়তে গিয়ে আমি পুরো শকুন্তলার বাংলা অনুবাদটি পড়ে ফেলেছি।

বললাম, শকুন্তলা আমার পড়া।

গলায় বিস্ময় ঢেলে কুমু বলল, তাই নাকি! তুমি কত জান হাবুলদা।

আমার সলজ্জ গলায় প্রতিবাদ করে বলা উচিত ছিল, তেমন আর কি জানি কুমু। জানবার কি আর শেষ আছে। কিন্তু ওসব কথা আমি বললাম না। আমার প্রতিপক্ষের (তিনি যত বয়স্কই হোন) কাছে হার স্বীকার করতে আমি পারব না।

মনের একটা অদ্ভুত আবেগে বলে ফেললাম, তুমি যখন এই সুন্দর নাটকটি পড়বে তখন আমি তোমার সামনে থাকব না কুমু, কিন্তু তুমি কি তখন আমাকে দেখতে পাবে?

কুমুর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল থালার দিকে। একসময় আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, ও বইতে কি আছে?

যাই থাক, যখন পড়বে তখন জানবে। আর তখন যদি কাউকে মনে পড়ে তাহলে জেনো সে তোমার কাছে রয়েছে।

যৌবনের প্রথম জোয়ারে শোভনতার কূল ছাপিয়ে গেল।

আমি কুমুর মুখে কিছু ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। কিন্তু অনর্গল কথা বলতে ভালবাসে যে কুমু, সে আর একটিও কথা তুলল না শকুন্তলা প্রসঙ্গে।

খাওয়া চুকলে আমি একটু দ্বিধায় পড়লাম। এঁটো তুলবে কে? বামুনের মেয়ে কি এতখানি সংস্কার একদিনে মুছে ফেলতে পারবে? না কি পানুদাই পরিষ্কারের ভার নিজের হাতে নেবে?

সেবার এসে কলার পাতায় খেয়েছিলাম, কুমুর বাবা নিজের হাতে তাঁর পাতা তুলে আমাকে পথ দেখিয়েছিলেন। এবার পুরোপুরি কাঁসার সরঞ্জাম।

পিঁড়ির ওপর অমন করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ হাবুলদা? মুখ ধোয়ার জল

রয়েছে বাইরে।

কুমুর কথায় চমক ভাঙল। পায়ে পায়ে বাইরে চলে গেলাম। মুখ ধুয়ে ফিরে দেখি, এঁটো বাসন তুলে নিয়ে কুমু ইতিমধ্যেই খিড়কীর ঘাটে নেমে গেছে।

বিকেল বেলার বাদল আঁধারে দাওয়ার এক কোণায় আমি আর কুমু বসে-ছিলাম একটা তক্তপোষের ওপর। পানুদা কুমুর নির্দেশে খেয়াঘাটের রাস্তার ধারে টঙে বসে পাখিয়া আগলাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধান করছিল উপযুক্ত প্রার্থীর, যাকে একটি পাখিয়া দান করা যেতে পারে।

সত্যি, এসব বর্ষার দিনগুলোতে সাধে কি মানুষ কবি হয়ে যায়। তরুণ তরুণীর মন সাধে কি দুলে ওঠে!

কুমু হঠাৎ আনন্দে ঝিলের শাপলার মত ফুটে উঠল। আঙুল তুলে বলল, দেখ হাবুলদা, ধবধবে সাদা বকের সারি কেমন সুন্দর ঘন নীল মেঘের বুকে ভেসে চলেছে।

ওদিকে তাকিয়ে বললাম, ছবি, ছবি।

রামধনু! দেখ কুমু, ঝিলের দুটো দিক রঙের সেতু দিয়ে কেউ যেন যোগ করে দিয়েছে।

বান ডাকল রক্তের ভেতর। আমরা দাওয়ার কোণে বসে থাকতে পারলাম না। হৈ হৈ করে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

কেউ যেন বৃষ্টিটা কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দিয়ে আমাদের শ্রাবণ আকাশে রামধনু দেখার সুযোগ করে দিলে।

রামধনু দেখলেই আমার বুকের ভেতরটা কচি পাতার মত কেঁপে কেঁপে ওঠে। প্রতিটা রঙের কোমল লাবণ্য আমার অনুভূতিকে ছুঁয়ে অবর্ণনীয় এক সম্মোহন সৃষ্টি করে।

দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রামধনু দেখছি। খাড়া হোগলার পাতাগুলো আমাদের সামনে সারি সারি দর্শকের মত চেয়ে আছে। হোগলা বনের ওপারে একফালি জল রূপোর আভায় চকচক করছে।

কুমু আর আমি, আমাদের এই ভাললাগাটুকুকে দুজনের হাতের বাঁধনে ধরে রেখেছি। কখন যে এই ভাললাগার মুহূর্তে আমরা পরস্পরের হাত ধরেছি তা নিজেরাই জানি না।

রামধনু একসময় ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এল। আমরা একটা অলৌকিক জগৎ থেকে ফিরে এলাম।

ও আমার মুখের দিকে অপরাহ্নের মিষ্টি রোদ্দুরের মত হেসে তাকাল। কোনো কথা বলল না। আমিও নিঃশব্দে ওর হাসির প্রতিবিম্ব ফোটালাম।

কখন দুজনে দুজনের হাত ছেড়ে দিয়েছি।

পেছন ফিরে আর এক অলৌকিক দৃশ্য। তালগাছের পাতার ফাঁকে অপরাহ্নের আলো সোনালী তালপাতার মত চারদিকে ফলক তুলে বেরিয়ে আসছে। একটা বাবুইপাখি বাসার বাইরে আধখানা শরীর বের করে সে দৃশ্য

উপভোগ করছে।

সন্ধ্যাটি বড় নিবিড় হয়ে কাটল আমাদের। দুটি মুড়ি চিবিয়ে দুদণ্ড তামাক সেবন করে পানুদা রাতের মত ঢুকল কাঁথার আড়ালে। শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা বসন্ত পানুদার অবলম্বন ঐ একটি কাঁথা।

আমরা হেরিকেন জেলে দুয়ার বন্ধ করে বসেছি। কুমু তার বইপত্র কুলুঙ্গী থেকে পেড়ে এনে সামনে সাজিয়ে রেখেছে।

বললাম, এই যে দেখছি, মেঘদূতটিও রয়েছে।

কুমু বলল, মদন পণ্ডিতমশাই এনে দিয়েছেন।

আবার ধাক্কা খেলাম।

মদন পণ্ডিতমশাইটি কে?

মদনমোহন ত্রিপাঠী। উনিই তো আমাকে সংস্কৃত পড়ান। ওবেলা বললাম না, গুরুদেব তীর্থে গেছেন।

নিজেকে মনে মনে শাসন করলাম। আমার কেন এমন হয়? ঈর্ষার সূক্ষ্ম কাঁটা কেন এমন করে আমাকে বিদ্ধ করে? বড় সংকীর্ণ মন আমার। আমি নিশ্চয়ই কুমুকে ভালবেসে ফেলেছি। নাহলে ওর আর আমার মাঝখানে অন্য কেউ এসে দাঁড়ালে এমন করে মনের মধ্যে আগুন জলে ওঠে কেন।

আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে কিছু ভাবছি দেখে কুমু বলল, কি হল তোমার?

কিছু না বলে মেঘদূতখানা টেনে নিয়ে পড়তে লাগলাম।

কুমু বলল, আমি এর অনেকগুলো শ্লোক মুখস্থ করে ফেলেছি। শুনবে? ঐ যে আমরা মেঘের বুকে বকের পাতি উড়তে দেখলাম।

'মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধান-ক্ষণ-পরিচয়ান্নুনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়ন-সুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥

বললাম, কি সুন্দর সুরেলা উচ্চারণ তোমার!

কুমু বলল, তুমি বাড়িয়ে বলছ হাবুলদা। মদন পণ্ডিতমশাই খালি ভুল ধরেন, উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে না। মানে বুঝে বুঝে ঠিকমত আবৃত্তি কর।

বললাম, আমি ওঁর মত সংস্কৃত পণ্ডিত নই যে তোমার ভুল ধরব। তবে তোমার গলায় সংস্কৃত যে শুনবে তারই ভাল লাগবে।

কিছুক্ষণ ওর মুখে আরও কয়েকটা আবৃত্তি শুনলাম।

কেমন লাগছে তোমার? জানতে চাইল কুমু।

ভাল লাগছে বললে সবটা বলা হবে না। শুধু এটুকু বলব, এ যাত্রায় আমার লাভ তোমার আবৃত্তি শোনা।

কুমু বলল, তোমার কথায় আমি একটুও খুশী হইনি হাবুলদা।

সে কি!

বিশ্বাস কর, আমি খুব দুঃখ পেয়েছি।

আমি কি তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য ও-কথা বলেছি ?

তুমি বুঝবে না, আমি কি বলতে চাইছি ।

হঠাৎ ওর হাতটা ছুঁয়ে বললাম, আমার ভুলটা তুমি ধরিয়ে দেবে না কুমু ?

ও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল । আমি যেখানে ওর হাতটিকে ছুঁয়ে আছি সেখানে ও স্থির দুটো চোখ পেতে রইল । হাত সরিয়ে নিল না ।

ওর চোখ থেকে টপ টপ করে দুফোঁটা জল আমার হাতের ওপর পড়ল । আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম, কুমু, আমি কি এমন অপরাধ করেছি যে তুমি এমন করে চোখের জল ফেললে ?

ও আঁচল টেনে মুখখানা মুছে নিল । তারপর বৃষ্টি শেষে নরম আলোর মত একটুখানি হাসি ফুটিয়ে বলল, তুমি এমন করে কথা বললে তাই তো কাঁদলাম ।

এখনও আমি আমার ভুলটা ধরতে পারিনি কুমু ।

এ যাত্রায় তুমি কি কুমুকে শুধু তার আবৃত্তির জন্য মনে রাখবে ?

এখন বুঝতে পারলাম, আমার মত নির্বোধ দুটি নেই । শ্রাবণের হাওয়ার সঙ্গে বর্ষার যে সম্পর্ক আমার সঙ্গে কুমুর কয়েক ঘণ্টার ভেতর সে সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে ।

বললাম, সেদিনের কুমু যে আজ ঝিলের জলে ফুটে ওঠা কুমুদিনী হয়ে দেখা দিয়েছে তা আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল ।

কুমু আর বসল না । উঠে দাঁড়িয়েই চঞ্চল পায়ে চলতে শুরু করল ।

বললাম, চলে যেও না কুমু ।

ও ফিরে দাঁড়াল । আমি সেই মুহূর্তে কুমুর মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলাম । কুমুকে এর আগে আমি এত রূপ নিয়ে দাঁড়াতে দেখিনি ।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, কিসের ছোঁয়ায় একটি মানুষ মুহূর্তে এমন করে বদলে যায় ! তার রঙ, তার দৃষ্টি, সারা মুখের আদলটাই ।

কিছু বলবে ?

বললাম, কুমু তোমাকে এই মুহূর্তে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে । আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না, আজ পথের ধারে আমি কি কুড়িয়ে পেলাম ।

ও দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, ওতে আর যাই মিটুক, খিদে মিটবে না । আমি রাতের খাবারের যোগাড় দেখি গে ।

ও দ্রুত পায়ে চলে গেল । আমি ওকে আর বাধা দিলাম না । কি এক আশ্চর্য প্রাপ্তিতে মন আমার ভরে উঠেছে । আমি কুমুর একখানা খাতা টেনে নিলাম । আমার জামার পকেট থেকে ফাউনটেন পেনটা বের করলাম ।

মেঘদূতের যে শ্লোকটা কুমু আবৃত্তি করে গেল সেটা বই খুঁজে বের করলাম । আমার যতটুকু ক্ষমতা তাতেই ওটা কুমুর খাতার পাতায় অনুবাদ করে লিখে দিলাম ।

বহিছে সমীরণ সুধীর সানুরাগে ।
মাতিছে গীতরসে চাতক বাম ভাগে ॥

নয়ন মনোহর তোমারি সেবা তরে।
বলাকা মালা গেঁথে চলেছে সারে সারে ।।
মধুর মিলনের কামনা ভরা মনে।
তোমার আড়ালটি খুঁজিছে ক্ষণে ক্ষণে ।।

খাতার পাতা উল্টে যেমন ছিল তেমনি রেখে দিলাম।

খাওয়াদাওয়ায় মন ছিল না। কিছু খেলাম। কুমু খালি বলতে লাগল, কিছু খেলে না, শুধু পাতে বসা তোমার সার হল।

ওকে কি করে বোঝাই, মন ভরে থাকলে সব কিছু ভরা থাকে।

রাতে একই ঘরের দুপ্রান্তে শুয়েছি দুজনে। প্রথমে বাইরের দাওয়ায় বিছানা পাতা হয়েছিল আমার। কুমু বলেছিল, চেষ্টা করে দেখতে পার, তবে আমার মনে হয় না, শুতে পারবে।

আমার জেদেই বিছানা হল বাইরে। দেখাই যাক না।

শুয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি তাড়া করল। জলের ছাঁট এসে লাগল মশারিতে। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। অমনি টুক করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল কুমু।

বলল, বাইরে শুতে পারবে না কিছুতেই, ভিজে একশা হবে, চল ভেতরে যাই।

দুজনে ঘরের দুপ্রান্তে শুয়ে আছি। সম্ভবত কারু চোখে ঘুম নেই। ব্যাঙের ডাক উঠেছে চরাচর কাঁপিয়ে। ঝেঁপে এসেছে বৃষ্টি! উলিতে জল ঝরে পড়ার একটানা শব্দ। জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের শিরা উপশিরা। মেঘ ডাকছে। কখনও বা দারুণ শব্দ করে বাজ পড়ছে। আমার মনে কুমুর উপস্থিতি।

কিছুক্ষণ পরে কুমুর গলা পেলাম, ঘুমিয়ে পড়লে হাবুলদা?

মনে হল, নদী পেরিয়ে, বৃষ্টির চিক ঠেলে শব্দগুলো আমার কানে এসে পৌঁছল। শব্দতে কি এত যাদু থাকে!

বললাম, ঘুম আসছে না।

আমি একটু তোমার বিছানার পাশে যাব?

আমার গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

ইতিমধ্যে পায়ের সাড়া পেলাম। কুমু আসছে আমার বিছানার ধারে। ও মশারীর খানিকটা তুলে ফেলল।

আমি উত্তেজনায় উঠে বসেছি। একটা হাত বিছানার মধ্যে ঢুকে এল। ঘন ঘন বিদ্যুতের চমকে আমি হাতখানা চিনতে পেরেছিলাম।

অত ভাবছ কি?

ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার খালি গায়ে একটা স্পর্শ পেলাম। কুমুর আঙুলের ডগাগুলো কি আমাকে ছুঁয়ে গেল। ভয়, আনন্দ, উত্তেজনায় তখন আমি রীতিমত রোমাঞ্চিত।

কুমুর গলা একেবারে বুকে এসে বাজল।

অসময়ে অজস্র মোতিয়া বেল ফুটেছে, তোমাকে দেব বলে তুলে এনেছিলাম। তোমার বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে গেলাম, ভারী মিষ্টি গন্ধ।

মশারি গুঁজে দিয়ে কুমু চলে গেল।

এক স্বর্গীয় সুবাসের স্পর্শে আমি আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম।

কুমুর বাবা এলেন সকাল সকাল। আমাকে দেখে ভারী খুশী হলেন। আমি রাতে ছিলাম শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কোন অসুবিধে হয়নি তো বাবা?

একটুও না। খুব আনন্দে কেটেছে। ছোট বোনের মত কুমু সারাক্ষণ আমাকে শাসন করেছে।

দীননাথ হেসে বললেন, পাগলীর ঐ এক স্বভাব।

সকাল সকাল খেয়ে ছাতা মাথায় বেরিয়ে গেলেন ইস্কুলের দিকে। আমাকে যাবার সময় বললেন, এই ঘরটাকে নিজের বাড়ি বলে ভেবো। পারাপারের পথে যখনই সুনিয়া খেয়াঘাটের দিকে আসবে, আমার বাড়িতে ওঠার কথা ভুলো না কিন্তু। মেয়েটা বড় একা, মানুষজনের দেখা পেলে ভারী খুশী হয়ে ওঠে।

দুপুরে খাবার পর আমিও বেরুলাম। বৃষ্টিটা কিছু সময় থেমে আছে। কুমু সঙ্গে এল পার ঘাট অব্দি। ওপার থেকে খেয়া আসছে। এপারে আমি ছাড়া দ্বিতীয় পারার্থী নেই।

আমার দিকে ফিরে কুমু বলল, আমি তোমার বোন?

বলেছি বুঝি?

ঐ তো তুমি বাবার সামনে বললে।

তাহলে তুমি আমার কে?

কেউ না।

কথাটা বলেই কুমু আর দাঁড়াল না। ওর সেই দানছত্রের দিকে চলে গেল।

আমার নৌকো এপারে ভিড়তেই আমি নীচে নামার জন্য তৈরী হলাম। একেবারে জলের ধারে নেমে যাবার আগে পেছন ফিরে তাকালাম। কোথাও কুমু নেই। ততক্ষণে সে তার ঐ ঝোপড়ির ভেতর সেঁধিয়েছে।

আমি বিলক্ষণ জানি, আমার চোখে ধরা না দিলেও কুমু তার জলসত্রের কোন এক ছিদ্র পথে তার ক্ষণিকের দিকে চেয়ে আছে।

আমি নেমে যেতে যেতে মনে মনে বললাম, তুমি কোন আড়ালে লুকোবে কুমু? একজনের বুকের মধ্যিখানে তুমি চিরদিনের বাসা বেঁধেছ। সেখানে শুধু মোতিয়া বেল ফোটে না, কনক চাঁপাও ফোটে। বর্ষা বসন্তের আকুল উৎসব চলে তার অন্তরঙ্গ আঙিনাটি ঘিরে।

মা এখন পাকাপাকিভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেছে দেশের বাড়িতে। আগে বেশী সময় থাকতে হত চাষ বাড়িতে। বাবা মারা যাবার পরে নাবালক ছেলেদের জমি জায়গা ডুবতে বসেছিল। বার ভূতে লুটেপুটে খাবার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। মা শক্ত হাতে হাল ধরে সামান্য যা কিছু ছিল তাকে

গ্রছিয়েছে। এগারো বছরে বউটি হয়ে এসেছিল মা। তখন বাড়ি সরগরম। গন্ডায় গন্ডায় ঝি চাকরে ঘর ভর্তি। ওরা দাস দাসী ছিল না, বাড়ির লোক হয়ে গিয়েছিল। ওদের জমি জায়গা দান করে ঘর তুলে বিয়ে দেওয়া হত। আবার ওদের ছেলেমেয়েরাই একদিন যোয়ান হয়ে আসত আমাদের বাড়ি কাজ করতে।

সকাল সন্ধ্যে পঞ্চচূড় মন্দিরে লক্ষ্মী জনার্দনের আরতি হত। গান গাইত কীর্তনিয়ার দল। উৎসবে, হোমে, যজ্ঞে সে এক উন্মাদনা।

কোজাগরীতে গজলক্ষ্মীর পুজো। সারারাত বাজি, ভোজ আর নৌবিহার।

সাগর মেলার একমাস আগে থেকে অন্তত পঞ্চাশ ষাটজন নাগা সন্ন্যাসী চলে আসত। তাদের সিধে দিতে হত একমাস ধরে। কখনো বা সঙ্গে নিয়ে আসত হাতি। তার খোরাকও যোগাতে হত।

বাবুয়ানির ঠাটঠমক বজায় রাখতে গিয়ে লাটে উঠল জমিদারী। ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেল শরিকে শরিকে। পুরনো বাস্তু ছেড়ে নতুন কুঠি বানিয়ে সরে গেল প্রায় সবাই। বাস্তু ভাগের টাকা যোগাতে মা হারাল সম্পত্তির অনেকখানি।

মা দোতলার একটা কোণ দেখিয়ে বলে, এখানে প্রথমে বউ হয়ে এসে বসেছিলাম, এখানেই আমি মরব।

বলি, পুরনো বাড়ি সারাতে যে মা অনেক খরচ।

লক্ষ্মী জনার্দনের মন্দিরের দিকে আঙুল তুলে মা বলে, সব ভাবনা তাঁর, যিনি মন্দিরে বসে আছেন।

এই কিছুকাল আগে হুড়মুড় করে মাঝরাতে ভেঙে পড়ল মন্দির।

বট অশ্বত্থ শেকড় চারিয়ে দিয়েছিল মন্দিরের অনেক গভীরে। ওপর থেকে ডালপালা ছাঁটাই হলে কি হবে বর্ষার জল ঢুকত শেকড় বেয়ে ফাঁক-ফোকরে।

সন্ধ্যারতির সময় কীর্তনিয়ারা লক্ষ্মী জনার্দন প্রভুর নাম-গান করে গেছে। নিত্যকার মত হুটোপুটি খেলে গেছে ছেলেমেয়েরা। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে মানুষজন তখন ঘুমে অচেতন। হঠাৎ গুম গুম, হুড় হুড় আওয়াজে বাড়ি কেঁপে উঠল।

ভূমিকম্প! ভূমিকম্প! বাড়ির বাইরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বেরিয়ে এল সবাই।

মন্দির কই? মন্দির!

পাশের পুষ্করিণীতে দেবালয়ের পাঁচটি চুড়ো সলিল-সমাধি লাভ করেছে।

বললাম, মা, তোমার মন্দির যে গেল।

মায়ের জবাব, ঠাকুর তো রয়েছেন। নিজের ঐশ্বর্যের চূড়া নিজে ভাঙলেন, আমার কি।

মা ছোট্ট একটি পাকার কুঠি করে দিল। তাতেই রয়ে গেলেন রাজরাজেশ্বর।

ঐশ্বর্যের ঐরাবত অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের তলানি ঘেঁটে সংসার চালাচ্ছিল মা। চাষ-বাড়ির জমি-জায়গা খতম হয়ে গিয়েছিল দেনার দায়ে। দশ বিশ বিঘে যা অবশিষ্ট ছিল তাই গোছগাছ করে যে ফসল পাওয়া যেত তাতে চলত না সারা বছর। এদিকে ঠাকুর সেবার ভার। ওদিকে বিত্তবান আত্মীয়দের আনাগোনা লেগে থাকত সারা বছর। এক একজনের সঙ্গে আসত খাস চাকর আর দাসী। স্নানের সময় দেহ দলাইমলাই। স্নান শেষে কোঁচানো কাপড় হাতে ধরিয়ে দেওয়া।

ঝিউড়িদের ছেলেমেয়ে নিয়ে নানা ঝঞ্ঝাট। তাদের সামলাতে দাসী আনতে হয় সঙ্গে। সেসব দাসী এ বাড়ির কুটোটি নাড়বে না, তারা কুটুমের সঙ্গে এসেছে, তাদের মান নেই বুঝি ?

সুতরাং সব চাপ হাসি মুখে সহ্য করতে হয় মাকে।

ঝড় বয়ে যাবার পর প্রকৃতির যেমন হাত পা ভাঙা অবস্থা, মায়ের সংসারেরও তাই।

মা নিজের হাতে মুড়ি ভাজত, আমরা তেল মাখিয়ে, পেঁয়াজ দিয়ে খেতাম।

মা সন্ধ্যাবেলা রান্না করত আর গল্প শোনাত। কি অদ্ভুত আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল মায়ের গল্প বলার।

মামারবাড়ি গেলে মা দাদামশায়ের আলমারী খুলে বই আনত। দাদামশাই ছিলেন নাম করা কবিরাজ। অল্প বয়সে মেয়ে বিধবা হলে দাদামশাই মাকে পড়াশোনার জন্য তাঁর বই-এর আলমারী খুলে দিয়েছিলেন। কত বই যে মা সেখান থেকে পড়েছে তার ঠিকানা নেই। দাদামশাই মারা যাবার পর আজও মা সেখান থেকে বই নিয়ে আসে। তাছাড়া আশপাশের লাইব্রেরী থেকে আমরা মাকে বই এনে দি।

ছোট ঠাকুর্দার পৈতৃক বাড়ির অংশ মা কিনেছে। ছোট ঠাকুর্দা এখন তাঁর আলাদা চাষ-বাড়িতে থাকেন। সুন্দরবনের কিছু সম্পত্তি পেয়েছেন তিনি। চাষ-বাড়ি থেকে সুন্দরবন যাবার পথে কিছুদিন তিনি কাটিয়ে যান মায়ের আশ্রয়ে। ছোট ঠাকুর্দা এলে কষ্টের ভেতরেও মায়ের খুশী খুশী মুখখানা দেখা যায়।

আজ কি রান্না করছ মা ? কতদিন তোমার হাতে ওলের ডালনা খাইনি।

আপনি কদিন থাকুন বাবা, আমি ডালনা রান্না করে খাওয়াব।

ছোট ঠাকুর্দার নেশা দুটো। বই পড়া আর গান গাওয়া। বিশেষ করে শ্যামাসঙ্গীত। ছোট্ট একটি খাতায় মুক্তোর অক্ষরে অজস্র শ্যামাসঙ্গীত লিখে রেখেছেন।

ভারী আবেগপ্রবণ মানুষটি। আমি ছোট ঠাকুর্দার পাশে পাশে থাকতাম ছেলেবেলা।

কোনো একটা বই পড়তে পড়তে, বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের বই, হা হা করে হঠাৎ কেঁদে উঠতেন। বইখানা নিয়ে ওপরের বারান্দা পেরিয়ে ছুটতেন নিচে

রান্নাঘরের দিকে। আমি অবাক হয়ে দেখতাম, মানুষটির বেশবাস অসম্বৃত হয়ে পড়েছে। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। মায়ের কাছে পেঁাছেই বলতেন, দেখ, দেখ মা কি লিখেছেন শরৎচন্দ্র।

অমনি বসে যাওয়া হল রান্নাঘরে। মা রান্না করতে করতে শুনছে আর ছোট ঠাকুর্দা পড়ে চলেছেন 'নিষ্কৃতি'। আবেগের জায়গাগুলোতে সেই ফুঁপিয়ে ওঠা।

আমার প্রপিতামহের তিন ছেলের তিন মূর্তি। শুনেছি, ঠাকুর্দা ছিলেন মাটির মানুষ। চাষ-বাড়ির চাষাভুষো, জেলে বাগদী তাঁর বড় প্রিয় ছিল। বড়কর্তাকে তারা দুঃখের কথা জানালে তিনি সাধ্যমত প্রতিকারের চেষ্টা করতেন।

আকালের সময়, কার্তিকা টানের সময় প্রজারা কাছারি থেকে ধান বাড় নিয়ে যেত টিপসহি দিয়ে। ফসল উঠলে শোধ দিতে হবে দ্বিগুণ, এই শর্তে।

ফসল উঠত। চাষারা যা পেত ধান ঝাড়াই করে তার সবটাই প্রায় রেখে যেতে হতো মালিকের ঘরে। কাঁদতে কাঁদতে শূন্য হাতে ঘরে ফিরত তারা। কাছারি ঘরে গোমস্তা, বঙ্কি পাটকের সামনে বড়কর্তার কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেও তিনি টলতেন না। জমিদারী সেরেস্তার একটা কানুন আছে তো।

সন্ধ্যে নামলেই বড়কর্তার খাস চাকর কৈলাস বেরিয়ে যেত। প্রজাদের ঘরে ঘরে ঘুরত সে।

দুপুর রাতে দেখা যেত মরাই থেকে যে যার প্রাপ্য ধান নিয়ে গোপনে মাঠের পথে বেরিয়ে যাচ্ছে।

গোমস্তাদের ঘটনাটা জানতে দিতে চাইতেন না বড়কর্তা। মেজবাবুর কানে কথাটা না পেঁাছয় তাই এই সাবধানতা।

শোনা যায় বড়কর্তা, কান্না একেবারেই সইতে পারতেন না।

একবার এক গরীব বাগদী বাড়ির মেয়ের বিয়ে হল তিন চারখানা গ্রামের ওপারে।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় মেয়ের সে কি আকুল কান্না। পথে যেতে যেতে সে পরিচিত গাছপালা জড়িয়ে ধরে ধরে কাঁদছিল।

বড়কর্তার কানে আওয়াজ পেঁাছতেই তিনি হেঁকে উঠলেন, কে কাঁদে দেখত কৈলাস।

কৈলাস খবর নিয়ে এল। অমনি বড়কর্তা উঠে অন্দরে চলে গেলেন।

বড় বউ, শিগ্‌গির তোমার কানের ইয়ারিং জোড়াটা দাও।

বড় বউয়ের হাতবাক্স খুলে গয়না বের করতে তর সয় না। প্রশ্ন করা তো দূরের কথা।

ছুটলেন কর্তা সেই ইয়ারিং নিয়ে। মেয়ের কাছে পেঁাছতেই সঙ্গীসাথীরা তটস্থ। তারা দ্রুত নমস্কার করে সরে গেল।

বড়কর্তা বললেন, কাঁদলে কিন্তু এ কানের গয়নাটি পাবে না।

সবার চোখ তখন কপালে উঠেছে। মেয়ে চুপ। তার কানের মাকড়ি খুলে

সোনার ইয়ারিং পরানো হল। মেয়ের মুখখানা ঝলমল করে উঠল।

বড়কর্তা বললেন, এখন যেখানে যেতে চাইছ না, কিছুদিন পরে সেখান থেকে আর আসতে চাইবে না। আনন্দে যাও মা, চোখের জল ফেল না।

এরপর গিন্নীমার নির্দেশে কৈলাস বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবর আনত, কার বাড়ির মেয়ের বিয়ের কথা চলছে। তিনি রুপোর গয়না আগেভাগে তৈরী করে রাখতেন। কৈলাসের হাতে পাঠিয়ে দিতেন বিয়ের দিন। নির্দেশ থাকত, মেয়ে যেন কাছারী বাড়ির সামনে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে না যায়।

মেজকর্তার চকবাড়ি ছিল বড়কর্তার সংলগ্ন। ছোট তরফের চাষ-বাড়ি ছিল অনেকখানি দূরে।

মেজকর্তা ছিলেন দীর্ঘদেহী সুদর্শন পুরুষ। বিপত্নীক মানুষটি একাধারে ছিলেন শিল্পী আর সঙ্গীতজ্ঞ।

জল জঙ্গলে ভরা চকবাড়িটিকে তিনি মনোরম করে গড়ে তুলেছিলেন। বাঁধান পুকুরের চারদিকে তালগাছের সারি। তার থেকে ধূসর বোতলের মত ঝুলত বাবুইয়ের বাসা। একটু হাওয়া লাগলেই দোল খেত সেই বাসা। বাবুই পাখিগুলো বাসায় বসে বসে দুলত।

ডানদিকে গোলাপ বাগিচা। নানা জাতের উৎকৃষ্ট গোলাপ ফুটে আলো করে রাখত পরিবেশটা। পেছনে গড়খাইয়ের পাড় সবুজ ঘাসে মোড়া ছিল। বাস্তুর সীমানা ঘিরে গড়খাই। গড়খাইয়ের ওপারে ধানের ক্ষেত নদীতীরে গিয়ে মিশেছে।

বড় এবং মেজকর্তার বাস্তুবাড়ির মাঝখানে গড়খাইয়ের যে অংশ তার ওপর বাঁশের একটি সাঁকো। ভারী সুন্দর হাতল দিয়ে মেজকর্তা সেটি তৈরী করেছিলেন। লতানে গাছে সাঁকোর দুটি পাশ ঢাকা থাকত। মাঝে মাঝে বেগুনি ফুল ফুটত সে লতায়।

মেজকর্তা একবার ঘোড়ায় চড়ে টহলে বেরিয়েছেন, দেখা হয়ে গেল এক সাহেবের সঙ্গে। সাহেব পানসী করে এসেছেন শিকারে, সঙ্গে মেমসাব।

মেজকর্তা সাহেবের বন্দুক নিয়ে নিজের হাতের লক্ষ্যভেদটি দেখালেন। সাহেব তো দারুণ খুশী। তিনি মেমসাবকে সঙ্গে নিয়ে মেজকর্তার আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

দুদিন চকবাংলোতে কাটিয়ে সাহেব যেদিন বিদায় নিলেন, সেদিন মেমসাহেবের হাতে মেজকর্তা একটি উপহার তুলে দিলেন। একগুচ্ছ হলুদ আর লাল গোলাপ। না, এগুলো তাঁর বাগানের ফোটা ফুল নয়, আঁশ কেটে রঙ করে নিজের হাতে তৈরী গোলাপ।

মেমসাহেবের ভুল যেন ভাঙতেই চায় না। মাছের আঁশ কেটে এমন সুন্দর জিনিসও করা যায়!

সাহেব পরে এই স্মৃতির নিদর্শন হিসেবে সোনার কাজ করা একটি রুপোর মেডেল মেজকর্তার কাছে পাঠিয়ে দেন।

সন্ধ্যায় সেতার বাজাতেন মেজকর্তা। তন্ময় হয়ে যেতেন তিনি। সন্ধ্যা

পেরিয়ে রাত ঘনাত। খাওয়া শোওয়ার হুঁশ থাকত না তাঁর। আশ্চর্য এক শ্রোতা পেয়েছিলেন তিনি। বাগদী বাড়ির আটন একটি মেয়ে। বাপ সুন্দরবনে কাঠ কাটতে গিয়ে আর ফেরেনি। মা মাছ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মরেছে।

মেয়েটাকে দেখার কেউ নেই, খেতে দেবারও কেউ নেই। যে যার নিজের ধান্দায় পাগল।

পড়েছিল ঘাটের পাটে। ঘুমিয়েই পড়েছিল। তালগাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয় দেখতে ঘাটে এসে চোখ পড়ল মেয়েটির ওপর।

বেশবাস আর চুলে ভিখিরীর ছাপ। কিন্তু শিল্পী মেজকর্তার চোখকে ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না। এইসব অতি সাধারণ ঘর এমন দেহের গঠন, এমন মুখের আদলও হয়!

খোঁজখবর নিয়ে মেয়েটির সবকিছু জানলেন। তারপর থেকে মেজকর্তার হেপাজতে।

সেতার শোনে রাত বারোটা, একটা অব্দি। চোখে ঘুম নেই, পেটে ক্ষিদে নেই।

ওর আগ্রহ দেখে মেজকর্তা সেতার শেখালেন। ক্রমে ওস্তাদ বাজিয়ে হয়ে উঠল শৈল। সে যুগে এমন একজন মহিলা বাদকের কথা ভাবাই যেত না।

শৈল তরুণী হল। স্বজাতিতে তার ধারে কাছে দাঁড়াতে পারে এমন একটি পাত্র ছিল না। অবশেষে জুটে গেল একটি ছেলে। দেশের কাজ করে বেড়ায়। শিক্ষিত ছেলে, জাতপাতের বিচার নেই। সুশ্রী সুন্দর যুবক। শৈলের বাজনা শুনে মুগ্ধ।

মেজকর্তা বললেন, আমি তোমাদের জমি জায়গা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দেব।

ছেলেটি বলল. তাহলে আর এ বিয়ে হল না।

মেজকর্তা বললেন, কেন, যৌতুক নিতে তোমার আপত্তি?

ঘোরতর আপত্তি। আমি দারিদ্র্যের ভেতর থাকলে আমার স্ত্রীকেও সেই অবস্থায় থাকতে হবে।

আমার মেয়েটিকে কি শুধু শাঁখা সিঁদুরে বিদেয় করব?

ছেলেটি নাকি হেসে বলেছিল, আপনি অনেককিছু দিতে পারবেন, আমি জানি, কিন্তু ঐসব মূল্যবান জিনিস রাখবার জায়গা আমার নেই।

পরে মেজকর্তার অনেক অনুরোধে পাঁচ বিঘের একটা প্লট নিতে রাজী হয়েছিল। মেজকর্তা ছেলেটিকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, এখানে একেবারেই লেখা-পড়ার চল নেই। যদি কখনও সুবিধে হয় ঐ জমিতে একটা ছোটখাট স্কুল বসাতে পার।

ছোটকর্তা শ্যামাসঙ্গীতে মজে থাকতেন। লাটে যাবার পথে পুরাতন পৈতৃক ভিটেতে যখন এসে উঠতেন তখন তাঁর গলায় শ্যামাসঙ্গীত বাজত। বড় বিপর্যয়ের ভেতর কাটছিল তাঁর শেষ দিনগুলো। মায়ের কাছে যে ক'দিন থাকতেন, মায়ের দুঃখে সান্ত্বনা দিতেন। মাও সমব্যথী খুঁজে পেয়েছিল ছোট ঠাকুর্দার ভেতর। তাই কষ্টের দিনেও ছোট ঠাকুর্দাকে মা যত্ন করেছেন,

খাইয়েছেন।

লাটে বার বার বন্যা এসে জমির বাঁধ ভেঙে দিয়ে যেত। সেই সঙ্গে ভাঙত ছোট ঠাকুর্দার কপাল। চড়া সুদে ধারধোর করে টাকা নিয়ে ছুটতেন! কিন্তু ফসল বেচে টাকা পরিশোধের বড় একটা সুযোগ পেতেন না তিনি। বারে বারে বাঁধ বাঁধার চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়ে যেত।

একটি শ্যামাসঙ্গীত এ সময় তাঁকে প্রায়ই গাইতে শুনতাম।

'মায়ের এমনি বিচার বটে
যেজন দিবানিশি দুর্গা ভজে—
তার কপালে বিপদ ঘটে।'

গানটি গাইতেন আর অঝোরে কাঁদতেন। মা কাছে-পিঠে থাকলে এগিয়ে এসে আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতেন। মুখে বলতেন, আসুন বাবা, কিছু খাবেন আসুন।

সেই ছোট ঠাকুর্দা শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। লাট থেকে নৌকোয় ফেরার সময় গলুইতে বসে গানের খাতাটি খুলে গান করছিলেন, হঠাৎ নৌকোর আচমকা দুলুনিতে খাতা পড়ে গেল জলে। হাহাকার, আক্ষেপ আর চোখের জল সেই থেকে হল সম্বল।

ঠাকুর্দা আর পৈতৃক ভিটেতে আসেননি। চাষ-বাড়িতেই তাঁর শেষের ক'টা দিন কেটেছিল। অন্ধ হবার পর মাকে লোক মারফৎ একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

মা নৌকো করে গিয়েছিল। আমিও সে যাত্রায় সঙ্গে ছিলাম।

মা প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালে অন্ধ মানুষটি হাতড়ে হাতড়ে মায়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, অনেক দুঃখ পেয়েছ জীবনে, সুখী হবে মা। তোমার সকল কষ্ট বিধাতা আমাকে দিন।

মা অমনি বলল, এঁকি বলছেন বাবা, বরং আশীর্বাদ করুন, ভগবানের দেওয়া দুঃখটুকু যেন হাসি মুখে বইতে পারি।

তাই হবে মা। তোমার মনের জোরই তোমাকে বিপদসাগর পার করে দেবে।

মায়ের সঙ্গে ছোট ঠাকুর্দার সেই শেষ দেখা।

সন্ধ্যার মুখোমুখি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়িতে এসে ঢুকলাম। দোতলার বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে উঠে এসে ঐ ভেজা পোশাকে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মা কাপড় দিয়ে মুখ মাথা মুছিয়ে বলল, ছাতা কেনার কথা চিঠিতে লিখে দিয়েছিলাম, তুই একটা ছাতা কিনতে পারিসনি।

বললাম, দেখ মা, ছাতা যদি কিনতাম তাহলে ছাতা আর টাকা দুটোর শোকই তোমাকে বইতে হতো। তুমি তো জান, ছাতা আমার ধাতে সয় না। কিনলে ওটা পরের মাথা ঢাকা দেবার জন্যেই কিনতে হবে।

মা বলল, তুই বৈঠকে দাঁড়া, আমি কাপড় এনে দিচ্ছি।

কাপড় ছেড়ে চালভাজা আর নারকেল চিবুতে চিবুতে মায়ের সঙ্গে গল্প

করতে লাগলাম।

কখন বেরিয়েছিলি যে এমন সন্ধ্যে হয়ে গেল ? তোর মামাবাড়ি থেকে তত্ত্ব নিয়ে আসত পহলদা। ভোরবেলা বেরিয়ে ঠিক তিনটের ভেতর এসে পেঁছিত। শেষ যেবার এলো, একঘণ্টা দেরী। বললাম, এবার যে বড় দেরী হল তোমার ?

বলল, কি করব দিদি, বয়সটা যে বেড়ে গেল। হাঁটুর কলকব্জা বিগড়ে গেছে। বসলে সহসা উঠতে পারি না। অনেকটা পথ তরতরিয়ে হেঁটে এলে আজকাল হাঁপ ধরে।

পারতপক্ষে আমি মিছে কথা বলি না, মায়ের কাছে তো নয়ই। বললাম, কাল ভোরবেলা বেরিয়ে আজ এই সন্ধ্যায় তোমার কাছে এসে পেঁছিলাম মা।

সে আবার কি !

সত্যি বলছি মা।

কারু বাড়ি ছিলে নাকি ? পথে তো আমাদের কোনো কুটুমবাড়ি পড়ে না।

একজনের বাড়ি ছিলাম।

কার বাড়ি রে ?

এক মাস্টারমশায়ের বাড়ি।

তোর কলেজের মাস্টারমশাই ? একই সঙ্গে এসেছিলি বুঝি ?

না মা। সেই যে সাইক্লোনের পরে টাউন থেকে দেশে আসার সময় এক মাস্টারমশাই তাঁর ডিঙিতে আমাকে নদী পার করে দিয়েছিলেন, মনে নেই তোমার ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দীনবন্ধু, না কি নাম যেন।

দীননাথ মিশ্র।

তুই তাঁর বাড়িতে ছিলি, কেন রে ?

বললাম, উনি সেবার কত উপকার করেছিলেন। তাই আসার সময় দেখা করতে গিয়ে কিছুতেই ছাড়া পেলাম না।

দীননাথ মিশ্র যে সে রাতে বাড়ি ছিলেন না, সে কথা আর মাকে বললাম না। মাও জিজ্ঞেস করল না। শুধু বলল, হ্যাঁরে মাস্টারমশায়ের একটি মেয়ে ছিল না ?

এখনও আছে মা।

কি যেন নাম তার ?

কুমু বলে ডাকে, কুমুদিনী মিশ্র।

কত বয়স হবে রে ?

আমি কি মুখ দেখে বলতে পারি মা। তবে মনে হয়, পনেরো ষোল হবে।

বামুন বাড়ির মেয়ে, এখনও বিয়ে হয়নি ?

কই কপালে, সিঁথিতে তো সিঁদুর দেখলাম না। হয়তো পাত্র খোঁজা চলছে, পেলেই বিয়ে হয়ে যাবে।

বড় ভাল মানুষ মাস্টারমশাইটি না রে ? তোকে কেমন আদর করে বাড়িতে রেখে দিলেন।

বললাম, ওঁরা মানুষ খুব ভাল মা।

মা নিজের মনেই যেন বলে উঠল, এ দুনিয়ায় কত ভাল লোক যে কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

মা যদি সোজাসুজি আবার কুমুর প্রসঙ্গে এসে পড়ে তাই অন্য কথা পাড়লাম।

হ্যাঁ মা, এখানে স্বাধীনতা দিবসের কোনো আয়োজন হয়নি?

হয়নি কি রে! কত সাজসজ্জা, কত বক্তৃতা, প্রভাত ফেরি। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা গান গেয়ে মাৎ করে দিলে।

তোদের পাঠশালার পূর্ণানন্দ মাস্টারমশায় কি সুন্দর স্বাধীনতার রথ তৈরী করেছিলেন। পথের ওপর দিয়ে ছেলেরা সে রথ টেনে নিয়ে গেল। রথের চারদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের নানা ছবি আঁকা। কত কবিতার লাইন লেখা ছিল রথের গায়ে। ছেলেরা গাইছিল নজরুলের গান।

কি গান গাইছিল মা?

মা অমনি গাইতে শুরু করে দিলেঃ

চলরে চলরে চলরে চল
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চল।

উদাত্ত গলার গান মা চাপা গলায় গাইল। তবু প্রাণে এসে লাগল সে গান।

গান থামিয়ে মা বলল, স্বাধীনতার দিন লবণ আইন অমান্যের কথা খুব মনে পড়ছিল। তোকে কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা নুন তৈরী করছিলাম। নিকুঞ্জবাবু বক্তৃতা দিতে উঠলেন। লবণ আইন অমান্যের কারণটি সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন। মানুষটি যেমন সুদর্শন তেমনি সরল সুন্দর তাঁর ভাষণ। মাঝে মাঝে আবেগে কাঁপছিল তাঁর গলা। পুলিস এসে ওঁকে অ্যারেস্ট করা মাত্র জনতা উত্তাল হয়ে উঠল। চারদিকে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। সে দিনগুলোর কথা কি ভোলা যায় রে।

মায়ের কাছে কাটালাম কদিন। রাতে শুতে যেতাম বোর্ডিং-এ।

গোবর্ধনদা তেমনি বোর্ডিং-এর ছেলেদের তদারকি করে যাচ্ছে।

কি রে হাবলা, এবার যে তুই বেমালুম পথ ভুলে গেলি?

কেন গোবর্ধনদা?

মনে মনে ভেবে দেখ।

বিশ্বাস কর, কাল সন্ধ্যায় এসে বাড়িতে ছিলাম, আজ তোমার কাছে সটান চলে এসেছি।

গোবর্ধনদা অমনি বলল, আমি ধন্য হয়ে গেলাম।

চুপ করে আছি দেখে গোবর্ধনদা আরও একধাপ গলা চড়িয়ে বলল,

প্রতিবার সবার আগে এই বোর্ডিং ছুঁয়ে যেতিস, আজকাল কলেজে ঢুকে উন্নতি হয়েছে। সোজা এখন বাড়ি চলে যাস।

আমি গোবর্ধনদার হাঁটুখানা জড়িয়ে ধরে বললাম, বেইমানটাকে ক্ষমা করে দাও গোবর্ধনদা।

ওঠ, আর ন্যাকামি করতে হবে না। আজ না এলে তোর ভাগের বাদাম বরফি আর কারু পেটে যেত।

কে আনল গোবর্ধনদা?

দীপা নিয়ে এসেছে কাল সন্ধ্যায়। তোর আসার খবর পেয়ে একটা ভাগ তোর জন্যেও রেখে দেওয়া হয়েছে।

হাত পাতলাম।

গোবর্ধনদা এক ধমক দিয়ে বলল, ট্যাঁকে করে এনেছি নাকি? দীপার কাছে যা, সে রেখেছে।

বললাম, আজ রাতে তোমার ঘরে শোবার জায়গা হবে তো?

তুই একেবারে শহুরে হয়ে গেছিস হাবলা। আগে হলে হেঁকে বলতিস, শুতে এলাম গোবর্ধনদা।

বললাম, আমি দীপাদির কাছ থেকে আগে ঘুরে আসি।

আয়। আমিও পাড়ায় রান্নার তেল আনতে যাচ্ছি। তুই আজ সন্ধ্যায় এখানে কেবল শুবি না, খাবিও। আমার গেস্ট।

আমি মাথা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করে দীপাদির বাড়ি ছুটলাম।

হেডমাস্টার আনন্দবাবু সামনেই বসেছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, কবে এলে?

প্রণাম করে বললাম, কাল সন্ধ্যায়।

কলকাতার কলেজ কেমন লাগছে?

বললাম, আমি তো আমার আগের কলেজেই চলে এসেছি।

তাই বুঝি? তা বেশ করেছ। এখনও এন. সি. রায় মশায় প্রিন্সিপাল আছেন তো?

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

আনন্দবাবু বললেন, শিক্ষা জীবনের দিনগুলোতে যে উন্মাদনা, সে আর কোথাও নেই। আমরা তখন বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র। কলকাতায় রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল রবি ঘোষের খুব নাম ডাক। ইংরাজী পড়ানোর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অমনি আমরা ক'বন্ধুতে মিলে ট্রেনে চেপে বসলাম। শিয়ালদার একটা হোটেলে থেকে পরের দিন ক্লাশ করলাম রবি ঘোষ মশায়ের। সে কি পড়ানো। আজও সেদিনের ছবি চোখের ওপর ভাসে।

স্মৃতির জগতে সামান্য কিছু সময় বিচরণ করে আনন্দবাবু বললেন, ভেতরে যাও, দীপা ওখানে আছে।

ভেতরে ঢুকে দেখি, দীপাদি একটা বাটিতে মুড়ি ঢালছে। আমাকে দেখে বলল, তোর গলা পেয়েছি, আয় মুড়ি খাবি। সকালে ডালের বড়া ভেজেছি।

বললাম, আমার বাদাম বরফি ?

ও, সেটাও শোনা হয়ে গেছে। গোবর্ধনদা কাল কটা সাঁটিয়েছে জানিস ? দশটা।

কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, আমার ভাগ নেই দীপাদি ?

যখন কানে এসেছে তোমার আগমন-সংবাদ তখন না রেখে উপায় কি।

দীপাদি বড়া ভাজা সহ একবাটি মুড়ি আমার হাতে ধরিয়ে দিল।

খা, আমি বরফি এনে দিচ্ছি।

মুড়ি খেতে খেতে ভাবছি, কত সহজে দীপাদি সবাইকে কাছে টেনে নিতে পারে।

দীপাদি এসে আমার কাছে বসল। বলল, তুই নাকি দাঙ্গার সময় কলকাতাতে ছিলি হাবলু ?

কে বললে তোমাকে ?

যেই বলুক, ঠিক কিনা বল না ?

ছিলাম দীপাদি। দারুণ ভয়ে রাতদিন সিঁটিয়ে থাকতাম। কত মারামারি, খুনখারাবি যে দেখেছি, বলে শেষ করতে পারব না।

দীপাদি বলল, চিরকালটা তুই একটা ভীতু রয়ে গেলি।

আত্মসম্মানে লাগল। ক্ষেপে গিয়ে বললাম, পাগলা কুকুর যদি হাটের মাঝখানে ঢুকে পড়ে এলোপাথাড়ি কামড়াতে থাকে, তাহলে আমি কি চুপচাপ তার কামড়ের অপেক্ষায় হাটে দাঁড়িয়ে থাকব, না বুদ্ধিমানের মত আড়ালে সরে যাব ?

দীপাদি হেসে চেঁচিয়ে উঠল, বাবা শুনছ, আমাদের হাবলু কি রকম বুদ্ধিমানের মত হিন্দুমুসলমানের রায়টের ওপর তার প্রতিক্রিয়াগুলো বলে যাচ্ছে।

আনন্দবাবু বললেন, সাবাস, সব শুনেছি আমি বাইরে বসে।

দীপাদি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, না হাবলু, তোমার পথটা কোন কাজের নয়। ওটা কেবল নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা।

বললাম, ঐ অবস্থায় আমার কি করণীয় আছে বল ?

কেন, জামাখানা খুলে ফেলবে। ঐ জামা দিয়ে জাপটে ধরবে পাগলা কুকুরটাকে। তারপর ওকে আছড়ে মেরে ফেলবে।

তর্ক জুড়ে দিলাম, পাগলা কুকুরটাকে ধরতে গেলে ও কামড়াতে পারে।

পরে চিকিৎসা করাতে পারবে। কিন্তু তুমি নিজে রিস্ক নিয়ে এতগুলো মানুষকে ক্ষ্যাপা কুকুরের কামড় থেকে রক্ষা করতে পার।

বললাম, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ দীপাদি, তবে ঐ দাঙ্গা থামানোর ক্ষমতা কারু একার কর্ম নয়।

দীপাদি বলল, আমাদের কিন্তু কথা হচ্ছিল সাহস নিয়ে। সাহসের অভাবেই কিন্তু আমরা হেরে গেলাম।

হেরে গেলাম, এ কথা তুমি বলছ কি করে। আমরা তো স্বাধীনতা

পেয়ে গেছি।

তুমি বুঝবে না হাবলু, স্বাধীনতা অর্জনের খেলায় আমরা হেরে একেবারে ভূত হয়ে গেছি। আমরা সাহসী হলে পাগলা কুকুরটাকে তেড়ে মারতে পারতাম। ওটাকে প্রথমেই মারতে হত, এখন আর উপায় নেই। ও একদিন নিজেও মরবে, অন্য অনেককে মারবে।

এ স্বাধীনতায় তুমি খুশী হওনি দীপাদি?

একটুও না। এখন চারদিকে সমারোহের উচ্ছ্বাস, আমি মনে করি এটা প্রবল শোকের সময়। যাঁরা দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের আত্মা কি মায়ের খণ্ডিত এই রূপ দেখে শান্তি পাবে?

আমি চুপ করে রইলাম। বুঝলাম, দীপাদির ভেতর এই স্বাধীনতা নিয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে দীপাদিও চুপ করে গেল।

কোন তর্ক বিতর্কের ব্যাপার হলে দীপাদি আমাদের 'তুমি' 'তুমি' করে কথা বলবে, নাহলে সারাক্ষণ 'তুই' বলে সম্বোধন।

আর খানিকটা মুড়ি দি।

অনেক দিয়েছ, আর না। আজকের মুড়িটা বরং রেখে দাও, কাল এসে খেয়ে যাব।

খুব হিসেবী হয়েছিস, দেখছি। কাল আসিস। তবে সন্দেশের আশায় এলে ঠকতে হবে।

বললাম, না থাকলে আর পাব কি করে। তবে তোমার ভাঁড়ারের সবকটা থালা, বাটি, হাঁড়ি উল্টে দেখে যাব।

সে দেখিস এখন। ওল্টানই সার হবে।

দীপাদি উঠে গিয়ে আরও দুটো বাদাম সন্দেশ আমার বাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, যা লোভী। তোর আশা থেকে গেলে আর কারু খেয়ে হজম হবে না।

বললাম, এখানকার স্বাধীনতা উৎসবে তুমি নিশ্চয়ই যোগ দিয়েছিলে?

একেবারেই না।

সেকি! উদ্যোক্তারা তোমাকে ডেকে নিয়ে যায়নি?

কিভাবে উৎসব হবে তার প্ল্যান করতে ডেকেছিল। আমি বলেছি, আপনারা উৎসব করুন, কিন্তু যেখানে আমার প্রাণের সায় নেই সেখানে কেবলমাত্র হাজিরা দিতে পারব না।

প্রসন্নবাবু বললেন, এইটুকু বয়সে মা এতখানি সংগ্রাম করলে, তুমি না এলে উৎসব কি সম্পূর্ণ হতে পারে?

বললাম, কাকাবাবু, সংগ্রাম তো শেষ হয়নি, নতুন করে শুরু হল। এ সংগ্রামে জয়ী হওয়া সবচেয়ে কঠিন। আমি আপনাদের উৎসবের দিনে সেই অবিরাম সংগ্রামের জন্য শপথ নেব।

তোমার বাবা গিয়েছিলেন?

দীপাদি বলল, শিবহীন যজ্ঞ হবে কি করে। বাবা আমার সঙ্গে একমত

ছিল, কিন্তু যেই সবাই এসে ধরে পড়ল, অমনি বাবা ভেতরে এসে বলল, আমার খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবীটা বের করে দেতো মা।

আমি কোনো কথা না বলে বের করে দিলাম।

বাবা নিজের থেকেই সাফাই গাইল, এখন তো করার কিছু নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে, তাকে আর ওল্টানো যাবে না। এখন ওদের সঙ্গে থেকেই ওদের সংশোধন করতে হবে।

বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সভাপতির আসনে বসান হল। শুনেছি, বাবা নাকি তার ভাষণে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সংগঠনের কথা বলে এসেছে।

তুমি তো যাওনি, শুনলে কার মুখে?

কে আর বলবে, আমার খবর-দেনে-ওলা ঐ এক গোবর্ধনদা।

হেসে বললাম, গোবর্ধনদাকেও দলে ভেড়াতে পারলে না? সেও যোগ দিতে গেল উৎসবে?

দীপাদি বলল, ও যে কতবড় একখানা প্রাণ নিজের ভেতর বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তা তোদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। ওসব মানুষকে কোনো দলের ভেতর টানতে নেই। ওদের ভাবনা সহজ, ওদের দৃষ্টি স্বচ্ছ। আমরা যেখানে যেতে পারি না, ওরা সেখানে যেতে পারে। আমরা যা দেখতে পাই না, ওরা তা দেখতে পায়।

আমি আজ দীপাদির কথা শুনে খুব অভিভূত হলাম। গোবর্ধনদা আমাদের সকলের প্রাণের মানুষ। আমাদের সুখ-দুঃখের সেও একজন অংশীদার। কিন্তু গোবর্ধনদাকে দীপাদি যে দৃষ্টিতে দেখেছে, আমরা কখনও সেভাবে তাকে দেখিনি। স্কুলে বার বার ফেল করা একটি ছাত্র। পড়া ছেড়ে দিয়েছে কোনকালে, কিন্তু স্কুলের চৌহদ্দী সে ছাড়তে পারেনি। স্কুলের সব অনুষ্ঠানেই সে অগ্রণী। হেডমাস্টার আনন্দবাবু তার নিষ্ঠা দেখে তাকে ছেলেদের বোর্ডিংয়ে কেয়ারটেকার করে দিয়েছেন। কি তীক্ষ্ন নজর তার সবকটা ছেলের ওপর। পাশাপাশি শাসন আর ভালবাসার এমন আন্তরিক ছবি কেউ কখনো দেখেছে কিনা আমার জানা নেই।

বোর্ডিংয়ে ফিরে এসে দেখি গোবর্ধনদা তার সিটে নেই। ছুটির দিনে বাড়ি গেছে সবাই। মাস্টারমশাইরাও গেছেন। তাহলে গোবর্ধনদা যে তেল আনতে পাড়ায় বেরুবে বলেছিল, ফেরেনি নিশ্চয়ই।

বাড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়েই অনাথ-আশ্রমের ঘরটায় চোখ পড়ল। সেই আমাদের অঙ্কের খোঁড়া মাস্টারমশাই অনাথবাবুর ঘর। অল্পস্বল্প বিকলাঙ্গ দু'একটি ছেলে ওখানে থাকে। আজ সবারই যে যার বাড়ি চলে যাবার কথা।

ঐ তো কোণায় খাটখানার ওপর কে যেন বসে আছে। মাথাটা নিচের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। এগিয়ে গেলাম জানলার ধারে। খাটের ওপর একটি ছেলে শুয়ে আছে, তার মাথায় জলপটি। একটা বাটিতে জল। গোবর্ধনদা আঙুলে জল তুলে ঐ পটিতে একটু একটু করে জল দিচ্ছে।

আমি ঢুকে গিয়ে বললাম, কি হয়েছে ওর গোবর্ধনদা?

কি আর হবে, জ্বর বাধিয়ে বসে আছে। বৃষ্টিতে ভিজে ঘণ্টা দুয়েক কাদা মাঠে ফুটবল পিটিয়েছে। তারপর তেঁতুলের গরগরে অম্বল দিয়ে ভাত সাঁটিয়েছে। এখন ওকে জাপটে ধরেছে জ্বরাসুর। মাথা টিপে, জলপটি দিয়ে অসুর মহারাজকে তুষ্ট করার চেষ্টা করছি, যাতে উনি এই পটকা ছেলেটাকে ছেড়ে চলে যান। কাল সারারাত জ্বরের ঘোরে বকে চলেছে। আমি একটা মিনিটের জন্যেও দুচোখ এক করতে পারিনি।

কি খাচ্ছে ?

সাগু বার্লি মুখে রোচে না নবাবের। এখুনি বল, তেঁতুলের আচার খাবি, অমনি তিড়িং করে লাফ মেরে খাটে উঠে বসবে।

জ্বরের ঘোরেও গোবর্ধনদার কথা শুনে ছেলেটির মুখে ম্লান হাসি ফুটল।

আমি বললাম, এখন যাই গোবর্ধনদা।

রাতের কথা মনে আছে তো ?

তুমি ডেকেছ, আমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে না এসে পারব। তবে তোমাকে তো নিজের হাতে রাঁধতে হবে।

সে তোকে ভাবতে হবে না।

সে রাতে গোবর্ধনদার হাতের রান্না খেলাম। কত রাত অব্দি দুজনে গল্প করলাম। কলকাতার দাঙ্গার খুঁটিনাটি গল্প, আমার পরিচিত বন্ধুদের গল্প, বিশেষ করে ইউসুফ আর শবনমের।

গোবর্ধনদা খুঁটিয়ে গল্প শুনতে ভালবাসে, আবার মনেও রাখে।

সে রাতে কিন্তু একটি বিষয় আমার চোখ এড়াল না। কথার ফাঁকে ফাঁকে অসুস্থ ছেলেটির কাছে বার বার গোবর্ধনদা দৌড়ে যাচ্ছিল।

আমি যখন ভোররাতে ঘুম ভেঙে উঠলাম তখন গোবর্ধনদা তার বিছানায় নেই। পায়ে পায়ে অনাথ আশ্রমে গিয়ে দেখি, বার্লি তৈরী করে গোবর্ধনদা ছেলেটিকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে ডানহাতে বাটিটা মুখের কাছে তুলে খাওয়াচ্ছে।

বছর দেড় পরে আবার আমার কুমুর সঙ্গে দেখা হল বি-এ পরীক্ষার পরে।

বাড়ি থেকে যাবার পথে আজকাল রসলপুর অথবা কালিনগরে গিয়ে বাস ধরি। সুনিয়া পার হয়ে গেলে অনেকখানি পথ হাঁটতে হয়, তাই বাদ পড়ে গেছে ওপথটা।

সেবার কুমুর জন্যে কেমন করে উঠল মনটা। হোক না সবটাই পায়ে হাঁটার পথ, তবু কুমুর কাছে আমাকে পেঁছিতেই হবে।

খেয়াঘাটের এপার থেকে তাকিয়ে দেখি, ওপারে ঠিক তেমনি তালপাতার ছাউনি নিয়ে কুমুদিনীর জলসত্রটি দাঁড়িয়ে আছে।

আমি খেয়া পেরিয়ে পায়ে পায়ে জলসত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কুমুদিনী পাশ ফিরে কি যেন করছিল। চোখের কোণায় পারার্থীকে দেখে

সামনে ফিরল। নেমে এল জলসত্র ছেড়ে।

হাবুলদা!

বিস্ময়, বেদনা কেবল কুমুর চোখে ছিল না, এক অদ্ভুত ভাবাবেগে আমার সমস্ত চৈতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

ভরা যৌবনে কুমু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে গড়া প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে। তার কপালে মস্তবড় একটি সিঁদুরের টিপ। হাতে পলার চুড়ি আর শাঁখা।

সেই মুহূর্তে মনে হল, সময় বড় নিষ্ঠুর। সে কারু জন্য দুদণ্ড অপেক্ষা করে না।

হাবুলদা, এতদিন পরে তোমার আসার সময় হল?

তোমার বাবা কেমন আছেন কুমু?

মাথা নাড়তে নাড়তে কুমুর চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল। এ জল এক পলাতকের ওপর অভিমানে, অথবা বাবার মৃত্যুর সংবাদ দিতে গিয়ে বুঝতে পারলাম না।

বিয়ের খবরটা সে নিজেই দিল। বাবা হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাকে গত হলে কুমু অসহায় হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় সে নাকি বার বার ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিল আমাকে কাছে পাবার জন্য।

কিন্তু ঠাকুর সাড়া দেননি তার ডাকে। সে সময় একমাত্র তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তার সংস্কৃত শিক্ষার গুরু।

সেই বিপত্নীক মানুষটির এক অবিবাহিতা কন্যা বর্তমানে অসহায় কুমুকে সবরকম বিপদ থেকে রক্ষার জন্য গ্রহণ করেছেন।

কুমু এবার আর তার বাড়িতে আমাকে ডাকল না। ডাকার প্রশ্নও ছিল না।

ছোট ছোট কয়েকটা কথা আদান-প্রদানের পর আমি কুমুর কাছে বিদায় নিয়ে শহরের পথে পা বাড়ালাম। কুমু আমাকে কিছুটা পথ এগিয়ে দিতে এল না। আসা সম্ভবও ছিল না। কেবল পেছন থেকে কুমুর গলায় কান্নার মত একটা ছত্র বেজে উঠল: হাবুলদা এ জন্মে আর একটিবার তোমার হাতে হাত রেখে রামধনু দেখা হল না।

চতুর্থ পর্ব

ভোরবেলা হোসপাইপের ফোঁসফোঁসানিতে ঘুম ভেঙে গেল।

দোতলার বারান্দায় আমার শোবার জায়গা নির্দিষ্ট হয়েছিল। এ বাড়িতে এই আমার প্রথম রাতের নিদ্রা। আমি বিছানায় উঠে বসে রইলাম। পথের ওপারে বিশাল কৃষ্ণচূড়ার গাছ। ডালে ডালে মণি-মুকুটের মত ফুল ফুটে আছে। তারই ফাঁকে আকাশ উঁকি দিচ্ছে।

দু'একটি তারা এখনও ঐ নীলের গায়ে হীরের টুকরোর মত জ্বলজ্বল করছে।

ঢং করে বারান্দার বড় ঘড়িটা আওয়াজ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাবা ভোলানাথ, উঠে পড় বাবা, সাড়ে চারটে বাজে।

আমার সবেধন নীলমণি এই ভোলানাথ, ওরফে ভোলা। গতকাল হাতে পেয়েছি এই টিউশনিটি। রাতে খাওয়া থাকা বাবদ ঘণ্টা তিনেক বিদ্যাদান করতে হবে। এমন সোনার চাঁদ আমি আর কোনদিন হাতে পাইনি।

টিউশনির জন্যে কি আমি কম ভুগেছি। রোদে পুড়েছি, জলে ভিজেছি।

অ্যাডমিশান নিয়েছি ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু সারাটা দিন টো টো করে ঘুরেছি টিউশনির খোঁজে।

একটি টিউশনি পেয়েছিলাম চিৎপুরে। পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়া সাকুল্যে মাসিক ফি কুড়ি টাকা। তখন আমি নিঃস্ব, কুড়িটা টাকা আমার কাছে অনেকখানি। কিন্তু কপালে টিকল না। একবেলা পড়াবার কথা কিন্তু কপাল গুণে আমার পড়ুয়াটি আমাকে দুবেলা ছুটিয়ে মারত। আমার সকালে যাবার কথা। আমি কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায় হাজির হতাম। পড়ার ঘরে বসে আছি তো আছি, ছাত্রের দেখা নেই। তিনি তখন সুখনিদ্রায় স্বপ্নের দেশে। আমি শুনতে পাচ্ছি বাড়ির কর্ত্রী তাকে ঠেলা দিয়ে বলছেন, ওঠ বাবা, ওঠ বাবা, ছ'টা বাজে। মাস্টার এসে গেছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে ছেলেই মাকে ধমক লাগিয়ে পাশ ফিরে শুলো। হপ্তায় প্রায় চারদিন এই দৃশ্য। শেষে কর্ত্রী এসে বলতেন মাস্টারমশাই এবেলা আর হবে না। ওবেলা আসুন।

আমার যেন আর কোন কাজ নেই। পড়াশোনা, খাওয়া-দাওয়ার পাট যেন জন্মের মতো চুকিয়ে বসে আছি। তবু বলতে হতো, আজ্ঞে আসব। যেতামও। কারণ এই টিউশনিটি হাতছাড়া হলে আমার মুখে একমুঠো অন্নও উঠবে না। এমনি করে মাসতিনেক জলে ভিজে এবেলা ওবেলা টিউশনি করেছি। ছাত্রকে ধরার জন্যে দিনভোর লুকোচুরি খেলতে হয়েছে। শেষে সত্যিই হাঁপিয়ে উঠলাম। পড়া স্নান খাওয়ার সঙ্গে এই টিউশনির তাল ঠিক রাখতে পারলাম না। একদিন সোজাসুজি বাড়ির কর্তাকে বললাম, দুবেলা আসতে হয়, আমার

স্নান খাওয়া থাকার ঠিক নেই, যদি অন্তত একটা থাকার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে ভাগ্যধরকে দেখাশোনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়। কর্তা ভেতরে চলে গিয়ে গিন্নীমার সঙ্গে বোধহয় কিছু পরামর্শে বসলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ওরা কেউই আমাকে হাতছাড়া করতে চাইবেন না। ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষায় স্কুলে শ্রীমান ভাগ্যধর যে নম্বর পেয়েছিল হাফইয়ার্লি পরীক্ষায় তার চেয়ে অনেকটা বেশি নম্বর অর্জন করেছে। সুতরাং আগামী ফাইনাল পরীক্ষার দিকে তাকিয়ে এহেন ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে কোন বাবা-মাই চাইবেন না। টিউটরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তারা এতদিনে নিশ্চয়ই অবহিত হয়েছেন।

আমার এইসব ভাবনা-চিন্তার ভেতরে ঘরের মালিক এক সময় আবির্ভূত হলেন। বললেন, আমার এ ঘরে আপনাকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হবে না। পোস্তায় আমার একটা আলুর গুদাম আছে। সকাল থেকেই পাইকাররা আসে, কাজের হুড়োহুড়ি। সেই রাত এগারোটায় গিয়ে গুদাম বন্ধ। আপনি আমার গদিতে এগারোটা নাগাদ গেলে রাতটুকু ওখানে শোবার ব্যবস্থা হতে পারে।

কোন দিকে না তাকিয়ে বলে বসলাম, আজ্ঞে তাই সই।

আমি কোন কালেই সাহসী ছিলাম না। নিদারুণ প্রয়োজন আমার সব ভয় ভাঙিয়ে দিল। এগারোটার পরে এক রাতে কর্তা গদি ছাড়লেন আর আমি গদিয়ান হলাম। আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। জানালা নেই, গোটাদুয়েক ছোট ছোট ঘুলঘুলি। তার ভেতর দিয়ে বাতাস আসে কি না আসে। তেলচিটে-পড়া গদিতে টান হয়ে শুলেই পা বেরিয়ে পড়ে হাঁটু অব্দি। তিনদিক বেষ্টন করে পাহাড়-প্রমাণ আলুর বস্তা। কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে রইলাম।

নতুন জায়গা, সহজে ঘুম আসতে চাইল না। কিন্তু ভয় তাড়াতে ঘুমকে পাকড়ে ধরলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ গায়ে ঢিলের মতো কিছু পড়তেই আমি ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। গদি থেকে নেমে ঘরের কোণে কোথায় যেন একটা সুইচ ছিল, ভালো করে দেখেও নিইনি। আর তাছাড়া এই ঢেলা-গুলো ভূতেও মারতে পারে এই ভেবে একেবারে কুঁকড়ে গদিতে বসে রইলাম। কারা যেন কাঁচি চালিয়ে কুচ কুচ করে কিছু কাটছে। নিজেদের ভেতর ফিসফিসিয়ে কি সব যেন বলছে। আবার ফরফরিয়ে কোথায় যেন উড়ে চলে যাচ্ছে। একসময় এই ভৌতিক পরিবেশে থাকা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল। শুনেছিলাম আলো দেখলে ভূত পালায়। তাই দম বন্ধ করে একলাফে ঘরের কোণে গিয়ে পৌঁছলাম। আমার পা লেগে জলচৌকিটা ওল্টাল। চৌকির তলায় সম্ভবত একটা জলভরা ঘটি ছিল। সেটা মেঝেতে গড়িয়ে অদ্ভুত এক-ধরনের গব গব শব্দ করতে লাগল। আমি হাতড়ে আলোটা জেবলে ফেললাম। গোটা আট দশেক ধেড়ে আর নেংটি মিলে অবাক হয়ে আমার মতো উজবুক রাতের অতিথিটির দিকে চেয়ে আছে। ভয়ডরের বালাই নেই। আমার গদির

ওপর গড়াচ্ছে কতকগুলো আলু। ঐ ইঁদুরগুলো রাতের অন্ধকারে বস্তা কেটে ওগুলোকে মুক্তি দিয়েছে।

শেষ রাতটুকু গদিতে শুয়ে চুপচাপ জেগে কাটালাম। আলোটাকে নিভিয়েই দিয়েছিলাম, এখন ভয় নেই, ভাগ্যের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছি।

আলো নেভামাত্র ওদের দৌড়-ঝাঁপ আবার শুরু হয়ে গেল। দু'একবার আমার বুক আর পায়ের ওপর দিয়ে জাম্প করে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। আমি নির্বিকার। মেঝেতে জল গড়াচ্ছে। ঘটিটাকেও তুলিনি, চৌকিটা চার-পা শিলিং-এর দিকে তুলে কাৎ হয়ে কচ্ছপের মতো পড়ে আছে। আমার মনে হোল. আমি একটা আলুর বস্তা, ওই চৌকিটা অথবা মালিকের তেলচিটে পড়া গদিখানা।

আমার মুখে বাক্য নেই, কোনো স্পন্দন আছে কিনা সন্দেহ। ভোর হয়েছে কখন বুঝতে পারিনি। শেষরাতে ঝিমুনি এসেছিল হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে বিছানায় উঠে বসলাম। দরজার ফাঁকে আর ঘুলঘুলি দিয়ে আলোর রশ্মি ঘরে এসে পড়েছে। দরজা খুলে দিতেই মালিক ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন।

কি মশাই ? ছ'টা অব্দি যে ঘুমিয়ে কাটালেন ? এদিকে ছাত্র যে পড়ার ঘরে হাপিতোশ করে বসে আছে। একি ! মেঝেতে জল গড়াচ্ছে ! চৌকিটার এ হাল করলে কে ?

আমি জড়সড় ও লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, কোনো কথার জবাব এলো না মুখে।

একটু রগচটা মানুষ ছিলেন ভাগ্যধরের পিতৃদেব। তেড়ে উঠলেন। না না, এসব আপনার কম্ম নয়। রাজপ্রাসাদে থাকার অভ্যেস। এসব গুদামে-টুদামে আপনাকে মানায় না। যান মশাই রাজবাড়ি-টাড়ি খুঁজে ঢুকে পড়ুন।

হাতছাড়া হলো আমার টিউশনি।

ভাগ্যধর আমার ভাগ্যে একবার ধরা দিয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। আমি ভাগ্যধরকে ধরে রাখতে পারলাম না।

আমার প্রথম টিউশনি হাতছাড়া হলো, আর প্রায় অভুক্ত অবস্থায় হাঁটাচলা বেড়ে গেল। পথে পথে টিউশনির খোঁজে ঘুরি, নিতান্ত খিদে পেলে দু-চার পয়সার মুড়ি কিনে খাই। বিনি পয়সার কলের জল জোটে কর্পোরেশনের কৃপায়। পথ চলতে চলতে ভাবি, আমি যেন পাইড পাইপার অব হ্যামিলনের জাদুর ছোঁয়া লাগা বাঁশিটা পেয়ে গেছি। ঐ বাঁশিটা বাজাতে বাজাতে চলেছি ভাগ্যধরের বাবার পোস্তার গদিটা লক্ষ্য করে। গদির সামনে দাঁড়িয়ে আমি যেন চেঁচিয়ে বলছি, সারা পোস্তা থেকে আমি ধেড়ে, নেংটি সব ইঁদুর সাফ করে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসব, বলো তোমরা আমাকে কি দেবে। অন্তত দু-চারটে টিউশনি। কিংবা খেয়ে পরে থাকার একটা ব্যবস্থা।

ভাল করে চোখ মেলে দেখি হয়তো একটা লাল বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছি। পাগলামিতে নিজের মনেই হেসে উঠি।

একদিন সত্যিই আমি একটা লাল বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। লোহার গেট, গেটের আড়ালে পাকানো গোঁফওয়ালা দরোয়ানজী বসে আছে। বাড়ির প্রাঙ্গণে একটি বেদীর ওপর এক অপূর্ব শ্বেতপাথরের নারী মূর্তি দাঁড়িয়ে। বেদীটির চারদিক ঘিরে জলাধর। নারীর মাথার পেছনের ফোয়ারা থেকে মুক্তবিন্দুর মত জল ছড়িয়ে পড়ছে ঐ জলাধারে।

স্নানরতা সেই রমণী হঠাৎ কাউকে দেখে সঙ্কুচিত হয়ে লজ্জাবস্ত্রটি গায়ে জড়িয়ে নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

অসাধারণ সেই মূর্তিটি আমার তরুণ দুটো চোখ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ একটি বালক ছুটে এলো সেই প্রাঙ্গণে। গেটের কাছে এসে দরোয়ানের কানে কানে কিছু ফরমাস করল। হাতে কিছু পয়সাও গুঁজে দিলে। কোনো কিছুর জন্যে একটা আব্দার। বহুকালের দারোয়ান প্রথমে মাথা নেড়ে আর্জি নাকোচ করে দিয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ মনে হলো নিমরাজি হয়েছে। গেট খুলে সে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। ছেলেটি লোহার গেট ধরে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।

আমি মুগ্ধচোখে ছেলেটিকে দেখছিলাম। বাল্য কৈশোরের মিলনভূমিতে সে দাঁড়িয়েছিল। কাঁচা রোদ্দুরের মতো রঙ তার। চোখদুটো উজ্জ্বল। মাথায় ঘন কালো কোঁকড়া চুল, মুখে চমৎকার মিষ্টি একটা ভাব। প্রয়োজন এসে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তাগাদা দিয়ে বললে, বেকুব ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছিস কি, টিউশনি করে কিনা দেখ না।

এগিয়ে গেলাম। যদ্দুর সম্ভব কমনীয় গলায় বললাম, ভাই টিউশনি পড়বে তুমি। তোমাকে কি কোন মাস্টারমশাই বাড়িতে পড়াতে আসেন?

ছেলেটি আমার প্রশ্নে একটু অবাক হয়েছিল। বোধহয় সে এমন করে কাউকে টিউশনি পড়াবার কথা বলতে শোনেনি। পরক্ষণেই সে ভাবটা তার কেটে গেলো। সে সহজ গলাতেই বলল, মাস্টারমশাই পড়াতে আসেন। আমি মার কাছে জেনে বলব।

বললাম, আমি কি তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব, তুমি জেনে আসবে?

ও বলল, মা তো পাইকপাড়া মামারবাড়ি গেছে। আপনি অন্যদিন আসুন।

দরোয়ানকে কাছাকাছি আসতে দেখে আমি মাথা-টাথা নেড়ে সরে পড়লাম। কবে আসবো এ কথাটি ভুলে আর জানা হলো না।

প্রতিদিন ঠিক পাঁচটার সময় আমি ঐ গেটের সামনে এসে দাঁড়াতাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য চোমরানো সাদা গোঁফওয়ালা সেই দরোয়ানজী ছাড়া আমি আর কাউকেই দেখতে পেতাম না। পাছে দরোয়ান কিছু ভেবে বসে তাই আমি একটু দূরে উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ঐ লাল বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকতাম।

যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছি। তখন একদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সেই দেবদূতের মতো ছেলেটিকে দেখতে পেলাম। আমি আগ্রহে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। দরোয়ানজী তখন সেখানে ছিল না। ছেলেটি আমাকে দেখে বলল,

আপনি কি আমাকে খোঁজ করতে এসেছিলেন ?

হ্যাঁ, এসেছিলাম। তোমাকে কিন্তু তিন চারদিন দেখতে পাইনি।

ও বলল, আমি মামার বাড়ি গিয়েছিলাম ফিরে আসতে গঙ্গা সিং আমাকে আপনার কথা বলেছে। আমি মাকে আপনার কথা বলেছি। আমার তিনজন টিউটর আছেন, এখন আর দরকার হবে না। সম্ভবত এক ভদ্রমহিলা ঘরের ভেতর থেকে আমাদের দেখছিলেন। তিনি অনুচ্চে হাতছানি দিয়ে ছেলেটিকে ডাকলেন। আমাকে দাঁড়াতে বলে ও ছুটে গেলো। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, মা আপনাকে ডাকছেন।

ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে আমি লাল বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। প্রশস্ত সাজানো একটা ঘর পেরিয়ে আমি যে ঘরে ঢুকলাম সম্ভবত সেটি ছেলেটির পড়ার ঘর। শ্বেতপাথরের একটি টেবিল মাঝখানে। দুদিকে দুটো মেহগিনি পালিশ করা চেয়ার। টেবিলের একধারে কিছু বই রাখা। দেয়ালে বিলিতি অয়েলপেণ্টিং—ক'টি উলঙ্গ ছেলে মনের আনন্দে ধস্তাধস্তি করছে।

ছেলেটি আমাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে ঘরের ভেতর চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ কারু দেখা নেই। বাইরের জানালা দিয়ে সেই পাকা একজোড়া চোমরানো গোঁফ দেখলাম। সে কি রকম যেন সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে চেয়েছিল। হয়তো ভাবছিল এই রাস্তার ছোকরাটা হঠাৎ সিঁড়ি ডিঙিয়ে খোকাবাবুর ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল কি করে! হঠাৎ চোখ ফেরাতেই দেখি এক ভদ্রমহিলা ছেলেটির সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকেছেন।

লালপাড় গরদের কাপড়খানি পরে তিনি লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো মৃদু হেসে শ্বেতপাথরের টেবিলটার একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাতে একটা থালা, কিছু ফল আর নারকেল নাড়ুতে ভরা।

কোথায় থাকো ?

স্নেহের এই একটুখানি ডাকে আমার চোখে জল এসে গেলো। বললাম, থাকার কোন নির্দিষ্ট আস্তানা নেই মা। তবে মোটামুটি একটা ঠাঁই খুঁজে নিই।

পড়াশোনা করো ?

হ্যাঁ, আমি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছি।

ভদ্রমহিলা বললেন, এটুকু খেয়ে নাও।

আমি খেতে শুরু করলাম। খাওয়া শেষ হলে উনি বললনে, বাবা তোমাকে সুমনের পড়ার জন্যে রাখতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু ওর সব সাবজেক্টেরই টিউটর রয়েছে।

একটু থেমে বলবেন কি বলবেন না কথাটা, ভাবতে ভাবতে বলেই ফেললেন, এ বছর আমাদের ব্যবসাতে ভারী একটা লোকসান হয়েছে, তাই নতুন কোন লোক ইচ্ছে থাকলেও কর্তারা নিতে দেবেন না বাবা।

ভদ্রমহিলা চলে আসার সময় বললেন, একটু দাঁড়াও। বলেই তিনি ঘরের ভেতর চলে গেলেন।

একটু পরে এসে আমার দিকে কয়েকটা নোট এগিয়ে ধরে বললেন, এটুকু টাকা তুমি কাছে রেখে দাও বাবা। তোমাকে টিউশনিটা দিতে পারলাম না বলে আমার মনে দুঃখ রইল।

আমি টাকাটা না নিয়ে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম, ও টাকাটা আমি নিতে পারব না মা, কিছু মনে করবেন না। পরিশ্রম করে যতটুকু পাবো তাই নেবো তবে আপনার অগাধ ভালবাসা আর আশীর্বাদ আমি মাথায় করে নিয়ে গেলাম।

এখন আমার ভোলানাথই ভরসা। এমনি ঘুরতে ঘুরতে হেদোর ধারে ভোলানাথকে পেয়ে যাই। তিনতলা পুরনো বাড়ির ছাদের ওপরে সম্ভবত বালখিল্যদের বল খেলা চলছিল। সেই বল শূন্যে উড়ে এসে পথের ওপরে আছড়ে পড়ল। মানুষ হলে মুখ থুবড়ে পড়েই থাকত, কিন্তু বলের বুকে অগাধ দম পোরা, সহজে মূর্ছা যাবার নয়। সে তিন চারবার ড্রপ খেতে খেতে রাস্তার একধারে গড়িয়ে থেমে রইল। এখন ছেলেগুলো হুড়মুড়িয়ে নিচে নেমে এসেছে। ততক্ষণে আমি হাত দিয়ে বলটা তুলে ফেলেছি। ছেলের দলের পাণ্ডাটিকে দেখলাম। বছর বার তেরো বয়স, নধর গঠন। মনে হচ্ছিল মাখন খাওয়া নাড়ুগোপালের মতো। আমি ওপার থেকে হাতে ধরা বলটা এপারে ছুঁড়ে দিলাম। অনেককটি ছেলে ধরতে গেলো, অমনি তাদের গায় লেগে বলটা ফিরে এলো। আমি এবার বলটাকে বগলদাবা করে ওদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। সর্দারের হাতে বলটা তুলে দিয়ে বললাম, এতটুকু ছাদে এত বড় বলটা নিয়ে খেলছ কি করে?

সর্দার অমনি বলল, আসুন না ওপরে দেখবেন কতো বড় ছাদ। ওরা হৈহৈ করে আমাকে প্রায় ধরে নিয়ে ছাদের ওপর উঠল।

ছাদটা নিতান্ত ছোট নয়। তবে ফুটবলের মাঠ নয় যে ঐ বল নিয়ে খেলা চলবে। তবু বললাম, হ্যাঁ ছাদটা বড়ই বটে। ওরা আবার খেলা শুরু করতে যাচ্ছিল কিন্তু শুরুতেই আসর ভেঙে গেলো।

ভোলা, ভোলা ডাক পাড়তে পাড়তে ওপরে উঠে এলেন এক ভদ্রলোক। গলায় পৈতে, খালি গা। ধবধব করছে রঙ, শীর্ণ চেহারার মানুষটি। বছর পঞ্চাশ বয়স হবে। বেশ কিছুক্ষণ তুবড়ির মত অনর্গল বাক্য বেরুলো তাঁর মুখ দিয়ে। ছেলেগুলো ততক্ষণে তাঁর পাশ কাটিয়ে দুদ্দাড় করে নিচে নেমে গেছে। ভোলাও মাথা নীচু করে নেমে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। ডান হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই ছেলেটি কে?

ভোলা সদুত্তর দিতে পারল না। আর দেবেই বা কি করে? আমার হাল হদিস কিছুই সে জানে না। চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলো।

আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বললাম, রাস্তায় ওদের বলটা পড়ে গিয়েছিল, আমি কুড়িয়ে এনে দিয়েছি।

কি নাম? কোথায় থাকা হয়?

সবই অকপটে বললাম। আমি যে এখন নিরাশ্রয় সে কথাটি সকরুণভাবে ঘোষণা করতে ভুললাম না।

আমি এম. এ-তে অ্যাডমিশন নিয়েছি শুনে তাঁর গলাটা হঠাৎ নরম হয়ে গেলো। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে এসো।

দোতলার একটি ঘরে ভদ্রলোক আমাকে এনে বসালেন। মুখোমুখি একটা মোড়ায় বসে বললেন, টিউশনি করবে?

আমি তো হতবাক। আকাশ থেকে আস্ত চাঁদটা পেড়ে এনে দিলেও এত খুশি হতাম না। আমি ভাবতেও পারছিলাম না একজন ভদ্রলোক সেধে আমাকে টিউশনির কথা বলছেন।

বললাম, আমি টিউশনি খুঁজছি। আমার টাকার চেয়ে একটা আস্তানার দরকার অনেক বেশি। রাতে আমার শোবার কোন জায়গা নেই।

ভদ্রলোক নিজের ভাঙা গালে হাতের মুঠোখানা ঠেসে ঢুকিয়ে, চোখ দুটো মেঝের ওপর ফেলে কি যেন ভাবতে লাগলেন। সামান্য সময় মাত্র, তারপর হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, ঘরের সংখ্যা আমার খুব কম। ঢাকা বারান্দায় এক চিলতে জায়গা আছে, দেখবে এসো, যদি সেখানে থাকতে পারো।

ভদ্রলোক আমাকে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে এবড়ো খেবড়ো একটা বারান্দায় এনে ফেললেন। রেলিং ঘেরা বারান্দা মাথায় ছাউনি। বর্ষাকালে জলের ঝাপটা ঠেকানো দায় হবে।

ভদ্রলোক যেন আমার মনের কথা বুঝে নিয়েই বললেন। বর্ষাকালে তেরপলের টুকরো ঝুলিয়ে দিলেই বৃষ্টি ঠেকানো যাবে। আর রাতটুকুই তো শোবার মামলা।

বললাম, এটুকু পেলে খুব উপকার হবে আমার।

ভদ্রলোক বললেন, দিনের বেলা কিন্তু এটা ব্যবহার করা যাবে না। মেয়েরা এখানেই রোদ্দুরে বড়ি, মশলাপাতি সব শুকুতে দেয়। তাছাড়া ভেজা কাপড় শুকুবার এই একটিমাত্র জায়গা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, দিনের বেলা আমার দরকার হবে না। তবে আমার ছোট একটা ট্রাঙ্ক আছে, ওটা রাখার জন্য একটু জায়গা পেলে আমার খুব সুবিধে হয়।

তার জন্যে ভাবনা নেই। খাটের তলায়-টলায় রেখে দিলেই চলবে।

ভদ্রলোক আবার ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। আমি তাঁর পেছন পেছন আগের ঘরটিতে এসে বসলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, আমার ছেলে ভোলাকে তুমি দেখেছ। ঐ যার সঙ্গে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছিলাম। ওকেই তোমাকে পড়াতে হবে। ও ক্লাশ নাইনে পড়ে। অঙ্কটা আমি নিজেই দেখিয়ে দিই, বাকি সাবজেক্টগুলো তোমাকে দেখাতে হবে। ভোলার বোন ক্লাস সিক্সে পড়ে। তাকে পড়ানোর ভার তার মা নিজের হাতে নিয়েছেন। মাঝে মধ্যে একআধটু দরকার হলে দেখিয়ে দিতে হবে।

বললাম, কবে থেকে আসব বলুন?

ভদ্রলোক বললেন, আজই আসতে পারো। বিছানাপত্তর আছে তো?

মাথা নেড়ে জানালাম, আছে।

রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই হবে। এটা ভোলাকে পড়ানো বাবদ। আর হাত খরচা মাসে পনেরো টাকা ঝুমিকে মাঝে মধ্যে কিছু দেখিয়ে দেবার জন্যে।

সেই থেকে আমি ভোলানাথের জিম্মায় বহাল হয়ে গেছি।

বাড়ির সবার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে আমার। ভদ্রলোক কোন একটি সদাগরী অফিসের বড়মাপের একজন কেরানী। ইলিশের মরশুমে আস্ত দেড়সেরী ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে আনেন। আমের দিনে আস্ত টুকরী ভরা আম ঘরে নিয়ে আসেন। ঘরের মেম্বার পাঁচজন। স্বামী স্ত্রী দুই ছেলেমেয়ে আর বালবিধবা এক পিসিমা। পিসিমাই এবাড়ির স্নেহের উৎস। কর্তার দিদি তিনি। কাজের চাকায় ঘুরছেন সারাদিন। ছেলেমেয়ে দুটি পিসি বলতে অজ্ঞান। বিশেষ করে রাতে দুজনেই পিসির দুদিকে পিসিকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে। ভাইবোনের বিবাদ কানে আসে। দুজনেরই দাবী, তুমি আমার দিকে ফিরে শোও পিসি।

পিসি কি করে উল্টো দাবীর সমাধান করেন তা আমি অন্ধকারে দেখতে পাই না। আমার বারান্দার ঠিক পাশের ঘরটিতেই ওদের শোবার জায়গা। ভোলার মা আর পিসির ভেতর কিছু মন কষাকষি আছে। তার পরিচয় মাঝে মাঝে আমি পেয়েছি। ভোলার মা সাজগোজ করতে আর সিনেমা দেখতে ভালবাসেন। পাশের ভাড়াটে মহিলাটির সঙ্গে উনি হপ্তায় প্রায় তিনটে ম্যাটিনী শো দেখে আসেন। এসব খবর ভোলাই গড় গড় করে আমার কাছে বলে যায়। ভাই ফিরে এলে সন্ধ্যায় জলখাবারটি মুখে জুগিয়ে দেওয়া, স্কুল থেকে ছেলে মেয়ে ফিরলে তাদের গা-হাত-পা ধুইয়ে মুছিয়ে মেজাজ মতো খেতে দেওয়া, তারপর রাতের-রান্নার গোছগাছ, এসব কিছুই পিসির ঘাড়ে। রাতের রান্নাটাও তিনিই করেন। কেবল দিনের রান্নাতে হাত লাগান ভোলার মা।

কি নিয়ে যে ওঁদের ভেতর গোল বাধে তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। অনেক সময় ঝগড়াঝাটি তুলকালামে গিয়ে দাঁড়ায়। গৃহকর্তা উপস্থিত থাকলে তিনিই হাঁক ডাক করে আগুন প্রবল হয়ে ওঠার আগে নিভিয়ে ফেলেন। ঝগড়ার সমাপ্তি হয় একপক্ষের আক্ষেপে, অন্যপক্ষের ফোঁপানিতে। অবশ্য ভোলার পিসিকেই আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুনেছি। বড়োরকমের ঝগড়াঝাটির পরে সাধারণত তিনচারদিন ননদ-ভাজে কথা বন্ধ থাকে, তারপর আকারে ইঙ্গিতে ঠারে-ঠারে কথাবার্তা চলে। এমনি করে পরিস্থিতি একসময় সহজ হয়ে আসে!

পিসিমা বুঝি তার ভোলা-অন্ত প্রাণ।

ছেলেরা পিসিকে ভালবাসলেও মা পিসির ঝগড়াতে কোন পক্ষই নিত না। মায়ের ধাতানি খাবার দারুণ ভয় ছিল তাদের। গম্ভীর গলায় ভোলা আর

ঝুমির নাম ধরে যখন তিনি ডাকতেন তখন ছেলে মেয়ে দুটো কেঁচো হয়ে যেত।

আশ্চর্য ব্যাপার! রাতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যখন পিসি শুতেন তখন ঝগড়ার জের টেনে অনেক সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেন। আমি জ্যোৎস্নার আলোয় দেখেছি, পিসির গায় ছেলেমেয়ে দুটো হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কোনদিন পিসিকে ছেলেমেয়েদের সামনে তাদের মায়ের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে শুনিনি।

ভোলার মা কিন্তু আমাকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। বই কেনার জন্যে হয়তো টাকার দরকার হয়েছে, তিনি জানতে পারলেই আমাকে টাকাটা দিয়ে দিতেন। আমি বলতাম, মা এ টাকাটা শোধ দিতে তো দেরী হবে। উনি বলতেন, যখন পারবে তখন দিও।

আমাকে দিয়ে উনি মাঝে মধ্যে ম্যাটিনি শো-র টিকিট কাটিয়ে আনতেন।

পিসিমা ছিলেন স্নেহের স্রোতস্বিনী। প্রতিটি কাজে আচরণে তাঁর স্নেহ নির্ঝরের মতো ঝরে পড়ত। কেবল ভোলা আর ঝুমিই সে স্নেহে স্নান করত না, আমি বাইরের একটি ছেলে হয়েও তার অগাধ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইনি। রাতে খাবার দিতেন যত্ন করে। সাধারণত রাতে রুটি খেতেন সবাই। উনি কথায় কথায় একদিন আমাদের দেশে দুবেলাই ভাত খাই কিনা জানতে চেয়েছিলেন। খেতে দেবার সময় উনি রুটির সঙ্গে কিছু ভাত মিশিয়ে দিতেন প্রায় দিনই। আমি ভোলার কাছ থেকে একদিন কথায় কথায় জানতে পেরেছিলাম, পিসিমা নাকি দিনের বেলা তাঁর ভাত থেকে আমার রাতের খাবারের জন্য কিছুটা তুলে রেখে দেন।

আর একটি ছবি একদিন আমার চোখে পড়েছিল। সেদিনটা ছিল ছুটির দিন। ভোলার মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে মামার বাড়ি গিয়েছিল। আমারও ছুটি। তাই পিসিমা আমাকে দিনের বেলাতেও খেতে বলেছিলেন। আমি দেখলাম স্নানের সময় পিসিমা তাঁর ভাইয়ের মাথায় নারকেল তেল চাপড়ে চাপড়ে ঘষে মাখাচ্ছেন। আর বলছেন, গোরা, তোর মাথার চুলগুলো যে একেবারে উঠে গেলো রে!

আমি দেখলাম পিসিমা ভাইকে কত যত্ন করে সারা গায় তেল মাখিয়ে দিলেন। তারপর প্রায় ধাক্কা দিয়েই বললেন, চল তোর গায়ের ময়লা গামছা দিয়ে ভাল করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে দিই।

আমি কিন্তু প্রতিদিন পিসিকে একাজ করতে দেখিনি! খেতে দেবার সময়ও ভাইকে আলাদা খাতির করে কোনকিছু দিতে দেখিনি। আমার মনে হয় ভাই বোনের এই মধুর সম্পর্কটুকু জায়ের চোখ থেকে পিসিমা সব সময়ই গোপন রাখতে চাইতেন।

ছুটি পড়লে এবং ভোলার মা বাপের বাড়ি গেলে দিনের বেলাতেও ও বাড়িতে পাত পড়ত আমার। আমাকেও পিসিমা অনেক যত্ন করে মাথার চুলে সাবান ঘষে স্নান করিয়ে দিতেন। বাড়ির স্নেহ থেকে বঞ্চিত একটি ছেলেকে

তিনি তাঁর স্নেহের ধারাতেই স্নান করাতেন। বালবিধবা এই পিসিমার কথা আমি কোন দিনই ভুলতে পারব না।

আমার আশ্রয়দাতার সংসারে হঠাৎ একটি বিপর্যয় নেমে এলো। তখন ভোলা স্কুল ফাইনাল দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। টেস্ট হয়ে গেছে, তাই স্কুলে যাবার বালাই নেই। রাতে পড়াই, তারপর সকালে উঠেও খানিকটা সময় তার পিছনে ব্যয় করতে হয়। এই অতিরিক্ত সময়টুকু তাকে পড়াই আমার মনের তাগিদেই। ভোলা এখন আর আমার টিউশনির ছাত্র নয়, সে আমার আর এক ভাইয়ের মত হয়ে গেছে।

পরীক্ষা শুরু হয়েছে ভোলার। মোটামুটি পরীক্ষা মন্দ হচ্ছিল না। তৃতীয় দিনে ছিল অঙ্ক। অনেক রাত জেগে ভোলার বাবা তাকে অঙ্ক কষাচ্ছিলেন। শেষে ছেলেকে শুতে পাঠিয়ে নিজে শুতে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় পড়ে গেলেন।

বেশ শব্দ হয়েছিল। ঘরে অন্য সকলে ঘুমিয়ে গেলেও পিসিমা সজাগ ছিলেন। কারণ ভোলা তখনও পড়ছিল। আর ভোলা পাশে না শুলে ঘুমই আসবে না পিসিমার। শব্দ শুনেই পিসিমা অমনি হাঁকলেন, কে পড়লি রে ?

সাড়া নেই। ভোলা তখন বিছানায় যাওয়ার আগে বাথরুমে চোখেমুখে জল দিয়ে নিচ্ছিল। সেও পিসিমার হাঁক শুনতে পেল। ততক্ষণে পিসিমা বিছানা ছেড়ে ভোলার পড়ার ঘরে ঢুকে পড়েছেন। ভোলাও তার পেছনে পেছনে ঘরে এসে ঢুকেছে। ভোলার বাবা পড়ে আছেন মেঝেতে, প্রায় স্পন্দনহীন। একটা আকুল আর্তনাদ আর কান্নায় ঘর ভরে গেল। ভোলার মা ছুটে এলেন। পাশের ঘরের ভাড়াটেরাও এসে দাঁড়াল। ছুটোছুটি, ডাক্তার ডাকা, এসব করতে করতেই ভোরের আলো ফুটলো।

অচৈতন্য অবস্থা থেকে চৈতন্যে ফিরে এলেন ভোলার বাবা। কিন্তু তখন মুখের কথা তাঁর জড়িয়ে গেছে, আর ডানদিকটা পক্ষাঘাতে পঙ্গু।

বেলা বাড়ছিল, ঘরের অসহায় মানুষগুলো তখন আতঙ্কে মূক হয় আছে। আমি ভোলার মাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললাম, এখুনি ভোলাকে পরীক্ষার হলে পাঠাতে হবে।

মা বললেন, কি বলছ তুমি ! ওঁর এরকম অবস্থায় !

আপনার কোনো ভাবনা নেই মা, আমি তো রয়েছি। ডাক্তার-বদ্যি সব করব আমি। আপনারা শুধু রোগীর কাছে বসে থাকবেন। ভোলা পরীক্ষা দিতে না পারলে পুরো একটা বছরই তার নষ্ট হয়ে যাবে।

আমার কথামতই কাজ হল, ভোলা অশান্ত মনে পরীক্ষা দিতে চলে গেল। আমি সেদিন বিবেচনার কাজই করেছিলাম। ফল বেরুলে দেখা গেল ভোলা সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করেছে। অঙ্কে পেয়েছে মাত্র চল্লিশ। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় সে সাত নম্বরের জন্য ফার্স্ট ডিভিসনে যেতে পারেনি। ভোলার এই পাশ করাতে একটি উপকার হল। সে তার বাবার সুবাদে ঐ অফিসেই

কনিষ্ঠ কেরানীর একটা চাকরী পেয়ে গেল।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারে ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল পুরো পরিবারটি।

তবে ঐ তরুণ কিশোর ভোলার দিকে তাকিয়ে আমার বড় কষ্ট হত। বাবা থাকলে সে আরো অনেকখানি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারতো। এই অল্প-বয়সে তার কাঁধে বিরাট এক জোয়াল চেপে গেল।

আমার টিউশনিটা গেল, তাদের যে অবস্থা তাতে আমাকে খেতে দেবার কোনো সামর্থ্যই ছিল না।

ভাগ্যের দেবতা কিন্তু আমার ওপর প্রসন্ন হলেন। ছেলেবেলা থেকেই লেখা-জোখার ঝোঁক। স্কুলে থাকতেই আমি লেখক বলে পরিচিত। কেবল হাতে লেখা ম্যাগাজিনে নয় ছাপার অক্ষরেও আমার নাম বেরিয়েছে। সেই আমার নামাঙ্কিত কবিতা অষ্টমশ্রেণীর একটি ছাত্র দুরু দুরু বক্ষে কলকাতার একটি কিশোর মাসিকে পাঠিয়েছিল, নাম ছিল তার 'কিশোর বাংলা'। কবিতাটি কিশোর বাংলায় ছাপা হল। সম্পাদকের উৎসাহভরা চিঠি পেলাম, আরো কবিতা পাঠাও। সেই থেকে কিশোর বাংলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। কলকাতায় আসার পর প্রথম যেদিন পত্রিকাটির অফিসে যাই সেদিন ঘর-ভরা একদল তরুণ তরুণী আমাকে দারুণভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। স্বামী প্রেমঘনানন্দ কাগজটি সম্পাদনা করতেন। সহযোগী ছিলেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক তরুণ যুবক। সেই ঘরে ছোট একটি প্রেস ছিল তাতে বেনুদার পরিচালনায় কয়েকটি ছেলেমেয়ে কম্পোজের কাজ করত। পূর্ববঙ্গ থেকে ভাগ্যতাড়িত কয়েকটি ছেলেমেয়ে ও তাদের মা ওখানে আশ্রয় পেয়েছিল।

আমি গিয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করে পরিচয় দিতেই উনি খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, এখানকার সকলেই তোমাকে চেনে।

আমি তখন স্বামীজীর নির্দেশে একটা মাদুরের ওপর বসেছি। স্বামীজীর কথায় অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। ছেলেমেয়েরা আমার দিকে চেয়ে আছে। তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। একটি কিশোর ছেলের নাম ধরে স্বামীজী ডাক দিলেন। সে চিলেকোঠার ঘর থেকে দুড় দুড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। স্বামীজী তাকে বললেন, 'রোদ ডুব ডুব···' কবিতাটা কবিকে শুনিয়ে দাও তো। ছেলেটি অমনি আমার কিশোর বাংলায় প্রকাশিত একটি কবিতা বলতে লাগল। আমার নামে ছাপার অক্ষরে সেই প্রথম কবিতাটি।

রোদ ডুব ডুব সোনার আলো
ডালিম গাছের ফাঁকে,
পুকুর কোণে ঝিলিক্ দিয়ে
সোনার ছবি আঁকে।
রামধনু রঙ শাড়ি পরে
পাট খলসের বউ,

কাশের বনে গান শুনছে
ঘি মৌ মৌ মৌ।
ডালিম গাছের গা জড়িয়ে
ঝুলতি লতার কোলে,
পেট ফুলিয়ে তুলো ফুটুকি
নাচছে তালে তালে।
কাঠবেড়ালী ত্রস্তে এসে
পটলচেরা চোখে,
লাল টুক টুক ডালিম ফুলের
রঙের বাহার দেখে।···

এবার সত্যি অবাক হওয়ার পালা আমার। সেই কবে লিখেছিল গ্রামের কিশোর কবি এই কবিতাটি, তা শুধু ছাপা হয়ে বেরোয়নি, কারু কারু কণ্ঠে সে কবিতাটি ঘুরে ফিরছে।

কয়েকদিনের ভেতরেই স্বামীজী আমাকে একটি কাজে বহাল করলেন। সহসম্পাদক রবীনদা তখন পত্রিকার লেখাজোখাগুলো দেখছিলেন। আমাকে সেই কাজের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ লেখাজোখা বাছাইয়ের কাজে রবীনদাকে সামান্য সাহায্য করা। এছাড়া স্বামীজীর আহ্বানে অনেক ছেলে-মেয়ে সেখানে এসে জড়ো হতো। আমরা সাহিত্যের যে কোন একটা বিষয় নিয়ে দু'দলে ভাগ হয়ে গিয়ে আলোচনায় মেতে উঠতাম। সেটা শেষ পর্যন্ত প্রবল বিতর্কে গিয়ে দাঁড়াত। শেষ পর্যন্ত আমরা স্বামীজীর কাছে সমাধান চাইতাম।

এই কিশোর বাংলাতেই আমার এমন অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়, যারা আমার নব ফাল্গুনের মানস-তরুণটিকে পুষ্পিত হতে সাহায্য করল।

এই কিশোর বাংলাতেই আমার প্রথম কবিতা ছাপা হয় এক মহিলার ছদ্মনামে। রবীন্দ্রনাথের 'সদ্যপ্রয়াণ' উপলক্ষে লিখেছিলাম সে কবিতা। তখন তরুণ লেখক লেখিকারা বলল, এসো আমরা সবাই মিলে পত্রিকায় একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখি।

ঠিক হল, আমরা যতজনে লিখব, তারা দুটি করে সংখ্যায় লেখার সুযোগ পাবে। এই বারোয়ারী উপন্যাসটিকে এক বছরে শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হল।

ছ'জন লেখক লেখিকা। তিনজন তরুণ আর তিনজন তরুণী।

প্রথমেই বিষয়টা নিয়ে দু'চারদিন আলোচনা হল আমাদের ভেতর। আমি তখন পেরিয়ে এসেছি বিয়াল্লিশের মেদিনীপুরের রক্ত-ঝরা দিনগুলো। সেই দিনগুলোর স্মৃতি নিয়ে কিছু বললাম। সবাই ঐ বিষয় নিয়ে লিখতে উৎসাহিত হল। উপন্যাসের নামকরণ করা হল, 'জীবনের বেদীমূলে'।

মহাসমারোহে শুরু হয়ে গেল লেখার কাজ। এই নিয়ে আমাদের ভেতর বাড়ি বাড়ি যাতায়াত চলল। উত্তেজনা, আলোচনা, সম্প্রীতি, বন্ধুত্বে তখন আমরা ভরপুর।

বিষয়টার সঙ্গে আমি বিশেষভাবে পরিচিত বলে সবার বাড়িতে আমারই ডাক পড়ত। ওরা নিজেরাই লিখত কিন্তু উপাদানের অনেকখানিই যোগাতাম আমি।

উপন্যাসটির তিন নম্বর লেখক ছিল, হৃদিরঞ্জন। আমার কলেজ জীবনের বন্ধু সে। রূপনারায়ণের ওপর একটি গদ্য কবিতা লিখে এক অপরাহ্নে কলেজের আমবাগানে সেটি আমাকে শুনিয়ে আমার হৃদয় একেবারে জয় করে নিয়েছিল। তারপর থেকে আমরা অভিন্ন বন্ধু।

বি. এ. পাশ করার পর ও গ্রামের বাড়িতে বসে রইল, আর আমি ভাগ্যকে জয় করে নেব বলে মহানগরীর গোলকধাঁধায় ঘুরতে লাগলাম।

হৃদিরঞ্জনের চিঠি আর কবিতা মাঝে মাঝে পাই। গ্রামের বাঁশবন, ঝাঁটি, রঙন, দূর্বার গন্ধ মেশা থাকে তাতে।

হঠাৎ চিঠিপত্র বন্ধ হৃদিরঞ্জনের দিক থেকে। আমি কিন্তু দু'দুটো চিঠি দিয়ে বসে আছি।

এদিক ওদিক থেকে চিঠি এল। খুলে দেখি হৃদিরঞ্জনের বাবা লিখেছেন। পরম শুভাশীর্বাদ,

বাবাজীবন, বড় বিপদে পড়ে তোমাকে চিঠি লিখছি। একবার তুমি এখানে চলে এসো। হৃদের মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে। সে কেবলই তোমার নাম করছে। এখানে এলে আরও কিছু কথা হবে, যা চিঠিতে লেখা সমীচীন নয়। দয়া করে একবার এসো বাবা। তুমি ছাড়া ও কারু কথা শুনবে বলে মনে হয় না।

পথ চেয়ে রইলাম।

আশীর্বাদক মেসোমশায়।

কোন কিছু না ভেবেই ছুটলাম দেশের দিকে। এক দুপুরে গ্রাম আর বাড়ি খুঁজে হাজির হলাম হৃদিরঞ্জনের দুয়ারে।

প্রথমেই হৃদির বাবার সঙ্গে দেখা হল। প্রণাম করে বললাম, হৃদিরঞ্জন কই? বললেন, তুমি একটু জিরিয়ে নাও বাবা, ঘামে গায়ের জামাখানা যে একেবারে ভিজে গেছে।

সবিনয়ে মাথা নেড়ে বললাম, ও কিছু না।

উনি হাত ধরে এনে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বসালেন। সামনের জানালা দিয়ে হাওয়া আসছিল পুকুরের জল ছুঁয়ে।

ঘরে চলাচল করছিল একটি চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশী মেয়ে। আর কোন মহিলা অথবা পুরুষ আমার নজরে পড়েনি।

মেসোমশায় মেয়েটিকে বললেন, তোমার দাদার বন্ধু। এখানে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা কর মা।

মেয়েটি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সম্ভবত বাবাকে ইঙ্গিতে ডাকল। হৃদির বাবা আমাকে বললেন, তুমি একটু বস, আমি এখুনি আসছি।

কিছু পরে মেয়েটি এক গ্লাস সরবৎ দিয়ে গেল। খেয়ে দেখি যেমন মিষ্টি

তেমনি টক। রোদের ভেতর দারুণ লাগল, টক মিষ্টি সরবতটা।

বসে আছি তো আছি, মেসোমশায়ের দেখা নেই। হঠাৎ সামনের পুকুরে চবর চবর শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি, মেসোমশায় কোমরে গামছা জড়িয়ে জাল ফেলছেন।

আমার আহারের আয়োজনে সকলে ব্যস্ত কিন্তু আসল মানুষটি এখনও রহস্যাবৃত।

তপ্ত কড়ায় তরিতরকারির আর মৎস্যের আর্তনাদের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হৃদির বোন অতিথি সৎকারের আয়োজনে ব্যস্ত।

মেসোমশায় উদ্যোগ আয়োজন করে দিয়ে পাশে এসে বসলেন।

একটুখানি চুপচাপ থেকে ভারী গলায় বললেন, হৃদের কাছে তোমাকে নিয়ে যাবার আগে কটা কথা বলেনি বাবা।

আমি তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। এবার ভাঙা গলায় বললেন, হৃদে যে একটি মেয়েকে ভালবাসত তা কি তুমি জানতে ?

আমি মাথা নেড়ে আর অর্ধস্ফুট স্বরে জানালাম, কই না তো।

গ্রামের একটি মানুষ হঠাৎ সহজ গলায় বললেন, ছেলেমেয়ে পরস্পরকে ভাল বাসতেই পারে, সেখানে আমাদের কিই বা বলার আছে।

আমার কোন কিছু মন্তব্য করার ছিল না, আমি সামান্য মাথা নিচু করে বসে রইলাম।

মেসোমশাই এবার যা বললেন তার থেকে জানতে পারলাম, এই গাঁয়েরই একটি মেয়ের সঙ্গে হৃদিরঞ্জনের ভাবসাব হয়। মেয়ের বাবা গ্রামের এক সম্পন্ন মানুষ। মেয়েটি আমাদের দু-ক্লাস নিচে কলেজে পড়ত। আমি মেয়েটিকে চিনতে পারলাম। মেয়েটি ধীরস্থির এবং কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির। দেখতে শুনতে বেশ ভালই। ইতিমধ্যে হৃদিরঞ্জন মেয়েটির বাবার অনুরোধেই তাকে পড়াতে শুরু করে। সেই পড়ানোর সুবাদে কবি হৃদিরঞ্জন মেয়েটিকে তার নিজস্ব কিছু কবিতা শোনায়। স্বভাবতই সেগুলি প্রেমের কবিতা। এই সূত্রে কবি ও তার মুগ্ধ শ্রোতার মধ্যে মনো-বিনিময় ঘটতে থাকে। সম্ভবত উভয়ের প্রেমের ক্ষেত্রে বাস্তব বোধবুদ্ধি কিছুটা শিথিল হয়েছিল। সেই অসাবধানতার সুযোগে কন্যার পিতা প্রেমিক যুগলের পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করেন। আর তারপর শুরু হয় প্রেমিক-বিতাড়ন।

অপমানে, প্রেমের বিচ্ছেদে হৃদিরঞ্জন মস্তিষ্কের ভারসাম্যটুকু হারিয়ে ফেলে। জিজ্ঞেস করলাম, হৃদিরঞ্জন কোথায় ?

মেসোমশায় বললেন, এসো আমার সঙ্গে। উনি পেছনের দরজা দিয়ে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দূরে একদিকে আঙুল দেখালেন।

আমি দূর থেকে দেখলাম, জংলা গাছপালার ভেতর থেকে কিছু ধোঁয়া আর আগুন বেরুচ্ছে।

সবিস্ময়ে বললাম, ওখানে কি ?

মেসোমশায় বললেন, ঘরে হৃদে অনেকগুলো কবিতার বই কিনে রেখেছিল।

প্রতিদিন ও একটি করে বই নিয়ে ঐ জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে ঢোকে। গাছের শুকনো পাতাপত্রের সঙ্গে ঐ বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে আগুন জ্বালায় আর একটি অদ্ভুত কাজ করে ও। বইয়ের সবকটি কবিতা ওর কণ্ঠস্থ। ও ঝুঁকে ঝুঁকে কবিতাগুলো আবৃত্তি করতে করতে পোড়ায়। পুরো এক গ্লাস জল ঐ আগুনে গরম হয়। পোড়ানো শেষ হলে হতভাগাটা সবটুকু গরম জল ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেলে। তারপর শুয়ে থাকে প্রায় ঘণ্টাখানেক। যখন উঠে দাঁড়ায়, তখন থেকে পরের দিন দুপুর পর্যন্ত বেশ চুপচাপ থাকে। প্রয়োজনে সাধারণভাবে দুচারটে কথা বলে, তার বেশি নয়।

উন্মাদনার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি আমার জানা ছিল না।

আমি বললাম, এখন তো সবে আগুন জ্বালা হয়েছে। কবিতাপাঠ ও পোড়ানোর পর ফুটন্ত জলপানের ব্যাপারটা আছে। তারপর ঘণ্টাখানেক ঘুম। অন্তত দেড় দুঘণ্টা সময় লাগবে আরও। এসময়টুকু কি ওর কাছে গেলে কোন সুবিধে হবে?

মেসোমশায় বললেন, একবার গিয়েই দেখ না কি হয়। ও কারু ওপর কোন অত্যাচার করে না।

আমি একাই এগিয়ে গেলাম। একটু খানি দূরে থমকে দাঁড়ালাম। ও তখন একটা কবিতা ঝুঁকে ঝুঁকে আবৃত্তি করছিল,

'আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে,
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।
যে আমাকে চিরদিন ভালবেসেছে।
অথচ যার মুখ আমি কোনদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠছে।
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।'

ও কবিতাটি ছিঁড়ে যজ্ঞে আহুতি দেবার আগেই আমি ডাক দিলাম, হৃদিরঞ্জন!

ওর হাত থেকে বইটা পড়ে গেল। ও উঠে দাঁড়াল। যেন বহুদিনের ভুলে যাওয়া একটা শব্দ ওর স্মৃতিতে বেজে উঠল।

এখন ও আমার দিকে চেয়ে আছে, আমি ওর দিকে। ওর চোখদুটো টকটকে লাল। অদ্ভুত এক উত্তেজনায় ওর মুখখানা দারুণ অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কিন্তু ও ঠিক আমাকে চিনতে পেরেছে। ও হঠাৎ ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। সব শেষ হয়ে গেল, আর তুই এলি।

জোরের সঙ্গে বললাম, কিছুই শেষ হয়নি। এত সহজে কি সব শেষ হয়ে যায়।

এরপর আমাদের আর বেশী কোনো কথাবার্তা হয়নি। আমরা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলাম। ওর অগ্নিকুণ্ড আগেই নিভে গিয়েছিল, গরম জল খাবার কোনো সুযোগ ছিল না। আর ও সেসব কথা উচ্চারণই করেনি।

রাতে একসঙ্গে শুয়েছিলাম। ও প্রায় স্বাভাবিকভাবে আমাকে তার প্রণয় কাহিনীটি বলে গেল।

আমি বললাম, তুই তো কোনোদিন তমালিকার সঙ্গে তোর সম্পর্কের কথা আমাকে বলিসনি।

ও বলল, তুই তো কলকাতা চলে গেলি, বলব কখন।

কেন, চিঠিতে ?

তোর সঙ্গে দেখা করে বলব বলেই ভেবেছিলাম। এসব চিঠিপত্রে বলা যায় না।

বললাম, মেয়ের খবর কি ?

ওকে কোথায় যেন পাচার করে দিয়েছে।

সেকি রে ? লেখাপড়া জানা মেয়ে, তার নিজের কিছু বক্তব্য নেই ? আমার মনে হয়, ওর ভালবাসা তোর মতো গভীর ছিল না।

ও সেই রাতের বেলা একটি হেরিকেন জেবলে ফেলল। সেই আলোয় তোরঙ খুলে একটুকরো চিঠি বের করল। চিঠিখানা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, এটা তার শেষ চিঠি।

আমি খুলে পড়লাম।

প্রিয় কবি,

তোমাকে ছেড়ে কতদূরে যাচ্ছি জানি না। তবে এটুকু জেনে রেখো, তোমার মনের থেকে আমি একটুও সরে আসিনি। বোধহয় এখানেই আমার পড়ায় ছেদ পড়ল। যেখানেই থাকি, তুমি আমার সঙ্গে আছ, কোনদিনই ওরা আমাকে অন্য কারু হাতে সঁপে দিতে পারবে না। তোমার সুধা।

বললাম, তাহলে তুই আর অগ্নি-তপস্যা করছিস কার জন্যে ? ওর চিঠিতে তো সব সমাধানই হয়ে গেছে। তুই এখন আমার সঙ্গে কলকাতা চল।

কলকাতা ! সেখানে আমি কি করব ? খাওয়া থাকারই বা কি ব্যবস্থা হবে ?

বললাম, সে ভাবনা আমার। তুই কালই আমার সঙ্গে যাবি।

নিজের পুঁজি নেই, তবু মনের জোরে বন্ধুকে সঙ্গে বেঁধে আনলাম।

হৃদিকে সরাসরি এনে তুললাম ভোলানাথের আশ্রয়ে। ভোলার মাকে বললাম, এ আপনার আর এক ছেলে। আমার সঙ্গে ঐ বারান্দাতেই শোবে। রাতেভিতে দরকারে ও অনেক সাহায্য করতে পারবে। তাছাড়া ঝুমির উঁচু ক্লাশ হল। মাঝে মাঝে অঙ্ক, ইংরাজীটা ওর কাছে দেখিয়ে নিতে পারবে।

ভোলার মা বললেন, সে তো খুব ভাল কথা বাবা।

আমি বললাম, খাওয়া-দাওয়ার কথা ভাববেন না। আমি যেখানে খাই, ওর ব্যবস্থা সেখানেই হবে।

ওর খাবার ব্যবস্থা 'কিশোর বাংলা'র বারোয়ারী রান্নাঘরেই হয়ে গেল। এখন টিউশনি পাচ্ছি, পত্রিকার সহসম্পাদক রবীনদার কল্যাণে। হৃদিরঞ্জন আর আমি চুটিয়ে টিউশনি করছি। বারোয়ারী রান্নায় মোটা ভাত, ডাল, তরকারী। খেতে বসে তাই যেন অমৃত। বীণাদি রান্না করেন। পূর্ববঙ্গ

থেকে দুটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে স্রোতের মুখে কুটোর মতো ভেসে এসেছেন। কি করে যেন আশ্রয় পেয়ে গেছেন স্বামীজীর আস্তানায়। অল্প বয়েস, বিধবা, অশ্রুমুখী। এক একটি মুখ আছে, সকরুণ বেদনায় ভরা। বীণাদির মুখখানা ঠিক সেরকম। হেসে কথা বললেও, বৃষ্টিভেজা রোদ বলে মনে হতো।

'জীবনের বেদীমূলে' নিঃশেষে প্রাণ দিয়ে চলেছেন দেশভক্তের দল। আমরা প্রবল শক্তিতে কলম চালিয়ে তাঁদের এনে ফেলেছিলাম, 'জীবনের বেদীমূলে'।

হৃদিরঞ্জনের কথাই বলি। বারোয়ারী উপন্যাসে তিন নম্বরে স্থান ছিল তার। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের দিনগুলো তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে ছিল। পর পর দুটি সংখ্যায় তাঁর দেখা চরিত্র ও ঘটনা সে ভারী সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলল। কিন্তু হৃদিরঞ্জনকে আমি খুব বেশীদিন কলকাতায় ধরে রাখতে পারলাম না।

এক সন্ধ্যায় দু'বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম, হঠাৎ হৃদিরঞ্জন বলল, দেখ দেখ ইনস্টিটিউটে কি যেন অনুষ্ঠান দেখলাম, উজ্জ্বল আলোকসজ্জায় সজ্জিত প্রবেশ-পথ।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়লাম।

হৃদিরঞ্জন ফিসফিস করে বলল, দেখ এগ্‌জিবিশান চলছে। শ্রীঅরবিন্দ আর মায়ের ছবি ঐ সামনে রাখা হয়েছে।

দেখলাম, ছোটবড় অনেক বইপত্র টেবিলে সাজানো। শুভ্রসুন্দর পোশাক-পরা নারী পুরুষেরা ইনস্টিটিউটের করিডোর দিয়ে হাঁটাচলা করছেন। হৃদিরঞ্জন অনেকগুলো বই নাড়াচড়া করল। আমার দিকে চেয়ে অনুচ্চ গলায় বলল, কয়েকটা টাকা হবে ?

আমি পকেট হাতড়ে কয়েকটা টাকা বের করে আনলাম। হৃদিরঞ্জন ওর থেকে গোটাদশেক টাকা বের করে নিল। একটি বই ও কিনবে।

বইটি কিনে ভারী খুশী। উল্টেপাল্টে বার বার দেখতে লাগল এবং আমাকে দেখাতেও লাগল।

বললাম, বেশ ভাল বই, বাসায় গিয়ে পড়া যাবে।

ওদিকে ছোটবড় নানা সাইজের ছবি বিক্রি হচ্ছিল। সবক'টিই অরবিন্দ অথবা মায়ের ছবি। আমি অবাক হয়ে একটি ছবির দিকে চেয়ে রইলাম। অল্পবয়সী এক বিদেশিনীর ছবি। অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল সেই বিদেশিনীর চোখেমুখে। ছবিটি কিনে ফেললাম। হৃদিরঞ্জনের দিকে চেয়ে দেখি, সে একটা থাম ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বইটার ভেতর ডুবে গেছে। আমি জানি, ও এমনি করেই সবকিছুর ভেতর ডুবে যেতে পারে। ওটাই ওর স্বভাব।

পকেটের ভেতর আমার নতুন কেনা ছোট ছবিখানা ঢুকিয়ে রাখলাম। হৃদিরঞ্জনকে সেটা আর দেখালাম না।

আমরা একসময় রাতের আস্তানায় ফিরে এলাম। বারান্দায় আলো জেলে মাদুর পেতে দুজনে মুখোমুখি বসলাম। বললাম, তোকে একটা জিনিস

দেখাব।

হৃদি আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

আবার বললাম, একটি চুম্বক, আকৃষ্ট না হয়ে পারবি না।

ও অসহিষ্ণু গলায় বলল, হেঁয়ালি রাখ, আসল কথাটি ঝট করে বলে ফেল।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে পকেট থেকে ছবিখানা বের করে ওর চোখের সামনে তুলে ধরলাম।

মুহূর্তে এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতে আমি আর কাউকে কখনও দেখিনি।

একসময় সে ছবিখানা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতক্ষণ দেখতে লাগল। একসময় ওকে তন্ময় দেখে আমি নিজেই ঝুমির পড়ার ঘরে চলে গেলাম। হৃদির বদলে সেদিন আমিই তৈরী করে দিলাম ঝুমির পড়াগুলো।

দিন পাঁচেক কেটে গেছে। এক ভোরে হোসপাইপের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি পাশে হৃদিরঞ্জন নেই। হয়ত ভোলার পিসিমার সঙ্গে ও ভোরবেলা গঙ্গার ঘাটে বেরিয়ে গেছে। ভোলাকে নিয়ে রোজই পিসিমা গঙ্গার ঘাটে নাইতে যান, এটা আমার এ বাড়িতে ঢোকার আগে থেকেই চলে আসছিল। ভাবলাম, হৃদিরঞ্জনের হয়ত গঙ্গাস্নানের বাসনা জেগেছে। তাই সঙ্গী হয়েছে পিসিমার।

রোদ উঠল। আমি বারান্দা থেকে পথের দিকে চেয়ে রইলাম। এবার দুজনকে টিউশনিতে বেরুতে হবে। কিন্তু হৃদিরঞ্জন কই! ঐ তো পিসিমা আর ভোলা গেট দিয়ে ঘরে ঢুকছে। ওরা ওপরে এলে হৃদির কথা জিজ্ঞেস করলাম। ভোলা অবাক হয়ে বলল, কই হৃদিরঞ্জন তো আমাদের সঙ্গে যাননি।

তাহলে গেল কোথায় ও! একা একাই কি টিউশনিতে বেরিয়ে গেল নাকি? কিন্তু এমনটা তো কখনও হয় না। দুজনে এক সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। ওর ঢাউস একখানা ব্যাগ প্যাসেজের হ্যাঙারে ঝোলান থাকত। তার ভেতরেই থাকত ওর সর্বস্ব। পিসিমা ডাক দিয়ে বললেন, কই এখানে হৃদের ব্যাগ তো দেখছি না।

মুহূর্তে বারান্দায় সকলে জড়ো হয়ে গেলাম। হৃদিরঞ্জন কলকাতার বাস তুলে নিশ্চিত দেশে রওনা হয়ে গেছে।

পিসিমা বললেন, দুবন্ধুতে কোন রকম মন কষাকষি হয়নি তো বাবা?

বললাম একেবারেই না। গল্পগুজব করতে করতেই ঘুমিয়েছি।

ভোলার মা বললেন, বড় ভাল ছিল ছেলেটা গো।

দেখলাম ঝুমির চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠেছে। আমি জানি হৃদির সঙ্গে ঝুমির সুন্দর একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় মেশা সে সম্পর্ক। হৃদি কেবল ঝুমির পড়াগুলোই তৈরি করে দিত না। সে ঝুমিকে নানা ধরনের গল্প শোনাত। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ঝুমি সেসব গল্প শুনত।

গল্পের জাদুকরকে হারিয়েই কি ঝুমি নীরবে কাঁদছিল? চাঁপাকলির মত একটি সুন্দরী মেয়ে ধীরে ধীরে রোদ আর হাওয়ার ছোঁয়ায় তার পাপড়ি মেলছিল। রোদের মত স্নেহের উত্তাপে বাতাসের মত কম্পমান সোহাগের স্পর্শে সে বিকশিত হয়ে উঠছিল। তাই হৃদিরঞ্জনকে হারিয়ে সেকি ভাসছিল

তার কৃতজ্ঞতার কান্নায় ?

ইউনিভারসিটি যাবার জন্য জামাটার ভেতর সবে মাথা গলিয়েছি, এমন সময় আমাদের পত্রিকা অফিসের ছাদে দুম্দাড় একটা শব্দ শুনতে পেলাম। পরক্ষণেই হৈ হৈ করে উঠল আশপাশের মানুষজন। আমি ছাদে উঠে গেলাম। সবাই আকাশের দিকে চেয়ে আছে। দেখ দেখ সর্বনাশ হয়ে গেল। আমি দেখি, দুটো প্লেনের একটা জ্বলতে জ্বলতে শিয়ালদার দিকে নেমে চলেছে, অন্য একটা প্লেন জ্বলন্ত অবস্থায় ঠিক আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ইউনিভারসিটির কোণায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে ছুটলাম ইউনিভারসিটির দিকে।

কলুটোলার কাছে গিয়ে দেখি ট্রপিকেলের উত্তর পশ্চিম কোণায় প্লেনখানা ভেঙে পড়েছে। প্লেনের তখন প্রায় কোন চিহ্নই ছিল না। ছোট প্লেনখানা তাল প্যাকিয়ে পুড়ছে। ইতিমধ্যে পথের ওপরে অগ্নিদগ্ধ জনদশেক পথচারীকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স যাতায়াত করছিল। পরে শুনেছিলাম, দুটি প্লেনেই চালক ছাড়া কোন যাত্রী ছিল না। ধাক্কা লাগার পরে একজন চালক নাকি প্যারাসুটে নেমে পড়তে পেরেছিলেন। অন্য হতভাগ্য চালকটি একেবারে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন পেট্রোলের ভয়ঙ্কর অগ্নিদাহে।

এই মর্মান্তিক স্মৃতি দীর্ঘদিন মানুষের মনে গাঁথা হয়েছিল। ইউনিভারসিটিতে যাই আসি। কিন্তু পড়াশোনায় মন বসাতে পারি না। পত্র-পত্রিকায় কি করে লেখাজোখা প্রকাশ করা যায় সেই সন্ধানে থাকি। রবিবারের আনন্দবাজারে কলকাতার ফুটপাথের ওপরে দীর্ঘ চিত্রধর্মী একটি লেখা প্রকাশিত হল। কিছুদিন পরে ঐ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাতে ছাপা হয়ে বেরুল একটি কবিতা।

শারদীয় সংখ্যাটি কবে প্রকাশিত হবে তাই নিয়ে দুরু দুরু বক্ষে কতদিন যে প্রতীক্ষা করেছি তার ঠিক নেই।

কবিতাটি ছোট, কিন্তু ছোট হলেই তো আর প্রকাশের যোগ্য হয় না। আমি পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছি। এক একবার ভাবি শারদীয় সংখ্যায় আমার কবিতা প্রকাশিত হবে, এ অসম্ভব। কিন্তু আশা কুহকিনী। একাকী থাকলেই স্বপ্ন দেখি, কবিতাটি ছাপা হয়েছে। আর আমি উল্টেপাল্টে নতুন বইটার ভেতর থেকে মহামূল্য রত্নের মত তাকে আবিষ্কার করছি।

পাতিরামের দোকানে প্রায়ই হাঁটাচলা করি। সাগ্রহে খোঁজ নিই। কবে শারদীয় সংখ্যাটি বেরুবে। যেদিন শুনলাম পরের দিন ভোরে পুজো সংখ্যাটি মুক্তি পাচ্ছে সেদিন রাতে প্রায় ঘুমোতে পারিনি। ভোর হতে না হতেই আনন্দবাজার অফিসে ছুটে গেছি। না, অফিসের ভেতর সাহস করে ঢুকতে পারিনি। দূর থেকে দেখলাম রবিবাসরের সম্পাদক মন্মথ সান্যালমশায় সারারাত জেগে কাকভোরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম। কলেজ স্ট্রীটে পাতিরামের দোকানে এক ছুটে এসে হাজির হলাম।

হ্যাঁ, ওরা দৈনিক কাগজের সঙ্গে পূজা সংখ্যাও এনেছে। একখানা কাগজ চেয়ে নিয়ে সূচীপত্রে চোখ বোলাতে লাগলাম। অবোধ বালক যেমন সিঁড়ি ভাঙার সময়ে অসংলগ্ন পা ফেলে ঠিক তেমনি আমার দৃষ্টিও সূচীপত্রের সিঁড়িতে হোঁচট খেতে খেতে নেমে চলল। ঐ তো আমার নাম। উচ্ছ্বাসে রক্ত বুকের কাছে ছলকে উঠল। টাকা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আনকোরা পূজা সংখ্যাটি সেই মুহূর্তে কিনে ফেললাম। আমার মনে হয় সে বছরের শারদীয় আনন্দ-বাজারের প্রথম ক্রেতা আমিই। আমার লেখক খ্যাতি বন্ধু-বান্ধব মহলে অনেকটাই ছড়িয়ে পড়েছে। কিশোর বাংলায় প্রায়ই লিখছি। তাছাড়া তখনকার দিনে বহুল প্রচারিত শিশুমাসিক শিশুসাথীতে নিয়মিত লেখাজোখা শুরু করেছি। শিশুসাথীর সম্পাদক হিসেবে নাম থাকত আশুতোষ ধর মশায়ের। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল বিনয়কুমার গাঙ্গুলী মশায়ের ওপর। আমি যখন এক বছরের তখন পিতৃহারা হই। তাই আমার কাছে পিতার কোন স্মৃতি নেই। কিন্তু বিনয়কুমার গাঙ্গুলী আমার কাছে যথার্থ পিতার স্থান অধিকার করেছিলেন।

স্কুলে পড়ার সময়েই 'ঝুমকো ও ঘুঘু' নামে একটি রূপকথা লিখেছিলাম। সেই আমার প্রথম গদ্য রচনা যা কলকাতায় শিশুসাথী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলাম। স্কুলের এক বন্ধু মাসিক শিশুসাথীর গ্রাহক ছিল। তার কাছ থেকেই ঠিকানা যোগাড় করে লেখাটা পাঠিয়েছিলাম।

কয়েকমাস কেটে গেল কোন সাড়া নেই। আমার মনে ক্ষীণ আশার দ্বীপটা তখন নিভু নিভু করতে করতে একেবারেই নিভে গেছে। আমি লেখা পাঠাবার কথাটাই তখন মন থেকে মুছে ফেলেছি। হঠাৎ একদিন আমার ঠিকানায় একটি চিঠি এল। খাম খুলে দেখি শিশুসাথী অফিস থেকে লেখা, আমার রূপকথাটি প্রকাশের জন্য মনোনীত হয়েছে।

দুছত্র লেখা মাত্র, কিন্তু সেদিন আমার ভোরের আকাশকে আনন্দ গানে ভরিয়ে দিয়েছিল। আমি সেই চিঠি বুকের মধ্যে নিয়ে পুরো একটি মাঠ পেরিয়ে পাশের গাঁয়ে ছুটে গিয়েছিলাম আমার দাদার এক বন্ধুর বাড়িতে। তিনি আমার লেখার ব্যাপারে সব সময়েই উৎসাহ দিতেন। আমি আমার প্রায় সব লেখাই সিধুদাকে পড়িয়ে আসতাম।

আশায় আশায় থাকি, কবে একটি নতুন শিশুসাথী আমার লেখা বুকে নিয়ে আমার হাতে এসে পড়বে। কিন্তু মাস ঘুরে বছর এল লেখাটি আর প্রকাশিত হল না। একবছর পরে আমি সম্পাদকের নামে চিঠি পাঠাতে লাগলাম। তারও একবছর পরে আমার হাতে পত্রিকাটি এসে পৌঁছল। তখন স্কুলের গণ্ডী আমি অতিক্রম করে গেছি। আমি এখন শিশুসাথীর নিয়মিত লেখক। প্রথম পাতার কবিতাটিও মাঝে মাঝে লিখতে হচ্ছে বিনয়বাবুর আদেশে। তাছাড়া শারদীয় সংখ্যায় লেখা ছাপা হচ্ছে।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটল। আমি 'ভাইবোন' নামে একটি গল্প লিখে-ছিলাম। গল্পটি পড়ে ঢাকা থেকে কবি জসীমুদ্দীন বিনয়বাবুকে একটি চিঠি

লেখেন। লেখকের পরিচয় তিনি জানতে চান। বিনয়বাবু আমার সম্বন্ধে তাঁকে কিছু লিখে জানিয়েছিলেন।

কয়েকমাস পরে আমি শিশুসাথী পত্রিকায় একটি কবিতা দিতে গেছি। বিনয়বাবুর ঘরে ঢুকেই দেখি স্বাস্থ্যবান দীর্ঘদেহী একটি মানুষ বিনয়বাবুর পাশের চেয়ারে বসে আছেন।

আমাকে দেখেই বিনয়বাবু বললেন, এঁকে চিনতে পার ?

আমি সলজ্জ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলাম।

আবার প্রশ্ন, 'কবর' কবিতাটা পড়েছ ?

ঐ বিখ্যাত কবিতাটি আমার দাদাদের সময় ম্যাট্রিকুলেশনে পড়তে পাঠ্য ছিল। সারা বাড়ির লোকে জড়ো হয়ে কবিতাটি পড়া হত। আমাদের বুক বেদনায় ভরে উঠত।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, পড়েছি বৈকি।

বিনয়বাবু এবার বললেন, দুছত্র বলতে পারবে ?

আমি শুরু করে দিলাম—

'এইখানে তোর দাদীর কবর
ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি
দুই নয়নের জলে।'

সবটুকু কবিতা আমি আবৃত্তি করে গেলাম।

আমার আবৃত্তির শেষে ভদ্রলোক হাততালি দিয়ে উঠলেন।

বিনয়বাবু বললেন, এখনো চিনতে পারনি ?

ভদ্রলোকের পায় হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম, 'কবর' কবিতার কবি জসীমুদ্দীন।

জসীমুদ্দীন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে তরুণ গল্প লেখকটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছেন।

হঠাৎ দরাজ গলায় কবি হেঁকে উঠলেন, বিনয়বাবু, যে সংখ্যায় 'ভাইবোন' গল্পটি বেরিয়েছিল সেটা দিন তো।

বিনয়বাবু পত্রিকাটি এনে দিতেই কবি বললেন, চল কলেজ স্কোয়ারে বসি গিয়ে। তুমি নিজের মুখে পড়বে, আমি শুনব। সেদিন অপরাহ্নের রাঙা রোদ এসে পড়েছিল কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘাসের জমিনে। কবি সেখানে আধশোয়া অবস্থায় গা এলিয়ে দিলেন। বললেন, পড়।

গল্পটি বড় ছিল। আমি সেটি পড়ে শেষ করলাম।

কবি উঠে পড়ে বললেন, এ নিয়ে চারবার আমার গল্প পড়া আর শোনা হল। ঢাকার বন্ধুদের শুনিয়েছি কিনা। এরপর একটু থেমে কবি বললেন, গল্প লেখককে পুরস্কৃত করা দরকার। এসো আমার সঙ্গে।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে এক পাবলিশারের ঘরে আমাকে নিয়ে ঢুকলেন। নিজের লেখা 'বালুচর' কাব্য-গ্রন্থটি চেয়ে নিয়ে আমার নাম লিখে

উপহার দিলেন।

আমার তরুণ মনে এই ঘটনাটি গভীর দাগ কেটেছিল।

সেদিন টিউশনি ছিল না। এসপ্ল্যানেডে এসে ট্রামে উঠে বসলাম। বিনয়-বাবুর বাড়ি সেদিন যাব। টালিগঞ্জের একটা কলোনীতে বিনয়বাবু থাকতেন। আমি খোঁজ করে এই প্রথম তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। নারকেল গাছের ভেতর ছোট ছোট টালীর বাড়ি, উদ্বাস্তু কলোনী। বিনয়বাবু সপরিবারে তারই ভেতর একটাতে থাকতেন। দরমার দেওয়াল। ভেতরে বিনয়বাবু যে ঘরটিতে থাকেন, সেখানে একটি তক্তপোষ পড়ে আছে। তারই ওপর বিছানা পাতা। বিনয়বাবু আমাকে তার ওপর বসতে বললেন।

আমি বিছানায় বসে আছি, বিনয়বাবু তক্তপোষের তলা থেকে একটি তোরঙ বের করলেন। সেটি খুলে ফেলতেই দেখা গেল, বইপত্র আর কাগজে ভরা। সেই তোরঙের কোণ থেকে তিনি একগোছা সুতোয় বাঁধা চিঠি বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ ত চিনতে পার কিনা?

আমি চিঠি খুলে অবাক! আমারই হাতের লেখা চিঠি। বছর কয়েক আগে গ্রামের একটি ছেলে শিশুসাথীর সম্পাদকের কাছে লেখা প্রকাশের জন্য আকুল আবেদন জানিয়ে যে চিঠিগুলি লিখেছিল, এ সেই চিঠি।

আমি শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বিনয়বাবুর দিকে চেয়ে রইলাম। একটি কিশোর হৃদয়ের ব্যথাকে এমন করে মর্যাদা দিতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

বিনয়বাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। ছোটখাটো মানুষটি। কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের টিপ। এক একটি মুখ আছে, সেদিকে তাকালেই মনে হবে, স্নেহ-মমতা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে! বিনয়বাবুর স্ত্রীর মুখেচোখে সেই মমতার মায়াময় রূপটি দেখেছিলাম।

উনি আমাকে প্রণাম করতে উদ্যত দেখে হাতে ধরা খাবারের বাটিখানা ছোট একটা টিপয়ে নামিয়ে রাখলেন।

আমি প্রণাম করলাম, তিনি মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

গুরুজনদের অনেককে প্রণাম করতে হয়, কিন্তু মন ভরে না। আবার এক একজনকে প্রণাম করা মাত্রই মনটা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। বিনয়বাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করে আমার মন ভরে গেল।

বিনয়বাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, আমি বুঝি বাদ পড়লাম?

উনি ত্রস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, আনছি।

বিনয়বাবু আর আমি পাশাপাশি খাটে বসে ফলাহারে মন দিলাম। দুধ কলা বাতাসা সহযোগে মুড়ি। বড় জামবাটি, খাবার ধরেছে অনেকখানি।

আরও মুড়ি নিয়ে এলেন বিনয়বাবুর স্ত্রী।

বললাম, না মা, আর নেব না।

উনি হেসে বললেন, শুধু মুড়ি নয়, দুধ-কলা, সবই পাবে।

বললাম, সকালে কোনোদিনই এত খেতে পাই না। তাই একটু খেলেই পেট

ভরে যায়। আপনি তো অনেকখানি দিয়েছেন।

উনি এবার স্বামীর বাটিতে কিছু দিয়ে গেলেন।

যাবার সময় বললেন, এখানে আজ খেয়ে যাবে।

আমি বললাম, আমার পত্রিকা অফিসে খাবার ফেলা যাবে। তাছাড়া অনেক বেলা অব্দি আমার জন্যে ভাতের থালা নিয়ে বসে থাকবেন বীণাদি।

পত্রিকা অফিসে বুঝি খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন আছে?

বললাম, 'কিশোর বাংলা' পত্রিকা অফিসে আছে। ছোট একটা প্রেসের কিছু কর্মী, আর আমাদের মত দু'একজন ওখানে খাওয়া-দাওয়া করি। পুরো খরচটা পত্রিকা অফিস চালাতে পারে না। আমরা টিউশনি করে কিছু টাকা ওখানে দি।

উনি বললেন, বীণাদি কে? উনি ওখানে রান্নার কাজ করেন বুঝি?

বললাম, দাঙ্গার সময় দুটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে পূর্ববাংলা থেকে চলে এসেছেন। স্বামী নেই, একেবারে অসহায় পত্রিকা অফিসে রান্নার কাজ পেয়ে বেঁচেছেন।

বীণাদি তোমাকে খুব স্নেহ করেন বুঝি?

সবাইকে। ওখানে যারা থাকে খায়, তাদের সবাইকে। আমি অনেকদিন উঁকি দিয়ে দেখেছি, বীণাদির পাতে একমুঠোর বেশী ভাত নেই। বললে বলেন, তুই থাম্ তো। এখানে এলি, কাজকর্ম কিছু নেই বুঝি।

এবার বিনয়বাবুর স্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সেই ঢাকার বাড়ির কথা আজও ভুলতে পারি না। উনি তখন হেডমাস্টার, কত ছেলে যে প্রতিদিন দল বেঁধে আসত আমার বাড়িতে তার হিসেব নেই। আমি একহাতে রাঁধতাম। ওদের খাইয়ে যে কত সুখ তা বলে বোঝাতে পারব না। অবশ্য দাঙ্গার কিছু আগেই তোমার জ্যাঠামশায় ওখানকার কাজ ছেড়ে কলকাতায় এসেছেন। শিশুসাথী পত্রিকা দেখাশোনা করার জন্য আশুতোষ ধর মশাই ওঁকে এখানে এনেছেন।

একটু থেমে বললেন, তুমি থাক কোথায়? বললাম, পত্রিকা অফিসে শোবার জায়গা বড় কম, তাই কোন কোনদিন পত্রিকার সহ-সম্পাদক রবীনদার বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকি। ওঁদের ঠাকুরদালানে।

ওঁদের নিজেদের বাড়ি?

হ্যাঁ, কলকাতার পুরানো বাসিন্দে। ওঁর বাবা কাকারা সপরিবারে থাকেন সে বাড়িতে। রবীনদার থাকার জন্যে ছোট্ট একটুকরো ঘর। তাতে বই ঠাসা। একটা লেখার টেবিল। ছোট্ট একটি তক্তপোষ। রাত এগারোটায় লেখাপড়া শেষ করে রবীনদা শুয়ে পড়েন। ঐ খাটে দুজন আঁটে না, তাই আমার বিছানা পড়ে ঠাকুরদালানে। পাছে আমি কিছু মনে করি, তাই রবীনদা মাঝে মাঝে আমার পাশে বিছানা পেতে শুয়ে পড়েন।

মা বললেন, ভারী ভাল ছেলে তো, ওকে একদিন আমাদের এখানে নিয়ে এসো।

বললাম, নিশ্চয় নিয়ে আসব। তবে রবীনদা খুব চুপচাপ থাকেন, আমাদের মত হড়বড় করে কথা বলেন না।

উনি রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াবার আগে বললেন, আর একদিন এসে খেও। সেদিন তোমার বীণাদিকে বলে এসো।

আমি মাথা নাড়লাম।

এতক্ষণ খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে চুপচাপ বসে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন বিনয়বাবু। এবার বললেন, তোমার জন্য একটা খবর আছে। কথাটা বলেই আমার দিকে প্রসন্ন হাসিভরা মুখে তাকালেন। আমিও তাঁর দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে রইলাম। তিনি বললেন, আশুবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমরা ছেলেমেয়েদের পাঠানো লেখাগুলো প্রতি মাসে সমালোচনা করব। কোন কোন লেখা ভাল হলে সংশোধন করে ছাপব। কবিতার যে অংশটুকু ভাল হবে, তা বাছাই আর মেরামত করে ছেপে দেব।

বললাম, খুব ভাল হবে।

আচ্ছা, এই আসরটার কি নাম দেওয়া যায় বল তো?

হঠাৎ মনে এসে গেল, বললাম, 'মধুকরের আসর'।

উনি তারিফ করে বলে উঠলেন, খুব ভাল। নানা ফুলের মধু সংগ্রহ হবে এ আসরে। আচ্ছা, তাহলে এ আসরের পরিচালকের নাম কি দেওয়া যায়?

বললাম, মধুকরের আসরের পরিচালক একমাত্র 'মধুকর'ই হবে।

উনি হঠাৎ বললেন, আগামী মাস থেকে তুমিই মধুকর। মাসে লেখাগুলো দেখে নির্বাচন আর সংশোধন করার জন্যে পারিশ্রমিক পাবে তিরিশ টাকা।

আনন্দে সত্যিই সেই মুহূর্তে আমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি শিশুসাথী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের একজন! তার ওপর তিরিশ, তিরিশ টাকা দক্ষিণা!

সেদিন মুখ ভরা হাসি, বুক ভরা বল নিয়ে 'কিশোর বাংলা' অফিসে ফিরে এলাম। বীণাদিকে বললাম, ভারী ক্ষিদে পেয়েছে।

সবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বীণাদি পাত পেড়ে খেতে দিলেন। সেদিন এত খেয়েছিলাম, সম্ভবতঃ বীণাদির হাঁড়িতে আর এক মুঠোও ছিল না।

খাওয়া শেষ হলে বললাম, বীণাদি আজ আপনার উপবাস।

বীণাদি বললেন, স্বামী যাদের নেই, তাদের উপবাস অভ্যেস করতে হয়। আজ যদি তোর দৌলতে সে সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে লাভ ছাড়া এক ফোঁটা লোকসান নেই।

আমি বললাম, পার বটে তুমি বীণাদি। বীণাদি কাছে বসেছিলেন, হঠাৎ আমার মাথাটা নেড়ে দিয়ে বললেন, এই তো মুখ দিয়ে আসল বাণীটি বেরিয়েছে। এতদিন আপনি, আপনি বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিলি কেন?

বললাম, সবাই তোমাকে সম্মান করে কথা বলে, তাই আমিও বলতাম।

বীণাদি বলল, তুমি বললে কোনরকম অসম্মান করা হয় না। বরং অনেক কাছের মানুষ বলে মনে হয়।

একদিন ছাদে বসে বীণাদিকে কাঁদতে দেখেছিলাম। দুপুরবেলা ছাদের দরজাটা ভেজানো ছিল। আমি হঠাৎ উঠে গিয়েছিলাম। ভেজা কাপড়খানা শুকুতে দেওয়া ছিল, তাই তুলতে। নিচে বেণুদা প্রেসের কাজে রাতদিন ব্যস্ত। রবীনদা তখনও আসেননি। স্বামীজী রোজকার মত কাজে বেরিয়ে গেছেন। আমি হঠাৎ একটা হাফ ছুটির দৌলতে ইউনিভারসিটি থেকে ভরদুপুরে এসে পড়েছি।

ভোজন দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, বীণাদির কোলে তার ছেলে বাবুই ঘুমিয়ে পড়েছে। বীণাদি তার গায়ে হাত বুলোচ্ছে আর ফিস ফিস করে কথা বলে চলেছে। মাঝে মাঝে আঁচলটা টেনে নিয়ে চোখ মুছছে বীণাদি। বীণাদি বলছে, সত্যি বাবা, আর তোকে কোনদিন মারব না। আমরা গরীব, চালচুলো নেই, এমন করে চেঁচিয়ে কি খাবার চাইতে আছে।

আবার ফোঁপানি। তারই ভেতর ফিস ফিস কথা শোনা যাচ্ছে, ক্ষিদে পেলে চুপিচুপি আমাকে এসে বলবি তো। আমি জানি বাবা, তোর কত ক্ষিদে পেয়েছিল। পাঠশালা থেকে ফিরে আমরা ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির হতাম। একটু থেমে আবার বলতে লাগল, সবাই যখন একসঙ্গে খেতে বসে তখন তুই সব চেয়ে বড় জিনিসটা নেবার জন্য বায়না ধরিস কেন? যার কিছু নেই তাকে ভাতের ফেন, ডালের জলটুকুই খেতে হয়। এই দুঃখের সাগর পেরিয়ে বড় হতে হবে রে বাবা।

আরও অনেক কিছু মনের আক্ষেপে বলেছিল সেদিন বীণাদি। যাকে উদ্দেশ্য করে বলা, সে কিন্তু মার খেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল মায়ের কোলেই।

আমি প্রথম মাসে শিশুসাথী অফিস থেকে তিরিশটা টাকা পেয়ে কিশোর বাংলায় চলে এলাম। তখন রাতের রান্নায় ব্যস্ত ছিল বীণাদি। আমি চুপিচুপি চোরের মত তার শোবার বিছানার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, কেউ যদি দেখে ফেলে। আমি বুক পকেট থেকে পনেরটা টাকা বের করে বীণাদির বালিশের তলায় রেখে দিলাম।

পরের দিন একটা কাণ্ড ঘটল।

ইউনিভারসিটি যাবার আগে আমি একাই খেতে বসতাম। সেদিনও খেতে বসেছি, বীণাদিকে ভারী অন্যমনস্ক দেখলাম। একসময় আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বীণাদি বলল, তোমার কি কোন টাকা হারিয়েছে?

বীণাদি কখনও 'তুই', কখনও বা 'তুমি' সম্বোধনে কথা বলত।

আমি প্রাণপণে নিজের মনের ভাবটি চেপে রেখে চোখে-মুখে বিস্ময় চিহ্ন এঁকে বললাম, কই না তো।

বীণাদি আবার বলল, ভাল করে হিসেবপত্র করে দেখেছ?

হেসে বললাম, যাদের অঢেল আছে তারাই হিসেব কষে দেখে বীণাদি। আমাদের মত চুনোপুঁটি, এক দু'আনার কারবারি হিসেব মেলাবে কি দিয়ে।

আবার বীণাদি বলল, ভুলে কিছু পকেট থেকে পড়ে যায়নি তো ভাই?

বার বার এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন বীণাদি?

বীণাদির মুখখানা গম্ভীর আর কেমন ম্লান হয়ে গেল। আমি খেয়েদেয়ে উঠে এলাম।

ইউনিভারসিটি, শিশুসাথী অফিস আর টিউশনি সেরে সন্ধ্যায় কিশোর-বাংলার অফিসে গিয়ে দেখি, পরিস্থিতি থমথমে। সদাপ্রসন্ন বেণুদা গম্ভীর মুখে প্রুফ দেখছেন। রবীনদা পত্রিকার লেখাগুলোতে চোখ বুলোচ্ছেন।

আমি চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি, রান্নাঘরে বুলবুল খুন্তি নাড়ছে। খোলা চুল। চোখমুখ কেমন যেন ফোলা ফোলা। বছর তের বয়সের এই শ্যামলা সুন্দর মেয়েটিকে আমরা সকলেই ভালবাসতাম।

আমি ইশারায় বুলবুলকে কাছে ডেকে বললাম, বড় যে রাঁধুনি হয়েছিস, মা কই ?

ও মুখে কোন জবাব না দিয়ে মায়ের শোবার ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম, আবছা আলো-আঁধারীতে বীণাদি বিছানায় শুয়ে আছে।

রাতে রবীনদার ঠাকুরদালানে শুয়ে আছি, পাশে রবীনদাও শুয়েছেন। হঠাৎ রবীনদা বললেন, বুলবুলটা আজ বীণাদির হাতে খুব মার খেয়েছে।

বললাম, সেকি, কেন ?

রবীনদা বললেন, বীণাদি তাঁর বিছানায় পনেরটা টাকা পান। সকলকে জিজ্ঞেস করে যখন জানতে পারেন, এ টাকা পত্রিকা অফিসের কারুরই নয়, তখন ছেলেমেয়ের ওপর তাঁর সন্দেহ হয়। কোথা থেকে টাকাটা হয়তো ওরা চুরি করেছে। ছেলেটার গালে এক চড় কষাতেই সে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় পালাল। তারপর বীণাদি পড়লেন বুলবুলকে নিয়ে। জেরায় জেরায় জের বার করলেন। তাঁর ধারণা হল, যেহেতু বুলবুল দোকানে সওদা করতে যায় সেহেতু, টাকা চুরিটা তারই কাজ। চুলের ঝুঁটি ধরে সে কি মার। আমি আর বেণু ছাড়াতেই পারি না। শেষে মারতে মারতে নিজেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। মুখে মাথায় জলের ছিঁটে দিয়ে জ্ঞান ফিরতেই বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্য হয়ে যাবে রঞ্জন, মেয়েটা এত মার খেয়েও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি।

সারারাত ঘুমুতে পারলাম না, অনুশোচনায় মরে গেলাম। এ আমি কি করেছি। কার দারিদ্র্য ঘোচাতে গিয়েছি আমি ? যার এতখানি আত্মমর্যাদাবোধ, মনের এতখানি ঐশ্বর্য, সামান্য কাঞ্চন দিয়ে তার মুখখানাকে উজ্জ্বল দেখতে চেয়েছি। ছিঃ ছিঃ।

পরের দিন দুপুরে খাবার আসনে বসেছি। পাশে বসে রোজকার মত ণাদি আমাকে খাওয়াচ্ছে। আড় চোখে তাকিয়ে দেখলাম, মুখের ভাব াভাবিক।

এক সময় খেতে খেতে খাওয়া থামিয়ে বীণাদির দিকে চেয়ে রইলাম।

কিছু নেবে ?

মাথা নেড়ে জানালাম, না।

তবে অমন করে চেয়ে রয়েছ কেন ?

বলেই ফেললাম, বীণাদি, তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাইবারও মুখ নেই।

আমি অনেক আগেই তোমাকে ক্ষমা করেছি রঞ্জন।

চমকে উঠলাম। বীণাদি কি করে জানল যে আমিই টাকাটা রেখেছি !

বললাম, জানি না তুমি কি করে জেনেছ তবে এতবড় একটা অপরাধের জন্য সারারাত আমি ঘুমুতে পারিনি।

বীণাদি হঠাৎ তাঁর বাঁ হাতখানা আমার মাথায় রেখে বলল, দিদিকে যদি কিছু দেবার ইচ্ছে হয়েছিল তাহলে সোজাসুজি তা আমার হাতেই তুলে দিতে পারতে।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা আমি বুঝতে পারিনি দিদি।

দেখলে তো গোপনীয়তার বিপদ কতখানি। রঞ্জন, আজ একটা কথা বলি, মনের মধ্যে যা আসবে তাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করবে, এতে অনেক শান্তি পাবে। মনের জোরও বাড়বে এতে। গোপনীয়তায় দুঃখ ছাড়া আর কিছু নেই।

আমি হাঁ করে বীণাদির কথাগুলো শুনছিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে গেল বীণাদি।

আমি খেতে লাগলাম। মনটা আমার অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেছে।

বীণাদি হঠাৎ বলল, তুমি এখন জীবনের সবকিছু বুঝতে আরম্ভ করেছ রঞ্জন, তোমাকে আমার বলতে কিছু বাধা নেই।

আমি বীণাদির মুখে অশ্রুতপূর্ব কথাটি শোনার জন্য তাকিয়ে রইলাম।

আমি যখন শুকনো পাতার মত ঝড়ের মুখে উড়তে উড়তে দেশ ছেড়ে চলে আসি তখন একটি মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মানুষটি আমাকে অসহায় দেখে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। আমিও সাধ্যমত আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। একসময় আমরা কলকাতা পৌঁছলাম। উনি যা বললেন তা হল, হুগলীর একটি গ্রামে ওঁদের পরিবার-পরিজন দাঙ্গার আগেই বসতি পত্তন করে আছেন। উনি টাকা পয়সার বিলি ব্যবস্থার জন্য দেশে থেকে যান। এখন ওঁরা জানেন না, মানুষটি কোথায় কেমনভাবে আছেন।

এ অবস্থায় উনি আমাকে সোজাসুজি একটি প্রস্তাব দিলেন, আমি যদি রাজি থাকি তাহলে আমাকে নিয়ে উনি নতুন করে সংসার পাতবেন। বেশকিছু টাকা পয়সা, সোনাদানাও উনি সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বললেন, আমার ছেলেমেয়ে দুটিকে উনি কোন অনাথ-আশ্রমে রাখার ব্যবস্থাও করে দেবেন।

আমি তখন একেবারে অসহায়। কলকাতা আমার কাছে সমুদ্র। মানুষটি তখন সেই সমুদ্রে একটা নৌকোর মত। সারারাত চোখ বন্ধ করতে পারিনি। ভেবেছি, শুধু ভেবেছি। আমার দুটো ছেলেমেয়ে কিন্তু আমাকে ছুঁয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। এত নির্ভরতা ওদের মায়ের ওপর। নিজের কোন

সুখের জন্যে আমি ওদের অনাথ-আশ্রমে ঠেলে দেব। কৃতজ্ঞ আমি ঐ মানুষটির কাছে। কিন্তু এ-কথা সত্য, একদিন ওর দেহভোগ মিটবে। তখন নিজের পরিজনের জন্য মন উতলা হবে। অনুশোচনাও আসতে পারে। তখন আমার আর ওর ভেতর তৈরী হবে একটা মিথ্যার জাল। সে জাল ছিঁড়ে ফেলা শক্ত, আবার তার বাইরে গিয়ে থাকা আরও শক্ত।

আমি শেষরাতে মানুষটির কাছে গিয়ে বললাম, আপনি যা করেছেন তার জন্যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করব না। তবে আপনি আমার কথা না ভেবে সকালের ট্রেনে আপনার আত্মীয়-স্বজনের কাছে চলে যান।

যাবার সময় উনি আমাকে মূল্যবান একটি গয়না দিতে চেয়েছিলেন। আমি গয়নাটি নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ওঁর হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ভুলব না আপনাকে কোনদিন।

বীণাদি একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি হবে ভাই গয়না নিয়ে? ওটাকে অকারণে একটা স্মৃতি হিসেবে আগলে রেখে কষ্ট পেতে হত, নয়ত অভাবের তাড়নায় বেচে খেতে হত। টাকা একদিন ফুরতো, তখন আরও গাঢ় অন্ধকার। তার চেয়ে খালি হাতে যত আগে বিপদের মুখোমুখি হওয়া যায় ততই মঙ্গল।

হঠাৎ বললাম, তুমি কি আমার টাকাটা তাহলে ফেরৎ দেবে বীণাদি?

মুচকি হেসে বীণাদি মাথা নেড়ে জানাল, না।

তবে সে ভদ্রলোককে ফেরৎ দিলে কেন?

সে কথা তো আগেই বলেছি। তবে তোমাকে যে ফেরৎ দেব না তার কারণ, তুমি আমারই মত সহায়-সম্বলহীন। গরীব মানুষ যখন আর একজন গরীবকে কিছু দেয় তখন তা মাথায় তুলে নিতে হয়।

আমি আবার বললাম, তুমি ঐ ভদ্রলোকের কথা আজ তুললে কেন বীণাদি?

উনি মনের কথা গোপন না রেখে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, আমিও আমার জবাবে অস্পষ্টতা কোথাও রাখিনি। তাই কারু ভেতরেই গোপনতার কোন গ্লানি রইল না।

আচ্ছা, এখন বল দেখি, টাকাটা যে আমার তা তুমি জানলে কি করে?

তুমি না বললে আমার জানার উপায় ছিল না রঞ্জন, তবে হঠাৎ একটা সূত্র হাতে এসে গেল।

আমি বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম।

বীণাদি বলল, তুমি পনেরো টাকা খাইখরচ বাবদ বেণুকে দিয়েছিলে। সে টাকা মাসকাবারি কেনার জন্য আমার হাতে আসে। কড়কড়ে নতুন পাঁচ টাকার তিনখানা নোট। আমার কিন্তু সন্দেহ হল নোটগুলো হাতে পেয়ে। বেণুকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম, তুমিই নোটগুলো দিয়েছ। মিলিয়ে দেখলাম, আমার পনেরো টাকা আর বেণুর দেওয়া টাকা এক ব্যাঙ্ক থেকে আনা হয়েছে। পর পর নম্বরেরও মিল আছে।

হেসে বললাম, চোর তার ধরা পড়ার কিছু সূত্র পেছনে রেখে যায়।

বীণাদি বলল, রঞ্জন বলি আর যাই বলি, তোর আর একটা নাম তো হাবলু।

ঐটাই তোর আসল নাম।

আমি উঠে পড়ে বললাম, ইউনিভারসিটির ফার্স্ট পিরিয়ডটা বোধহয় আর করতে পারলাম না।

ক্লাশ-রুমের দরজা বন্ধ ছিল। আস্তে আস্তে কটা টোকা মারলাম। বন্ধুরা এসে খুলে দেবে, এই ভরসা। সাধারণতঃ তাই হয়।

দরজা খুলে দিলেন যিনি তাঁকে দেখেই মাথা নিচু করে নিজের সীটের দিকে সরে পড়লাম। অবশ্য নির্দিষ্ট কোন সীট না থাকলেও মোটামুটি বসার একটা জায়গা স্থির করা থাকত।

সুনীতিবাবু দরজাটি বন্ধ করে আবার ডিক্টেশান দিতে লাগলেন। সুনীতিবাবুর যেদিন ক্লাশ থাকত সেদিন ফার্স্ট বেঞ্চে বসা খুব একটা সুবিধেজনক ছিল না। তিনি ইংরাজীতে ভাষাতত্ত্বের ওপর নোট দিতেন। এত দ্রুত বলে যেতেন যে সবটুকু লেখা প্রায় কারু পক্ষেই সম্ভব হত না। কেউ কেউ দু'চারটে শব্দ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লিখত। পরে যখন সুনীতিবাবুর ক্লাশ হত তখন উনি সামনের বেঞ্চের যে কোন ছেলের খাতা টেনে দেখতেন। ছেলেটি ঠিক মত লিখতে পেরেছে কিনা, তা দেখতেন না, কত দূর তিনি নোট দিয়েছেন তা জেনে নেবার জন্যেই খাতাটা দেখতে চাইতেন। শেষের দু'চারটে শব্দ দেখলেই তিনি বুঝে নিতেন সেদিন কোথা থেকে তিনি নোট শুরু করবেন।

সুনীতিবাবুর সমস্ত চেহারার মধ্যে একটা ভারিক্কি ভাব ছিল, কিন্তু চোখে মুখে কৌতুক আর আনন্দের অপূর্ব এক দীপ্তি মাখানো থাকত। বন্ধ ক্লাশ-রুমের বাইরে থেকে কেউ টোকা দিলে অধ্যাপকদের মধ্যে একমাত্র সুনীতি-বাবুই নিজের হাতে তৎপরতার সঙ্গে দরজা খুলে দিতেন।

সুনীতিবাবুর ক্লাশ বছরে আঙুলে গোনা কয়েকটা দিনই পেতাম। বারো মাসের ভেতর সম্ভবত মাস ছয়েক উনি দেশের বাইরে থাকতেন। বিদেশ থেকে ফিরে এলেই আমরা তাঁর কাছে বিদেশ ভ্রমণের গল্প শুনতে চাইতাম। এমন অপূর্ব স্মৃতিচারণ আমি অন্তত আর কারু মুখে শুনিনি। এত গভীর পাণ্ডিত্য অথচ এমন সরস সহজ প্রকাশভঙ্গী যথার্থই বিরল।

জাপানীরা (যতদূর মনে পড়ছে) কেমন করে একটা শব্দকে মুখের মধ্যে জিভের ডগায় নেড়ে-চেড়ে নানারকম অর্থবহ বাক্য উগরে দিতে পারে, তা তিনি নিজেই উচ্চারণ করে দেখতেন। বিভিন্ন দেশের লোকাচার, সংস্কৃতির কথা যখন বলতেন, তখন আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতাম। মনে হত ঐসব দেশের মানুষেও বুঝি এত খুঁটিয়ে তলিয়ে নিজের দেশটাকে দেখেনি।

আমার এক শিল্পী বন্ধু ছিল। কি করে যেন সুনীতিবাবুর সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়ে যায়। সুনীতিবাবু তাঁর বইয়ের জন্য কয়েকটা স্কেচ বন্ধুকে

দিয়ে আঁকিয়ে নেন।

স্কেচটেচ তো আঁকা চুকলো, এখন শিল্পীর পারিশ্রমিকের কথা। সুনীতিবাবু আমার বন্ধুটিকে বললেন, আপনি অনেক খেটে স্কেচগুলো তৈরি করেছেন, আপনার কাজ আমার বেশ পছন্দ হয়েছে, এখন বলুন কত দিতে হবে পারিশ্রমিক ?

বন্ধুটি মুখ নিচু করে মাথা নেড়ে জানাল, সে এ কাজের জন্য কোন রকম পারিশ্রমিক চায় না।

সুনীতিবাবু বললেন, না, না, আপনাকে খাটিয়ে নেব কেন ? সে হবে না, আপনি একটা কিছু বলুন, তারপর আমি যা দেবার দেব।

বন্ধু অনড়, কিছুতেই নেবে না।

সুনীতিবাবুও এতগুলো ছবি মুফতে হস্তগত করতে নারাজ।

শেষে বন্ধুটি বলল, কাল আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব।

সুনীতিবাবু খুশী হয়ে বললেন, বেশ, তাই হবে।

পরের দিন বন্ধুটি একখানা খাতা হাতে সুনীতিবাবুর বাড়িতে উপস্থিত।

সুনীতিবাবু বললেন, হিসেব নিকেশ হয়েছে তো, কি দিতে হবে ?

বন্ধুটি খাতাখানা সুনীতিবাবুর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, স্যার, আপনার নাম সহি করে দিতে হবে।

আচ্ছা, তা না হয় দেওয়া যাবে, এখন কি দিতে হবে বলুন ?

স্যার, যদি একান্তই ছবির দাম দিতে চান তাহলে আপনি যতগুলো ভাষা জানেন, সেই ভাষায় স্ক্রিপ্টে আপনার নাম সহি করে দিন।

সুনীতিবাবু কিছু সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। শেষে মৃদু হেসে বললেন, কাল আসুন, খাতাটা রেখে যান।

পরের দিন বহু ভাষাবিদ সুনীতিকুমারের অজস্র বিচিত্র সব স্বাক্ষরে খাতা ভরে নিয়ে বন্ধুটি বাড়ি ফিরেছিল।

আমরা বলেছিলাম, তোমার ছবির মূল্য দা ভিঞ্চির একখানা ছবির চেয়ে কিছু কম নয়।

এক একজন মানুষ থাকেন যাঁরা ভাষাচর্চায় বিশেষভাবে আগ্রহী। সে ধরনের আগ্রহ আমার একেবারেই ছিল না। কিন্তু আমাদের অধ্যাপক সুকুমার সেন যখন সেই নিরস জগতের দরজা ধীরে ধীরে খুলে দিতেন তখন সে জগতের যতটুকু পরিচয় পেতাম তাতে বিস্মিত না হয়ে পারতাম না।

সুকুমারবাবু সুনীতিকুমারের একেবারে প্রথম দিকের ছাত্র ছিলেন। গুরুর প্রতি এমন অচলা ভক্তি সত্যিই দুর্লভ।

সুকুমারবাবু ক্লাশে কোন প্রসঙ্গ উঠলেই সুনীতিবাবুর কথা বলতেন। সে কথাগুলিতে গভীর শ্রদ্ধা মাখানো থাকত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষার ইতিবৃত্ত রচনা করে সুকুমারবাবু তখন ছাত্র ও গবেষক সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে বসেছেন। সুনীতিবাবুর পরেই সুকুমারবাবুর নামটা সর্বত্র উচ্চারিত হত। আমরা শুনতাম, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর এত পড়াশোনা আর কারু আছে

কিনা সন্দেহ। সুকুমারবাবুর শরীরটা ছিল বেশি ভারিভুরি। তিনি পড়াতেনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি। তাই আমাদের ভেতর একটা কথার চলন ছিল, সর্বদিক থেকে এমন গুরুভার, গুরুত্বপূর্ণ গুরুদেব আর দ্বিতীয় নাস্তি।

সুকুমারবাবু তাঁর ছাত্রদের 'আপনি' সম্বোধনে কথা বলতেন।

আমরা একবার তাঁর কাছে অনুযোগ করলাম, স্যার আপনি আমাদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করলে খুবই সংকোচ বোধ করি। মনে হয় আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে আছি। আপনি আমাদের 'তুমি' বলেই সম্বোধন করবেন।

উনি হেসে বললেন, 'তুমি', 'আপনি'তে কিছু যায় আসে না। ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক চিরদিনই অটুট থাকে। আমার মাস্টারমশায়ও (সুনীতি-বাবু) তাঁর ছাত্রদের 'আপনি' সম্বোধন করেন। কিছু মনে কর না, ওটা একটা অভ্যেস।

ছোটখাট মানুষ ছিলেন শশীভূষণ দাশগুপ্ত। আনুনাসিক ছিল তাঁর উচ্চারণ। অত্যন্ত দুরূহ বিষয়গুলি প্রাঞ্জল করে মনের মধ্যে গেঁথে দেবার দক্ষতা ছিল তাঁর। গবেষক হিসেবেও তখনই তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গ্রীষ্মের দুপুরেও কোনদিন আমরা শশীবাবুর ক্লাশ ছেড়ে করিডোরে পায়চারি করিনি।

আর এক আচার্য বিশ্বপতি রায়চৌধুরী মশায়। তিনি এলেই সারা ক্লাশে হাওয়া বদলে যায়। শীর্ণ ছোটখাটো মানুষটি। ক্লাশে ঢুকেই প্রথমে পকেট থেকে নস্যির কৌটোটি বের করেন। ঠেসে ঠেসে নাকে নস্যি গুঁজে শুরু করেন অধ্যাপনা। তিনি পড়ান যতটুকু তার চেয়ে বলেন অনেক বেশি। ভারী আকর্ষণীয় তাঁর বলা। যে কোন একটি বিষয় এমন স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বলে যান যা শুনলে মনে হবে তিনি স্বচক্ষে দেখে, স্বকর্ণে শুনে বলে যাচ্ছেন। তাঁর কতকগুলো প্রিয় উদাহরণ ও উপমা তিনি প্রায়ই ব্যবহার করতে ভালবাসেন। প্রতিবার বলার আগে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তাজমহলের উদাহরণটা আগে তোমাদের দিইনি তো ?' এমনি আরও অনেক কিছু।

আমরা বলি, না স্যার, না স্যার, বলুন শুনি।

আমরা কিন্তু ঐসব উদাহরণ, উপমা ওঁর মুখ থেকে বহু প্রসঙ্গে বহুবার শুনেছি। উনি কখন কি বলেছেন তা ভুলে যান। ওঁর মুখে একই কথা বার বার শুনলেও আমাদের ক্লান্তি আসে না।

মণিবাবু ক্লাসে ঢোকেন মর্জি মত। পড়ান চর্যাপদ। ভারী কঠিন বই। তাঁর লেখা বই থেকে ব্যাখ্যাটি পেয়ে যাই। ঐ বইটিই আমাদের একমাত্র ভরসা। সকলের পুস্তক ভাণ্ডারে মজুত রাখতে হয়।

মণিবাবু জীবনের শেষপর্বে এসে গেছেন। এখন আর পড়াতে পারেন না, খোলা বই হাতে বসে থাকেন। দু'চার ছত্র নিজের মনেই বলে যান। এক এক সময় একধরনের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়েন। হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে সোজা হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করেন। মুখে ফুটে ওঠে এক

অপার্থিব হাসি।

আমরা একটুও গোলমাল করি না। মণিবাবুর বিশ্রাম শান্তিতে হোক, এই কামনা করি।

জগতে এক একটি মানুষ থাকেন, যাঁদের আচরণ শিশুর মত। তাঁরা আপনিই সকলের ভালবাসা কেড়ে নেন। আমরা বুঝতে পারতাম, দীর্ঘদিন মানুষটি অধ্যাপনা করেছেন, এখন ওঁর ইচ্ছামতই কাজ করতে দেওয়া উচিত। এ যেন প্রবীণ অধ্যাপকের এক অলিখিত অধিকার। বাড়ির অতি প্রবীণ বৃদ্ধ সংসারের কোন পরামর্শে আর অংশগ্রহণ করতে পারেন না, তবু সংসারের সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তির মধ্যমণিটি হয়ে বসে রয়েছেন।

আমাদের বাংলার বিভাগীয় প্রধানের ক্লাশ ছিল। তিনি পড়াবেন বৈষ্ণব পদাবলী। ইংরাজী সাহিত্যের নামকরা পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রীকুমারবাবু। তিনি আবার আমাদের বাংলা বিভাগের প্রধানও। লম্বা কালো মানুষটি। বাইরে থেকে রসকষ বোঝার কোন উপায় নেই। অত্যন্ত কঠিন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। ওঁকে আমি হাসতে দেখিনি। ক্লাসে এসেছেন কোট-প্যাণ্ট পরে। প্রায় দিনই ঐ পোশাকে আসেন।

পড়াতে শুরু করলেন বৈষ্ণব পদাবলী। বোধহয় রসকষহীন মানুষটির পড়াতে পড়াতে কিছু ভাব এসে গিয়েছিল, তাই মাথাটাকে চেয়ারের পেছন দিকে ঠেলে একটু ডাইনে বাঁয়ে দুলিয়ে পড়তে লাগলেন—

'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু
তবু হিয় জুড়ন না গেল।'

লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রেখেও হৃদয় জুড়াল না।

মনে হল শ্রীমতী রাধার এই অনুভূতিটুকু প্রকাশ করার জন্য যে পরিবেশের দরকার ছিল, অধ্যাপকের পোশাক-পরিচ্ছদ, আবেগহীন উচ্চারণে তা ছিল না। কিন্তু ওঁর হাতেই ছিল রস-সামগ্রীগুলি পরিবেশনের ভার। রবীন্দ্রনাথের প্রেম বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ 'মহুয়া'ও উনিই পড়ান।

আমরা নিজেদের ভেতর বলাবলি করতাম, প্রেম, আবেগ উচ্ছ্বাসের রঙ-বাহারি বুদবুদ নয় গভীর অনুভবের, এই সত্য বোঝাবার জন্য শ্রীকুমারবাবুর আবির্ভাব।

গুরুগম্ভীর শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা ছিল শ্রীকুমারবাবুর। তাঁর বাংলা 'উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থটি পড়লেই এ কথার সত্যতা বোঝা যায়। তবে বিশ্লেষণ যে কত গভীর হতে পারে, জীবনের সর্বদিকে সঞ্চারী আলো ফেলে তা দেখাবার চেষ্টা করতেন শ্রীকুমারবাবু।

বাইরে কঠিন হলেও মানুষটি যে কতখানি পূর্ণ-প্রাণের ছিলেন, কতখানি ছাত্র-দরদী ছিলেন তার পরিচয় আমি বিশেষ এক অবস্থার ভেতর পড়েই পেয়ে গেলাম। আমাদের ইউনিভারসিটির সেক্রেটারী ছিলেন শৈলেনবাবু। ছাত্রদের সঙ্গে কথা প্রায়ই বলতেন না, কিন্তু কাজেকর্মে দেখিয়ে দিতেন, তিনি কতখানি ছাত্র-বৎসল। এক-দু'বছর আমরা নামমাত্র মাহিনা দিতাম, একেবারে ফাইনালের

আগে শোধ করতাম পাওনা গণ্ডা। শৈলেনবাবুর কাছে মাহিনা পরিশোধের ব্যাপারে অক্ষমতার আবেদন জানালেই উনি বেশ কিছুটা মকুব করে দিতেন। এই রেওয়াজ চলে আসছিল।

হঠাৎ ইউনিভারসিটির একটা অভ্যন্তরীণ গোলমালে শৈলেনবাবু চাকরী ছেড়ে চলে গেলেন। সেক্রেটারী হয়ে এলেন অধ্যাপক আচার্য। খবর রটে গেল তিনি অত্যন্ত স্ট্রিক্ট মানুষ, ভারী কঠিন ঠাঁই। তার পরিচয়ও পেতে দেরী হল না। আমাদের নাম কাটা গেল রোল কলের খাতাটি থেকে।

চোখে অন্ধকার দেখে সকরুণ একটি আবেদনপত্র রচনা করে ছুটলাম সেক্রেটারীর ঘরে। নিচের তলায় বিশাল ঘর। মোটা দেয়াল। ঘরখানা যেমন আবছা অন্ধকারে ঢাকা, তেমনি শীতল। আমি দুরু দুরু বক্ষে আবেদনপত্রটি এগিয়ে দিলাম। তুষার কঠিন স্থির বরফের চোখ। একবার দৃষ্টি ছুঁইয়েই বললেন, ইউনিভারসিটি মামার বাড়ি নয়। মাহিনা, রি-অ্যাডমিশান ফি, ফাইন, সবই একসঙ্গে দিতে হবে, তবেই নাম উঠবে খাতায়, পরীক্ষা দেওয়াও সম্ভব হবে।

আমি অনেক অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি করলাম, কিন্তু প্রফেসার আচার্য এমনি হার্ড-নাট যে একটুও ভাঙতে পারলাম না।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, স্যার, এ ব্যাপারে একবার প্রেসিডেণ্টকে বলে দেখব।

উনি কঠিন চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে আমার হাতে ধরা আবেদন-পত্রখানা চেয়ে নিলেন। পাছে প্রেসিডেণ্ট বে-আইনী কিছু করে বসেন তাই আবেদন-পত্রটির পাশে আমার কাছে ইউনিভারসিটির হক প্রাপ্যগুলির হদিস লিখে জানিয়ে দিলেন।

এ এক নতুন ফ্যাসাদ। তবু ছুটলাম প্রেসিডেণ্টের ঘরের দিকে। তখন শ্রীকুমারবাবু কলা-বিভাগের প্রেসিডেণ্ট। আমি দরজা ঠেলে ঢোকামাত্রই শ্রীকুমারবাবুর মন্তব্য শোনা গেল, আঃ জ্বালালে, একটু যে পড়াশোনা করব তার উপায় নেই।

হাত বাড়িয়ে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, দেখি কি আছে।

আমি তখন আমার পরিণতিটা বুঝে গিয়েছি। যন্ত্রচালিতের মত আবেদন পত্রটি ওঁর হাতে দিয়ে দিলাম।

উনি আমার আবেদন এবং সেক্রেটারি মশায়ের নোট (কোন খাতে কত দিতে হবে) খুঁটিয়ে দেখলেন।

টিউশনি কর ?

তখন একটিমাত্র টিউশনি হাতে। বললাম, আজ্ঞে স্যার, টিউশনি করেই সবকিছু চালাতে হয়।

এবার শ্রীকুমারবাবুই যুগিয়ে দিলেন কথা, সারাদিনে বেশ কটি টিউশনি করতে হয় নিশ্চয়ই।

ধরা গলায় বললাম, আমার আর কোন উপায় নেই স্যার।

উনি আমার পাঁচ মাসের মাহিনা মকুব করলেন। রি-অ্যাডমিশান ফি, ফাইন সবই বাদ দিলেন।

আমি আবেদন-পত্রখানা হাতে নিয়ে পাখির মত উড়ে যাচ্ছিলাম, পেছন থেকে হঠাৎ উনি ডেকে উঠলেন, আরে শোন। আমি যেতেই উনি আমার দরখাস্তটি টেনে নিয়ে লিখলেন, ফাইন—ওয়ান রুপি। লিখতে লিখতেই বললেন, বুঝলে, সামান্য একটা টাকা ফাইন দিও, নইলে সেক্রেটারীর সম্মান থাকে না।

আমার কোন আপত্তিই ছিল না। আমি তখন খুশিতে হাওয়ায় ভাসছি।

আবেদন-পত্রখানা নিয়ে আবার সেক্রেটারীর ঘরে ঢুকলাম। ওঁর সহি ছাড়া মাহিনা জমা দেওয়া যাবে না।

দরখাস্তটি টেনে নিয়ে উনি চোখ বোলালেন। আমি স্পষ্ট দেখলাম. অপমানে, ক্ষোভে মুখের রঙ মুহূর্তে পাল্টে গেল। বোঝা গেল, প্রেসিডেণ্টের আচরণে দারুণ রকম ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি।

কিছুক্ষণ কাগজখানা নাড়াচাড়া করে প্রেসিডেণ্টের ওপর প্রতিশোধের একটা পথ বের করলেন। ভাবখানা এই, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ডাউন করলেও, তোমার ওপরে আমি যেতে পারি।

যেখানে শ্রীকুমারবাবু ফাইন, ওয়ানরুপি লিখেছিলেন, সেখানটা ঘ্যাঁচ করে লাল কালি দিয়ে কেটে লিখলেন, ফাইন এক্সকিউজড।

দুই মহারথীর যুদ্ধের মাঝখান দিয়ে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে আমি মহানন্দে কাউণ্টারে টাকাটা জমা দিয়ে দিলাম।

আপনি রঞ্জনদা ?

পড়ন্ত দুপুরে 'কিশোরে বাংলা'র অফিসে বসে বিশেষ সংখ্যার লেখাগুলো নির্বাচন করছিলাম। এ সংখ্যাটি সম্পাদনার জন্য আমি আর শ্রাবন্তী পাঠক-দের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি। প্রতি বছর এমনি একটি করে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিশোর বাংলার লেখক লেখিকার ভেতর থেকে পাঠকেরা দুজন সম্পাদক নির্বাচন করেন। তারাই সে সংখ্যাটির দায়িত্ব পায়।

মেয়েটির দিকে তাকালাম। সুশ্রী সুঠাম এক তরুণী। স্বভাবতই আমার মনে এক চাপা চাঞ্চল্য। বাইরের গাম্ভীর্য অটুট রেখে বললাম, হাঁ, আমিই রঞ্জন। কোত্থেকে আসছেন ?

ওর শ্যামল সুন্দর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঠোঁট আর চোখে খেলা করে গেল কৌতুকের হাসি।

আমি শ্রাবন্তীর বোন। দিদি আপনার কাছে এই লেখাগুলো পাঠিয়েছেন। একখানা মোটা খাম ও আমার হাতে ধরিয়ে দিল।

আমি খুলে দেখলাম, শ্রাবন্তীকে দেওয়া কিছু লেখা ও নির্বাচন করে পাঠিয়েছে। মনোনীত লেখাগুলির ওপর 'ম' লেখা, আর অমনোনীত লেখার ওপর 'অ' লেখা। ছোট্ট একটা চিরকুট সঙ্গে। তরুণীটিকে মাদুরে বসতে

বলে চিঠি খুললাম।

প্রিয় রঞ্জন,

আমার বোধবুদ্ধি মত লেখাগুলো নির্বাচন করে পাঠালাম। শেষ বিচারের ভার তোমার ওপর। অমনোনীত লেখার কিছু কিছু ভাল অংশ তুলে সমালোচনা করতে বলেছিলে, আমি শুধু দাগ দিয়েছি। মন্তব্যটা তুমি করো। আমার বোন পুষ্পিতা লেখা নিয়ে যাচ্ছে ছোটকাকুর সঙ্গে। সে অনার্সের ছাত্রী, খুব স্পর্শকাতর আর অভিমানী। আশা করি তোমার আতিথ্যে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না।

তোমাদের শ্রাবন্তী।

আমার সহ-সম্পাদিকা শ্রাবন্তী দারুণ কৌতুকপ্রিয়। কলকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠ রক্তসম্পর্ক। কৌলিন্য এবং কৌতুকের মিশ্রণে অনবদ্য হয়ে ওঠে আলাপচারী শ্রাবন্তীর মুখ। শ্রাবন্তী চম্পকবর্ণা হলে পুষ্পিতাকে নব মেঘবর্ণা বলা যেতে পারে।

শ্রাবন্তীর চিঠির শেষ ছত্রে রয়েছে, আমার আতিথ্যে যেন পুষ্পিতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়।

কি ভেবে এ ছত্রটুকু লিখেছে ও। আমার আচরণে কি শ্রাবন্তী কখনও রূঢ়তা অথবা মর্যাদাহানিকর কোন কিছু লক্ষ্য করেছে। সে যা হোক, প্রথম দেখাতেই আমার পুষ্পিতাকে ভাল লেগেছে। বাদল মেঘের কোলে স্নিগ্ধ রোদের হাসিটুকু ফুটিয়ে সে এসেছে।

আমি তার দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলাম। আপনার কাকাবাবু কোথায়?

স্বামীজীর সঙ্গে পাশের ঘরে গল্পে জমে গেছেন।

আমি যে এ ঘরে আছি সে খবর আপনি পেলেন কি করে?

স্বামীজী বললেন।

অন্য কেউ তো বসে থাকতে পারতেন এ ঘরে।

ও আবার মিষ্টি একটুকরো হাসি উপহার দিল।

আমি দিদিদের সঙ্গে আপনার একটা গ্রুপ ফটো দেখেছি।

ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথা। আপনি কি খাবেন?

গা দুলিয়ে পুষ্পিতা বলল, কিছু না।

আমি বললাম, এমন জিনিস আনব, আপনি না খেয়ে পারবেন না।

আগে শুনি, বস্তুটা কি?

উহুঁ। আগে তো এনে ফেলি, আপনি না খেলে আমি দুজনেরটা খেয়ে ফেলব।

ও আবার হাসল।

সদ্য শিশুসাথী আর টিউশনির টাকা পেয়েছি। মনটা বেশ প্রফুল্ল আর গরম আছে। জামাটা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

অতিথি এবং স্বামীজীর জন্য সিঙাড়া, মিষ্টি নিলাম। আর একটা ঠোঙা

ভরে নিলাম অসাধারণ আলুর চপ। আলুতে সামান্য আমচুরের গুঁড়ো দিয়ে ভাজে। ভারী মুখরোচক।

বীণাদির মেয়ে স্বামীজীদের খাবার আর চা পরিবেশন করল। আমি চপের ঠোঙা নিয়ে ঢুকলাম নিজের ঘরে।

পুষ্পিতা কৌতূহলী হয়ে উঠল, কি আনলেন দেখি ?

আমি ঠোঙা না খুলেই বললাম, তুমি তো ছোঁবে না বলেছ।

আপনির জায়গার স্বাভাবিক ভাবেই তুমিটা এসে গেল। মর্যাদাহানি করে বসলাম না তো।

ও কিন্তু হৈ হৈ করে প্রতিবাদ করল, আমি খাব না বলেছি, ছোঁব না তো বলিনি।

ওর হাতে ঠোঙাটা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, খাওয়া কিংবা ছোঁয়া এখন মাননীয়া অতিথির ইচ্ছাধীন।

ও তরঙ্গ তুলে হাসি শুরু করেও থেমে গেল! সম্ভবত পাশের ঘরের কথা ভেবে।

হাসি থামিয়ে ও বলল, আমি আবার মাননীয়া হলাম কবে থেকে ?

আচ্ছা, ওটা না হয় উইথড্র করলাম। কিন্তু মাননীয়ার বদলে অনুরূপ একটা শব্দ তো চাই। ধর, আদরণীয়া।

এবার মুখে আঁচল চেপে ও ফুলে ফুলে হাসতে লাগল।

কোন বিশেষণ আমার চাই না। তুমি দিদির বন্ধু আমাকে শুধু পুষ্পিতা বলেই ডেকো।

ডাকতে পারি একটা শর্তে।

পুষ্পিতা বলল, আগেভাগে বলে রাখছি রঞ্জনদা, তোমার নাম ধরে ডাকতে পারব না কিন্তু। ওটি আবার বলে বস না যেন।

ক্ষেপেছ। আমার দাদাগিরি ফলাবার ব্যবসাটা তুলে দেবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।

ও ঠোঙার ভেতরে উঁকি দিয়ে আঙুল ডুবিয়ে একটা চপ তুলে নিয়ে আমার হাতে দিল। আমি কামড় দিয়েই পরিতৃপ্তির আওয়াজ তুললাম।

এবার আমার শর্তটা বলে ফেলি।

পুষ্পিতা বলল, বল।

তুমিও আমার সঙ্গে এই চপগুলোর আদ্যশ্রাদ্ধ করবে।

ও হেসে ঠোঙা থেকে একখানা চপ বের করে নিল।

ও এই শর্ত, তা বেশ। আমি খাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে সব ক'টা শেষ করতে হবে।

আগে তো তুমি খাও।

পুষ্পিতা একখানা চপ খেয়ে রুমাল বের করে হাত মুছতে যাচ্ছিল, আমি বললাম, সে হবে না, অন্তত আরও দু'খানা খেতে হবে। এই প্রথম দেখলাম, একটি তরুণীর চপে অরুচি।

পুষ্পিতা অমনি বলল, অরুচি তো নয়। আমি একসঙ্গে বেশি খেতে পারি না।

তবে ঠোঙাটা ব্যাগে পুরে নিয়ে যাও। ক্ষিদে পেলে বাড়িতে বসে খাবে।

ও বলল, অভিপ্রায়টা বুঝেছি। বন্ধুর জন্যে মন কেমন করছে। তা খানদুয়েক চপ ঠোঙায় দিয়ে দাও, আমি তোমার বান্ধবীকে খাইয়ে দেব।

সত্যিই ও দুখানা চপ ঠোঙায় রেখে বাকীগুলো আমার হাতে দিয়ে দিল।

আমি বললাম, আর দুখানা অন্তত নাও।

ও হেসে বলল, জান না, অমৃত কণামাত্র খেতে হয়।

স্বামীজী ওঘর থেকে পুষ্পিতার নাম ধরে ডাকলেন। ও 'আসছি' বলে সাড়া দিল। যাবার সময় বলল, তোমাকে খুব ভাল লেগেছে রঞ্জনদা, একদিন এসো আমাদের বাড়ি। খুব গল্প করব আমরা তিনজন বসে।

মাথা কাৎ করে জানলাম, যাব।

পুষ্পিতা চলে গেল, কিন্তু মিষ্টি একটুখানি গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে গেল আমার মনের মধ্যে। আমি লেখাগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ওর কথা ভাবতে লাগলাম। স্বভাবতই শ্রাবস্তীর সঙ্গে ওর তুলনাটা মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করতে লাগল। শ্রাবস্তীর মুখে চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি, পুষ্পিতার সারা মুখে স্নিগ্ধ সুষমা। শ্রাবস্তীর কথায় কৌতুক ঝলমল করে ওঠে, আর পুষ্পিতা কথা বলে যায় অন্তরঙ্গ উচ্চারণে।

রবীনদা এলেন। আমি তাঁকে পুষ্পিতার আসার খবর দিলাম। তার বাড়িতে রবীনদাকে নিয়ে একদিন যাব, সে কথাও জানালাম।

রবীনদা বললেন, খুব ভাল, একটা ছুটির দিনে যাওয়া যাবে।

ওদের বাড়ির ঠিকানাটা কিন্তু আমার কাছে নেই রবীনদা।

স্বল্পভাষী রবীনদা মৃদু হেসে বললেন, তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি পুষ্পিতাদের বাড়িতে অন্তত বার পঞ্চাশেক গেছি।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কি রকম ?

আরে ওরা তো আমার ন'মামার মাসতুতো ভাইয়ের পিসতুতো বোনের মেয়ে। পৈতে পার্বণে, বিয়ে-সাদিতে এখন ডাকহাঁক হয়। তাছাড়া শ্রাবস্তীর বি. এস. সি. পড়ার সময় আমি ওকে কেমিস্ট্রি পড়িয়েছি।

কতদিন আগে রবীনদা ?

এইতো মাস কয়েক আগে ওর রেজাল্ট বেরুল।

দুবোন প্রায় পিঠোপিঠি, কি বলেন ?

বলতে পার।

একটু থেমে রবীনদা বললেন, শ্রাবস্তীর গান শুনেছ ?

ও গান গায় বুঝি ?

ও রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনয় করে, সঙ্গে সঙ্গে গান থাকলে গানও গায়। অতি সুন্দর গলা।

বললাম, একদিন ওর বাড়িতে বসেই শুনতে হবে। দারুণ গুণী মেয়ে তো।

পুষ্পিতার জন্যে হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল আমার। ও যেন এই মুহূর্তে গুণী দিদির আড়ালে পড়ে গেল।

রবীনদা এবার বললেন, পুষ্পিতা কিন্তু কম গুণের মেয়ে নয়। শ্রাবস্তীর মত হয়ত এতটা ভাল গাইতে পারে না, তবে ছবি আঁকায় ওস্তাদ। একটা ছোটখাট এগজিবিশানও হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকায় বেশ প্রশংসা বেরিয়েছে।

পুষ্পিতা যে গুণের মেয়ে একথা শুনে মনটা পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠল।

মাসখানেক পরে রবীনদা পত্রিকা অফিসে ঢুকে আমার দিকে একখানা কার্ড এগিয়ে ধরে বললেন, এটা তোমার, পড়ে দেখ।

কার্ডখানা পড়ে যা বুঝলাম, মেয়েদের একটি কলেজ জুবিলি উৎসব উদযাপন করছে। প্রাক্তন ছাত্রীরা রক্তকরবী নাটকের অনুষ্ঠান করছে আর বর্তমান ছাত্রীরা করছে শ্যামা। অন্যান্য অনুষ্ঠান-লিপিও রয়েছে তার ভেতর, তবে এই দুটিই প্রধান।

ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হল না দেখে রবীনদা হেসে বললেন, আমার ঠিকানায় দুখানা কার্ড আর একটুকরো চিঠি পাঠিয়েছে শ্রাবস্তী। ওদের কলেজের অনুষ্ঠানে মুখ্য ভূমিকাটাই ওর। অবশ্য প্রাক্তন ছাত্রীদের নাটকে।

ও কি নন্দিনীর ভূমিকায় নামছে?

অবশ্য।

বললাম, পুষ্পিতা?

শ্যামাতে উত্তীয়।

মনটা একটু দমে গেল। যদি শুনতাম পুষ্পিতা শ্যামার অভিনয় করছে তাহলে মনটা খুশিতে ভরে উঠত। যাকগে, দিদির দীপ্তির পাশে ও না হয় কিছুটা ছায়া হয়েই রইল।

রবীনদা শেষে বললেন, শ্রাবস্তী লিখেছে, পুরো মঞ্চের অলংকরণের ভার পড়েছে পুষ্পিতার ওপর। রাতদিন সে নাওয়া খাওয়া ভুলে লোকজন নিয়ে মঞ্চ তৈরির কাজে ব্যস্ত। শ্রাবস্তী বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে লিখেছে, তোমাকে নিয়ে আমি যেন অবশ্যই অনুষ্ঠানে যাই।

মনে রাখার মত অনুষ্ঠান দেখে এলাম শ্রাবস্তীর। ও শীতের দিনে একটুকরো রোদের মত ঝিলিক দিয়ে উঠেছে সারা মঞ্চে। কথায়, হাসিতে, খুশিতে ঝর্ণার মত ও মাতিয়ে দিয়েছে সমস্ত অডিটোরিয়াম। একঝাঁক পায়রার পাখা টানার শব্দের মত হাওয়ায় বার বার ছড়িয়ে পড়েছে করতালি ধ্বনি।

রবীনদা আর আমি কলেজের মস্তবড় অডিটোরিয়ামে ঢুকে দ্বিতীয় সারিতে সীট পেয়েছিলাম।

পর্দা উঠতে প্রথম যা আমাকে আকর্ষণ করল তা মঞ্চসজ্জা। গগনেন্দ্রনাথের অঙ্কনরীতিতে একটি যক্ষপুরী তৈরি করা হয়েছে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি যেন গোলকধাঁধা রচনা করেছে। যক্ষপুরীর বাতায়নের ভেতর দিয়ে ঝিলিক মারছে সোনার পাহাড়ের চূড়ো।

একটা অতি প্রাচীন বটগাছ তৈরি করা হয়েছে। সেটা কাণ্ডে, ডালে,

ঝুরিতে সমস্ত যক্ষপুরীটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। গাছটার ডালগুলো পত্রশূন্য। একটা রিক্ততা সমস্ত গাছটির দেহে হাহাকার করছে। অস্পষ্ট আলোয় যক্ষপুরী আর বৃক্ষটি রহস্যময়।

একটুকরো হলুদ আলো এসে পড়েছে বৃক্ষটির সবচেয়ে উঁচু ডালে। ঐ ডালটি যক্ষপুরীকেও ছাড়িয়ে উঠেছে আকাশের দিকে। ঐ ডালের শেষপ্রান্তে কটি লাল ফলের মাথায় সবুজ দুটি পাতা। রিক্ত গাছটা যেন ঐ দুটি ছোট পাতায় তার প্রাণটাকে জিইয়ে রেখেছে। একটা নীলকণ্ঠ পাখি আকাশে নীল ডানা ছড়িয়ে উড়ে আসছে ঐ হলুদ আলো, দুটি পাতা আর লাল কটি ফলের দিকে।

আমি নাটকের শেষেও মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম পুষ্পিতার মঞ্চসজ্জা। ওর ভাবনার আশ্চর্য ক্ষমতা। রাজা ও নন্দিনীর দুটো সুন্দর প্রতীক।

নাটক ভাঙতে আমি আর রবীনদা দেখা করতে গেলাম কুশীলবদের সঙ্গে। সকলে তখন পেইন্ট তুলতে ব্যস্ত। আমাদের ঠিক দেখতে পেয়েছে শ্রাবস্তী। ছুটে এল পাশে।

কেমন লাগল রবীনদা?

কোনকিছু ভাল লাগলে রবীনদার গলা বুজে আসে। অত্যন্ত আস্তে ভেঙে ভেঙে কথা বলেন।

খু-উ-ব ভাল। আগে তোমার যে নাটক দেখেছিলাম, তাকেও ছাড়িয়ে গেছ।

রবীনদা আবেগে আর কথা বলতে পারলেন না। নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানীর ভেতরেও তাহলে এতখানি আবেগ লুকিয়ে থাকতে পারে!

শ্রাবস্তী আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে একটু হাসল।

আমরা পেছন ফিরেছি, রবীনদা পা বাড়িয়েছেন আমার আগে, শ্রাবস্তী হঠাৎ আমার হাতে কি একটা গুঁজে দিয়ে পালাল।

আমি হাতের মুঠোয় সে বস্তুটি ধরে পথে এসে নামলাম। বাসে উঠেই পকেটে পুরলাম বস্তুটি। মন ভারী উৎসুক আর চঞ্চল হয়ে রইল। রবীনদার সামনে খুলে দেখতে পারলাম না।

রবীনদা কথা বলে চলেছেন। কোন দৃশ্য কে কত সুন্দর করল। আমি কিন্তু শুধু হুঁ দিয়েই চলেছি, কোন কথা বলতে পারছি না। আমার মনকে এমনই বেঁধে রেখেছে বস্তুটি, যে আমি নির্বাক হয়ে গেছি।

ঠাকুরদালানে যাবার আগে রবীনদা তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে দিনের ডাকগুলো দেখতে ঢুকলেন। আমি পকেট থেকে বস্তুটা বের করে হলুদ একটুকরো আলোয় দেখতে লাগলাম।

একটি রক্তকরবী ফুল শ্রাবস্তী আমাকে সবার অলক্ষ্যে উপহার দিয়েছে। সমস্ত নাটক জুড়ে এই ফুলটি শোভা পাচ্ছিল তার কবরীতে।

আশ্চর্য একটা মৃদু গন্ধ মুহূর্তে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এইটুকু

উপহারের কি অসীম শক্তি, সব তরুণী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার মনের আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছিল, তারা ভোরের আলোর আগমনে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে পুষ্পিতাও আত্মগোপন করল আমার মন-অরণ্যের অন্ধকার অন্তরালে। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানটি দেখার ভাগ্য আমার আর হল না। উত্তীয়ের আত্মদান আমার অগোচরেই রয়ে গেল। শ্যামার গানগুলো গাইবার কথা ছিল শ্রাবস্তীর। সে আর আমার শোনা হল না।

সকাল থেকে সারা গায়ে ব্যথা আর জ্বরো জ্বরো ভাব। তার ওপরে একটা টিউশনি সারলাম। বীণাদি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জ্বর দেখে ভাতের বদলে রুটি করে খাওয়ালেন। ইউনিভার্সিটিতে দুটো পিরিয়াডের পর আর বসতে পারলাম না। মাথা ভারী হয়ে উঠল, গায়ে জ্বর এল তেড়ে।

কিশোর-বাংলা অফিসে এসে রবীনদার দেখা পেলাম। রবীনদা বীণাদির কাছে আমার জ্বরের খবরটা আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখে চোখে উদ্বেগ। এখন কেমন বোধ করছ?

ম্লান হেসে বললাম, ভাল নয়। মাথা আর গায়ের যন্ত্রণা খুব বেশী।

রবীনদা বললেন, আমি বীণাদির কাছে শুনেই সঞ্চিতার কাছে গিয়েছিলাম। ও কলেজ শেষ হলে এখানে আসবে।

বললাম, সঞ্চিতাদি আসবে ভাল কথা। তবে আমার জ্বরের সঙ্গে তার আসার যোগ কি।

রবীনদা বেশী কথা বলেন না। শুধু বললেন, মুড়ি সন্দেশ আনিয়ে রেখেছি, ইচ্ছে হলে খেয়ে শুয়ে পড়। তবে তুমি তো জান, এখানে জ্বর হলে সেবা পেতে পার কিন্তু থাকার জায়গা পাওয়া মুশকিল হবে।

আমি আর কোন কথা না বলে মুড়ির ঠোঙাটা হাতে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলাম। ঠোঙা থেকে দু'চারটে মুড়ি বের করে মুখে ফেললাম, কিন্তু খাবার প্রবৃত্তি হল না। কিছু পরেই গলিতে একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। মনে হল, নিচে পত্রিকা অফিসের দরজায় এসে থেমেছে।

কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। রবীনদা লেখার ফাইল থেকে মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালেন।

আরে সঞ্চিতা, এত তাড়াতাড়ি কলেজের কাজ চুকে গেল!

সঞ্চিতাদি দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল।

এখন কেমন আছ রঞ্জন।

বললাম, একরকম।

ঐ এক উত্তর হয়েছে তোমাদের। বলেই সঞ্চিতাদি বইয়ের ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে সোজা আমার কাছে চলে এসে মাথায় হাত রাখল।

দেখ রবীন টেম্পারেচারটা। মাথায় চাল ফেললে মুড়ি হয়ে যাবে।

সঞ্চিতাদি রবীনদার সমবয়সী। আমাদের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়।

আমার হাতে টান দিয়ে বলল, ওঠ।

কোথায় যাব? দু'একদিন তো জ্বরটাকে দেখা যাক, তারপর না হয়

ডাক্তার দেখান যাবে।

সঞ্চিতাদি বলল, আর কথা বাড়িও না রঞ্জন, আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। বাড়ি পৌঁছে খাব। জলদি জলদি ওঠ ভাই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। রবীনদা বললেন, তুমি ওকে নিয়ে যাও সঞ্চিতা, আমি পরে একসময় যাব।

সঞ্চিতাদির গাড়িতে উঠে বসে তার বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

বোঝা গেল, রবীনদা সঞ্চিতাদির সঙ্গে একেবারে পাকা ব্যবস্থাই করে এসেছিলেন। ওঁর ঠাকুরদালান কিংবা পত্রিকা অফিস, একটি অসুস্থ মানুষের পক্ষে যে নিরাপদ আস্তানা নয় তা তিনি জানতেন, তাই এটুকু বন্দোবস্ত আগে-ভাগেই করে রেখেছিলেন।

সঞ্চিতাদি?

চলমান গাড়ির ভেতর কোলে একটা বই ফেলে মগ্ন হয়ে পড়ছিল সঞ্চিতাদি? আমার ডাকে বইয়ের পাতা থেকে চোখ ফিরিয়ে স্নিগ্ধ গলায় বলল, বল।

আমি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললাম, জ্বর হলে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তোমরা ভারী অসুবিধেয় পড়বে।

চোপ।

কিছুক্ষণ নীরবতা। হঠাৎ সঞ্চিতাদি বলল, তোমার কাণ্ডজ্ঞান আবার কবে ছিল রঞ্জন। সেই বর্ষামঙ্গলের কথা মনে কর।

'বাণীবাসর' নামে রবীনদা, বাণীদি, সঞ্চিতাদিরা একটা সাংস্কৃতিক সংস্থা করেছিলেন। বাণীবাসরের অনুষ্ঠান হত বিভিন্ন জায়গায়। রবীনদা আমাকেও অন্যতম মেম্বার করে নিয়েছিলেন।

সেবার বর্ষামঙ্গল উৎসব হল স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ মন্মথনাথ ঘোষ মশায়ের বাড়িতে। সভাপতি হয়ে এলেন তারাশঙ্কর। আমার ওপর গ্রন্থনার ভার ছিল। আমি আর সঞ্চিতাদি ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে গান সংগ্রহ করলাম। পূর্ববঙ্গ গীতিকা, মৈমনসিং গীতিকা থেকে যোগাড় হল লোকসঙ্গীত। বহু যুগের ওপার থেকে গানের স্রোতে ভাসিয়ে আনতে হবে মেঘকে এপারে। মেঘদূত, গীতগোবিন্দের সংস্কৃত শ্লোকে সুর দেওয়া হল। সেই সংস্কৃত সাহিত্যের মেঘ বৈষ্ণব যুগে পদাবলীকারদের বিরহের অশ্রু সঞ্চয় করে এল রবীন্দ্র নজরুল যুগে।

এমনি একটা পথপরিক্রমার চিত্র আঁকা হয়েছিল। গ্রন্থনা এবং পাঠ দুটো ভূমিকাই ছিল আমার।

পাঠ শেষ হলেই গানে গানে বর্ষা-বরণ চলছিল। একবার পাঠ শেষ, গান হচ্ছে। আমি নীরব। পেছন থেকে খোঁচা খেয়ে চমকে উঠলাম। ফিসফিসিয়ে সঞ্চিতাদি বলছে, এ্যায় রঞ্জন, দুলছ কেন?

সত্যিই তো আমি গানের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছিলাম। সামনের দর্শকেরা কি ভাবছেন।

আবার গান, আবার আমার দুলুনি, আবার খোঁচা।

তারাশঙ্কর বললেন, কথিকা আর গানে আপনারা সত্যিই বর্ষাকে আকাশ থেকে ধরিত্রীর বুকে নামিয়ে এনেছেন। আমার মনে হচ্ছে, আমি বীরভূমের বর্ষা-প্লাবিত প্রান্তরের বুকে দাঁড়িয়ে অবগাহন করছি।...

সেই কাণ্ডজ্ঞানহীনতার খোঁচা আমাকে অনেকদিন ধরে খেতে হয়েছিল। আজ সুযোগ বুঝে সঞ্চিতাদি সেই খোঁচাটি দিয়ে দিল।

দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পল্লীর তিনতলা একটি বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামল।

গাড়ি থেকে আমরা নামলাম। ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন এক ভদ্রমহিলা, বেল দেবার আগেই নিচে নেমে এসে দরজা খুলে দিলেন।

মা, এই যে শ্রীমান রঞ্জন। এর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এখন জ্বর বাধিয়ে বসে আছেন। থাকার জায়গা নেই, সঙ্গে নিয়ে এলাম।

বেশ করেছিস।

ভদ্রমহিলার প্রশান্ত সুন্দর মুখশ্রী আমার বড় ভাল লাগল। আমি প্রণাম করতেই গায়ে হাত রেখে বললেন, গা পুড়ে যাচ্ছে। বেবী ওকে তিনতলার ঘরে নিয়ে যা। আমি মোতিয়ার মাকে দিয়ে বিছানা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বেবী অর্থাৎ সঞ্চিতাদি আমাকে নিয়ে তিনতলার ঘরে ঢুকল।

সামনে বড় ছাদ। ফুলের টব দিয়ে সাজানো। ছাদের একদিকে লম্বা টানা একখানা ঘর। মোজাইক ফ্লোর। একখানা খাট আর একটা টেবিল রয়েছে ঘরে। শ্বেতপাথরের টেবিল। খাটে একটি মাদুর ছাড়া কিছুই পাতা ছিল না।

দু'তিন মিনিটের ভেতরেই মোতিয়ার মার দেহে লেপ তোশক চাপিয়ে নিজে একখানা বালিশ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন সঞ্চিতাদির মা।

এরপর শয্যা রচনা, তার ওপর আমার শয়ন।

শ্বেতপাথরের টেবিলে জল, ফল, সবই ঢাকা রইল।

মা কিছুক্ষণ পাশে বসে মাথা টিপে টিপে দিলেন। তাঁর অযাচিত স্নেহে সেই প্রবল জ্বরেও আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মা কারণটা বুঝতে না পারলেও চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন।

নামের আগে যাঁদের মহাত্মা বসানো হয়, তেমনি এক মহাত্মার পরিবার থেকে এসেছেন সঞ্চিতাদির মা। রবীনদার কাছে শুনেছিলাম এঁর কথা, এখন স্বচক্ষে দেখে দেবী-দর্শনের আনন্দ অনুভব করলাম।

বলা নেই, কওয়া নেই, উটকো একটা রোগাক্রান্ত ছেলেকে হঠাৎ বাড়িতে এনে ওঠালে গৃহকর্ত্রীর মুখের প্রসন্নতা কোন রকমেই আমরা আশা করতে পারি না। কিন্তু ইনি প্রথমেই যেভাবে কন্যাকে সমর্থন ও রোগীকে আশ্বস্ত করলেন তাতে অভিভূত না হয়ে পারলাম না।

রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। ছাদের আলোটা আমার সুবিধের জন্য জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। আমি একটা আশ্চর্য ছবি দেখলাম। এক ফালি আলো আমার ঘরের দেয়ালে এসে পড়েছিল। সাদা দেয়ালটাকে দেখে মনে হচ্ছিল সিনেমায়

একটা পর্দা। ঐ স্ক্রীনের ওপরে চমৎকার ভঙ্গীতে দুলছিল একটা লতা। আগেই দেখেছি, ওটা রাধাঝুমকোর লতা। নিচের থেকে অদম্য প্রাণশক্তির জোরে উঠে এসেছে তিনতলা অব্দি। লতার গা ভরে বড় বড় পাতা। তার ফাঁকে ফাঁকে ঝিরি ঝিরি পাপড়ির টাকার মত ফুল। নীলাভ বেগুনি। সেই ফুলগুলোও স্পষ্ট দেখছিলাম।

একটা আবক্ষ ছবি পর্দার ওপর ফুটে উঠল। আবক্ষ একটি কিশোরী মূর্তি। আমি বিছানায় উঠে বসতেই মূর্তিটা সরে গেল। অনেক রাত, কে ওখানে দাঁড়িয়ে! গায়ে ব্যথা বা জ্বর ছিল না। সঞ্চিতাদি ডাক্তারের ঘরণী, তাই ডাক্তার না ডেকে নিজেই ওষুধ এনে খাইয়ে দিয়েছিল। সঞ্চিতাদির স্বামী ডাক্তার মিত্র মাইথনে থাকতেন। সঞ্চিতাদিকে কলকাতায় থেকে কলেজে কাজ করার স্বাধীনতা তিনিই দিয়েছিলেন। ছুটিতে সঞ্চিতাদি মাইথনে গিয়েই কাটিয়ে আসত। ডাক্তার মিত্র এলে শ্বশুরবাড়িতেই উঠতেন।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। চাঁদের আলো ছাদে এসে পড়েছে। একটি কিশোরী আমাকে দেখে ছাদের আলসেতে শরীর চেপে দাঁড়াল। ওর মুখে চোখে ভয় কি লজ্জা বুঝতে পারলাম না।

বেশ মোলায়েম গলায় বললাম, এত রাতে তুমি ছাদে কি করছ?

মাঈজী আমাকে এখানে থাকতে বলেছে। আপনার কিছু দরকার হতে পারে।

আমি ভীষণ সংকুচিত হলাম। একটি কিশোরী মেয়ে আমার জন্যে রাতে জেগে আছে।

বললাম, আমার কিচ্ছু দরকার নেই, তুমি শুতে যাও। এত রাত, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ।

আমি তো এই এলাম এতক্ষণ মাঈজী আপনার মাথার কাছে কুর্শিতে বসেছিলেন।

সে কি! আমি তো কিছু জানি না। সঞ্চিতাদির মা এখানে ছিলেন?

আবার আসবেন বলে গেছেন। ততক্ষণ আমি থাকব। আমি ওঁর পায়ের কাছে শুয়ে থাকি।

কোন ধাতুতে বিধাতা পুরুষ এইসব মাতৃমূর্তি গড়েছেন, আমি জানি না। ভারী আবেগের কথা হলেও সেই মুহূর্তে আমি চোখের জল ফেলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম, আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে এই বাংলাদেশেই ভূমিষ্ঠ হই। আমি মোতিয়াকে বললাম, তুমি এখুনি দো-তলায় শুতে চলে যাও। মাঈজীকে বল, আমি খুব ভাল আছি। জ্বরটর কিছু নেই।

মোতিয়া প্রথমে অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলল, সাচ বলছ?

আমি বললাম, সাচ। এখুনি আমি শুতে যাচ্ছি। তুমি আমার সামনে নিচে নেমে যাও।

মোতিয়া ঘুম চোখে একটু হেসে নিচে নেমে গেল। ওপর থেকে শোনা গেল, মাকে ও আমার শরীর সম্বন্ধে আশ্বস্ত করছে।

সাতদিন সঞ্চিতাদির মায়ের যত্নে আমি ছিলাম তারপরে আমি কাজের অছিলায় মাকে অনেক বুঝিয়ে চলে এলাম।

মায়ের চোখ ছলছল করছিল, আমার চোখও শুকনো ছিল না।

শিশুসাথীতে সঞ্চিতাদি লিখত। আমি দেশে গেলে সঞ্চিতাদিকে কবিতায় চিঠি দিতাম, সঞ্চিতাদি তার উত্তর দিত কবিতায়।

একবার শিশুসাথীতে আমার 'চিঠি' আর ওর 'উত্তর' পাশাপাশি ছাপা হয়ে বেরুল। মিলের কবিতা। দুটো করে ছত্র মনে আছে।

'তুমি এখন রাজার বধূ
সাতমহলার পাটরানী,
আজও মধুমতীর ঝিলে
আমরা শালুক নাল টানি।'

আমার এই ছত্রের জবাবে সঞ্চিতাদি লিখল,

'রাজার বধূ হলাম কিনা
জানিনা ভাই, বুঝিনে তা,
আজও আমি স্বপ্ন দেখি
সেই কুঁড়ে ঘর ছেঁড়া কাঁথা।'

বড় আনন্দ আর রোমাঞ্চের ভেতর কেটেছে প্রথম যৌবনের সে দিনগুলো।

দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রান্তর থেকে আমরা কুড়িয়ে বেড়িয়েছি অফুরন্ত আনন্দ বেদনার মণি কণিকাগুলি।

শিশুসাথী অফিসে বিনয়বাবু একদিন আমাকে পাশের ঘর থেকে ডাক দিয়ে বললেন, রঞ্জন এদিকে এসো একবার।

আমি আমার কাজ ফেলে ওঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

এক সম্ভ্রান্ত সুদর্শন প্রবীণ মানুষ বসেছিলেন বিনয়বাবুর পাশের চেয়ারে। আমি ঢুকতেই বিনয়বাবু বললেন, এঁকে প্রণাম কর।

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বিনয়বাবু ভদ্রলোককে বললেন, এই ছেলেটি আমাদের এখানে কিছু কিছু লেখাজোখা দেখে সংশোধন করে দেয়। লেখার হাতটিও বড় মিষ্টি। ও এবার বাংলায় এম. এ পরীক্ষা দেবে। আপনার কলেজে ওকে একটু সুযোগ দেবেন।

ভদ্রলোক বললেন, আগে তো ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আসুক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

আমি সামান্য সময় সেখানে দাঁড়িয়ে সবিনয় নমস্কার জানিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকলাম।

কিছুক্ষণ পরে বিনয়বাবু আমার টেবিলের পাশে এলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বিনয়বাবু বললেন, কে এসেছিল জান? রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল পি. কে. গুহ। এখন ঐ কলেজটার নূতন নাম হয়েছে, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। প্রতিষ্ঠাতার নামে।

বললাম, উনি ঠিকই বলেছেন। আগে তো পাশ করি, তারপর কলেজে ঢোকার স্বপ্ন দেখব।

বিনয়বাবু বললেন, আমি ব্রাহ্মণ, কোন দিন কারু অমঙ্গল চিন্তা করিনি। আমি বলছি, তুমি পাশ করে কলেজে চাকরী পাবে।

বাবাকে আমার মনে পড়ে না। বিনয়বাবুকে দেখে মনে হত, বাবা কি এতখানি স্নেহময় আর শুভানুধ্যায়ী।

পাশ করলাম। চাকরী-বাকরী নেই। পত্রিকার অফিসগুলোতে ঘুরি। দু'চারটে লেখা ছাপা হয়। আনন্দবাজার আর যুগান্তরে লেখা বেরুলে কিছু দক্ষিণা পাওয়া যায়। এক ঠ্যাংএ দাঁড়িয়ে আছি তখন আমি। একটি মাত্র টিউশনি সম্বল। এমন দুর্দিন আমার জীবনে আর আসেনি।

মা লিখল, শুনেছি, আমাদের ইস্কুলে টিচার দরকার। অনেক উমেদার। তুমি এসে চেষ্টা করতে পার। মাস্টারমশায় তোমাকে ভালবাসেন।

মায়ের ডাক পেলাম বটে, মন সায় দিল না।

কলকাতা তখন আমার চোখে মোহিনী মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। অপ্রতি-রোধ্য আকর্ষণ তার। পত্রিকা অফিস ছেড়ে, বন্ধু আর বান্ধবীদের ছেড়ে যাই কোথায়। বেকারত্বের যন্ত্রণায় যখন ভুগছি তখন মুশকিল আসান রবীনদার শরণাপন্ন হলাম।

রবীনদা, কলকাতা ছাড়তে হবে।

স্বল্পভাষী রবীনদা বললেন, কি হল ?

আপনার ঠাকুরদালানে ঠাঁই, পত্রিকা অফিসে খাই, সারাদিন পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াই। ঠিক মত টাকার যোগাড় নেই। এ অবস্থায় দেশে পালান ছাড়া গতি কি।

তাই তো।

ব্যাস, রবীনদা আর একটি কথাও বললেন না।

পরের দিন কিশোর বাংলা অফিসে বসে আছি, রবীনদা ঢুকেই বললেন, এসো আমার সঙ্গে।

আমি উঠে রবীনদার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

কোথায় যাব রবীনদা ?

এসো না আমার সঙ্গে। আমার স্কুলের মাস্টারমশায়ের কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে কাজ করেন। যদি কিছু হিল্লে হয়।

রাসবিহারী রায় মশায়ের বাড়িতে রবীনদা আমাকে নিয়ে গেলেন।

সেদিন একটা ছুটির দিন ছিল। রাসবিহারীবাবু বসেছিলেন তাঁর পড়ার ঘরে। রবীনদা ঢুকে প্রণাম করলেন, আমিও।

একে তো চিনলাম না রবীন ?

ওর লেখাজোখায় বেশ হাত আছে। এবার এম. এ. পাশ করেছে বাংলায়। চাকরির চেষ্টা করছে।

রাসবিহারীবাবু হঠাৎ বললেন, লিভ ভেকেন্সিতে কাজ করবে ?

এত আনন্দ খুব কমই পেয়েছি জীবনে। মনে হল পথ থেকে হাত ধরে কেউ আমাকে প্রাসাদে এনে তুললেন। আমি সাগ্রহে বললাম, হ্যাঁ স্যার, একটা কাজ পেলে আমার খুব উপকার হয়।

উনি একখণ্ড সাদা কাগজ আর পেন আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ওই টেবিল চেয়ারে বসে সেক্রেটারীর নামে একটা দরখাস্ত লিখে ফেল। 'বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম যে···।'

দরখাস্তটি লিখে ওঁর হাতে দিলাম।

উনি দরখাস্তটি পড়ে বললেন, হাতের লেখাটি তো বেশ তৈরি করেছ। আমি নির্মলবাবুকে (হেডমাস্টার) দিয়ে তোমার দরখাস্ত সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়ে দেব। আশা করি চাকরিটা তোমার হয়ে যাবে। কদিন ধরে বাংলার ক্লাশগুলো ফাঁক যাচ্ছে। রাসবিহারীবাবু বড় একটা ঘরের মেঝেতে বসেছিলেন। চারদিকে তাঁর বই কাগজপত্র ছড়ানো। গঁদের শিশি, কাঁচি, আলপিন, ক্লিপ সবই তাঁর হাতের কাছে ছিল। শুনলাম, ঘরের চারদিকের দেয়ালের র‍্যাকে প্রায় হাজার দশেক নতুন, পুরনো বই আছে। রাসবিহারীবাবু নিজেই বললেন, বিভিন্ন পুরনো পত্র-পত্রিকা থেকে মূল্যবান বিষয়গুলো কেটে কেটে নতুন পাতায় সেঁটে ফাইল করে রাখছি। একা আর পেরে উঠছি না। রবীন যখন ছাত্র ছিল তখন কত কাজই না আমার করে দিয়েছে।

রবীনদা বললেন, আপনার কাজ করতে পেরেছিলাম, সে আমার সৌভাগ্য। অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম।

রাসবিহারীবাবু বললেন, এখনকার ছেলেরা শুধু পড়া বুঝে নিতে আসে। গ্রামারের প্রশ্নগুলোর সহজ সমাধান হয়ে গেলেই তারা খুশি।

রবীনদা হঠাৎ উৎসুক হয়ে বললেন, ওটা কিসের ফাইল তৈরি করেছেন স্যার ?

বিদ্যাসাগরের একটা কাহিনী পেয়ে গেলাম। ওটাকেই ফাইলে বন্দী করছি। কাহিনীটা খুব ইণ্টারেস্টিং।

আমরা উৎসুক হয়ে কাহিনীটা শোনার জন্যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

রাসবিহরীবাবু বললেন, শুনতে চাও ?

বলুন স্যার।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের বাড়িতে মজলিশ বসেছিল। চত্তর পেরিয়ে লম্বা সিঁড়ি ভেঙে বিরাট সভাগৃহে জমায়েত হয়েছেন বন্ধুবান্ধবেরা। আশপাশের রাজ-রাজড়ারা উপস্থিত। বন্ধুদের মধ্যে আছেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ্দুরে চারদিক জ্বলছে। দুদিক থেকে টানা পাখাওলারা পাখা টানছে।

আলোচনার মাঝখানে বিদ্যাসাগর হঠাৎ থেমে গেলেন। তাঁর চোখ তখন গিয়ে পড়েছে রৌদ্রদগ্ধ খোলা চত্বরে। বৃদ্ধ এক দরওয়ান রোদে পুড়ে ঘর্মাক্ত

দেহে মাথা নিচু করে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে আর সংকোচে সে ওপরে উঠে আসতে পারছে না। বিদ্যাসাগর তাকে চিনতে পারলেন। বৃদ্ধটি সংস্কৃত কলেজেরই দরওয়ান।

বিদ্যাসাগর দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গেলেন। ঘর্মাক্ত বৃদ্ধটির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন ওপরে। নিজে যেখানে বসেছিলেন সেখানে তাকে জোর করে বসিয়ে পাখাওলাদের বললেন, জোরে পাখা টান।

রাজারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে অন্যদিকে মুখ করে বসে রইলেন।

বিদ্যাসাগর দরওয়ানের হাত থেকে জরুরী কাগজপত্র নিয়ে সইসাবুদ করলেন।

শেষে কাগজগুলো দরওয়ানের হাতে দিয়ে বললেন, সাবধানে যেও।

সে বেচারা ছাড়া পেয়েই হুমড়ি খেতে খেতে চত্বর পেরিয়ে পালিয়ে বাঁচল।

লোকটি চলে যেতেই ফুঁসে উঠলেন সবাই, বলিহারি আক্কেল তোমার পণ্ডিত! রাস্তার একটা লোককে এনে আমাদের মাঝখানে বসিয়ে দিলে!

বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসছেন।

কেউ বললেন, আবার হাসছ!

কেউ আবার বললেন, তোমার জ্বালায় দেখছি পথেঘাটে মান সম্ভ্রম খোয়াতে হবে।

বিদ্যাসাগর এবার বললেন, আমি তোমাদের দুটো প্রশ্ন করব, তার জবাব যদি তোমরা দিতে পার তাহলে যে শাস্তি দেবে আমি মাথা পেতে নেব। দুটো কারণে মনে হয় তোমাদের ক্ষোভ জমতে পারে। প্রথম কারণ তোমরা উচ্চবর্ণের মানুষ, আর ঐ লোকটা নিম্নবর্ণের। সেদিক থেকে তোমাদের ভাবনার কোন কারণ নেই। ও কনৌজের ব্রাহ্মণ। আর দ্বিতীয় ক্ষোভের কারণটি সম্ভবত ও দরিদ্র।

মহারাজ এক্ষেত্রে তোমাকে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই, আমি তোমার বাবাকে শ্রদ্ধা করব এটা তুমি নিশ্চয়ই আশা কর।

মহারাজ বললেন, অবশ্যই।

বিদ্যাসাগর আবার বললেন, আমার বাবাকে তুমি শ্রদ্ধা করবে এটা আশা করতে পারি কি?

মহারাজ বললেন, তুমি যখন আমার বন্ধু তখন তোমার বাবাকে শ্রদ্ধা করাও আমার কর্তব্য।

তাহলে শোন মহারাজ, আমার বাবা পাঁচ টাকা মাইনেতে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন। এই বৃদ্ধ মানুষটি গরীব বলে যদি তাকে ঘৃণা কর তাহলে আমার বাবাকেও তোমাদের ঘৃণা করতে হয়।

সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

রাসবিহারীবাবুর মুখে বিদ্যাসাগরের এই কাহিনীটি শুনে রবীনদা আবেগে মাথা নাড়তে লাগলেন। আমি বললাম, যথার্থ মহাপুরুষেরা ভবিষ্যৎ চিন্তার জগতে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে থাকতে পারেন।

রাসবিহারীবাবু বললেন, এঁদের নিয়েই তো সারা জাতটা এখনও বেঁচে আছে।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে আমি বাংলার শিক্ষক হলাম। দশম শ্রেণীতে পড়ে একটি ছেলে, নাম সূর্যকান্তি। ছেলেটি লম্বা সুদর্শন। নবম শ্রেণী থেকে প্রথম হয়ে সে ক্লাশে উঠেছে। কদিনের ভেতরেই সে আমার ভক্ত হয়ে গেল। একদিন স্কুল ছুটির পর ও আমাকে পেছন থেকে এসে ধরল।

আমার বাড়িতে একদিন চলুন না মাস্টারমশায়!

ও এমন আব্দারের ভঙ্গীতে কথাটা উচ্চারণ করল, যা শুনলে মনে হবে, ও যেন আমাকে আগেও এমনি আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

আমি বললাম, কোথায় থাক তুমি?

আহিরিটোলায়। খুব কাছেই, যেদিন বলবেন নিয়ে যাব।

কৌতুক করে বললাম, আজই যদি যাই?

ও খুব খুশি হয়ে উঠল। আনন্দের আতিশয্যে তরুণ মাস্টারমশায়ের একখানা হাত ধরে টানতে লাগল।

আমি সূর্যের সঙ্গে তার বাড়িতে গেলাম। বর্ধমানে ওদের বাড়ি। সেদিন মাছ এসেছিল দেশ থেকে। সূর্যের মা খয়রা মাছ ভেজে একটা বড় থালাতে রাখছিলেন।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই সে দৃশ্য আমার চোখে পড়েছিল।

সূর্য ছুটে গিয়ে মায়ের কানে কানে অতিথির আগমন-বার্তাটা জানিয়ে দিল। উনি উনুন থেকে কড়াটা নামিয়ে আমার দিকে দুটো হাত জোড় করার ভঙ্গীতে এগিয়ে এলেন।

আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করতেই উনি আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললেন, তাই তো বটে, একেবারে ছেলেমানুষ। এসো বাবা, টাটকা মাছভাজা খাও। কিছুক্ষণ আগে দেশ থেকে এসেছে।

সূর্য বলল, মা মাস্টারমশায় প্রথম এলেন আমার বাড়ি, তুমি শুধু মাছভাজা খাওয়াবে?

সূর্যের মা বললেন, মাস্টারমশায় কিরে, দাদা বলে ডাকবি, ও আমার আর একটা ছেলে। কত অল্প বয়েস ওর।

বললাম, সূর্য তুমি আমাকে স্বচ্ছন্দে রঞ্জনদা বলে ডাকতে পার।

ও বলল, এবার থেকে তাই ডাকব রঞ্জনদা।

সূর্যের মা এবার বললেন, কি খাবে বল বাবা? ইস্কুলের পর নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

বললাম, ঐ মাছভাজাই খাব, তার সঙ্গে মুড়ি হলে মন্দ হয় না।

ভেতর থেকে মিষ্টি গলার আওয়াজ পেলাম, আমি যে ময়দা বের করলাম মা।

ওটা এখন রেখে দে, রঞ্জন আজ রাতে এখানেই খেয়ে যাবে।

এত আন্তরিক সে আমন্ত্রণ যে আমি না বলতে পারলাম না।

রাতে রান্নাঘরে হলুদ আলোতে সবাই খেতে বসলাম। সূর্যের বাবা দেশে গিয়েছিলেন, তাঁকে খাবার আসরে পাওয়া গেল না। সূর্য আর আমি খেতে বসলাম। সূর্যের মা তরকারিপত্র গোছগাছ করে দিচ্ছেন, সূর্যের বোন কাজল সেগুলো আমাদের থালার কাছে এনে পর পর সাজিয়ে দিচ্ছে। মাথাভর্তি কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল কাজলের। থুতনির কাছটা একটু চাপা। পনেরো বছরের বেশি হবে না কাজলের বয়েস। স্বর্ণ চাঁপার মত ফিকে হলুদ গায়ের রঙ যার, তার নাম কি করে কাজল হয়! ওর ভোমরার মত কালো চুলের জন্যে কি? কথাটা বলেই ফেললাম, বলে কিন্তু ঠকলাম। কাজল দিব্যি আসা-যাওয়া করছিল, আর এল না।

ওর মা হাসি মুখে নিজের হাতে পায়েস পরিবেশন করে গেলেন। বললেন, তোমার কথায় বাবা ও ভারী লজ্জা পেয়েছে।

আমি জোরের সঙ্গে অন্তরালবর্তিনীকে শুনিয়ে বললাম, 'কাজল' নামটি কিন্তু ভারী মিষ্টি। সে কালোই হোক আর ফর্সাই হোক।

চমৎকার কাটল নৈশভোজের সময়টুকু। আমি আসতে গিয়ে সহজে আসতে পারলাম না। পরের সপ্তাহে শনিবার ওরা দেশে যাবে সবাই, আমাকেও ওদের সঙ্গী হতে হবে, এই কথা দিতে হল। আমাকে একটু এগিয়ে দেবার জন্য সূর্য সঙ্গে আসছিল। হঠাৎ পেছন থেকে একটি মেয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে ফিরে তাকালাম।

বাব্বা, আপনি যা জোরে হাঁটেন না। এত জোরে হাঁটলে আমি আপনাকে ধরব কি করে।

কাজল!

ও এসে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, আমি সরে দাঁড়ালাম।

ও স্পষ্ট গলায় বলল, তা হবে না। কাজে ছিলাম তাই প্রণাম করতে পারিনি। এখন আমাকে প্রণাম করতে দিতেই হবে।

বললাম, তুমি গোত্রের প্রধান, মুখ্য বংশ জাত—মুখুজ্জে ব্রাহ্মণ। তোমার প্রণাম নি কি করে?

দাদা আপনাকে প্রণাম করে।

ও আমার ছাত্র।

কাল থেকে সময় পেলেই আপনি আমাকে পড়িয়ে যাবেন। আমি আপনার ছাত্রী হয়ে যাব।

হেসে বললাম, বড় বুদ্ধি তোমার।

ও অমনি বলল, সত্যি পা ছুঁতে দেবেন না? আপনার কি কোন সংস্কার আছে?

না।

ও আর কোন কথা না বলে আমার পায়ে হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করল।

বলল, আপনি দাদা তো, প্রণাম করতে হয়।

এরপর বাঁহাতে ধরা একটা ছোট্ট কৌটো থেকে এলাচ সুপুরি বের করে আমার হাতে দিলে।

মুখশুদ্ধি না খেয়ে চলে এসেছেন, তাই ছুটে এলাম।

কপট ক্ষোভের গলায় বললাম, তাই বুঝি? তাহলে প্রণাম-টনাম ছলনা?

ও বলল, তা কেন হবে, দুটোই সত্যি।

সূর্য বোনের কৌটো থেকে এলাচ বের করে খেল।

আমি বললাম, কাজল অনেকখানি এসে গেছে। তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও সূর্য। আমি একটুখানি এগিয়েই বাস ধরব।

কাজল বলল, আমি একা এসেছি, একাই যেতে পারব।

ও বাসার দিকে হাঁটতে শুরু করল। আমি সূর্যকে ইঙ্গিতে ওর পেছনে যেতে বললাম।

দুদিন পরে কলেজ স্কোয়ারে দেখা হয়ে গেল বিশ্বেশ্বর মিশ্রের সঙ্গে। আমাদের মাস্টারমশায় ছিলেন। এমন পণ্ডিত আর এমন গোঁড়া ব্রাহ্মণ আমি খুব কমই দেখেছি। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত তিনটি ভাষাতেই প্রথম শ্রেণীতে এম. এ।

ইংরাজীতেও সমান দক্ষ। কালীঘাটে রোজ পুজো দিয়ে মায়ের সিঁদুর মাথায় নিয়ে ফেরেন।

আমাদের মত কারু সঙ্গে দেখা হলেই, শোন, মা, মা।

প্রণাম করলেই বলেন, মা, মা, কোথায় যাওয়া হচ্ছে।

আমাদের কাছে মাতৃনাম উচ্চারণ করেন স্বাভাবিক জোরের সঙ্গে। সে সময় ওঁর চোখে মুখে একটা ঘোর লেগে থাকে। উনি যখন ওঁর বয়েসী অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলেন তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছি, কথার ফাঁকে ফাঁকে মা, মা, ধ্বনি মুহূর্তে মুখ পাশে ফিরিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করে যান।

একদিন ক্লাশে ঢুকে চুপচাপ বসে রইলেন কতক্ষণ। হঠাৎ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি?

একজন বলল, স্যার, শাসক ইংরেজদের ওপরে আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু বেণ্টিঙ্ক এই কু-প্রথাটি দূর করার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আর একজন বলল, হিন্দুরা তাঁদের অতি উচ্চ দার্শনিক চিন্তার জন্য যেমন স্মরণীয় তেমনি এই দুষ্কর্মটির জন্যও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বিশ্বেশ্বরবাবু ক্ষেপে উঠলেন, মূর্খ, সতীদাহকে তোমরা দুষ্কর্ম বল?

এখন আমরা চুপ। ভাষাতত্ত্বের একটা হাফের পরীক্ষক উনি। ওঁকে আদপেই চটান চলবে না।

উনি আবার বললেন, অর্ধাঙ্গিনী কাকে বলা হয়?

আজ্ঞে স্ত্রীকে।

কেন?

স্বামীর অর্ধ অঙ্গের সমান বলে।

ঠিক। তোমার অর্ধ অঙ্গ পুড়ে গেলে আর অর্ধ অঙ্গ বাঁচে ?

না।

তাহলে সতীদাহ প্রথা সঠিক ছিল। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহমনে স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। তাই যথার্থ সতীদের দাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন শাস্ত্রকারেরা।

আমাদের প্রবল হাসি ও প্রতিবাদের মুখ চেপে আমরা শুধু সমর্থনসূচক মাথা নাড়তে লাগলাম।

কলেজ স্কোয়ারে বিশ্বেশ্বরবাবু সান্ধ্য-ভ্রমণে আসেন নি। তিনি পূব থেকে পশ্চিমে রাস্তাটা শর্টকার্ট করবার জন্য কলেজ স্কোয়ারে ঢুকেছিলেন।

আমি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই উনি স্বভাবসিদ্ধ গলায় বলে উঠলেন, মা, মা।

সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, এখন তুমি কি করছ ?

সাময়িক মাস্টারির কথাটা চেপে গিয়ে বললাম, তেমন কিছু না স্যার, ওই শিশুসাথী অফিসে (কলেজ স্কোয়ারের পূবদিকেই শিশুসাথী পত্রিকার অফিস ছিল) আমি কিছু কিছু লেখা সংশোধন করি। আর সামান্য কিছু পাই।

উনি বললেন, তোমার লেখার হাত তো বেশ ভাল। যাবে আমার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়ি ?

আমি সাগ্রহে বললাম, এখুনি যাব স্যার ?

হ্যাঁ, তোমার অন্য কিছু কাজ আছে নাকি ?

বললাম, না স্যার, চলুন।

উনি স্বগতোক্তির মত করে বললেন, বিশাল বটগাছ, ওখানে একটুখানি আশ্রয় পেলে আর কোথাও যেতে চাইবে না। বড় স্নেহশীল মানুষ।

আমরা বাসে উঠে শেষ অপরাহ্ণ বেলায় ভবানীপুরের দিকে রওনা হলাম। স্যার আশুতোষের বাড়িতে যখন ঢুকলাম তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ভেতরে কোন ঘর থেকে পুজোর মৃদু ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। আমরা দোতলায় উঠে এলাম। বাঁদিকে ছোট ছাদ পেরিয়ে বিরাট হলঘর। আলো জ্বলছে, সারি সারি চেয়ার পাতা, শেষপ্রান্তে বড় একটি টেবিল আর চেয়ার। কাউকে সেখানে দেখতে পেলাম না।

বিশ্বেশ্বরবাবু আমাকে ওই হলঘরে থাকতে বলে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই ঘুরে এসে বললেন, এস আমার সঙ্গে।

আমরা দুজনে সিঁড়ির ডানদিকের করিডোর ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

উনি চুপি চুপি বললেন, এইদিক দিয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবু হলঘরে যাবেন।

বলতে না বলতেই শ্যামাপ্রসাদবাবু একটি ঘর থেকে বেরুলেন। বিশ্বেশ্বর-বাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রণাম করলাম। শ্যামবর্ণ মানুষটি। সমস্ত মুখের মধ্যে দুটি চোখ আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করল। মনে হল ওই দুটি

চোখের দৃষ্টি মুহূর্তে যে কোন মানুষের অন্তরের গভীর পর্যন্ত দেখে নিতে পারে।

উনি স্মিতহাস্যে বললেন, কি খবর বিশ্বেশ্বর ? এ ছেলেটি কে ?

বিশ্বেশ্বরবাবু প্রথমেই হাতে ধরে থাকা একটি আধফোটা জবাফুল বের করে ওঁর দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, সকালে দক্ষিণেশ্বরে আপনার কল্যাণ কামনায় পুজো দিতে গিয়েছিলাম। এটি ভবতারিণীর প্রসাদী ফুল।

ফুলটি শ্যামাপ্রসাদবাবু হাতে ধরে নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন, এ ছেলেটি এম. এ পাশ করেছে। লেখার হাত বেশ ভাল। যুগান্তর, আনন্দবাজারে লেখে।

শ্যামাপ্রসাদবাবু সোজাসুজি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এখন কাজকর্ম কি করছ ?

বললাম, 'শিশুসাথী' অফিসে সামান্য কাজ করি।

বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন, ওর বড় অভাব স্যার, কোন কাজকর্ম নেই।

শ্যামাপ্রসাদ বললেন, কি ধরনের কাজ তুমি চাও ?

আমি বললাম, স্যার, কলেজে যদি একটু কাজ পাই…।

কলেজের কাজে কিন্তু টাকা খুব কম।

আমি পড়াতে ভালবাসি স্যার।

তুমি কলকাতার কলেজগুলোতে সন্ধান রাখ, কোথাও কোন ভেকেন্সি আছে কিনা। খালি থাকলে আমাকে বল। আচ্ছা, আমাদের জনসংঘ পত্রিকায় কিছু লেখা দিতে পার।

বললাম, গ্রামের সাধারণ মানুষদের নিয়ে একটা ফিচার করা যায় স্যার।

উনি বললেন, খুব ভাল, লেখ।

শ্যামাপ্রসাদ হলঘরের দিকে গেলেন।

বিশ্বেশ্ববাবু বললেন, তুমি দু-তিনটে ফিচার তাড়াতাড়ি লিখে আমাকে দিও। তুমি এখন বাসায় ফিরে যাও, আমি পরে যাচ্ছি।

আমি 'গ্রাম-পথিক' ছদ্মনামে জনসংঘ পত্রিকায় জেলে, জোলা, কামার ও কুমোরদের নিয়ে কয়েকটা ফিচার লিখেছিলাম। সেসব বিশ্বেশ্বরবাবুর কাছেই আমি জমা দিতাম। একদিন বিশ্বেশ্বরবাবু বলেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদবাবু তোমার লেখাগুলো পড়ে খুব খুশী হয়েছেন।

সূর্যের বোন কাজল আমাকে অভিভূত করেছিল। ওদের নিমন্ত্রণে আমি ওদের গাঁয়ের বাড়িতে যাই। দেখলাম, জমিজমা প্রচুর। লোকজনের হাঁকডাক যাতায়াতের সমারোহ। বেশ বড় দীঘি, দুদিকে দুটো বড় বড় বাঁধানো ঘাট। পাড়ার মেয়েরা একদিকে, ছেলেরা একদিকে স্নান করে।

আমরা যেতেই মাছ ধরার ধুম পড়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েরা নতুন অতিথির হাত ধরে কখনো ঘাটের পাটে বসতে লাগল গল্প শোনার আগ্রহে, কখনো বা পথঘাট চেনাতে লাগল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে।

কাজল কিন্তু দিনেরবেলা কোনদিনই আমার সঙ্গে বেরুত না। গ্রামের লোকের চোখে পনেরো বছরের মেয়েটি নিশ্চয়ই অরক্ষণীয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই দিনেরবেলা স্বাভাবিক নিয়মেই ঘোরাফেরা বন্ধ ছিল তার।

তখন জ্যোৎস্না রাত চলেছে। মায়ের অনুমতি নিয়ে সূর্য, আমি আর কাজল মাঠের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে যেতাম। রাতে চরাচর রহস্যময় হয়ে উঠত। ওদের পরিচিত একটি তালপুকুরের ধারে বসে আমি কোন ইংরাজী বইয়ের আকর্ষণীয় গল্প বলে যেতাম। ওরা মুগ্ধ শ্রোতার মত সে কাহিনী-গুলো শুনত।

এক রাত্রিতে খাবার পরে আমরা বেড়াতে গেছি। নির্দিষ্ট তালগাছটির তলায় বসে টুকরো টুকরো কথা বলছি। চাঁদ পুকুরের জলে রুপোর কুঁচি ছড়াচ্ছে। হালকা হাওয়ায় তালগাছের পাতায় সর্ সর্ একটা ধ্বনি উঠছে। সূর্য পুকুরের পাড় ধরে মনের আবেগে ঘুরতে লাগল।

আমার টুকরো টুকরো কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ কাজল আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে আমার এত ভাল লেগেছে রঞ্জনদা! প্রথমদিন মা তোমাকে ঠিকই চিনেছিল, তাই বলেছিল, তুমি তার আর এক ছেলে। সূর্য আর আমি পিঠোপিঠি ভাইবোন, তাই লোকের সামনে ছাড়া ওকে কখনো দাদা বলে ডাকি না। তুমি আজ থেকে আমার নিজের দাদা, একেবারে আমার নিজস্ব কিন্তু।

আমি সেই জ্যোৎস্নালোকে কাজলের মুখে চোখে এক গ্রামকন্যার আশ্চর্য মমতার ছবি দেখলাম। এ মাধুরী আমি কোন মেয়ের চোখে আগে কোনদিন দেখিনি।

আমার নিজের কোন বোন ছিল না। বোনের স্থানটা শূন্য ছিল এতকাল। কিন্তু সে শূন্যতা আমাকে কোন পীড়া দেয়নি কখনো। কাজলের কথাটুকু শুনে আমার বুকের মধ্যে সেই বন্ধ ঘরের দরজাটা খুলে গেল।

আমি বললাম, তুমি আমার বোন, আজ থেকে একমাত্র বোন।

ও আমার একখানা হাত মুঠো করে ধরে আনন্দে দোলাতে লাগল।

ফিরে আসার সময় বার বার মনে হতে লাগল ভাইবোনের মত এমন মধুর সম্পর্ক এ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নেই।

কিছুদিন পরে সূর্যের পরীক্ষা হয়ে গেল, ফলও বেরুল ক'মাস পরে। সূর্য স্কলারশিপ পেয়েছে। সে ঢুকল প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজী অনার্স নিয়ে।

একদিন আমি শিশুসাথী অফিসে বসে আছি, হন্তদন্ত হয়ে আমার খোঁজে এসে ঢুকল সূর্য।

বললাম, কি ব্যাপার?

ভীষণ উদ্বিগ্ন গলায় ও বলল, আহিরিটোলার বাড়িতে কাজলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, সে কি!

আমরা দুজনে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

সূর্য কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, ওকে কোথায় পাওয়া যাবে বল তো রঞ্জনদা? বাবা গেছেন বেনারস। ফিরতে অন্তত সাতদিন দেরি হবে, এখন আমি কি করি।

বললাম, মা কি করছেন? কোন রাগারাগি হয়েছিল কি কাজলের সঙ্গে?

না। তবে ওর জন্যে বাবা একটা সম্বন্ধ এনেছিলেন, ওর সেটা পছন্দ নয়। কিন্তু বাবাও নাছোড়। ছেলে নাকি উপযুক্ত, বেশ সম্পন্ন বাড়ি-ঘরদোর।

আমি বললাম, বাবা তো কাজলকে ভীষণ ভালবাসেন।

কাজলেরও তো দেখেছি বাবা-অন্ত প্রাণ। তবে এই সামান্য গোলমালের সমাধান হল না?

সূর্য মাথা নাড়ল। বলল, বাবা এ ব্যাপারে তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে বেনারস চলে গেছেন। আর আজ সকাল থেকেই কাজল উধাও।

আত্মীয়দের বাড়িতে খোঁজ করেছিলে?

সূর্য বলল, মা বারণ করেছে। কথাটা জানাজানি হলে একটা কেলেঙ্কারী হবে।

বললাম, উনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু খোঁজ করে তো দেখতে হবে। আচ্ছা দেশের বাড়িতে চলে যায়নি তো?

সূর্য কাতর গলায় বলল, হতে পারে, আমার মাথায় কিছুই আসছে না।

বললাম, 'কিশোর বাংলা' অফিসে একবার যাব। ওখানে আমার কাপড় জামা আছে। তুমি এস আমার সঙ্গে। তারপর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ট্রেন ধরে তোমার দেশের বাড়িতে দুজনে চলে যাব।

পত্রিকা অফিসের বাইরে ও দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভেতরে ঢুকলাম। বীণাদিকে সামনেই পেয়ে গেলাম। বীণাদি বলল, একটি মেয়ে তোমার খোঁজে এসেছিল, তুমি নেই শুনে চলে গেল।

আমি আকুল হয়ে বললাম, নাম কিছু বলেছিল বীণাদি?

জানতে চাইবার আগেই সে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

পুষ্পিতা, শ্রাবস্তীরা কেউ নয়তো?

বীণাদি বলল, তোমার কি হয়েছে বল তো, আমি কি ওদের দু'বোনকে চিনি না!

আচ্ছা, মেয়েটির মাথায় কোঁকড়া চুল, থুতনিটা একটু চাপা, চাঁপাফুলের মতো রঙ?

একটু হেসে বীণাদি বলল, মেয়েটিকে মনে হচ্ছে কবির খুব পছন্দ?

আমি গভীর গলায় বললাম, রঙ্গ নয় বীণাদি, মেয়েটিকে আমি খুব স্নেহ করি। ওর দাদা আমার ছাত্র। বাবার পছন্দের ছেলেটিকে ও বিয়ে করতে চায় না, তাই বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে ঘুরছে।

বীণাদির মুখে এখনো রসিকতা, ফিসফিস করে বলল, ঠিক দেখ তোমার ভালবাসায় মজেছে।

বললাম, তুমি ও মেয়েকে চেন না বলেই এমন কথা বলছ! আমি এখন চললাম, ওর দাদা বাইরে দাঁড়িয়ে। তুমি আমার জামা কাপড়ের ব্যাগটা এনে দাও।

বীণাদি ব্যাগ এনে দিল, আমি বেরিয়ে পড়লাম।

আমার অনুমান ঠিকই ছিল। কাজল ট্রেন ধরে একাই দেশে চলে এসেছে। দেশের বাড়িতে পৌঁছে কিন্তু আমি আর সূর্য, কাজলকে দেখতে পাইনি। কেউ তার খবরও দিতে পারেনি। একসময় ওদের গরুর পরিচর্যা করে যে মেয়েটি সে মাঠ থেকে গরু তাড়িয়ে নিয়ে এল। তখন ভর সন্ধ্যে।

মেয়েটি ঘরে ঢুকে চার দিকে তাকিয়ে আমাদের বলল, দিদিমণি কই?

সূর্য বলল, দিদিমণি আমাদের সঙ্গে আসেনি।

মিছে কেন বলছেন দাদাবাবু। একই ট্রেনে দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয়েছে ওপাড়ার ভজহরির। মাঠ পেরিয়ে যাবার সময় সেই তো আমাকে বলল।

সূর্য শুধু বলল, হুঁ।

আমি সূর্যকে বললাম, ও ঠিকই এদিকে কোথাও এসেছে। তুমি এখানে ওর জন্যে অপেক্ষা কর, আমি একটু বাইরে ঘুরে আসছি। ও এলে ওকে আটকে রাখবে। বলবে, আমি এসেছি, ওর সঙ্গে আমার দরকার আছে।

আমি বেরিয়ে গেলাম। সেদিনও পথঘাট মাঠ চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছিল। আমি অন্যমনে মাঠ পেরিয়ে তালপুকুরের দিকে এগিয়ে চললাম। এদিকে পায়ে চলার পথ নেই, তাই সন্ধ্যার পর বড় একটা কেউ এদিকে আসে না। পুকুরপাড়ে কিছু ঝোপঝাড় আছে। তার পরেই তালগাছের সারি। এ পুকুরটাও সূর্যদের।

আমি পাড়ে উঠেই ওকে দেখতে পেলাম। প্রপাতের মতো খোলা চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। ও পুকুরের দিকে চেয়ে বসে আছে। আমি ওর মুখখানা দেখতে পাচ্ছিলাম না। পায়ে পায়ে ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও এমনি মগ্ন ছিল যে আমার পায়ের সাড়াই পেল না।

আমি ওর পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে ওর মাথার ওপর দুটো হাত রাখলাম।

ও ভীষণ চমকে পেছন দিকে ফিরে তাকাল। এখানে এ অবস্থায় সে আমাকে দেখবে কল্পনাও করেনি।

তুমি!

আমি আমার দুটো হাতের অঞ্জলিতে তার পদ্মের মতো মুখখানা তুলে ধরে বললাম তুমি দাদাকে খুঁজতে গিয়েছিলে, পাওনি, তা বলে দাদাও কি তার বোনকে খুঁজে পাবে না? আমাকে জড়িয়ে ধরে ওর সেকি কান্না।

উচ্ছ্বাস একটু কমলে আমি বললাম, সব ব্যাপারটা আমি জানি, তোর ব্যাপারটা তুই নিশ্চিন্তে আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারিস। আমি বলছি, তুই সারা জীবনের মত ঠকে যাবি, এমন কাজ আমি করব না।

ও আমার হাত শক্ত করে ধরে বসে রইল।

একটু শান্ত হলে আমি বললাম, তোর আপত্তিটা কিসের বলত কাজল ?

বড্ড কালো রঙ।

তুই শুধু কালো বলে বাতিল করলি ? তারাশঙ্করের কবি বইটা পড়িসনি ?

'কালো যদি মন্দ তবে
কেশ পাকিলে কান্দ কেনে।'

ও অমনি আমাকে একটা ঠ্যালা দিয়ে বলল, আচ্ছা না হয় রঙটা মেনে নেওয়া গেল, চুল বড্ড পাতলা।

আমি বললাম, জগৎ সংসার ঘুরে আয়, তোর মত কেশবতী কন্যা কটা পাওয়া যায় আঙুলে গুনে দেখিস।

তা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু আমাকে দেখতে এসে ও আর ওর বন্ধু বাবা মা'কে প্রণাম করেনি। এই কি ভদ্রতা ?

আমি হেসে উঠে বললাম, নমস্কার নিশ্চয়ই করেছে।

তা করেছে কিন্তু সেটা কি উচিত হয়েছে ?

তুই কেন বুঝছিস না কাজল তোদের সঙ্গে তাঁদের কোন আত্মীয়তাই হয়নি। এক্ষেত্রে প্রায়-অপরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হলে সৌজন্যমূলক নমস্কার বিনিময়ই করতে হয়।

কাজল আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, সত্যি বল রঞ্জনদা, তোমাকে কি ওরা উকিল করে পাঠিয়েছে ?

আমি ওর পিঠে চাপড় মেরে বললাম, এখন বাড়ি চল।

ও বলল, ফয়সালা না হলে আমি আহিরিটোলায় ফিরব না।

তোর বাবার সঙ্গে রাগারাগি হল কি নিয়ে ?

এইসব নিয়ে। বাবা গোঁ ধরে রইল, এখানেই করতে হবে।

আমি বললাম, কখনই না।

বললাম, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ওর হাত ধরে তুলে বললাম, খিদে পেয়েছে, চল যাই। সামান্য কিছু খেয়ে এখুনি ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরতে হবে। মা চিন্তায় অস্থির হয়ে আছেন।

আমি ঠিকানা যোগাড় করে একদিন রওনা হলাম। ছেলেটিকে নিজের চোখে একবার দেখব বলে।

তার সঙ্গে আলাপ করব। এ বিষয়ে সূর্যের মায়ের সঙ্গে আমি পরামর্শ করে নিয়েছিলাম। মেয়ে বেশী স্বাধীন হয়ে গেছে বলে মুখে বকুনি দিলেও তাঁর মনে এ ব্যাপারে সুখ ছিল না। হাজার হোক, মেয়ের মনের শান্তি নষ্ট হলে, কোন মা-ই বা শান্তিতে থাকতে পারে!

আমি বাসে বসে ভাবছি, এ বিয়েতে কাজলের মন এতখানি বিরূপ হল কেন।

সংস্কৃতে একটা কথা আছে, 'কন্যা বরয়তি রূপম্'। প্রথম দর্শনেই ছেলেটির আকৃতি ওর পছন্দ হয়নি। ঠিক আছে, দেখাই যাক না। আমি

যতদূর জানি, কাজলের বাবা অবুঝ বা অবিবেচক নন। তিনি কাজলকে তো সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। কাজলও বাবা-অন্তপ্রাণ। তবে গোলটা বাধল কোথায় ?

আমি ঠিকানা খুঁজে ছেলেটির বাড়িতে পেীছে গেলাম।

চমৎকার জায়গায় বাড়ি। দোতলা থেকে লেকের একটা অংশ দিব্যি দেখা যায়। বাড়ির কাজের লোকটি আমাকে দরজা খুলে দিল। আমি বললাম, অনিমেষ আছেন। লোকটি বলল, হ্যাঁ, দাদাবাবু ওপরে আছেন।

একটু ডেকে দাও।

আমি আমার আর কোন পরিচয় দিলাম না।

অনিমেষ নিচে নেমে এল।

কালো কিন্তু সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারার যুবক।

অনিমেষ একটু অবাক চোখে অপরিচিত মানুষটির দিকে তাকাল। আমি হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আমাকে আপনি চিনবেন না। আপনি যখন হরিনাথবাবুর মেয়েকে দেখতে যান তখন আমি ও-বাড়িতে ছিলাম না। আমি ওদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সূর্যদের আর এক ভাই বলে আমাকে জানবেন। আমার নাম রঞ্জন।

ওর মুখে সৌজন্যের একটা হাসি ফুটে উঠল।

আপ্যায়ন করে বলল—আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।

আমি বললাম, না ভাই, আজ ভেতরে বসব না। আপনার যদি দেবার মত একটু সময় থাকে তাহলে আমার সঙ্গে বাইরে একটু বেরিয়ে আসুন।

দুঃখিত মুখে অনিমেষ বলল, সত্যি আপনি বসবেন না ?

অন্য একদিন।

অনিমেষ জামা পরেই নিচে নেমে এসেছিল, সে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল।

আমরা একটু এগিয়ে লেকের ধারে একটা গাছতলায় বসলাম। জায়গাটা মোটামুটি নির্জন। একটু দূরে বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে অপরাহ্ণের ভ্রমণার্থীরা দ্রুত হাঁটাচলা করছিল। অনিমেষ আমার দিকে তাকাতেই আমি বললাম, কিসের ওপর থিসিস করছেন ?

অনিমেষ বলল, আমি ফিজিক্সের ছাত্র ছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বাধা দিয়ে বললাম, ওসব আমি বুঝব না। আমি বিশুদ্ধ কলা-লক্ষ্মীর পূজারী।

অনিমেষ আমার কথায় হাসল। বলল, সাহিত্যের ব্যাপারে আমার দৌড়ও আপনার ওই ফিজিক্সের মত।

আমি বললাম, এবার আসল কথায় আসা যাক। কাজকর্মের ব্যাপারে কিছু ভাবছেন ? না, থিসিস সবমিট করেই ভাববেন ?

রেজাল্টটা মোটামুটি ভালই হয়েছে। দু-একটা কলেজে চেষ্টা চালাচ্ছি।

এবার বললাম, আমার বোন কাজলকে আপনার পছন্দ হয়েছে ?

ও বলল, আমি তো আমার মত দিয়েই এসেছি।

এখন সোজাসুজি বললাম, আপনাকে কাজলের পছন্দ হয়নি, কারণ ওর নামের সঙ্গে আপনার রঙের মিল আছে বলে।

হেসে অনিমেষ আমার দিকে তাকাল। সুন্দর ঝকঝকে দাঁত অনিমেষের। উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের শ্রী ছড়িয়ে আছে ওর সারা শরীরে।

বললাম, শুনে দুঃখ পেলেন ?

ওঁর আমাকে পছন্দ না হলেও ওঁকে আমার পছন্দ হয়েছে।

কেন আপনি ওকে পছন্দ করেছেন, সে কথা একটু জানতে পারি কি ?

অনিমেষ বলল, দেখুন, প্রথম দেখাতেই ভাল, মন্দ লাগার ব্যাপারটা চুকে যায়। ওঁকে প্রথম দেখাতেই ভাল লেগে গিয়েছিল।

কেন, একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন ?

ওঁর বয়স একেবারেই বেশী নয়। কিন্তু মুখে একটা সুন্দর বুদ্ধির দীপ্তি আছে। তার ওপর আছে সরলতার লাবণ্য। কথাটা বলেই অনিমেষ কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেল।

বললাম, আমার বোনের সৌভাগ্য যে এমন চোখে আপনি তাকে দেখেছেন। আমার কাছ থেকে তার সম্বন্ধে আর কিছু আপনার জানার আছে ?

অনিমেষ হঠাৎ বলল, একটা কিছু সম্পর্ক হলেই তো সব কিছু জেনে নেওয়া যাবে। আর আত্মীয়তা না হলে বেশী কিছু না জানাই ভাল।

আমার একটি অনুরোধ আপনার কাছে, আমি যে আপনার সঙ্গে দেখা করে গেলাম, এ ব্যাপারটা শুধু আপনার আর আমার মধ্যে রইল।

অনিমেষ বলল, আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। কিন্তু আপনি এক কাপ চা না খেয়ে যেতে পারবেন না।

আমি অনিমেষের হাত ধরে বললাম, আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। শুধু চা নয় ভাই, সিঙাড়া মিষ্টিও খেয়ে যাব। তবে আজ নয়।

এ সম্বন্ধটা ভেঙে গেলেও আসবেন তো ?

একথা ভাবছেন কেন ? ভাল যখন লেগেছে আপনাকে তখন আসবই।

অনিমেষ আমাকে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে গেল।

আহিরিটোলার বাড়িতে কাজলকে একান্তে ডেকে বললাম, তোর চক্ষুশূলের সঙ্গে দেখা করে এলাম।

কাজল একেবারে অবাক হয়ে বলল, কে !

অনিমেষ ব্যানার্জী।

সত্যি তুমি গিয়েছিলে তাঁর কাছে।

গম্ভীর গলায় বললাম, না গেলে তুই যে কতবড় মূর্খ তা বুঝতে পারতাম না।

ও কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি কি করেছি রঞ্জনদা ?

তুই অনিমেষকে একটুও চিনতে পারিস নি।

ও চুপ করে বসে আমার গায়ে ওর আঙুল দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগল।

আমি ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম, বিশ্বাস কর এমন ছেলে লাখে একটাও মেলে না।

কাজল বলল, কক্ষণো না। এ তোমার বাড়াবাড়ি।

বিশ্বাস কর কাজল আমি আজ তাকে মুখোমুখী ভাল করে দেখেছি, তোর চোখ দিয়েই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। তারপর অনেকক্ষণ লেকের ধারে বসে বসে কথা বলেছি। আমার বোন কাজল ওকে পেলে কক্ষণো ঠকবে না। অনিমেষ হয়ত সুন্দরদর্শন পুরুষ নয়, কিন্তু তার দেহে যে স্বাস্থ্যের শ্রী আছে তা বহুজনের ভেতরেই নেই, আর সেটাই পুরুষের আসল সম্পদ।

চুপচাপ কতক্ষণ দুজনে বসে রইলাম। এক সময় নীরবতা ভেঙে বললাম, সোজাসুজি তোর মতটা কি বল তো ?

ও আমার একটা হাত তার হাতে নিয়ে বলল, যতই বল, তোমার মত নয়।

বললাম, বুঝেছি, আসল পাগলামীটা কোথায় ! তুই সত্যিই একটা আস্ত বোকা। আমার মতন বাউণ্ডুলের পাল্লায় পড়লে যে কোন মানুষেরই ভবিষ্যৎ ঝরঝরে। জেনে রাখ, তোর ওই কেষ্টঠাকুরের কাছে আমি একেবারেই ডাস্ট।

আরো জোরে ও আমার হাতটা ওর গালে চেপে বসে রইল কতক্ষণ। আমার হাতটা ভিজতে লাগল ওর চোখের জলে।

বাৎসরিক প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশান সেরিমনিতে ছেলেরা 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের অভিনয় করার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ওরা জোর করে আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে রিহার্সেল দেবার ভার। বেশ কয়েকদিন লেখাপড়ার দফারফা। কখনো-কখনো এক আধটা ক্লাসে যাই নিয়মরক্ষা করতে। সারা স্কুলে যেন একটা ছুটির আমেজ। কোথাও মাস্টারমশাইরা আবৃত্তি শেখাচ্ছেন, কখনো দেশাত্মবোধক গানের কলি ভেসে আসছে। আমাকে অন্যান্য কয়েকজন মাস্টার-মশায়ের সঙ্গে বসে অভিনেতাদের নির্বাচন করতে হয়েছে। এই নিয়ে মেটাতে হয়েছে সূক্ষ্ম মন কষাকষি। এখন স্কুল ছুটি হয়ে গেলেও প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত ক্লাইভ, সিরাজউদ্দৌলা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। শাগরেদরা ছুটোছুটি করছে এদিক ওদিক। মোশান-মাস্টার সেজে বসে আছি। চেঁচিয়ে যাচ্ছি সমানে। যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্দীপনা সঞ্চার করতে গেলেই চেঁচাতে হয়। আমি যত চেঁচাই, ছেলেরা তত চেঁচায়। কখনো এক ভাঁড় চা, আবার কখনো একগাল মশলামুড়ি জোটে। ভাবি, কি প্রাণশক্তি আমাদের। কালিয়া, পোলাও খেলে আরও কত চেঁচাতে পারতাম।

আগামীকাল স্টেজ রিহার্সেল, পরের দিন ফাংশান। আমি পুর্ণোদ্যমে রিহার্সেল দিয়ে চলেছি। হঠাৎ মনে হল, শিশুসাথী অফিসে অনেকদিন যাওয়া হয়নি। আমার 'মধুকরের আসরের' কথা মনেই ছিল না। কিছু লেখা নির্বাচন করে দিয়ে এসেছিলাম কিন্তু প্রতিমাসে যে মুখবন্ধটি লিখতে হয়, তা লেখা হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম। ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল, মাস্টারমশাই

কোথায় যাচ্ছেন ?

আজ এখানেই থাক। আমাকে একবার শিশুসাথী অফিসে যেতে হবে।

ছেলেরা আবার চেঁচাল, না স্যার, এটা শেষ করে দিয়ে যেতে হবে।

বললাম, অবুঝ হয়ো না, এটা শেষ করে যেতে হলে শিশুসাথী অফিস আমার জন্যে খোলা থাকবে না।

ইতস্তত করে আরো কিছুক্ষণ বসে গেলাম। ছেলেদের ভেতর উল্লাসের ধ্বনি উঠল। কিছু সময় রিহার্সেল দেবার পর আমার মন বলল, আজ অবশ্যই একবার শিশুসাথীতে যেতে হবে।

আমি উঠে বললাম, কাল স্টেজ-রিহার্সেলে আমি সব ঠিক করে দেব, আজ তোমরা চলে যাও।

কে যেন অদৃশ্যলোক থেকে শিশুসাথী অফিসের দিকে আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল।

চারটে তখনও বাজেনি, আমি শিশুসাথী অফিসে এসে পেঁছিলাম। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দেখলাম, বিনয়বাবুর ঘরের দরজার সামনে প্রেস-ইনচার্জ পরেশবাবু দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখামাত্রই পরেশবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, এই যে বিনয়বাবু, রঞ্জন এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বিনয়বাবুর চেয়ার সরানোর শব্দ শুনলাম। তিনি নিজেও দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কেমন ছেলে হে তুমি, একটা ঠিকানা পর্যন্ত রেখে যাওনি। সেই যে মাসখানেক আগে ডুব দিলে আর এই উঠলে !

আমি মাথা চুলকে বললাম, আপনি তো জানেন আমার পারমানেণ্ট কোন ঠিকানা নেই। তবে রোজ যেখানে খেতে যাই সে ঠিকানাটা অন্তত দিতে পারতাম।

বিনয়বাবু বললেন, এখন আর কথা বলার সময় নেই, চারটে বাজতে যায়। তুমি দৌড়ে রিপন কলেজে প্রিন্সিপ্যাল পি. কে. গুহের কাছে চলে যাও। তিনি শনিবার এখানে এসে তোমার খোঁজ করেছিলেন।

সবিস্ময়ে বললাম, আমার খোঁজ, কেন ?

ঐ যে বছরখানেক আগে তোমার চাকরির কথা আমি তাঁকে বলে রেখেছিলাম। ঠিক তাঁর মনে ছিল, তাই একটা লিভ-ভেকেন্সী হতেই তিনি নিজে আমাকে খবর দিতে এসেছিলেন। এ কথাও বলে গেছেন, একবার ঢুকতে পারলে যে কোন ভাবেই হোক কলেজে একটা পারমানেণ্ট ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

পরেশবাবু বললেন, তোমার কপাল ভাল, আজ এসেছ। পি. কে. গুহ বলে গেছেন, মঙ্গলবারের ভেতর তুমি না গেলে বুধবার অন্য একটি লোক এসে যাবেন।

আমি ছুটলাম রিপন কলেজে। দেখা হল প্রিন্সিপ্যাল গুহের সঙ্গে। তিনি বললেন, কাল থেকে কাজে লেগে যাও। প্রধানত তুমি ডে-তে ক্লাশ নেবে, আর সপ্তাহে তিনদিন নেবে মর্নিং ক্লাশ। পরশু থেকে ডে আর মর্নিং একসঙ্গে

করবে, পারবে তো ?

উত্তেজনায় ফুটছি। বললাম, আমার কোন অসুবিধেই হবে না স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, আমি কালই মর্নিং-এর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মীরা দত্তগুপ্তার সঙ্গে কথা বলে নেব।

আমি পি. কে. গুহকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি, উনি বললেন, একটু বস। কালকের রুটিনটা তোমাকে দিয়ে দি। হেড-ক্লার্ক কালীবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, বি. সি. বি-র বাংলা ক্লাশগলো ইনি করবেন। কালকের রুটিনটা অন্তত ওঁকে দিয়ে দিন।

কালো লম্বা মানুষটি বললেন, আমি এখুনি এনে দিচ্ছি স্যার।

মিনিট পনেরোর মধ্যে কালীবাবু বি. সি. বি-র ছ'দিনের রুটিন কপি করে আমার হাতে তুলে দিলেন।

আমি কলেজ থেকে বেরিয়েই একটা ট্রামে উঠলাম।

আমার মা দুদিন আগে অসুস্থ শরীর নিয়ে কলকাতায় এসেছে ডাক্তার দেখাতে। গণেশ টকির কাছে পরিচিত এক ভদ্রলোকের কোয়ার্টারে উঠেছে। আমি আনন্দ-সংবাদটা প্রথমে মাকে দিয়ে প্রণাম করব ভাবছিলাম। ট্রাম এসে দাঁড়াল কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। আমার মনে হল, যিনি অনাত্মীয় হয়ে নিঃস্বার্থভাবে আমার জন্য এতখানি করলেন, তাঁকে সবার আগে প্রণাম করা কর্তব্য। ভাবা মাত্রই নেমে পড়লাম। দ্রুত পায়ে হাজির হলাম শিশুসাথী অফিসে।

অফিস বন্ধ হয়েছে সবেমাত্র। বিনয়বাবু আর পরেশবাবু ফুটপাথে নেমে দাঁড়িয়েছেন। আমি গিয়ে বিনয়বাবুকে প্রণাম করে পরেশবাবুর দিকে এগোতেই উনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বিনয়বাবু বললেন, আরে একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রাইভেট সেক্রেটারী তোমার খোঁজ করছিলেন। অবিলম্বে তোমাকে ডক্টর মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

আশ্চর্য ব্যাপার, প্রায় বছরখানেক ওদিকে যাইনি, হঠাৎ আহ্বান।

কোনদিকে না তাকিয়ে বাসে উঠে বসলাম। বাস ভবানীপুরে নিয়ে চলল।

স্যার আশুতোষের বাড়ির সামনে নামলাম। বছরখানেক আগে বিশ্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে এসেছিলাম এখানে।

ওপরে উঠলাম। হলঘরের দিকে এগোতেই দরোয়ান বলল, মুখার্জী সাব বাহার গেছেন।

কোথায় ?

ডাক্তার বিধান রায় সাহাবের বাড়ি। একটা কিছু ফাংশান আছে।

ফিরবেন কখন ?

সাড়ে আটটায় ফিরবেন।

হলঘরে আর কি আসবেন ?

জরুর আসবেন। আপনি বসুন।

একটা ছোট হলুদ বাতি জ্বলে আছে। মস্তবড় হলঘরখানার অন্ধকার তাতে দূর হচ্ছে না। আমি সারি সারি চেয়ারের ভেতর কোণের একখানা চেয়ার বেছে নিয়ে বসে রইলাম। আশ্চর্য। বড় ঘড়িতে সাড়ে আটটার ঘণ্টা বাজল, ঠিক মিনিট পাঁচেক পরে খালি গায়ে একটা লবঙ্গজাতীয় কিছু চিবুতে চিবুতে ঘরে ঢুকলেন শ্যামাপ্রসাদ।

মুহূর্তে তাঁর সেই তীক্ষ্ন চোখ দেখে নিল আমাকে।

তুমি এসেছ।

প্রণাম করে দাঁড়াতেই বললেন, খগেনবাবু এখন কলেজে রয়েছেন, তুমি গিয়ে বল, পার্টটাইম লেকচারারের জন্য আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।

ছুটলাম আশুতোষ কলেজের দিকে। নাইটের প্রিন্সিপ্যাল খগেন সেন বসেছিলেন, আমি ঢুকে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। উনি ছেলেদের ওপর কোন কারণে সম্ভবত বিরক্ত হয়েছিলেন, তাই আমাকে দেখে ছাত্র ভেবেই বলে উঠলেন, কি চাই? এখন সময় নেই, পরে এসো।

বললাম, স্যার, আপনার কলেজে পার্টটাইম বাংলার লেকচারার দরকার, ডক্টর মুখার্জী তাই আমাকে পাঠিয়েছেন।

খগেনবাবু আমাকে সমাদরে বসতে বললেন। তারপর ভাল করে আমাকে দেখে নিয়ে বললেন, নাইটে এখানে কমার্সে অনেক বড় বড় ছেলে পড়ে। আপনার চেয়েও অনেকে বয়সে বড়। আপনি ওদের ঠিক ম্যানেজ করতে পারবেন না।

বললাম, একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন না স্যার।

উনি বললেন, ডাক্তার মুখার্জীর সঙ্গে আমি একটু কথা বলে দেখি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে শ্যামাপ্রসাদবাবুকে খবরটা জানালাম। উনি বললেন, ঠিক আছে।

বলতে না বলতেই দেখলাম, খগেনবাবু আসছেন। আমি তাঁকে দেখেই সুইং ডোর ঠেলে করিডোরে চলে গেলাম।

খগেনবাবু ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ডক্টর মুখার্জী বললেন, ছেলেটিকে পাঠিয়েছিলাম, কি হল?

স্যার, নাইটে কমার্সে অনেক চাকুরে ছেলে পড়ে, বয়েসে তাদের অনেকেই ওর চেয়ে বড়। তাছাড়া ওর চেহারাটাও তেমন ভারিক্কি নয়। তাই ক্লাশ ম্যানেজ করতে পারবে কিনা ভাবছি।

ডক্টর মুখার্জী বললেন, ভাবনার কিছু নেই, ও কাজ করুক, না পারলে ও আপনিই ছেড়ে দেবে।

খগেনবাবু বললেন, ঠিক আছে স্যার।

নমস্কার করে উনি বেরিয়ে গেলেন। আমি ডক্টর মুখার্জীর কাছে এসে দাঁড়ালাম।

সব শুনেছ?

হাঁ স্যার। আমি আপনার সম্মান রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।

উনি হাসলেন। আমি প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম।

একজন ভদ্রলোক সেই সময় ঢুকছিলেন শ্যামাপ্রসাদের বাড়ির গেট দিয়ে। আমি ভদ্রলোককে একটু আগে প্রফেসারস রুমে বসে থাকতে দেখেছিলাম। আমি যখন প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন উনি আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ভদ্রলোক ঢুকতে গিয়েও থেমে গেলেন। আমার নাম ধরে ডেকে বললেন, আপনার চাকরী হয়ে গেল।

আমি বললাম, ডক্টর মুখার্জী তাই বললেন।

ভদ্রলোক বললেন, আমি আজ শিশুসাথী অফিসে খবরটা দিয়েছিলাম।

বললাম, ভাগ্যিস যথাসময় পেয়ে গেছি খবরটা।

উনি বললেন, অসাধারণ এই মানুষটি, কেবল নেতা হিসেবে নয় একটি হৃদয়বান মানুষ হিসেবে।

আমি চুপ করে শুনতে লাগলাম।

উনি বললেন, দিল্লী থেকে প্লেনে দমদমে নেমেই আমার কাছে কলকাতার কাজের ফিরিস্তি চাইলেন। আমি ওঁর কাজের তৈরি করা একটা তালিকা হাতে তুলে দিতেই উনি চোখ বুলিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কলেজের বাংলা লেকচারারের জন্য 'গ্রাম-পথিক' নামে যে ছেলেটি লিখত তাকে খবর দাও। আমি আপনার ঠিকানা জানতাম না। সেকথা শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে জানাতেই তিনি বললেন, ছেলেটি একসময় বলেছিল, সে শিশুসাথী অফিসে কাজ করে। তুমি ওখানে এখুনি খবর দাও।

তাই আপনাকে খবর দেওয়া সম্ভব হয়েছে আমার।

আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শ্যামবাজারগামী গাড়িতে উঠলাম। বসে বসে ভাবতে লাগলাম, একবছর আগে একটা কথা বলেছিলাম, এমন তো কত কথা কতজনই বলে থাকে, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ শত কাজের মাঝেও অসহায় একটি ছেলের কথা ভোলেননি।

আমি বাসায় ফিরে এসে মাকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই মা উদ্বিগ্ন মুখে বলল, ফিরতে তোর এত রাত হল!

আমি মাকে সব কথা খুলে বললাম। শেষে বললাম, মা, তোমাকেই আগে প্রণাম করে রিপন কলেজের খবরটা দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু পাকেচক্রে তা আর হয়নি। বিনয়বাবু আর শ্যামাপ্রসাদ তোমার আগেই আমার প্রণাম পেলেন।

মা খুশি হয়ে বলল, তোমার যে এই কর্তব্যবোধটুকু হয়েছে সেজন্যে আমি ভারী খুশি হয়েছি।

আমি বললাম, কিন্তু মা এ কেমন হল?

কিসের আবার কি হল?

তুমি যে বল, ভাগ্য কি দিল না দিল তা ভাববে না, লড়াই করে যাও একদিন জিতবেই। কিন্তু মা ভাগ্য সহায় না হলে একই দিনে কি করে দুটো কলেজে হঠাৎ চাকরী পেয়ে যাই! আরো ভেবে দেখো, দুটো কলেজে তিন শিফটে কাজ পাচ্ছি আমি, কারু সঙ্গেই ঠোকাঠুকি লাগছে না। এমনও তো

হতে পারত, শ্যামাপ্রসাদ আশুতোষ ডে-তে আমাকে কাজটা অফার করলেন। কিন্তু মা ভাগ্যই সবদিক ম্যানেজ করে দিলে।

মা শুধু বলল, এ বিশ্বাস যতই মনের ভেতর ধরে রাখার চেষ্টা করবে জীবনে ততই কষ্ট পাবে। কোনদিকে না তাকিয়ে শুধু কাজ করে যাও।

প্রথম অভিনন্দন পত্র এল শ্রাবস্তীর কাছ থেকে।

প্রিয় রঞ্জন,

আমার দুর্ভাগ্য তোমার চাকরীর খবর পেতে হল রবীনদার মুখ থেকে। নিজে আমার বাড়িতে এসে একজন তরুণ অধ্যাপক তার সদ্য পাওয়া চাকরীটার খবর দিয়ে যাবে এতটা আশা আমি করিনি। কিন্তু দুছত্র চিঠিও কি আশা করতে পারি না তার কাছ থেকে। যাক আমার অন্তরের অভিনন্দন রইল। আমার চিঠির যদি জবাব দাও তাহলে কোন কৈফিয়ৎ দিতে যেও না। কষ্ট পাব।

তোমার নতুন কর্মজীবনে আমার একটি অনুরোধ রইল, অধ্যাপনায় মগ্ন হয়ে সাহিত্য চর্চায় যেন ছেদ না পড়ে।

শুভেচ্ছা জেনো।

শ্রাবস্তী

আমি শ্রাবস্তীর চিঠির কোন জবাব না দিয়ে এক সন্ধ্যায় তার বাড়িতে এসে হাজির হলাম। কড়া নাড়তে আধো আলো অন্ধকারে যে এসে দরজা খুলে দিল সে শ্রাবস্তী নয়, পুষ্পিতা। আমার দিকে তাকিয়েই একমুখ হাসি হেসে পুষ্পিতা ডাক দিয়ে বলল, দিদি কে এসেছে দেখে যা।

কথাটা বলেই কৌতুকময়ী আমাকে পাশের সিঁড়ি দিয়ে গ্যারেজের ওপরের ঘরে চলে যেতে বলল।

আমি তাই করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে পুষ্পিতা। আমি ভেতরে থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম শ্রাবস্তীর পায়ের আওয়াজ। সে বোনের কাছে এসে থেমে গেল।

কই কে এসেছে ? কাউকে তো দেখছি না।

পুষ্পিতা বলল, তুমি নিজেকে ছাড়া কাউকেই দেখতে পাও না।

ঝাঁঝিয়ে উঠল শ্রাবস্তী, থাম তো জ্ঞানদানন্দিনী। ফিলজফি পড়ে একেবারে দার্শনিক বনে গেছিস।

দুজনের বিতর্ককে আর বাড়তে না দিয়ে আমি ভেজানো দরজাটা খুলে আবির্ভূত হলাম।

শ্রাবস্তী অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। পুষ্পিতার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত। আমি মাথা নত করে বললাম, প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি দুবোনের কাছে। নিজের মুখে খবরটা দেব বলেই চিঠিপত্র লিখে জানাই নি।

শ্রাবস্তী বলল, আমি তো তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইনি রঞ্জন।

বললাম, তুমি চিঠিতে কৈফিয়ৎ দিতে বারণ করেছিলে, তাই আত্মপক্ষ

সমর্থনের জন্য নিজে এসে হাজির হয়েছি।

ও একটু গভীর গলায় বলল, এস, আমরা পড়ার ঘরে বসি।

আমরা তিনজনেই পাশে একটি প্রশস্ত ঘরে গিয়ে বসলাম। এ ঘরে আমি আর রবীনদা আগেও এসেছি। সুন্দর সাজানো ঘর। সুরুচির ছাপ এদের বাড়ির সর্বত্র। আমি রবীনদার কাছ থেকে জেনেছিলাম শ্রাবস্তী আর পুষ্পিতা শান্তিনিকেতনে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়াশুনা করে কলকাতা চলে এসেছে।

আমি বললাম, মেসোমশায়, মাসীমা কাউকেই তো দেখছি না।

শ্রাবস্তী অমনি বলল, ওঁদের দেখতে না পেয়ে তুমি কি খুবই দুঃখিত?

বললাম, সুখ দুঃখের প্রশ্ন নয়। স্বাভাবিক সৌজন্যের প্রশ্ন।

শ্রাবস্তী এমনি বাঁকানো কৌতুকেই কথা বলতে ভালবাসে।

পুষ্পিতা উত্তর দিল, বাবা স্বগ্রামে স্বপরিবারে সাতদিনের জন্য প্রস্থান করেছেন।

বললাম, দুই কন্যাকে মহানগরীতে ফেলে রেখে সপরিবারে প্রস্থান হয় কি করে?

শ্রাবস্তী বলল, তুমি অধ্যাপনা করবে কি করে তাই ভাবছি। পরিবারের একটা মানে যে 'স্ত্রী' তাও জান না।

পুষ্পিতা বলল, তোরা ঝগড়া কর দিদি, আমি নতুন অধ্যাপকের জন্যে কিছু খাবার তৈরী করি।

বললাম, পুষ্পিতা বস, খাবার দাবার পরে হবে।

পুষ্পিতা বসল না, মুচকি হেসে বলল, বান্ধবীর সঙ্গে গল্প কর। আমি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসছি।

শ্রাবস্তী উঠে গিয়ে মনে হল বোনের কানে কানে কিছু বলল। আবার ফিরে এলো শ্রাবস্তী।

ও আমার মুখোমুখি বসে বলল, দুটো কলেজে তিন সিফটে কাজ করতে তোমার কষ্ট হয় না।

বললাম, খুব উৎসাহের সঙ্গেই করি।

কৌতুকময়ী আবার বলল, মর্নিং সিফ্‌টে উৎসাহটা নিশ্চয়ই বেশী থাকে।

আমি ওর কৌতুকটা প্রথমে ধরতে পারিনি। তাই বললাম, রাতে ঘুমের পর শরীরটা ফ্রেস থাকে তো, তাই উৎসাহটা সকালেই বেশী থাকে।

ও বলল, এই মাত্র কারণ।

আমার মাথায় ততক্ষণে ওর দুষ্টুমিটা ধরা পড়েছে। বললাম, অবশ্যই উৎসাহের অন্য কারণও আছে। তবে সেটা ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বলার নয়।

ও বলল, কি পড়াচ্ছ? দু-একটা কবিতার নাম কর তো?

সাগরিকা, দীপশিখা।

ও চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাদের সময়েও ওই দুটো কবিতা ছিল। খুব জমিয়ে পড়াচ্ছ নিশ্চয়ই?

বললাম, তোমরা দু'বোন যদি ছাত্রী হতে তাহলে তোমাদের মুখের দিকে

তাকিয়ে পড়ানোটা জমতো ভাল।

আমাদের চেয়েও সুন্দর মুখের দেখা পাবে। হয়ত ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছ।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলাম।

শ্রাবন্তী এখন আর নিজের মধ্যে নেই। ওর অদ্ভুত একটা স্বভাব আমি দেখেছি। কৌতুক-কথা বলতে বলতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাওয়া। তখন ও মুহূর্তে অন্য এক জগতে চলে যায়। পরিবেশ পরিস্থিতির দিকে তখন কোন লক্ষ্যই ওর থাকে না। আপনার ভেতর আপনি মগ্ন, অদ্ভুত সব কথা বলে যায়। আমরা যখন বারোয়ারি উপন্যাস লিখি তখন পত্রিকা অফিসে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে মেদিনীপুরের গ্রামে কিভাবে গুলি চলেছিল সেই বর্ণনা দিচ্ছিলাম। অনেকের সঙ্গে ও পাশে বসে শুনছিল। হঠাৎ দেখলাম ওর চোখমুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। মনে হল ওর গৌরবর্ণ আগুনের শিখার মত জ্বলছে। চোখের দৃষ্টি অন্য জগতে ধ্যানস্থ।

কি করে যে এমন হয় বুঝি না। চপল রসিকতার সঙ্গে এমন গাঢ় ভাব মেশে কি করে!

বললাম, কি ভাবছ?

ও মাথাটায় ঝাঁকুনি দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় নিজেকে ফিরিয়ে আনল। একসময় বলল, জান রঞ্জন, তুমি যখন 'সাগরিকা' কবিতার কথা বলছিলে তখন আমি নিজেকে সমুদ্রজলে স্নান করে উঠে আসা সাগরিকার সঙ্গে অভিন্ন বলে ভাবছিলাম। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম পাল তোলা জাহাজ এসে ভিড়ল সমুদ্রতীরে। জাহাজ থেকে নামল যে কুমার তার মাথায় মুকুট, দক্ষিণ করে ধনুর্বাণ।

আমি মুগ্ধ চোখে কতক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখলাম রঞ্জন। আমি ভাবতেও পারছি না।

কি এমন দৃশ্য শ্রাবন্তী?

অনুরোধ কর না রঞ্জন, সে আমি মুখ ফুটে বলতে পারব না।

হেসে বললাম, চিরদিনই তোমার অসংকোচ-আচরণ, আজ নিজেকে এমন করে গুটিয়ে নিলে কেন?

ঝিনুকের ভেতরে যখন মুক্তোর জন্ম হয় তখন একটা যন্ত্রণা অহরহ চলতে থাকে। মুক্তোটি সৃষ্টি হয়ে যাবার পর সে তাকে সৃষ্টির গভীর আনন্দে গোপন করে রাখে। আমি আমার ভাবনার মুক্তোটিকে তেমনি গোপন করে রাখতে চাই রঞ্জন।

আমিও তোমাকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করে বিব্রত করব না শ্রাবন্তী।

ও আমার হাতখানা ধরে আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল, রাগ করলে? আমি সেই বিদেশী রাজপুত্রের মুখে আমার কোন এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর ছবি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম।

পুষ্পিতা একটি বড় থালায় দুটো খাবারের প্লেট সাজিয়ে নিয়ে হাজির হল। মুখে বলল, এটুকু খেতে খেতে তোমরা দুজনে গল্প কর। আমি রাতের

রান্নার যোগাড় করছি।

শ্রাবন্তী ওমনি বলল, জলযোগের ব্যবস্থা তুই করলি, রাতের খাবার আমিই তৈরী করব। তুই এখানে বসে রঞ্জনের সঙ্গে গল্প কর।

বললাম, দু'বোনের ভেতর কর্মবিভাগ কি হবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, আমি খেতে পেলেই খুশী। কিন্তু তিনজন রয়েছি একসঙ্গে, দুটো প্লেট কেন?

পুষ্পিতা বলল, আমারো আছে মশায়, তোমাদেরটা ধর আমারটা আনছি।

ও সত্যি আর একটা সাজানো প্লেট নিয়ে এল। আমরা খেতে খেতে গল্প করতে লাগলাম। খাওয়া শেষ হলে তিনটে প্লেট আর থালা নিয়ে উঠে পড়ল শ্রাবস্তী।

তোরা গল্প কর আমি রান্নাঘরে ঢুকলাম।

পুষ্পিতা বলল, তুই একা পারবি না দিদি।

শ্রাবস্তী ততক্ষণে আর একটা ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। সেখান থেকে সে বলল, ঠিক পারব, তুই গল্প চালিয়ে যা।

এখন পুষ্পিতা আর আমি মুখোমুখি।

পুষ্পিতা শান্ত, অনুভূতিপ্রবণ। শ্রাবস্তীর মত ভাবনা আর প্রকাশের প্রচণ্ডতা নেই তার। পুষ্পিতা আনন্দকে নিজের গভীরে লালন করতে জানে। শ্রাবস্তী আনন্দকে ফোয়ারার মত ছড়িয়ে দিয়ে সুখ পেতে চায়।

মাস কয়েক আগে 'রক্তকরবী' নাটকের মঞ্চসজ্জা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তারই একটা রঙীন মিনিয়েচার ঘরের কোণে দেখতে পেলাম। সেই গগনেন্দ্র-নাথের পাষাণপুরীর রহস্যময় সোপান। সামনে নিষ্পত্র শাখার জাল ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বনস্পতি। কেবল প্রাসাদশীর্ষ ছুঁয়ে দুটি পাতা আর কয়েকটি লাল ফল সূর্যালোকে ছুঁয়ে জেগে আছে। সেই নীলকণ্ঠ পাখি নীল আকাশ থেকে উড়ে আসছে তার ডানা মেলে।

বললাম, এতদিন পরে 'রক্তকরবী'র অসাধারণ পট পরিকল্পনার জন্য তোমাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এতদিন পরে বলে কোন ক্ষোভ নেই। আমার কথা শুনে খুশীতে পুষ্পিত হয়ে উঠল পুষ্পিতা।

তোমার ভাল লেগেছিল রঞ্জনদা?

সে ভাল প্রকাশ করি এমন ভাষা আমার নেই।

পুষ্পিতা চুপ করে বসে রইল।

আমি বললাম, বিরাট মৃত্যুর রিক্ততার ভেতর তোমার ঐ জীবনের আলোটুকু, শুকনো শাখায় ঐ দুটি সবুজ পাতা, লাল ফল, ঐ নীলকণ্ঠের উড়ে আসা আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। তোমার এই পরিকল্পিত প্রতীক আশ্চর্য এক ভাবনার জগতের দ্বার খুলে দিয়েছে।

আবেগে আমি অনেক কথা বলে গেলাম, ও চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল, নীলকণ্ঠ পাখি তো আলোর দূতী। ঐ অন্ধ পাষাণপুরীর ওপরে

একটুকরো প্রাণের আলো। ওর ছোঁয়াতেই তো জেগে উঠল প্রাণ।

বললাম, তুমি সমস্ত নাটকের তাৎপর্যটুকু নিকষ সোনার বিন্দুর মত ফুটিয়ে তুলেছ।

ও এবার লজ্জা পেল। বলল, দিদির কথা বল। ওর অভিনয় তোমার কেমন লেগেছিল?

সমালোচনার কিছু পাইনি। ভারী স্বচ্ছন্দ ওর অভিনয়। ঐ যে ও গেয়ে উঠছিল,

'ভালবাসি ভালবাসি
এই সুরে কাছে দূরে
জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।'

সেই সুর এখনও কানে বাজছে।

পুষ্পিতা বলল, আপনি তো পরের দিন আসেননি। শ্যামার গান ওই তো গেয়েছিল। সবাই খুব প্রশংসা করেছে।

বললাম, আমার একটা দুঃখ থেকে গেছে।

ও আমার দিকে তাকাল।

আমি তোমার দ্বিতীয় দিনের মঞ্চ-সজ্জা আর উত্তীয়বেশী পুষ্পিতার অভিনয় দেখতে পাইনি।

ও একটুকরো হাসি মুখে ফুটিয়ে বলল, ভাগ্যিস দেখনি রঞ্জনদা। যেমন মঞ্চ-সজ্জা তেমনি অভিনয়।

আমি এই প্রথম তোমার কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না বলে দুঃখিত।

আমার কথা শুনে ওর সারা মুখে মিষ্টি হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল। শ্যামল মেঘের ভেতর থেকে সূর্যের লুকনো হাসির উদ্ভাসের মত।

ও শুধু বলল, তোমার দুঃখ পাবার একটাই মাত্র কারণ থাকতে পারে, সেটা তোমার বান্ধবীর গান না শোনা।

বললাম, কোথায় কতটুকু আমার ক্ষতি তা আমি জানি পুষ্পিতা। 'কি পাইনি' সেটা আমার মনে মনেই থাক।

ও গভীর মুহূর্তটাকে এড়িয়ে গিয়ে বলল, আমার তোলা ফটো দেখবে?

সবিস্ময়ে বললাম, তুমি ভাল ফটোগ্রাফার বুঝি?

সব কিছুতেই আমাকে ভালর পর্যায়ে ফেলে দিও না রঞ্জনদা। আমি ফটো তুলি ঠিক, তবে নিজের খেয়াল-খুশিতে।

বললাম, কই দেখাও তোমার ফটো।

পুষ্পিতা একটা ড্রয়ার টেনে দু'তিনটে খামের প্যাকেট বের করল। তারপর সেগুলো নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, এখন আমরা মুখোমুখি বসে ফটোগুলো দেখব।

ও একটা প্যাকেট খুলে ছবি সাজাল।

বিভিন্ন অভিনয় আর গানের আসরে শ্রাবস্তীর নানা ভঙ্গীর ছবি। পুষ্পিতার ছবি তোলার দক্ষতা আমাকে বারে বারে চমকে দিচ্ছিল।

শ্রাবস্তীকে নানা এ্যাঙ্গল থেকে ধরেছে ও। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে মূল ছবির সঙ্গে ছায়াছবিটিকে পর্দায় এমনভাবে ধরা হয়েছে যাতে সমস্ত ছবিটাতে আলাদা একটা মেজাজই এনে দিয়েছে।

রঙীন ছবিগুলোতে ওর সৌন্দর্যের মহিমা রঙে রসে অভিব্যক্তিতে দারুণ খোলতাই হয়েছে।

কৌতুক করে বললাম, এমন দিদি-অন্ত-প্রাণ দেখা যায় না। এ যেন প্রিয়জনের জন্য উত্তরীয়ের আত্মদান।

এ কথা কেন বলছ ?

তোমার একটিও ছবি দেখছি না বলে।

ফটোগ্রাফারের ছবি আবার কে কবে দেখতে পায়। তুমি এত বোকা কেন রঞ্জনদা।

হেসে বললাম, নিখাদ একটা প্রশংসাপত্র আজ তোমার কাছ থেকে পাওয়া গেল।

ও বেশ খানিকটা সংকোচের গলায় বলল, ওরকম মন্তব্য করা আমার উচিত হয়নি রঞ্জনদা।

বোকা হাবা বললে কার মনে না লাগে বল ?

ও আমার কথা শুনে বেশ খানিকটা দমে গেল। কোন উত্তর আর ওর মুখে যোগাল না।

আমি বললাম, তুমিও যে আমারই মত বোকা তা আমি জানতাম না।

ও আমার কৌতুকটুকু ধরতে পেরে জলতরঙ্গের মত হেসে উঠল।

ওর হাসির শব্দে সম্ভবত রান্নাঘর থেকে এসে দাঁড়াল শ্রাবস্তী। অনুযোগের সুরে পুষ্পিতাকে বলল, হ্যাঁরে, রঞ্জনের সঙ্গে সব কথা শেষ করে ফেললি, আমার জন্য অবশিষ্ট একটুও রাখলি না।

ওর কথা শুনে আবার হেসে উঠলাম আমরা।

শ্রাবস্তী বলল, শোন পুষ্পিতা, আমি এক কাণ্ড করে বসে আছি।

কি কাণ্ড আবার ?

অতিথির সামনে বলব ?

আমাকে আবার অতিথি ভেবে বসলে কবে থেকে শ্রাবস্তী ?

যেদিন থেকে তুমি নিজেকে সরিয়ে রাখলে আমাদের কাছ থেকে।

এ তোমার বৃথা অনুযোগ শ্রাবস্তী। আমি জানি কতটা নিখাদ আমার বন্ধুত্ব।

ও বলল, এখনও অনেক পথ বাকী, দেখা যাবে।

শ্রাবস্তী আবার চলে যাচ্ছিল, পুষ্পিতা বলল, আমাদের সাসপেন্সের ভেতর রেখে দিয়ে পালালি ! কি কাণ্ড করে বসে আছিস, বললি না তো ?

ও ফিরে বলল, যে কটি গোবিন্দভোগ চাল মা যত্ন করে তুলে রেখেছিল, আমি সেগুলোকেই ঘি ভাতের জন্য নিয়েছি।

পুষ্পিতা বলল, তাতে কি হয়েছে, ওটা তো একদিন আমরাই খেতাম, না

হয় আগেভাগে খেয়ে ফেললাম।

সঙ্গীত করলাম বল।

আমি বললাম, কি ভাগ্য আমার, ঝালমুড়ি খেয়ে তোমার বাড়ি থেকে ফিরব ভেবেছিলাম, কিন্তু ভাগ্যবিধাতা যে অন্য কথা লিখে রেখেছিলেন কে জানত।

আরও অনেক কিছুই ভাগ্যবিধাতা তোমার কপালে লিখে রেখেছেন যা তুমি এখন পড়তে পারছ না।

পুষ্পিতা খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়ে শ্রাবস্তীকে ধরে বলল, আমাকে একটু রান্নাঘরে ঢুকতে দে দিদি, তুই ততক্ষণ রঞ্জনদাকে বাকী ফটোগুলো দেখা। তোর ফটোর চ্যাপ্টারটা আমি দেখিয়ে ক্লোজ করে দিয়েছি।

শ্রাবস্তী পুষ্পিতাকে ঠেলে দিয়ে বলল, তোকে কে বাহাদুরি করে দেখাতে বলল আমার ফটোগুলো ?

বিশ্বাস কর দিদি, তোর ঘরোয়া ছবি একটাও দেখাইনি।

বললাম, সে সবই তো দেখতে হবে।

শ্রাবস্তী বলল, হবু শ্বশুরমশায়ের বাড়ি থেকে যখন ফটো আসবে তখন দেখ।

'দিদি যাচ্ছি' বলে পুষ্পিতা দৃশ্যের আড়ালে সরে গেল।

শ্রাবস্তী আর আমি বাকী ছবিগুলো কতক্ষণ ধরে দেখলাম।

ছবি দেখা শেষ হলে ও সেগুলোকে প্যাকেটে বন্দী করে ড্রয়ারে রেখে এল।

আমি শ্রাবস্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এক লহমায় কে যেন ওর মুখ চোখের ওপর থেকে আগের কৌতুক চপলতার মুডটাকে মুছে নিয়েছে। এখন ওর দৃষ্টি নিস্তরঙ্গ দীঘির নিটোল বুকের মত।

শ্রাবস্তী একটু দূরে শান্তিনিকেতনী একটা মোড়ার ওপর বসে বলল, রক্তকরবী নাটকের শেষে তোমাকে যে আমি একটা উপহার দিলাম, তার স্বীকৃতিটুকু অন্তত একছত্রে লিখে জানাতে পারতে।

আমাকে তুমি এতবড় একটা উপহার দেবার যোগ্য ব্যক্তি বলে ভাববে, এ আমি ভুলেও ভাবতে পারিনি। ওটা তোমার খেয়ালখুশীর দান বলেই ভেবেছিলাম।

ও গলায় ক্ষোভ আর অভিমানের সুর মিশিয়ে বলল, নন্দিনী যে প্রতীক মাথায় পরেছে তাকে সে যেমন তেমন মানুষের হাতে তুলে দেবে, একথা তুমি ভাবলে কি করে।

নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি চিরদিনই সন্দিহান শ্রাবস্তী। তবে তোমার ঐ ফুল আমার অনেকগুলো ভাবনার মুহূর্তকে গভীর তৃপ্তিতে ভরে তুলেছিল।

শুনে বন্ধু হিসেবে খুব খুশী হলাম। তবে তোমার এটুকু ধারণা থাকা উচিত ছিল, রঞ্জন ছাড়া নন্দিনী তার ফুল আর কাউকে দিতে পারে না।

আমি শ্রাবস্তীর কথা শুনে নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

শ্রাবস্তী ঐ কথাটুকু বলেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

কতক্ষণ পরে এলো পুষ্পিতা। অনুচ্চে বলল, কি কথা হল তোমার দিদির সঙ্গে?

কেন বল তো?

সেই যে এঘর থেকে বেরিয়ে দিদি ছাদে উঠে গেছে আর নামেনি।

বললাম, তাই বুঝি, কিন্তু কেন?

পুষ্পিতা বলল, তোমাদের আলোচনায় আমি হাজির ছিলাম না সুতরাং কিছুই বলতে পারব না। তুমি একবার ছাদে যাও রঞ্জনদা।

নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় আবিষ্কার করলাম নন্দিনীকে। পুষ্পিতার সেই নীলকণ্ঠ পাখি, যে জয়ের খবর এনেছিল, আলোর আগমনী গান গেয়েছিল।

আমি নিঃশব্দে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোন কথা উচ্চারণ করলাম না।

ওর মগ্নতা ভাঙল একসময়। আমাকে ছাদে দেখে সম্ভবত বিস্মিত আর কিছুটা লজ্জিতও হল!

তুমি ছাদে এলে কি করে! পুষ্পিতা কি দিয়ে গেছে?

ঘরে ঢোকার অধিকার যখন পেয়েছি, ছাদে ওঠার অধিকারও তখন অর্জন করেছি। তোমাকে বেশ কিছুক্ষণ দেখিনি, তাই ভাবলাম, একবার খুঁজে দেখি। পুষ্পিতা বলল, তুমি ছাদে। তাই উঠে এসেছি।

শ্রাবস্তী বলল, তোমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে, চল নিচে নামি।

সে রাতে খাবার পর দুই বোনে আমাকে রাত্রিযাপনের অনুরোধ জানিয়েছিল, কিন্তু পরিচারিকা থাকায় আমি তাদের সে আহবানে সাড়া দিইনি। বাবা-মা ফিরে এলে কোন প্রসঙ্গে কথাটা যদি তাঁদের কানে যায় তাহলে আমাদের এই সুন্দর সন্ধ্যাটা সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠবে। তাঁরা দুটি কন্যাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন ঠিক কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার দেন নি। আমি সবদিক বিবেচনা করেই সে-রাতে চলে এলাম।

রাতের কলেজে তখন কি যেন একটা পরীক্ষা চলছিল। ইনভিজিলেশান ডিউটি ছিল চোদ্দ নম্বর ঘরে। বড় হলঘর দুজনে ডিউটি দিচ্ছিলাম। একজন বয়স্ক অধ্যাপক ছিলেন, তাঁকে চেয়ারে বসতে বলে আমি সারা ঘর ঘুরে ঘুরে ডিউটি দিচ্ছিলাম। একঘণ্টা পার হয়ে গেল, হঠাৎ ছেলেদের কাগজ নেবার ধুম পড়ে গেল। আমি কাগজ দিচ্ছিলাম, প্রবীণ অধ্যাপকটিকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে দিইনি। এমন সময় একটি বেয়ারা এসে খবর দিল, এক ভদ্রমহিলা আপনার খোঁজে এসেছেন।

কোথায় তিনি?

সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। বসতে বলেছিলাম, বসেননি।

আমি বেয়ারাটিকে কিছু সময় দাঁড়াতে বলে সিঁড়ির দিকে চলে গেলাম।

শ্রাবস্তী দাঁড়িয়েছিল। প্রায় চার মাস আগে ওর বাড়িতে সেই মধুর

সন্ধ্যাটি কাটিয়ে আসার পর ওর সঙ্গে আবার দেখা হল। ভাবলেশহীন মুখে ও বলল, জরুরী দরকার, আমার সঙ্গে একবার আসবে।

একটু দাঁড়াও আমি এখুনি আসছি। ফিরে এসে বললাম, চল।

ও আর আমি কলেজের গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে উত্তরমুখো হাঁটতে লাগলাম। ও কোন কথা বলছিল না। আমরা নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুপারে' কবিতার সেই রহস্যময়ী রমণীর মত ও আমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছিল। যদিও আমার রাত্রি ছিল আলোকোজ্জ্বল। আর রমণী কিংবা আমার সঙ্গে কোন অশ্ব ছিল না। আমরা বেশ খানিক পথ পেরিয়ে আধো আলো অন্ধকারে ভিক্টোরিয়ার কাছাকাছি একটি গাছের তলায় বসলাম। চরাচরে ছড়িয়ে পড়েছিল অস্পষ্ট মায়াময় জ্যোৎস্না। আমি তখনও কোন কথা জিজ্ঞেস করবার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। ওকে কেমন যেন চিন্তিত বলে মনে হল। একসময় আমার দিকে মুখ তুলে বলল, খুব অসুবিধেয় ফেললাম, তাই না ?

বললাম, ঠিক আছে।

বেরিয়ে আসার মুখে ইংরাজীর অধ্যাপক বন্ধুবর শিশিরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তাকে সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিয়ে আমার ঘরটি সামলাতে বলে এসেছিলাম। শিশির আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, তুমি যাও আমি দেখব।

শ্রাবন্তী বলল, রাত নেমেছে। এই সময় এমন একটা নির্জন জায়গায় কেন যে তোমাকে টেনে আনলাম তা আমি নিজেও জানি না।

বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল শ্রাবন্তী, হঠাৎ একসময় বলে উঠল, দেশের বাড়ি চলে যাচ্ছি রঞ্জন, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করল।

আমি এর কি উত্তর দেব। তবু বললাম নিশ্চয়ই দেশ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে, তখন আবার দেখা হবে।

জানি না। আশ্চর্য ভাগ্য আমার রঞ্জন, কি চাই তা স্পষ্ট করে নিজেও জানি না, আবার কার কাছে চাইলে যে মনের জিনিসটি ঠিক পেয়ে যাব তাও বুঝতে পারি না।

বললাম, কিছুটা অস্থিরতার ভেতরে কি তোমার দিন কাটছে শ্রাবন্তী। তোমার বাবা মা এখানে আছেন তো ? পুষ্পিতা ?

ও বলল, সবাই দেশে চলে গেছে। আমাদের কলকাতার বাড়ির গ্যারেজের ওপরের ঘর, সংলগ্ন রান্নাঘর বাথরুমটুকুই আমাদের ব্যবহারের জন্য রইল, বাকি সবটাই ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে।

তাই বুঝি ? কিন্তু কেন ?

সে আমি বলতে পারব না। হয়তো প্রয়োজন ছিল ভাড়া দেবার, হয়তো প্রয়োজন ছিল না আমাদের দুবোনের এত বড় ঘর নিয়ে এখানে থাকার।

তুমি না হয় দেশে গেলে কিন্তু পুষ্পিতার পড়া এখনও তো শেষ হয় নি। ও মামার বাড়ি থেকে পড়বে, সেই ব্যবস্থাই হয়েছে।

বললাম, দেশে তোমার একা থাকতে খুব কষ্ট হবে, বিশেষ করে পুষ্পিতাকে ছেড়ে।

শ্রাবস্তী আর কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। ছোট তিনটি শব্দ উচ্চারণ করল, চল ফেরা যাক।

যেমন আসার পথে ও একটিও কথা বলেনি, যাবার সময়েও কোন কথা বলল না।

সময়ের প্রবাহে আরও বছরখানেক কোথা দিয়ে যে ভেসে চলে গেল তা জানতে পারলাম না। একদিন রবীনদার ঠিকানায় একটা চিঠি পেলাম। চিঠি খুলে দেখি পুষ্পিতার লেখা। একছত্র মাত্র। পরশু সন্ধ্যায় একবার আমার বাড়িতে কি তুমি আসতে পারবে রঞ্জনদা ?

আমি নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় কলেজে ছুটি নিয়ে পুষ্পিতার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। আস্তে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। প্রিণ্টেড গরদের একখানা শাড়ি পরে, খোঁপায় চাঁপা ফুল গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে পুষ্পিতা।

আমি জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে এতক্ষণ চেয়েছিলাম রঞ্জনদা।

ও দরজা বন্ধ করে দিল।

আজ যে আমি কত আশা করেছিলাম তুমি আসবে বলে সে আশা ঠাকুর আমার পূর্ণ করলেন। তুমি দাঁড়িয়ে থেক না, এস আমার সঙ্গে।

তিন চারটে সিঁড়ি ভেঙে ওর পেছন পেছন গ্যারেজের ওপরের ঘরে উঠলাম। ঘরের কোণায় একটা শ্বেতপাথরের টিপয়ের ওপর রাখা দক্ষিণ ভারতীয় দীপাধারে দীপ জ্বলছে। সারি সারি অনেকগুলি দীপ মন্দিরের চূড়ার মত ওপরে উঠে গেছে। তারই আলোয় উদ্ভাসিত ঘর।

আমি মুগ্ধ হয়ে ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে রইলাম। পালিশ করা কালচে লাল মেঝের ওপর বৃত্তাকারে বিরাট একটি আলপনা আঁকা হয়েছে। পাতায় লতায় ফুলে আলপনাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ওই মেঝেতে সাদা রঙটি ফুটেছে সুন্দর। বৃত্তের মাঝখানে চমৎকার দুটি ময়ূর ময়ূরী মুখোমুখি পেখম মেলে আছে। একটি দেয়াল ঘেঁষে সুন্দর সুসজ্জিত ডিভান। চাদরটির বর্ডারে ভারী সুন্দর সুতোর নক্সা। পুষ্পিতা হঠাৎ আমার দুটো হাত ধরে মিনতির সুরে বলল, আলপনার মাঝখানে আজ তোমাকে দাঁড়াতে হবে রঞ্জনদা।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, একি বলছ ? অসম্ভব ! এত সুন্দর একটা সৃষ্টিকে আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দেব ?

পুষ্পিতা বলল, কিছুই তো চিরদিনের হয়ে থাকে না রঞ্জনদা। আজ না হোক কালই ওকে মুছে তুলে দিতে হবে।

কিন্তু আমাকে দিয়ে এ কাজটুকু তুমি কেন করাতে চাইছ ? আজ রাতটুকু অক্ষত হয়ে থাকুক তোমার সৃষ্টির মহিমা।

পুষ্পিতা বলল, আমার মনের একটা ইচ্ছা মনের মধ্যেই রয়ে গেল রঞ্জনদা।

আমি তার বড় বড় চোখে জলের ছায়া দেখতে পেলাম। সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়

শুধু পুষ্পিতার ইচ্ছাটুকু সম্মান দেব বলে আমি আলপনার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। ময়ূর দুটিকে কিন্তু স্পর্শ করতে পারলাম না।

মেঘভাঙা কোমল একটুকরো আলোর মত ওর মুখে হাসির আভা ফুটে উঠল।

আমার কতদিনের সাধ তুমি পূর্ণ করলে আজ।

আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, এবার কি আমি ওই ডিভানে গিয়ে বসতে পারি?

ও বৃত্তের বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে দিলে। আমি ওর হাতের আঙুল-গুলো স্পর্শ করে আলপনার গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমি ডিভানে বসলে ও বলল, আজ আমার জন্মদিন রঞ্জনদা। ওই দেখ দীপাধারে উনিশটা দীপ জ্বলেছে।

আমি ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, জন্মদিনের কোন আভাসই তুমি চিঠিতে দাওনি পুষ্পিতা। একগুচ্ছ ফুলও কি আমি তোমার জন্যে কিনে আনতে পারতাম না?

হাঁটুগেড়ে বসে ধূপের কাঠিগুলো জ্বালাতে জ্বালাতে পুষ্পিতা বলল, এই যে তুমি এসেছ, এটাই আমার সবচেয়ে বড় উপহার রঞ্জনদা।

তবু প্রিয়জনকে কিছু দিতে তো মন চায়।

ও আবার ম্লান একটা হাসি হাসল, থাক, তুমি ক্ষণিকের অতিথি হয়ে এসেছ এই ভাগ্য।

ধূপ জ্বালানো শেষ হলে পুষ্পিতা আমার দিকে চেয়ে বলল, আমার আজকের জন্মদিনের সঙ্গে গভীর আনন্দ আর দারুণ এক ব্যথা মিশে আছে।

ব্যথা কিসের পুষ্পিতা?

আনন্দটার কথাই আগে বলি, তুমি এসেছ। এর চেয়ে বড় আনন্দ সংবাদ এই মুহূর্তে আর কিছু নেই। ব্যথার কথাটা সত্যিই কি তুমি জানতে চাও? নাই বা হল আজ ব্যথার প্রসঙ্গ তোলা।

যখন কথাটা উঠেছে তখন তাকে ঢেকে রেখে লাভ নেই পুষ্পিতা।

ও চুপ করে মাথাটা নীচু করে বসে বলল, এই প্রথম আমার জন্মদিনে দিদিকে পেলাম না। আর কোনদিনও হয়তো তাকে পাব না।

আমি আতঙ্কিত বিস্ময়ে বললাম, এ কথা কেন বলছ পুষ্পিতা!

জানেন রঞ্জনদা, দিদির বিয়ে হয়ে গেছে।

সে তো সুখবর। কেবল দুঃখ এই যে আমি জানতে পারলাম না।

না জানাই আপনার ভাল।

এ কথা কেন বলছ?

দিদি অদ্ভুত এক বিয়ে করে বসে আছে।

সে কি!

হ্যাঁ রঞ্জনদা, একটি আদিবাসী চাষার ছেলেকে সে বিয়ে করে বসে আছে। এরপর আর কিছু আমার কাছে জানতে চেও না।

আমি সত্যিই আহত হলাম। এমন রুচিশীল একটি মেয়ে কি করে এ কাজ করল তা ভেবে কূল পেলাম না। পুষ্পিতাকে বললাম, তোমাকে দিদির সম্বন্ধে আর কোন কথাই জিজ্ঞেস করব না, শুধু তার ঠিকানাটা আমাকে দিতে পার ?

ও বলল, ঠিকানা আমার জানা আছে। একটু অপেক্ষা কর আমি লিখে দিচ্ছি।

বললাম, আজ সুখে দুঃখে মেশানো তোমার জন্মদিনে আমি আমার লেখার কলমটা তোমাকে উপহার দিতে চাই, তুমি না বল না লক্ষ্মীটি।

আমি আমার বড় শখের পার্কার পেনটি ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, এই কলমটা দিয়েই তোমার দিদির ঠিকানাটা লিখে দাও।

ও কলমটা মাথায় ছুঁইয়ে একটুকরো কাগজে শ্রাবস্তীর ঠিকানা লিখে দিল।

ফেরার সময় ও আমার সঙ্গে এল বড় রাস্তা অব্দি। ওর বাড়ির সংলগ্ন পথটার ফুটপাথে দু'তিনটে বকুলগাছ ছিল। ঐ গাছের তলা দিয়ে আসার সময় পুষ্পিতা আমাকে একমুঠো বকুল কুড়িয়ে উপহার দিল। ও যখন ফুল কুড়োচ্ছিল তখন স্বগতোক্তির মত বলছিল, তোমাকে কোনদিনও ভুলতে পারব না রঞ্জনদা।

আমি সেদিন কাপুরুষের মত পুষ্পিতার কাছে বিদায় নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কেন ? সে কেনর সঠিক উত্তর আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করেও পাইনি।

কিছুকাল পরে একদিন ডাকে পুষ্পিতার বিয়ের চিঠি এল। মুহূর্তে মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আমার মনের মধ্যে এরা দুই বোন যে ভালবাসার রাজত্ব গড়ে তুলেছিল, আজ যেন তা আমার দখলের বাইরে চলে গেল।

আমার মনের এই নিঃসঙ্গতার দিনে, একদিন আমি রবীনদাকে নিয়ে শ্রাবস্তীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

শ্রাবস্তীর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আমার নির্জন মুহূর্তগুলো নানা ভাবনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। কখন মনে হত, আমার নীরবতাকে প্রত্যাখ্যান ভেবে সে এভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে।

সেদিন আকাশে ঝকঝকে রোদ্দুর।

দুদিকে প্রসারিত বালির চর। মাঝখান দিয়ে শীর্ণ সুবর্ণরেখা বয়ে চলেছে। আমরা চরের ওপর দিয়ে হাঁটছিলাম। দূরে কাছে জনবসতির প্রায় কোন চিহ্ন নেই। দু'চারটে গাছগাছালি আর ফাঁকা মাঠ। আমরা যেতে যেতে বালিতে তিনভাগ ডুবে যাওয়া একটা ইঁটের তৈরি বাড়ি দেখলাম। একজন পারাথীর্কে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওটা একটা নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ। আরও খানিকটা এগিয়ে গাছের জটলার ভেতর কয়েকটি কুঁড়েঘর আবিষ্কার করলাম।

সেখানে জিজ্ঞেস করতে লোকেরা বলল, ওরা এখন ক্রোশখানেক দূরে নদীর ওপারটায় রয়েছে।

তখন বেলা প্রায় এগারোটা, একটা উঁচু জায়গায় শালগাছে ঘেরা কুঁড়ের আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম।

শ্রাবন্তী, শ্রাবন্তী বলে বারদুয়েক ডাক দিতেই বাঁশের দরজাটা ঠেলে বেরুবার শব্দ শুনতে পেলাম।

কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই শ্রাবন্তী আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। অভিভূতই সে শুধু হয়নি, আমরা যে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি এটুকু বিশ্বাস করতেও তার কষ্ট হচ্ছিল।

রবীনদা অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ, শ্রাবস্তীর বেশবাস দেখে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। তিনি অশ্রুভরা গলায় শুধু বললেন, শ্রাবস্তী!

শ্রাবস্তী রবীনদার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। রবীনদা তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। আমি দেখলাম শ্রাবস্তীর চোখও জলে ভরা।

রবীনদা নিজেই কাঁদছিলেন তবু শ্রাবস্তীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, দুঃখ করো না বোন, সব ঠিক হয়ে যাবে। এরপর শ্রাবস্তী ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তালপাতার বড় বড় চাটাই পেতে দিল দাওয়ায়। আমরা সেখানে বসলাম।

চমৎকার নিকোন বাড়ি। শালগাছের ছায়া পড়েছে উঠোনে। শেষ অঘ্রাণের হিমেল হাওয়া বয়ে আসছিল সুবর্ণরেখার ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে শুকনো পাতার রাশ বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছিল।

হঠাৎ আমাদের একেবারে অবাক করে দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে এসে দাঁড়াল শ্রাবস্তী। কোলে তার সম্পূর্ণ নগ্ন একটি শিশু। শিশুটিকে কোলে করে নিয়ে পরম পরিতৃপ্তিতে হাসছে তার মা।

এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে বলেই ছেলেটিকে আমার কোলে ফেলে দিল।

আশ্চর্য! একটুও কাঁদল না ছেলেটা, ফোকলা মুখে ভারী মিষ্টি হাসতে লাগল।

রবীনদা বলল, ও কাঁদবে না।

শ্রাবস্তী বলল, ক্ষিদে না পেলে ও একেবারেই কাঁদে না।

ছেলেটার কোমরে একটা কালো কার, তাতে একটা ফুটো পয়সা বাঁধা। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ছেলে। রঙটা শ্যামল, শ্রাবস্তীর ধারে কাছেও নয়। মুখখানা কার মতো ঠিক বুঝতে পারলাম না, তবে বড় সুন্দর।

আমি ওকে বুকের ওপর চেপে ধরে উঠোনে ঘুরতে লাগলাম। বললাম, ওর বাবা কোথায়?

ক্ষেতের কাজে বেরিয়েছে। কোন কোন জায়গায় এখনো ধান তোলা বাকি।

কখন ফিরবে?

দুপুর হয়ে যাবে রবীনদা। আমি ওকে জলখাবার দিয়ে এসেছি।

আমি বললাম, ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে নাকি।

ও বলল, একা কার কাছে রেখে যাব। পিঠে বেঁধে নিয়ে যাই।

রোজ টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার বয়ে নিয়ে যেতে হয়?

খুব হাসল শ্রাবস্তী। বলল, তুমি কি ভেবেছ আমরা তোমাদের মতো সভ্য জগতে বাস করি? আমি রোজ ছোট একটা হাঁড়িতে পান্তাভাত নিয়ে ওকে খাওয়াতে যাই। সঙ্গে অবশ্য একটা কাঁসি থাকে।

রবীনদা বলে উঠলেন, চমৎকার! এমন একটা জীবন তুমি বেছে নিয়েছ, যা ঈর্ষা করার মতো।

আমি প্রস্তাব দিলাম, শ্রাবস্তী চল না তোমার মানুষটিকে তার কাজের জায়গা থেকে ডেকে আনি।

শ্রাবস্তী বলল, সত্যি যাবে!

বললাম, নিশ্চয়। তবে রবীনদাকে আর টানব না। রবীনদা অনেকখানি হেঁটেছেন। এখন তোমার দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

শ্রাবস্তী বলল, কিন্তু খাওয়ার আয়োজন যে করতে হবে, আমি গেলে চলবে কি করে।

বললাম, অনেকখানি দূরে বুঝি?

না, ঐ বাঁকটা পেরুলেই যে তালগাছটা দেখছ তার তলায়।

তবে চল যাই, ফিরে এসে যাহোক কিছু চাপিয়ে দিও।

শ্রাবস্তী বলল, আমার সংসারে চোদ্দ ব্যঞ্জনের আয়োজন নেই কিন্তু। ডাল, ডিমের কারি আর ভাত খাবে।

রবীনদা বললেন, তোফা।

বাচ্চাটাকে শ্রাবস্তী সত্যি সুন্দর করে পিঠে বেঁধে নিলে।

বলল, রবীনদা, আপনি আমার সংসারের ভেতর বাইর দেখুন, আমরা এখুনি ফিরে আসছি।

সামান্য একটু এগিয়েই আমি বললাম, আমি যদি শিল্পী হতাম তাহলে তোমার আজকের মাতৃমূর্তি'টা এঁকে রাখতে পারতাম।

ও সেদিক দিয়ে গেল না। বলল, আমার দুর্দশার ছবিটা নিজের চোখে দেখবে বলে এসেছ?

আমি বললাম, তুমি আমার একটা কথার সঠিক জবাব দেবে।

ও তার দুটি চোখ মেলে দিয়ে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, সত্যি করে বল তো, তুমি সুখী হয়েছো!

আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে রঞ্জন।

এখানে শুধু আমার একটি প্রশ্ন, আজকে তোমার এ জীবনের জন্য আমার কি কোন দায়িত্ব থেকে গেছে।

দায়িত্ব না থাকলেও নিঃসন্দেহে একটা প্রেরণা কাজ করেছে।

আমি ওর কথার গভীর অর্থটুকু ছুঁতে না পেরে কৌতূহলী চোখ মেলে তাকালাম।

আমার মনের অবস্থা বুঝে ও বলতে লাগল, দুখন এই অঞ্চলেরই সাধারণ

বাড়ির একটি ছেলে। ওর বয়স যখন দশ বছর তখন ও তার মা বাপকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। কেউ তখন আমাদের বাড়িতে ওকে নিয়ে যায়। আমি ছোটবেলায় দেশে এলে ওর সঙ্গে খেলাধুলো করেছি। ও আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। ও ভারী সরল আর পরিশ্রমী। সারাদিন আমাদের বাড়ির কাজ করত, গরু বাছুর নিয়ে মাঠে যেত।

ওকে কেউ অবহেলা করলে আমি সইতে পারতাম না। এ নিয়ে মা বাবার সঙ্গে আমার কয়েকবার কথা কাটাকাটি হয়েছে। তুমি বিশ্বাস কর রঞ্জন আমি ওকে বিয়ে করব স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি।

একদিন আমি ঘরের জানালায় বসে মাঠের দিকে চেয়ে ছিলাম। একটা ঝড়ের হাওয়া পাতাপত্র ধুলোমাটি উড়িয়ে নিয়ে আসছিল। তখন সন্ধ্যে হয় হয়। হঠাৎ দেখলাম, লাঙ্গল কাঁধে গরু তাড়িয়ে নিয়ে দুখন ঘরে ফিরে আসছে। পশ্চিমের হালকা রাঙা রোদ তার মুখে পড়েছে। পেছনে মেঘ তার বৃষ্টি নিয়ে তাড়া করছে দুখনকে। ও বৃষ্টিতে ভিজে গেল, তখনো পশ্চিমের রোদের হলুদ প্রলেপ তার গায় মুখে। আমি সেই মুহূর্তে দুখনকে অন্য এক জগতের মানুষ বলে ভাবলাম।

আজকে বলতে দ্বিধা নেই রঞ্জন, তোমার সঙ্গে প্রথম দেখায় সেই মানুষটিকেই খুঁজে পেয়েছিলাম। তুমি তখন শহরে এলেও সেই নির্ভেজাল মাটির গন্ধ তোমার সমস্ত শরীরে লেগেছিল। সেই সারল্য ও সেই অকৃত্রিম আলো। তোমার শিক্ষা, সংস্কৃতি সেই আলোটুকুকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল। প্রথম দেখাতেই তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। পরে আমি বুঝেছিলাম তুমি সৃষ্টি-পাগল মানুষ, তোমাকে কোনরকমেই ধরে রাখা ঠিক হবে না। যে মুহূর্তে আমি সেই কথা বুঝতে পারলাম, আমি চলে এলাম আমার দুখনের কাছে।

নিবিষ্ট হয়ে ওর কথা শুনে যাচ্ছিলাম। ও থামলে আমি বললাম, তুমি অন্যজগতের এক মানবী। আমাদের মতো মানুষের ধরাছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে। চল তোমার মানুষটিকে দেখে আসি।

আমি দুখনকে দেখলাম, ধানের আঁটি মাথায় করে খামারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ও আমাদের দেখতে পাচ্ছিল না। ওর নজর ছিল সামনের মেঝে রাস্তার ওপর।

হাত ইশারায় আমাকে কথা বলতে বারণ করে শ্রাবস্তী চেঁচিয়ে বলল, খামারে ধানটা ফেলে দিয়ে তুমি আজকের মতো কাজে ছুটি করে চলে এস।

ধানের গোছা ওর মাথা মুখ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। শ্রাবস্তীর ডাকের ও জবাব দিল, এই এলাম।

ও সেই তালগাছের তলায় এসে আমাদের দুজনকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। সহজ সরল বলিষ্ঠ সুন্দর পুরুষ। কালো কারে বাঁধা একটা ভুমরো বুকে ঝোলানো। শ্রাবস্তী বলল, আমার বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছে। আনন্দে উপচে পড়ল, ছুটে এসে আমার পায় হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল,

আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, আমরা বন্ধু, তোমার সঙ্গে আমার প্রণামের সম্পর্ক নয়।

শ্রাবন্তী দুখনের মাথায় লেগে থাকা ক'টা ধান পরম যত্নে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিল। আমি ছাড়া সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইল হেমন্তের সোনালী শস্য আর মধ্যাহ্নের মিঠে রোদ্দুরে উদ্ভাসিত সুবর্ণরেখার বালুচর।

ট্রেনে বসে ভাবছিলাম, জীবন কত বিচিত্র। এক বহতা নদীর মতো আঁকাবাঁকা কত খাতেই না তার প্রবাহ।

এইসব ভাবতে ভাবতে এতটা পথ প্রান্তর যে কি করে পেরিয়ে এলাম তা বুঝতে পারিনি। রবীনদার ডাকে চমক ভাঙল। আবার সেই সভ্যতার পাদপীঠ কলকাতা।

ভূধরবাবুর লিভ ভেকেন্সীতে আমি কলেজে ঢুকেছিলাম। কঠিন অসুখে তখন তিনি শয্যাশায়ী। তাঁর ছুটি ফুরিয়ে আসছিল। তিনি কলেজে যোগ দিলে আমার স্বল্পমেয়াদী চাকরীতে যবনিকা পড়বে। চাকরী গেলে কি হবে এই দুর্ভাবনায় আমি সে সময় বেশ পীড়িত। আশুতোষ নাইটে পার টাইম, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথে (রিপন) পুরো সময়ের অধ্যাপনা। এটি গেলে ভাতে টান পড়বে।

ভূধরবাবুর পায়ের ক্ষত সারছে না, কেউ কেউ বলছেন, ও'র সুগার থাকায় সহজে সারা মুশকিল।

এ বিষয়টা নিয়ে আমার মনে দুটো প্রতিক্রিয়া কাজ করছিল। আমি এক একবার ভাবছিলাম, বৃদ্ধ অসুস্থ মানুষ, চাকরীর আর দু'একটা বছর বাকি, নাই বা এলেন কলেজে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকে শাসন করে বলতাম, স্বার্থপর, নিজের সুবিধের জন্যে অন্যের অকল্যাণ চিন্তা।

অমনি মনে মনে বলতাম, ঠাকুর উনি যেন সুস্থ হয়ে ওঠেন, আমার চাকরী চাই না।

ছুটি ফুরিয়ে যেতেই অনেক কষ্টে সিঁড়ি ভেঙে ভূধরবাবু দোতলায় প্রফেসারস্ রুমে এলেন। তাঁর পরিবর্তে আমি যে কাজ করছি সেটাও কেউ কেউ ও'কে জানিয়েছিলেন। উনি এক সময় আমার পাশে উঠে এসে পিঠে হাত রেখে বললেন, তুমি নতুন এসেছ? তোমার সুখ্যাতি শুনলাম, বড় ভাল লাগল।

এমন আন্তরিকভাবে কথাগুলো বললেন, যা আমার তরুণ হৃদয়কে ভীষণভাবে স্পর্শ করল। আমি সঙ্গে সঙ্গে নত হয়ে ও'র পায়ের ধুলো নিলাম।

উনি অনুচ্চে বললেন, আমি ফিরে এসেছি ঠিক, কিন্তু যতটুকু শুনেছি, এজন্যে তোমাকে চলে যেতে হবে না। তুমি দিনে কয়েক পিরিয়ড এবং সকালে কয়েক পিরিয়ড ক্লাস করতে পারবে। যা পাও তার চেয়ে সামান্য কিছু তোমার কমবে।

হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বললেন, বিয়ে থা করেছ নাকি?

সলজ্জ হাসি হেসে মাথা নেড়ে জানালাম, এখনও সে সৌভাগ্য হয়নি।

ভূধরবাবু বললেন, ব্যাচিলারের ওটুকু টাকা বাদ গেলে কোন ক্ষতি হবে না।

অনার্সের ছেলেমেয়েরা ভূধরবাবুর পড়ানোর বেশ প্রশংসা করত। উনি ছেলে-মেয়েদের বৈষ্ণবপদাবলীটি বড় যত্ন করে পড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ভূধরবাবু কিন্তু যোগ দিয়েই মাঝে মাঝে কামাই করতে শুরু করলেন। শেষে তাঁর আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

কলেজ থেকে শেষ বিদায়ের দিন তিনি সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর পক্ষে আর আসা হয়ত সম্ভব হবে না। তিনি আমার পাশে এসে বসলেন।

বললেন, তরুণ বন্ধু জীবন সবে শুরু হল তোমার, আমার দিন ফুরিয়ে এল। তবে এই সান্ত্বনা নিয়ে যাচ্ছি, আমার ছেলে মেয়েরা তোমার সান্নিধ্যে খুশীই থাকবে। আজ অঞ্জলি আর দীপক তোমার পড়ানোর প্রশংসা করে গেল।

তখন মেয়েদের অনার্স ক্লাসগুলো ছেলেদের ক্লাসের সঙ্গেই হত।

আমি বললাম, সবে এসেছি, যত্ন করে পড়াবার চেষ্টা করছি কিন্তু আমি জানি স্যার আমার দুর্বলতাগুলো কোথায়। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি সেগুলো কাটিয়ে ওঠার।

ব্যস তাহলেই হল। পদাবলী সাহিত্য যখন পড়াবে তখন নিজেই পাত্র-পাত্রী হয়ে যাবে। মগ্নতাই সাকসেস। অবশ্য প্রকাশভঙ্গীটিও মনোজ্ঞ হওয়া চাই। প্রতিদিন বাড়িতে অনুশীলন করবে তবেই ওটা আয়ত্তে এসে যাবে।

উনি চলে যাওয়ার সময় কেন জানি না সেদিন আমি ওঁর সঙ্গে নিচে নেমে এসেছিলাম। অঞ্জলি ওঁকে দোতলায় যখন প্রণাম করছিল তখন আমি তাঁর চোখভরা জল দেখেছিলাম।

ভূধরবাবু আর আসেননি।

ইতিহাসের অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ ভারী জমিয়ে গল্প করতে পারেন। উনি গল্প করে যাচ্ছিলেন আমি মুগ্ধ শ্রোতার মত শুনছিলাম।

তুমি যে কলেজে এসেছ রঞ্জন তার বিপুল একটা ঐতিহ্য আছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন এই রিপন কলেজেরই প্রিন্সিপাল। ত্রিবেদীমশায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে নাগরিক সম্বর্ধনা দেবার উদ্যোগ আয়োজন চলেছে কলকাতায়। এই কর্মযজ্ঞে বহু গুণী-জনের সমাবেশ হয়েছে।

সাহিত্য পরিষদই গ্রহণ করেছে এই সম্বর্ধনার দায়িত্ব। উৎসবের দিন জনসমাগমে ভেঙে পড়ছে টাউন হল। মঞ্চে দীপ্ত সূর্যের মত এসে বসেছেন রবীন্দ্রনাথ। সভাপতি সারদাচরণ মিত্র সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। উপনিষদ থেকে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখা কবি-প্রশস্তিমূলক সঙ্গীতটি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হল। নাটোরের মহারাজা এগিয়ে এলেন, হাতে তাঁর রৌপ্যাধারে একটি প্রশস্তি অর্ঘ্য। তিনি কবিকে সেটি উপহার দিলেন।

এরপর উঠে দাঁড়ালেন সভাপতি মহাশয়। কবির কণ্ঠে তিনি মাল্যদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন একটি স্বর্ণকমল। চতুর্দিক করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবার উঠে দাঁড়ালেন। তিনি স্মরণ করলেন তিরিশ বছর আগে তরুণ রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভায় অভিনয় করার কথা। সে সময় তিনি যে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন সেটি সেই সভায় পাঠ করলেন। প্রথম কয়েক ছত্র মনে আছে—

'উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেক না আর।
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হলো হের।

উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব "বাল্মীকি-প্রতিভা", দেখাইতে পুনর্বার।'

বললাম, তারপর।

বিমলাপ্রসাদ বললেন, এবার উঠে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম বন্ধু আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায়। তিনি সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক হিসেবে অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করলেন।

'কবির শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় করকমলেষু

বাঙালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ পাতে যখন নব শতদল বিকশিত হইল ইত্যাদি।'

বললাম, মনেও থাকে বটে আপনার।

বিমলাপ্রসাদ হেসে বললেন, মানপত্রটি কিভাবে দেওয়া হল জিজ্ঞেস করলে না তো?

উৎসাহে বললাম, বলুন বলুন।

উনি বললেন, প্রাচীন তুলট কাগজে লেখা পুঁথির মতো হাতির দাঁতের তৈরি পাতায় ছাপা হয়েছিল অভিনন্দন পত্রটি। সেটিকে বাঁধা হয়েছিল প্রাচীন পুঁথির মত করে। সেই পুঁথিকে আবার সুদৃশ্য ব্রকেডের কাপড়ে জড়িয়ে কবির হাতে অর্পণ করা হয়েছিল।

এরপর কবি সবিনয় তাঁর সুরেলা কণ্ঠে অতি সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর দান করেন।

আমি বললাম, অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে আরো কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে। কলেজের প্রফেসারস্ রুমে আমি তাঁর সুন্দর অয়েল পেণ্টিংটি দেখেছি। চোখ দুটি বেশ বড় বড়, ভাব-ব্যঞ্জক।

বিমলাপ্রসাদ অমনি বললেন, তুমি যখন রামেন্দ্রসুন্দরের চোখের কথা তুললে তখন সে সম্বন্ধে একটি কথা আমি বলব। তার আগে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের আর একটি কথা বলে নিই।

রামেন্দ্রসুন্দরের অত্যন্ত আদরের কন্যাটি মারা গেলে তিনি ভীষণ কাতর হয়ে পড়েন। প্রবল দুঃখে সান্ত্বনার জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র প্রার্থনা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ঠিকই জানতেন শোকে সন্তাপে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে পত্র লেখেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুকালের ঘটনাটি আরও স্মরণীয়। সুহৃদ রবীন্দ্রনাথ তখন রামেন্দ্রসুন্দরের চোখে এক আলোকময় পুরুষের মতো। তিনি সকাতরে তাঁর শেষ শয্যার পাশে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলে তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছাটুকু কবিকে জানান।

আমার দিকে তাকিয়ে বিমলাপ্রসাদ বললেন, অনুমান কর ত, তাঁর শেষ ইচ্ছাটি কি ছিল?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম, কোন কিছুই আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়।

বিমলাপ্রসাদ বললেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের পদধূলি চাইলেন। এ তাঁর শেষ ইচ্ছা।

রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন মন। বন্ধুর এই অনুরোধ রক্ষায় কিছুতেই সায় দিতে চাইল না। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ইচ্ছাটুকুই জয়ী হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দক্ষিণপদ রামেন্দ্রসুন্দরের মাথার কাছে রাখলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মাথাটি স্পর্শ করল তাঁর চরণ। একবিন্দু জল গড়িয়ে পড়ল সে চরণে। রবীন্দ্রনাথের চক্ষু দুটিও শুষ্ক ছিল না।

এই ঘটনার দু'একদিনের মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু হয়।

আমি বললাম, এবারে রামেন্দ্রসুন্দরের সেই চোখের কথা বলুন।

সেকথা ভোল নি দেখছি। ম্যাট্রিকুলেশনে যে বছর জানকী ভট্টাচার্য ফার্স্ট হন, তাঁর সঙ্গে ব্র্যাকেটে ফার্স্ট হয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। দুজনের বাড়ি দু অঞ্চলে কিন্তু কলকাতায় এসেছেন কলেজে পড়তে। জানকীবাবুর কৌতূহল, রামেন্দ্র-সুন্দরকে দেখবেন। খোঁজখবর করে তিনি জানলেন রামেন্দ্রসুন্দর সিটি কলেজের বোর্ডিংয়ে আছেন। ওমনি সেখানে চললেন জানকীনাথ। আলাপ হল, কিছুটা বন্ধুত্বও।

জানকীবাবু ফিরে এসে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বললেন, বড় সুন্দর দুটি চোখ ছেলেটির, ভাললাগার মতো। তবে ওকে আমি এবার ব্র্যাকেট থেকে সরিয়ে দেব।

তাই হয়েছিল, দুজনে বাঁধা পড়েছিলেন অচ্ছেদ্য বাঁধনে।

যখন রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল হলেন তখন বন্ধু জানকী-নাথকে ইংরাজীর প্রফেসার করে এই কলেজেই টেনে নিয়ে এলেন। দু'বন্ধুর অনেক মজার মজার গল্প শুনেছি।

বিমলাপ্রসাদ গঙ্গাকে আরও দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে আবার শুরু করলেন, রামেন্দ্রসুন্দর, জানকীনাথ আর একজন অঙ্কের অধ্যাপক (নামটা ঠিক মনে নেই), প্রিন্সিপালের ঘরে বসে গল্প করতেন। ভারী বন্ধুত্ব এই তিনজনের। একদিন অঙ্কের অধ্যাপক ও জানকীনাথ প্রিন্সিপালের ঘরে ঢুকে গল্প শুরু করলেন। দরজার দিক পেছন করে বসেছেন জানকীনাথ, বিপরীতে মুখোমুখি বসে গল্প করছেন অঙ্কের অধ্যাপক। গল্পের মাঝে মাঝেই জানকীবাবু রামেন্দ্রসুন্দর আসছেন না বলে অস্থিরতা প্রকাশ করছিলেন। হঠাৎ অঙ্কের অধ্যাপক জানকী-বাবুর কাছে উঠে এসে তাঁর কাঁধের উত্তরীয়টা জানকীবাবুর মাথায় ঘোমটার মতো চাপিয়ে দিয়ে বললেন, 'জানকী অবগুণ্ঠিত হও, রাম এলেন।'

সঙ্গে সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ঘরে এসে ঢুকলেন। বন্ধুদের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠল।

চা এল। বললাম, বিস্কুট আনলে না গঙ্গা। চারখানা ক্রিম ক্র্যাকার।

বিমলাপ্রসাদ বললেন, আরও শোনবার মতলব মনে হচ্ছে। তুমি কি এসব লিখবে নাকি হে?

বললাম, আজ আপনাদের কাছ থেকে এইসব মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করে নিজের স্মৃতির কোঠায় সঞ্চয় করে রাখছি।

গল্প বলতে আরম্ভ করলে বিমলাপ্রসাদ অক্লান্ত।

আমার আগ্রহ দেখে আবার শুরু করলেন, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথের

পুত্র তখন এই কলেজের ছাত্র। টেস্টের পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল সুরেন্দ্র-পুত্রটি কৃতকার্য হতে পারেনি।

অধ্যাপকদের কেউ কেউ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এসে বললেন, কি করেছেন! স্যারের ছেলে যে ফেল করে গেছে।

রামেন্দ্রসুন্দর নিরাসক্তভাবে বললেন, তাই নাকি?

ওকে আটকাবেন না স্যার।

দেখব।

ফাইনাল লিস্ট বেরুতে দেখা গেল, সুরেন্দ্রনাথের ছেলের নাম নেই।

অমনি হিতাকাঙ্ক্ষী প্রফেসাররা প্রিন্সিপালের কাছে ছুটে এসে বললেন, স্যার ভীষণ গোলমাল হবে। সুরেন্দ্রনাথ দু-চার দিনের ভেতরেই কলকাতায় ফিরছেন।

উনি বললেন, দেখা যাবে।

একজন শুভানুধ্যায়ী বেরিয়ে যেতে সবাই রামেন্দ্রসুন্দরকে বললেন, এর পরিণতিতে আপনার চাকরীও যেতে পারে।

রামেন্দ্রসুন্দর একটি রেজিগনেশান লেটার লিখে নিজের পকেটে রেখে দিলেন। কোন কোন বন্ধু রামেন্দ্রসুন্দরের অভিপ্রায়টি জানতে পারলেন, কর্তা কৈফিয়ৎ চাইলেই তিনি রেজিগশান লেটারটি ধরিয়ে দেবেন।

সুরেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরলেন। তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী দু-একজন প্রফেসার গিয়ে তাঁকে পুত্রের সংবাদটি দিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন রামেন্দ্র-সুন্দর পকেটে রেজিগনেশান লেটার নিয়ে ঘুরছেন।

খবরটা পাবার পরের দিনই সুরেন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে ডেকে পাঠালেন।

কলেজের কাজ শেষ করে রামেন্দ্রসুন্দর চললেন সুরেন্দ্রনাথের বাড়ি।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বৈঠকখানায় বসে জরুরী চিঠিপত্রের উত্তর লিখছিলেন। আড়চোখে তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখে নিলেন। কিছু বললেন না। রামেন্দ্রসুন্দর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একসময় চিঠি থেকে চোখ তুলে সুরেন্দ্রনাথ হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, রামেন্দ্রবাবু রেজিগনেশান লেটারটা আমার হাতে দিন।

চমকে উঠলেন রামেন্দ্রসুন্দর। কর্তা কথাটা জানলেন কি করে। যে যাই হোক, রামেন্দ্রসুন্দর রেজিগনেশান লেটারটি বের করে সুরেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়ে দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ওই লেটারখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে বললেন, কি ভেবেছেন রামেন্দ্রবাবু! আমি আমার ওই ছেলের জন্য আপনার মতো এক জুয়েলকে হারাব!

ভারী স্নেহপ্রবণ মানুষ গঙ্গারাম। যতদিন যাচ্ছে আমি ওর ব্যবহারে অভিভূত হয়ে পড়ছি। আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের মত তরুণ অধ্যাপকদের ও গভীর স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে। দুটোর পরেই আমাদের অফ্ পিরিয়ডে ও যাকে প্রফেসার্স রুমে দেখতে পায়, তার কাছেই এগিয়ে এসে বলে, বাবুসাহেব, মুখখানা

যে শুখিয়ে গেছে, কিছু খাবার এনে দি।

আমরা ওকে খাবার অর্ডার দি। হিসেবের বাইরেও কিছু বেশী পয়সা দেওয়া থাকে। উদ্দেশ্য, বাকী পয়সাটা গঙ্গারাম পাবে। কিন্তু খাবার এনেও খুচরো পয়সা ফেরৎ দেবেই। যদি বলি, গঙ্গারাম, ওগুলো তোমার, ও সেলাম জানিয়ে বলবে, না বাবুসাহেব, ও আপনি তুলে রেখে দিন। পরে দরকার হলে আমি চেয়ে নেব। কিন্তু কোনদিনই আমি কারও কাছ থেকে গঙ্গাকে টাকা চাইতে দেখিনি।

এই গঙ্গারাম আমাকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে আমি তাকে নিয়ে গল্প-ভারতীতে "পিতৃস্মৃতি" নামে একটি গল্প লিখি। সেই গল্পের জন্য দক্ষিণা পেয়েছিলাম চল্লিশ টাকা। সেই টাকার পুরোটাই আমি গঙ্গার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, গঙ্গা এ টাকাটা রেখে দাও। এটা তোমার।

গঙ্গা অবাক হয়ে বলল, বাবুসাহেব কিসের টাকা এ?

আমি তোমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম, সে বাবদ এ টাকাটা আমি পেয়েছি, সেজন্যে এ পুরো টাকাটা তোমার।

কথাগুলো বলেই আমি গঙ্গাকে সে লেখাটা দেখালাম।

গঙ্গারাম বাংলা বলতে পারলেও পড়তে জানত না। তবু গভীর আগ্রহে চোখের কাছে সে লেখাটা ধরে দেখতে লাগল। পরে দু একবার কাগজের পাতায় হাত বুলিয়ে সে আমাকে পত্রিকাটা ফেরৎ দিল।

আমি গঙ্গার মুখে চোখে গভীর এক পরিতৃপ্তির ছবি ফুটে উঠতে দেখলাম।

ও বলল, বাবুসাহেব আমি লাখোঁ রুপেয়া পেয়ে গেছি। তুমি আমাকে ওই চল্লিশ রুপেয়া দিয়ে কি করবে, আমি ও রুপেয়া নেব না। তুমি কিতাবে আমার কথা লিখেছ। এর চেয়ে বেশী আমার আর কি পাবার আছে?

সেদিন ওই মর্যাদাসম্পন্ন মানুষটিকে আমি আর দ্বিতীয়বার টাকা নেবার জন্য অনুরোধ করতে পারিনি।

আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক তারকবাবুকে এই নির্লোভ মানুষটির কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন, তাহলে গঙ্গার একটা কাহিনী বলি শোন।

রবি ঘোষ তখন ইংরিজীর ডাকসাইটে অধ্যাপক এবং আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল। গঙ্গার বাবা তখন তাঁর খাস বেয়ারা। সতেরো বছরের গঙ্গারামকে তার বাপ দেশ থেকে নিয়ে এল একটা চাকরীর সন্ধানে। সাহস করে ছেলের কথা প্রিন্সিপালকে বলতে পারেনি সামান্য বেয়ারাটি। কেবলমাত্র হেডক্লার্ক এ কথাটি জানতেন। প্রিন্সিপাল এইটুকু মাত্র জানতেন যে গঙ্গারাম তাঁর বেয়ারার ছেলে, দেশ থেকে এসেছে বাপের কাছে।

গঙ্গারামের বাবা ছেলেকে কলকাতার পথঘাট চিনিয়ে দিচ্ছিল। উৎসাহী গঙ্গারাম সহজেই চিনে নিচ্ছিল শেয়ালদা আর কলেজ স্ট্রীট সংলগ্ন জায়গাগুলি।

একদিন গঙ্গারাম দাঁড়িয়েছিল হ্যারিসন রোড আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে। লোকজন, যানবাহনের যাতায়াত দেখছিল সে। এমন সময় একটা ছেলে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, সিটি কলেজটা কোনদিকে বলতে পার ভাই?

গঙ্গারাম সবে সিটি কলেজের রাস্তাটা চিনেছিল। সে একটু এগিয়ে গিয়ে

হাত বাড়িয়ে বলল, এই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাও, সিটি কলেজের বড় বড় থাম দেখতে পাবে।

ছেলেটি এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ গঙ্গারামের মনে একটা ভাবনা ঢুকল ও সিটি কলেজে যাচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই ভর্তিটর্তি হতে। কারণ গঙ্গারাম দেখেছিল, রিপন কলেজেও তখন ভর্তি চলেছে।

ও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে ছেলেটিকে ধরল।

তুমি সিটি কলেজে যাচ্ছ কেন ভাই?

ছেলেটি বলল, আমি ওখানে ভর্তি হব।

গঙ্গারাম যা ভেবেছিল তাই। সে অমনি তার হাত ধরে বলল, সিটি কলেজে কেন? আমাদের কলেজে চল।

ছেলেটি বলল, কোন কলেজ তোমার?

রিপন কলেজ, বহুত নামী কলেজ।

ছেলেটি অমনি বলল, না না এক ভদ্রলোক সিটি কলেজের প্রিন্সিপালকে চিঠি লিখে দিয়েছেন, আমাকে আদ্ধেক মাইনেতে ভর্তি করে নেবে।

গঙ্গার জেদ চেপে গেছে। সে বলল, আমার কলেজে গেলেও তুমি আদ্ধেক মাইনেতে পড়তে পারবে।

নাছোড় গঙ্গা ছেলেটিকে টানতে টানতে নিয়ে এল কলেজে। উত্তেজনায় সে তখন ভরপুর। কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সোজা সে ছেলেটিকে নিয়ে ঢুকে গেল প্রিন্সিপালের রুমে।

প্রিন্সিপাল গঙ্গারামকে আগে দেখেছিলেন, কিন্তু তার এই আচরণে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন।

গঙ্গা এক নিঃশ্বাসে বলতে লাগল, বাবুসাহেব এ ছেলে সিটি কলেজে ভর্তি হবার জন্য যাচ্ছিল। আমি ওকে এখানে ধরে এনেছি। ও বলছিল সেখানে নাকি আদ্ধেক মাইনেতে পড়তে পারে, আমি বলেছি আমার কলেজে চল, সেখানেও তুমি আদ্ধেক মাইনেতে পড়তে পাবে।

রবি ঘোষ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে অবাক। উনি সঙ্গে সঙ্গে হেডক্লার্ককে ডেকে পাঠালেন। বললেন, এই ছেলেটিকে হাফ্‌ফ্রি নয় একেবারে ফ্রিতে ভর্তি করে নিন। আর এই গঙ্গারামকে আজ থেকেই কাজে বহাল করুন।

তারকবাবুর কথা শুনে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। যে কলেজে রামেন্দ্র-সুন্দর, রবি ঘোষের মত প্রিন্সিপাল কাজ করে গেছেন, সেই কলেজে আমার কাজ করবার সুযোগ হয়েছে, একে আমি মনে মনে মহাগৌরবের বলে মনে করলাম।

বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, প্রমথনাথ বিশী—এইসব উজ্জ্বল নাম-গুলি তখনও বর্ষীয়ান প্রফেসারদের মুখ থেকে মিলিয়ে যায়নি। তাঁদের ক্রিয়া-কলাপ, আচার-আচরণের কথা ওঁরা প্রায়ই বলতেন।

ওঁদের মধ্যে জনৈক অধ্যাপক, যিনি ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন, তিনি অনেক বড় ক্লাসে পড়াবার সময় কিছুটা অসুবিধে অনুভব

করতেন। কণ্ঠস্বর যতটা উঁচুতে চড়ালে শেষ বেঞ্চ পর্যন্ত ছেলেরা ভাল ভাবে শুনতে পায়, সে শক্তি তাঁর কণ্ঠে ছিল না। তাই তাঁর ক্লাসের ছাত্ররা দিনে দিনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল।

একদিন কয়েকজন ছাত্র প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল।

প্রিন্সিপাল বললেন, এটা তোমাদের কয়েকজনের অভিমত না সমস্ত ক্লাসের ?

স্যার সমস্ত ক্লাসের।

প্রিন্সিপাল বললেন, ওঁর ক্লাস যেসব ছেলের পছন্দ নয় তাদের নাম একটা কাগজে সই করিয়ে নিয়ে এসো আমার কাছে।

ছেলেরা পরের দিনই সই করা কাগজ নিয়ে দল বেঁধে এল প্রিন্সিপালের ঘরে।

প্রিন্সিপাল কাগজটা দেখলেন। তিনি সুপারিনটেনডেণ্টকে ডেকে পাঠালেন। সুপারিনটেনডেণ্ট এলে, তাঁর হাতে কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এইসব ছেলে-দের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দিন।

ছেলেরা তো অবাক। তারা তখন প্রিন্সিপালের মনোভাবটি বুঝে ফেলেছে। সকলেই সমস্বরে তাদের অপরাধের কথা স্বীকার করল।

প্রিন্সিপাল বললেন, যতদিন এই অধ্যাপক আমাদের কলেজে আছেন ততদিন কলেজের গৌরব।

পরের দিন প্রিন্সিপাল কিন্তু নতুন ভাবে ক্লাসগুলো অ্যারেঞ্জ করে দিলেন। ওই অধ্যাপককে অনার্সের ক্লাস দিয়ে দিলেন বেশী করে।

আমি এসে এইসব প্রখ্যাত অধ্যাপক এবং সাহিত্যিকদের কাউকেই দেখিনি। তবে বিমলাপ্রসাদ মুখার্জী তখন অধ্যাপক হিসেবে যেমন নাম করেছেন, প্রাবন্ধিক হিসেবেও তেমনি। আমার সৌভাগ্য আমি হীরেন মুখার্জীকেও অধ্যাপনা করতে দেখেছি। তখন হীরেনবাবু লোকসভার সদস্য হয়েছেন, বক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভারী অবাক লাগত। প্রসন্ন মুখখানাতে সবসময় মৃদু একটা হাসি লেগে থাকত। কম কথা বলতেন। এই মানুষটি যে একজন প্রখ্যাত বাগ্মী সেটা আমি কেন জানি না ভাবতে পারতাম না।

আমাদের সংস্কৃতের এক অধ্যাপক ছিলেন জানকীবাবু। আমি দেখতাম, জানকীবাবুর সঙ্গে একান্তে হীরেনবাবু মাঝে মাঝে কি নিয়ে যেন আলোচনা করেন। একবার জানকীবাবুকে বলতে শুনেছিলাম একটি সংস্কৃত শ্লোক। যার অর্থ মোটামুটি এই যে গোবৎস দুগ্ধ পানে পরিতৃপ্ত হবার পর গৃহস্বামী অবশিষ্ট দুগ্ধটুকু দোহন করতে পারবেন। রাজার সাম্রাজ্য একটি ধেনু বিশেষ। প্রজাগণ গোবৎসতুল্য। রাজ্যের সম্পদ প্রথমে প্রজারাই ভোগ করার অধিকারী। তাদের প্রয়োজন পূর্ণ হলে অবশিষ্ট গ্রহণ করবেন রাজা।

কোন কোন দিন জানকীবাবুকে বলতে শুনতাম। আমি কাল বই ঘেঁটে

আপনাকে সংগ্রহ করে দেবার চেষ্টা করব।

আমার পরে মনে হয়েছিল হীরেনবাবু তাঁর বক্তব্যকে পরিপুষ্ট করার জন্যে এইসব অমূল্য উক্তিগুলি সংগ্রহ করতেন।

একদিন প্রিন্সিপাল পি. কে. গুহ এবং অন্যান্য প্রফেসাররা হীরেনবাবুকে তাঁর পার্লামেন্টের অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে অনুরোধ করেন। হীরেনবাবু সেদিন নানাধরনের আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছিল যখন তিনি পার্লামেন্টের প্রখ্যাত এক একজন ব্যক্তিকে ধরে ধরে আলোচনা করেন। আজাদ কিরকম শৌখিন ছিলেন, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ কিরকম রুচিসম্মত ছিল এসব কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন আজাদ বার বার তাঁর সুন্দর টুপিটিকে খুলতেন আবার সেটিকে ঠিকঠাক করে মাথায় চাপিয়ে দিতেন এটা অনেকটা তাঁর মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নেহেরুর বক্তৃতার মধ্যে আদর্শবাদী এবং কল্পনাপ্রবণ মানুষটির ছবি ফুটে উঠত। কিন্তু কোন কথা তাঁর মনোমত না হলে তিনি ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতেন। শ্যামাপ্রসাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন রাজনৈতিক মতবাদে আমাদের সঙ্গে তাঁর ফারাক অনেক, কিন্তু বক্তা হিসেবে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি যে বিষয় নিয়ে কথা শুরু করতেন সে বিষয় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটত তাঁর বক্তৃতায়। তিনি যখন ভাষণ দিতেন তখন বিভিন্ন পার্টির সদস্যরা তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। এ বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদের একটা সম্মোহনী শক্তি ছিল। হয়তো জওহরলাল বক্তৃতা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন এমন সময় শ্যামাপ্রসাদ বক্তৃতা দিতে উঠলেন। অমনি জওহরলালের অন্তরঙ্গ জন ছুটলেন পণ্ডিতজীর কানে খবরটা তুলে দিতে। শ্যামাপ্রসাদ বলতে উঠেছেন শুনলেই জওহরলাল পার্লামেণ্ট চলে আসতেন। দুজনের অনেক উপভোগ্য বাক্যুদ্ধ হতে শোনা গেছে।

ইংরাজীর অত্যন্ত জ্ঞানী অধ্যাপক ছিলেন সুধাংশুবাবু। ব্যবহারিক জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এতখানি উদাসীন ব্যক্তি আমি খুব কমই দেখেছি। এক-বার ওর বাসায় গিয়েছিলাম। ও'র পড়ার ঘরে ঢুকে দেখি, অজস্র বই আলমারির মাথায়, শেলফে, খাটে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে। কোনটা খোলা কোনটা বন্ধ। মানুষটি তার ভেতরে মগ্ন হয়ে আছে। ঘরের পারিপাট্যের দিকে বিন্দুমাত্র নজর নেই তাঁর। পোশাক পরিচ্ছদের দিকে কোনদিনই তাঁর নজর ছিল না। আমি কলেজে দেখেছি একদিকের কাপড় তাঁর হাঁটুর কাছাকাছি উঠে এসেছে, অন্যদিকের কাপড় পায়ের আঙুলের ওপর লোটাচ্ছে। শীতকালে গায়ে একখানা চাদর। একটু গরম বোধ হলেই যে কোন কাঁধের ওপর জড়োসড়ো করে রেখে দিতেন। একদিন দেখলাম সুধাংশুবাবু নিবিষ্ট হয়ে একখানা মোটা বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছেন। সম্ভবত সর্দিতে আক্রান্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে চাদরে ফ্যাঁচ করে নাকটা মুছে নিচ্ছিলেন। সেইটুকু কর্ম করতেও যেন তাঁর বিরক্তি এসে যাচ্ছিল। তাঁর অধ্যয়নে কোনরকমে বাধার সৃষ্টি হোক এটা তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন না।

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বিনীত ভাবে বললাম, কি করছেন আপনি ?

উনি যেন বহুদূরের জগত থেকে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। বেশ বুঝতে পারছিলাম আমি তাঁর গভীর মগ্নতাকে ভেঙে দিয়েছি।

উনি কিন্তু আমার ওপর কোনরকম বিরক্ত হলেন না। বললেন দুচারটে রামায়ণ সংগ্রহ করে পর্বে মিলিয়ে দেখছি। আধুনিক অনাধুনিক শব্দগুলো বিশ্লেষণ করে দেখছি প্রক্ষিপ্ত কোথায় কোথায় হয়েছে।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। ইংরাজী সাহিত্যের মানুষকে সংস্কৃত সাহিত্যের এতখানি গভীরে ডুবে থাকতে দেখিনি। ইংরাজীর বিনোদবাবু (বি. এম) ও'র অন্তরঙ্গ প্রফেসারদের নিজের বাড়িতে ডাকতেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, নিজের লেখা অধ্যাপক বন্ধুদের শোনান। আমি একবার ও'র কাছ থেকে ডাক পেয়েছিলাম। সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন বিনোদবাবুর বাড়িতে হাজির হয়ে ও'র লেখা প্রায় ঘণ্টাদুয়েক শুনেছিলাম।

নিজের লেখা অন্যকে শোনাতে মানুষের যতখানি আগ্রহ অন্যের লেখা বসে বসে শুনতে সম্ভবত তার ততখানি অনাগ্রহ। এটা আমি নিজের ক্ষেত্রে এবং অন্যদের কাছে খবর নিয়েও জেনেছি। কিন্তু সেদিন দুঘণ্টা ধরে একটানা বিনোদ-বাবুর লেখা শুনতে আমার মনের ওপর একটুও চাপ পড়েনি। তখনও আমি জানতাম না পড়ার শেষে আমাদের জন্যে একটি পুরস্কার আছে। বিনোদবাবু ছিলেন মা কালীর ভক্ত, সেদিন মায়ের প্রসাদী পাঁঠার মাংসে আমরা পরম পরিতৃপ্ত হয়েছিলাম। এই পাঁঠা খাবার পর থেকে বিনোদবাবুকে আমি ঘোরতর শাক্ত বলেই জানতাম কিন্তু একদিন বিনোদবাবু তাঁরই লেখা যীশুখৃষ্টের ওপর একখানি বিরাট গ্রন্থ আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

কাগজপত্রে লিখছ, পড়ে দেখো।

আমি বললাম, পড়ব বৈকি, আপনি যখন দিয়েছেন তখন খুঁটিয়ে পড়ব।

আমি বইখানি পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একজন অখৃষ্টানের পক্ষে এ বই লেখা কি সম্ভব! নানা ঘটনার বিশ্লেষণে এবং মনোজ্ঞ মন্তব্যে বইখানি এতই আকর্ষণীয় হয়েছিল যে আমি জায়গায় জায়গায় লাল পেন্সিলের দাগ না দিয়ে পারিনি। যদিও কোন বইতে দাগ দেওয়া আমার ঘোরতর স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। পরে বিনোদবাবুর সংগৃহীত উদ্ধৃতি আমি আমার রচনার বহু জায়গায় ব্যবহার করেছি। ও'র একটি স্মরণীয় রচনা তিন খণ্ডে প্রকাশিত স্মৃতিকথা। নিজব্যয়ে বইগুলি ছেপেছিলেন, তাক্ লাগিয়ে দেবার মতো ভাষা অথবা রচনা-কৌশল ছিল না। কিন্তু আকর্ষণীয় ছিল বইটির সত্যনিষ্ঠ উপাদান। সমাজ সংসারের এমন নিখুঁত ইতিহাসের ছবি বড় একটা আমাদের চোখে পড়ে না। একটা বিশেষ সময়ে বাজারদর কত ছিল তা যেমন রয়েছে তেমনি আবার কোন তরুণ অধ্যাপক সরু গোঁফ রাখতে শুরু করেছেন তারও বর্ণনা আছে; এবং এই তরুণ অধ্যাপকটি হয়ত প্রেমে পড়েছেন এমন একটি মন্তব্যও করা হয়েছে। যে মন্তব্যটি যথার্থ সত্যে পরিণত হয়েছিল।

ভারী মিষ্টি মেয়ে ছিল মধুশ্রী। ফরসা ছোটখাটো মেয়েটি। দেখলেই বার্মিজ

অথবা জাপানী মেয়ের মতো মনে হত। পরে ওর কাছে খবর নিয়ে জেনেছিলাম, ওর বাবা বার্মাতে চাকরী করতেন। ওরা যুদ্ধের সময় সেখান থেকে পালিয়ে আসে। আসার সময় বার্মার জঙ্গলের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের কথা বলতে গিয়ে ওর চোখ ছলছলিয়ে উঠত, মুখে কিন্তু আশ্চর্য একটি হাসি লেগে থাকত। ওই জঙ্গলেই ওরা বাবা মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কয়েক বছর অক্লান্ত সন্ধানের পর ওরা পরস্পরকে খুঁজে পায়।

মেয়েরা অনেকেই আমাকে খাতা দেখতে দিত। অন্যান্য সব প্রফেসারের মতো আমিও খাতা সংশোধন করে ওদের ফেরত দিতাম। মধুশ্রী বেশ গুছিয়ে ওর উত্তরগুলো লিখত। মাস্টারমশায়দের কারেকশানের জন্য ও খাতার বাঁ পাশে বেশ খানিকটা জায়গা রেখে দিত।

জায়গা রাখার ব্যাপারে অন্যান্য মেয়েরা কিন্তু মধুশ্রীর মতো ছিল না। সাধারণত মেয়েদের চরিত্রে স্বভাবজ একটা গৃহিণীপনা আছে। তারা পয়সা দিয়ে কেনা কাগজ সহজে নষ্ট করতে চাইত না। কিন্তু মধুশ্রীর সৌন্দর্যবোধ ছিল প্রবল। সে যতটুকু লিখত, ভেবে চিন্তে লিখত। কাটাকুটি তার লেখায় বড় একটা দেখা যেত না। তার পোশাক-পরিচ্ছদ দারুণ কিছু দামী ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত সুরুচিসম্মত ছিল। ওর বাবা মা তখন আসামে থাকতেন।

গরমের ছুটির আগে যে সব খাতা মেয়েরা আমার কাছে দিয়েছিল তার প্রায় সব কটাই সংশোধন করে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, কেবল দিতে পারিনি একটি আর সেটি ছিল মধুশ্রীর খাতা।

ছুটি শুরু হবার কদিন আগে থেকেই মধুশ্রীকে আমি দেখিনি। এরপর ছুটি পড়ে গেল। দীর্ঘ দুমাস গরমের ছুটি। একদিন ছুটি ফুরল, শুরু হল ক্লাস। ঘণ্টা বাজল মেয়েরা হই হই করতে করতে ঢুকল ক্লাসে। শুরু হয়ে গেল পঠন পাঠন। সব মেয়েকেই প্রায় আমি ক্লাসে দেখতে পেলাম কিন্তু মধুশ্রীকে দেখলাম না।

একটি ছাত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে কি হল না হল সেটা নিশ্চয়ই আমার বিচার্য বিষয় নয় কিন্তু মধুশ্রীর ব্যাপারে আমি নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারলাম না। হয়ত ওর খাতাখানাই আমাকে বার বার ওর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আমি অফিস থেকে ওর ঠিকানা নিয়ে ওকে একটা চিঠি লিখলাম। সে ঠিকানা আসামের। প্রায় কুড়িদিন পরে মধুশ্রীর উত্তর এল। আমার চিঠি পেয়ে সে যে কতখানি অভিভূত হয়েছে সারা চিঠি জুড়ে সেকথা সে জানাতে ভোলেনি। তাছাড়া লিখেছে আপনার কাছে আর পড়তে পারলাম না বলে আমি কম দুঃখ পাইনি। আপনার কাছে আমার যে খাতা আছে তা আনতে আমি আর কলেজে যাব না তবে আপনি যদি কোনদিন নিচের ঠিকানায় আমাদের বাসায় বিকেলের দিকে আসেন তাহলে আমরা ভীষণ খুশী হব। আমরা বলতে আমি, দিদি আর আমার এক ছোট ভাই এখানে থাকি।

এক পড়ন্ত বিকেলে মধুশ্রীর ঠিকানা খোঁজ করে ওদের ভাই বোনের ডেরায় হাজির হলাম। অবশ্য আগেই একখানা পোস্টকার্ড ফেলে দিয়েছিলাম।

ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করেই ছিল। আমি দরজায় কড়া নাড়তে না নাড়তেই দরজা খুলে গেল। সামনে মধুশ্রী পেছনে তার দিদি। দুজনেই সহজ আন্তরিক হাসিতে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। মধুশ্রী এগিয়ে এসে প্রণাম করল। আমি মধুশ্রীর দিদিকে চিনতে পেরেছিলাম ওদের মুখের মিল দেখে।

মধুশ্রীর দিদি দুটো হাত জোড় করে ছিল, আমি প্রতিনমস্কার জানালাম।

আপনার কার্ড আজ দুপুরের ডাকে পেয়েছি, বলল, মধুশ্রী।

বললাম, ভাই কই ?

ও স্কুলে গেছে। আপনার চিঠি আসার আগেই চলে গেছে। নইলে ও নির্ঘাৎ কামাই করত।

হেসে বললাম, ভাগ্যিস আমার চিঠি ওর চোখে পড়েনি।

ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল দুবোনে। খাটের ওপর বিছানা, তার ওপর চন্দন রঙের মণিপুরী চাদর পাতা, বর্ডার জুড়ে সাদা সুতোর নকশা।

আমি পা ঝুলিয়ে বিছানায় বসলাম। ওরা আমাকে পা তুলে বিছানায় আরাম করে বসতে বলল।

বললাম, তাহলে বাথরুম থেকে পাটা ধুয়ে আসতে হবে।

মধুশ্রী বাথরুম দেখিয়ে দিলে।

আমার মনে হয় একটি বাড়ির স্বাস্থ্য ও শ্রী অনেকখানি নির্ভর করে তার বাথরুমের ওপর। আমি ছোট স্নানের ঘরটির ভেতর ঢুকে বড় টবে ভর্তি জল আর মগ পেলাম। কুলুঙ্গীতে তেলের শিশি আর সাবান সাজিয়ে রাখা আছে। শেষ স্নান সেরে গেছে যে সে ঐ সব ব্যবহারের জিনিস অযত্নে ফেলে রেখে যায়নি। বেশ গুছিয়ে রেখে গেছে। দেয়ালের হ্যাঙারে গামছা, তোয়ালে ঝোলান। যেমন তেমন করে নয়, বেশ যত্নে পাট করে রাখা।

হাত পা ধুয়ে মুছে এসে জমিয়ে বসলাম। বিস্কুট আর চা নিয়ে এল মধুশ্রীর দিদি।

আলাপ করে জানা গেল, ইকনমিক্সে সদ্য এম, এ পাস করেছে। পি, এইচ, ডি-র জন্য থিসিস লেখার ইচ্ছে, তাই বইপত্র ঘাঁটছে।

বললাম, সুন্দর পরিকল্পনা।

ও বলল, আপনি তো ডক্টরেটটা করে নিতে পারেন ?

আমার পরিকল্পনা একটু আলাদা। লেখাজোখার বাতিক ছোটবেলা থেকে, তাই ওতেই প্রাণ সঁপে দিয়ে বসে আছি। চাকরীটা করছি অন্নসংস্থানের জন্য।

মধুশ্রী কিন্তু আপনার পড়ানোর প্রশংসা করছিল। কাজে হৃদয় ঢেলে না দিলে কিন্তু ছেলেমেয়েদের সাধুবাদ পাওয়া অসম্ভব।

বললাম, ভাল একটা গদ্য বা কবিতা কার না পড়াতে ভাল লাগে বলুন। আমাদের কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে এত গুণী অধ্যাপকেরা রয়েছেন, তাঁদের কাছে এখনও আমাকে নামহীন গোত্রহীন বলতে পারেন। তবে যে বৃত্তি গ্রহণ করেছি তাতে আমার নিষ্ঠার অভাব নেই, এটুকু নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

আমাদের অনেকক্ষণ আলাপের পর মধুশ্রী এল। বাঁ হাতে একখানা থালা উঁচু

করে ধরে আছে। ডান হাতের গ্লাসটা সামনের টেবিলে বসিয়ে রেখে থালাটি নিচে নামাবার আগেই বলল, অতি সামান্য আয়োজন, একেবারে না বলতে পারবেন না।

সহাস্যে বললাম, না দেখেই ?

ওতে দেখার মত কিছু নেই।

আবার বললাম, এত অল্প যে অণুবীক্ষণে দেখতে হবে।

ও কিছু না বলে এবার থালাটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, টেবিলে বসে অথবা যেখানে বসে গল্প করছেন, সেখানে রেখে খান।

থালার বস্তুগুলি পরিমাণে একেবারেই কম ছিল না। সবই ভাজা, মিষ্টি-গুলোও ভাজা।

মিষ্টির ভেতর মোটা মোটা দুটি চিত্রকুট। থালার মাঝখানে মুঠো দুয়েক সদ্য ভাজা কুচো নিমকি। তার পাশে আট দশখানা গোল কালচে বাদামী রঙের ভাজা বস্তু পড়ে আছে।

বললাম, এগুলি কি ? গোটা দুয়েক রেখে বাকী সব তুলে নাও। এতসব কি খাওয়া যায়।

মধুশ্রী বলল, আগেই তো বলেছি, না বলতে পারবেন না।

অগত্যা খাওয়া শুরু করলাম। প্রথমেই ঐ গোল কালো ভাজাটি মুখে পুরলাম। ওরে শ্বাস কি স্বাদ। মাছের তেলের বড়া, কিন্তু একটা কিছু সলিড বস্তু তার সঙ্গে মেখে দেওয়া হয়েছে।

বললাম, এ বস্তুটি ত্যাগ করলে সারারাত আফসোসে ঘুমুতে পারতাম না। অবশ্য ছলনা করে আর একবার খাবার লোভে তোমাদের ব্যাসায় ফিরে আসতে হত।

মধুশ্রী অমনি আমার পাত থেকে খান চারেক বড়া তুলে নিয়ে হাসতে লাগল।

ওর দিদি বলল, কি হল, তুলে নিলে যে ?

উনি আমাদের টানে না হোক বড়াগুলোর টানে আর একবার অন্তত আমাদের এখানে আসবেন।

বললাম, তুমি এতটা বুদ্ধিমতী, জানতাম না মধুশ্রী।

ও আমার পাতে বড়াগুলো রেখে দিয়ে বলল, আপনি আবার আসবেন তো ?

বললাম,তোমার দিদির মুখে গল্প শোনা আর তোমার হাতের তৈরী খাবারের লোভে আমাকে বারে বারে আসতে হবে।

ওর ভাই স্কুল থেকে এলে মধুশ্রীর দিদি বনশ্রী উঠে গেল। মধুশ্রী আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগল।

আমার ভাই ক্লাশ টেনে পড়ে। দিদি ওকে সব সাবজেক্ট পড়ায়, আমি শুধু বাংলাটা দেখিয়ে দি।

ফিক্ করে এক ঝলক হেসে উঠে মধুশ্রী বলল, তাই ও বাংলায় সব চেয়ে কম নম্বর পায়।

বললাম, এ তো আমারই পরাজয়। আমার ছাত্রীর ছাত্রটি যদি পরীক্ষায় খারাপ করে তাহলে দোষটা আলটিমেটলি গুরুর গুরুর ওপর এসে পড়বে।

আমি আপনার কাছে হেরে গেলাম। দিদি হলে এত সহজে হার মানত না।

তোমার দিদি ইকনমিক্সের ছাত্রী তার ওপর থিসিস লিখছেন। আমি ও'র সঙ্গে যুদ্ধে পারব কেন?

ও কথা বলবেন না স্যার। দিদি এখনও কলেজে চাকরী পায়নি?

তাতে কি হয়েছে। কলেজে পড়ান না এমন অনেকেই আমাদের মত অধ্যাপকদের গুরু হবার যোগ্যতা রাখেন।

আবার হারলাম।

আমি বললাম, তোমার কাছে হারতে পারলে খুশী হতাম, কারণ শিষ্যের কাছে গুরুর পরাজয় গৌরবের।

ও চুপ করে আছে দেখে বললাম, আমাকে এতক্ষণ ভাজাভুজি তৈরী করে খাওয়ালে, নিজেরা কিছুতেই তখন খেলে না, এখন ভায়ের সঙ্গে বসে দুবোনে খাও গিয়ে। আর যদি ভেবে থাক আমি চলে গেলে খাবে, তাহলে আমি এখুনি উঠছি।

মধুশ্রী হৈ হৈ করে উঠল, না না স্যার, আপনার এখুনি যাওয়া চলবে না, আমি এই খাবার প্লেট নিয়ে আসছি। দিদি ভায়ের কাছে বসেই খাবে।

আমি মধুশ্রীদের সংগ্রামের ছবি দেখে খুশী হলাম। জিয়োগ্রাফিতে অনার্স নিয়ে পড়বে বলে মধুশ্রী আমাদের কলেজ ছেড়েছিল। আমি ওর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালাম।

সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হয়ে নেমেছিল। আমি সেদিনের মত ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

কয়েকদিন পরে একখানা চিঠি পেলাম। মধুশ্রীর দিদি লিখেছে।

মাননীয়েষু

আপনি সেদিন আমাদের এখানে আসায় আমরা দারুণ খুশী হয়েছি। আবার একদিন আসুন না? সেদিন আপনার সঙ্গে আমার অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু একটি জরুরী বিষয় বলতে ভুলে গেছি। সেটি মধুশ্রীর বিয়ের ব্যাপার।

আপনি বলতে পারেন বড় বোন থাকতে মধুশ্রীর এত তাড়া কিসের। আমি শুধু আপনাকে একটি কথা জানাই, এক ভারতবন্দিতা, আত্মনিবেদিতা সাধিকার নামাঙ্কিত বিদ্যালয়ে আমি পড়েছি। আমার স্কুল জীবনেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সংসার রচনা না করে মানুষের সেবায় জীবনটা উৎসর্গ করব। সেই ব্রত এখনও শুরু করতে পারিনি তবে তার প্রস্তুতি চলেছে মনে মনে। বাবা মার বয়েস হয়েছে, আমার ওপর ভাইবোনের ভার। ওদের খানিকটা এগিয়ে দিতে পারলে আমি মুক্ত হই।

মধুশ্রী, আমার বোন বলে বলছি না, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী আর সুন্দর স্বভাবের মেয়ে। আপনাদের মত শিক্ষায় যুক্ত আছেন, এমন কোন পাত্র পেলে মধুশ্রী তার

পড়াটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আমরা জাত বিচারে বিশ্বাসী নই, শুধু একজন শিক্ষিত হৃদয়বান খাঁটি মানুষ চাই।

প্রীতি নমস্কার জানবেন।

বনশ্রী।

পুনশ্চ : প্রথম চিঠিতেই আপনার ওপর ঘটকালির ভার দিচ্ছি, মধুশ্রী জানতে পারলে আমাকে আস্ত রাখবে না।

আমি হলে একদিন আলাপের পর বোনের বিয়ের জন্য কারুর কাছে ঘটকালির প্রস্তাব দিতে পারতাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু মধুশ্রীর দিদির সঙ্গে আলাপ করে এবং তার ছোটখাটো আচরণ দেখে যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয়েছে মেয়েটির মধ্যে বুদ্ধির কোন কৌশল নেই। পরিচ্ছন্ন কথা বলতে সে ভালবাসে।

চিঠিখানা বার বার পড়ে আমার মনে হতে লাগল, বনশ্রী তার বোনের জন্য আমার কথা ভাবেনি তো?

অবশ্য নিশ্চিত করে এ বিষয় কিছু বলা যায় না। তবে জাতবিচারের কথা এ প্রসঙ্গে ওঠালো কেন? আমি ওদের জাতিভুক্ত নয় বলে কি এ কথাটা বনশ্রী স্পষ্ট করে জানিয়েছে?

চিঠির উত্তর দিলাম। সেদিন ওদের সান্নিধ্য যে আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে সেকথা সবিস্তারে জানালাম। শেষে লিখলাম, আপনার প্রস্তাবটি আমার মনে রইল।

শুধু এইটুকু কথা লিখেই ঐ প্রসঙ্গে ইতি টানলাম।

আসলে আমি মানুষটা হঠাৎ করে কোন ডিসিসান নিতে পারি না। ঝোঁকের মাথায় কোন মহৎ কাজ করে ফেলার দুঃসাহসও আমি দেখাতে পারি না। হয়তো আমি তখনও জীবনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারিনি বলে সংসারের কোন দায়িত্ব নেবার কথাও আমার মনে আসেনি।

সে যাহোক, মধুশ্রীকে নিয়ে যে সংসার রচনা করবে তার গৃহজীবন যে সুখের হবে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ।

এরপর অনেকদিন ওদের ওদিকে যাইনি।

সেবারে গরমের ছুটি কাটাতে গেছি দেশে। একদিন পড়ন্ত দুপুরে ঘর থেকে বেরিয়ে স্কুলের দিকে হাঁটছিলাম, হঠাৎ একটি ক্ষীণ কণ্ঠের ডাক শুনে পাশের জানালা দিয়ে ভেতর দিকে উঁকি দিলাম। বাইরের আলোয় ভেতরটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল। আমি মানুষটিকে একেবারেই চিনতে পারছিলাম না। কিছুটা আলোছায়ার জন্যও হতে পারে। আবার মানুষটির গলা শোনা গেল, ভেতরে আয়।

আমি ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলাম। আলো থেকে আবছায়ে দাঁড়িয়ে চোখটা যখন ধাতস্থ হল, তখনই আমি জানতে পারলাম, মহেশ্বর মাস্টারমশাই বিছানায় শুয়ে আছেন। উড়ুনীটা গায়ে চাপা দেওয়া সেই প্রবল পরাক্রান্ত মানুষটির বিশাল দেহের চিহ্নমাত্র নেই। কেবল ছোট একখানা জালার মত জেগে আছে উদরটা। বুঝলাম, জলোদরী রোগে মৃত্যুর দিন গুনছেন তিনি।

বিছানার একপাশে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। আমি বিছানায় না বসে খাটখানা ধরে মাটিতে হাঁটু ভেঙে বসে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

আমার মনে হল, আমি যেন সেই পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্র। মাটিতে বসা ছাড়া আমাদের উচ্চাসনে বসার হুকুম নেই।

অনেক কথা হল তাঁর সঙ্গে। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি কথা বলছিলেন।

এক সময় বললেন, তুই বাবা, আমার একটা ইচ্ছা পূরণ করবি ?

বলুন।

আমি জানি, এ সময় তোদের বাগানে খুব জামরুল হয়। সাদার ওপর গোলাপী ছোপ। দুটো খাওয়াবি বাবা ? ডাক্তারের বারণ। একটু চুপি চুপি আনতে হবে।

বললাম, আপনার যদি অসুখ বেড়ে ওঠে ?

ম্লান হাসি ফুটে উঠল মুখে, বুঝতে বাকি নেই, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। চলে যাব, দুঃখ নেই। সংসারে আমার কে আছে বল ! কেউ নেই একা। বানে ভেসে এসেছিলাম, আবার বানের একটা ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

মাস্টারমশাই উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে কথা বলতে বারণ করে বেরিয়ে এলাম। কিছুক্ষণের ভেতরেই চারটে জামরুল পকেটে পুরে নিয়ে আবার তাঁর বিছানার কাছে হাজির হলাম। পকেট থেকে সেগুলো বের করে ও'র বিছানার পাশে রাখতেই মুখে কি হাসি।

একটি হাতে তুলে খেতে খেতে বললেন, ভারী মিষ্টি, বড় রসাল। সেটি শেষ করে আর একটি হাতে নিয়ে বললেন, তোকে আর একটা অনুরোধ করব রাখবি ?

বলুন।

হয়ত, আর কোনদিন তোর মুখে সেই 'কাজলা দিদি' কবিতাটা শুনতে পাব না, আজ একবার শোনাবি ? বড় ভাল লেগেছিল রে।

আমি সেই মৃত্যুপথযাত্রীকে সেদিন শেষবারের মত 'কাজলা দিদি' আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলাম। যে কবিতা শোনাতে গিয়ে কোনদিন গলা কাঁপাইনি, চোখের জলে গাল ভাসাইনি, তাই শোনাতে গিয়ে আমার গলা আপনি কেঁপে গেল, চোখ উপচে নেমে এল জলের ধারা।

মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে এলাম। বুড়ো শিবমন্দিরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। সেই কবে ছেলেবেলায় শিবঠাকুরের পুজো দিয়ে আমরা বলেছিলাম, হে ঠাকুর, মহেশ্বর মাস্টারমশাই যেন আর ফিরে না আসেন।

আজ মাটিতে লুটিয়ে বুড়ো শিবকে প্রণাম করতে করতে বললাম, সেদিন অপরাধ করেছিলাম ঠাকুর, আজ তুমি আমাদের মাস্টারমশাইকে সুস্থ করে তোল। তাঁর কষ্ট দূর করে দাও।

আমার ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই মাস্টারমশায়ের দিন ফুরিয়ে গিয়েছিল। হয়ত আর একটা অদৃশ্য বন্যার ঢেউ এসেছিল, আর সেই ঢেউতে তিনি যেখান থেকে এসেছিলেন, সেখানেই ফিরে গিয়েছিলেন।

মেয়েদের কলেজে 'রাজা' নাটকের মহড়া চলেছে। ভাইস প্রিন্সিপাল মীরাদি এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। যদিও মীরাদি ভাইস প্রিন্সিপাল, কিন্তু আসলে তিনিই প্রিন্সিপালের কাজ করেন। অন্য কলেজ থেকে এসে এই নব প্রতিষ্ঠিত কলেজটিকে তিনিই গড়ে তুলেছেন।

মেয়েদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি ছিলেন অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ। নাটকের ইতিহাস রচনায় তিনিই ছিলেন অগ্রণী। বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারার সপুরুষ মানুষ। সদাহাস্যময়, কণ্ঠস্বরে সুন্দর একটা নাটকীয় সংবেদন আছে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় অধ্যাপক হিসেবে তখনই চিহ্নিত হয়েছেন।

'রাজা' নাটকের অভিনয় হচ্ছে। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী নন্দিতা সুরঙ্গমা আর সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী সঙ্গীতা সুদর্শনা। সঙ্গীতা এখানে রানীর সাজে সুসজ্জিতা। বেশ মানিয়েছে ওকে। কিছুদিন আগে মেয়েদের কলেজে বাইশে শ্রাবণের একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। গানে নাচে কবিগুরুর উদ্দেশ্যে মেয়েরা নিবেদন করেছিল তাদের প্রণতি। ওই অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিল সঙ্গীতা। ভরাট সুরেলা গলায় সে গেয়েছিল—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

ওর সেদিনের গানে একটি প্রতীক্ষার ভাব ছিল যা সরাসরি সংবেদনশীল যে কোন মনকে স্পর্শ করবে। অনেকের কণ্ঠ অত্যন্ত সুরেলা সহজেই মানুষের কানকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু যে কণ্ঠ প্রাণকে তন্ময় করে দিতে পারে; সে কণ্ঠে কেবল সুর থাকলে চলবে না সুরের অতিরিক্ত আর একটি বস্তু থাকা চাই। সেটি হল, ভাব। সঙ্গীতার সেদিনের গানে সুরের অতিরিক্ত ওই বস্তুটি ছিল।

সঙ্গীতা মেয়েটি সত্যিই সুদর্শনা। তার সৌন্দর্য কিন্তু চোখকে ঝলসে দেয় না। রূপের মধ্যে এমন একটি লাবণ্য থাকা চাই যা দৃষ্টিকে নন্দিত আর হৃদয়কে পূর্ণ করে দিতে পারে। সে রূপ একেবারেই সহজলভ্য নয়। সঙ্গীতা আশ্চর্যভাবে তেমনি এক দুর্লভ সহজ লাবণ্যময় সৌন্দর্যের অধিকারিণী।

নাটক শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুদর্শনা তার দাসী সুরঙ্গমাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল আর সে দিচ্ছিল তার উত্তর। বিস্ময় হতাশা ক্ষোভ মিশেছিল সুদর্শনার কথায়। সুরঙ্গমার উত্তরগুলি ছিল গভীর সে অত্যন্ত শান্ত অথচ স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে রানীর কথার জবাব দিচ্ছিল।

সুদর্শনা আকুল হয়ে সুরঙ্গমার কাছে জানতে চাইল, 'সত্যি করে বল আমার রাজাকে দেখতে কেমন। আমি একদিনও তাকে দেখলুম না। অন্ধকারেই আমার কাছে আসেন, অন্ধকারেই যান।'

আবার বলছে, 'মার কাছে শুনেছি, তাঁকে দৈবজ্ঞ বলেছিল, তাঁর মেয়ে যাঁকে স্বামীরূপে পাবে পৃথিবীতে তাঁর মতো পুরুষ নেই।'

আমার মনে হল সুদর্শনা যেমন সুন্দর লাবণ্যময় মেয়ে তার সাথীরও তেমনি পুরুষোত্তম হওয়া প্রয়োজন।

রাজা বলছেন, 'আমার কোন রূপ কি তোমার মনে আসে না।

সুদর্শনা ঃ এক রকম করে আসে বইকি। নইলে বাঁচব কী করে।

রাজা ঃ কিরকম দেখেছ।

সুদর্শনা ঃ সে তো একরকম নয়। নববর্ষার দিনে জল-ভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এইরকম—এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়া-মাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে-থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয়, তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দ-ফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেতচন্দনের ছাপ; তোমার মাথায় হালকা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু; তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তা হলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতর মহলে প্রবেশ করব।'

সুদর্শনা যখন নববর্ষার জলভরা মেঘের কথা বলছিল তখন ওর বড় বড় দুটি চোখ ভারী স্বপ্নময় হয়ে উঠেছিল। আবার ও যখন শরতের শুভ্রতার মধ্যে দিগন্তে সোনার দ্বার খুলে যাবার কথা বলছিল তখন ওর মুখখানিতে ছড়িয়ে পড়ছিল শরতের সোনার রবির আভা।

নাটক শেষ হলে মনে হল, এরা কত সহজ স্বচ্ছন্দ অভিনয় করে গেল। এ এক অন্য জাতের অভিনয়। এখানে ত্রুটি আছে কিন্তু স্বভাবধর্মের স্বচ্ছন্দ প্রকাশের অভাব নেই। পেশাদারী নাটকে অনেক সময় যা দুর্লভ হয়ে পড়ে।

পরের দিন অফ পিরিয়ডে একা বসে একটা কি কবিতার লাইন লিখছিলাম, আবার কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কতক্ষণ কি ভাবছিলাম। হঠাৎ পায়ে হাতের ছোঁয়া লাগতেই চমকে উঠলাম।

আরে, সুদর্শনা। কি খবর তোমার? নাটক ভাঙার পর অনেকেই দেখা করতে এসেছিল, তোমাকে তো দেখলাম না।

ও একটু লাজুক গলায় বলল, আপনার অভিমতটা একটু আলাদা করে শুনব বলে সবার মাঝখানে আপনার সঙ্গে দেখা করিনি।

হেসে বললাম, এখনি তোমাকে দেখে কি নামে ডাকলাম।

ও তেমনি মাথা নীচু করে মৃদু হেসে বলল, সুদর্শনা।

তবে? তুমি এত ভাল অভিনয় করেছ যে দর্শকেরা তোমার আসল নামটাই ভুলে গেছে। তুমি সুদর্শনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছ।

আপনি ভীষণ বাড়িয়ে বলছেন।

একটুও না। তাছাড়া সঙ্গীতা, তুমি যে মনে প্রাণে কবি তা তোমার গান শুনলে বোঝা যায়।

আপনি আমার গান কোথায় শুনলেন ?

কেন, বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠানে।

ও একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনি খুব গান ভালবাসেন ?

কে না গান ভালবাসে। ভাল গান হলে তো কথাই নেই। তুমি গান শেখো কোথায় ?

গীতবিতানের এক মাস্টারমশাই আমার বাড়িতে আসেন।

তাই এমন নিখুঁত করে গেয়েছ সেদিন।

ও খুব খুশী হয়েছে বলে মনে হল। যাবার আগে বলল, সুরঙ্গমা কিন্তু আমার চেয়েও ভাল করেছে।

বললাম, দুজনের অভিনয়ই আমার ভাল লেগেছে। এখানে তুলনা করা বৃথা।

ও যখন সুরঙ্গমার অভিনয়ের প্রশংসা করছিল তখন ওর চোখে মুখে প্রশংসার ভাবটি সত্য হয়ে ফুটে উঠতে দেখেছিলাম। ওর এই অকপটতা আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করল।

মাস খানেক পরে সেকেন্ড ইয়ারের মেয়েরা এসে আমাদের সবাইকে প্রণাম করে চলে যাচ্ছিল। ওদের টেস্টের রেজাল্ট বেরিয়ে গিয়েছিল, ওরা এখন ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ঘরে বসে তৈরী হবে।

সবাই চলে গেল কিন্তু সঙ্গীতাকে দেখলাম না। টেস্টে ওর খাতা আমি দেখেছি। প্রতিটি প্রশ্ন গুছিয়ে লেখা। বাংলা শব্দভান্ডারেও ওর দখল দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। সেই খবরটা দেবার জন্য আমি উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম, কিন্তু ও এল না।

ও ঠিকই জানত পরের দিন আমার একটা অফ্ পিরিয়ড আছে। সে সময় আমি একা একা বসেই কাজ করি।

ও পরের দিনই এল। একখানা খাতা আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, এতে কিছু লিখে দিন।

হঠাৎ যা মনে এল তাই লিখে দিলাম।

যে অশত্থ ছায়া দেয়
সে অশত্থ হোক তব প্রাণ,
জীবনের ক্লান্ত পথচারী
পায় যেন ছায়ার সন্ধান।

ও খাতাটা চোখের সামনে ধরে অনেকক্ষণ দেখল। তারপর খাতাটা বন্ধ করে ওর ব্যাগ খুলে একটি সুদৃশ্য কৌটো বের করল। কৌটো আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটি আইভরির কৌটো। আমার অত্যন্ত প্রিয়। আপনি একদিন ক্লাসে বলেছিলেন আপনার ছাদে বাগান আছে। আমার ঐ কৌটোর ভেতর সূর্যমুখী ফুলের বীজ আছে। ঠিকমতো যত্ন নিলে প্রতিবছর ওর থেকে ফুল পাবেন।

আমি একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, আমি বীজটা তোমার নিচ্ছি, এই

একটুকরো কাগজেই নিয়ে নেব। এত দামী কৌটো তুমি আমাকে দিও না, ওটা তোমার নিজের কাছে রেখে দাও।

ও কয়েকবার মাথা নাড়ল, পরে বলল, ওটা আপনার জন্যেই এনেছি। আপনি একদিন বলেছিলেন ভিক্ষে দিলেও তার ভেতর মমতা থাকা চাই। এক গ্লাস জল কাউকে খেতে দিলেও প্লেটের ওপর বসিয়ে পরিবেশন করা ভাল। তাই আজ আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটিতেই আমার প্রিয়ফুলের বীজ আপনাকে দিলাম।

আমি সঙ্গীতাকে না বলতে পারলাম না। ওর সৌন্দর্য-ভাবনা আমাকে মুগ্ধ করল।

বৈঠকখানা বাজারের ভেতর দিয়ে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে চলেছি, পেছন থেকে রবিবাবুর গলা শুনতে পেলাম, রঞ্জন কোথায় চলেছ, এ বাজার তো তোমার নয়।

ফিরে দাঁড়িয়ে একমুখ হেসে বললাম। না স্যার, এ বাজার আপনার। ভয় নেই, আমি কিছুই কিনব না। আপনার জন্যে সব সাজানো রইল।

রবিবাবুর হেসে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পাশে একটি ছেলে, হাতে ধরা ব্যাগ থেকে লাউডাঁটা উঁকি দিচ্ছে।

রবিবাবু আমাদের ফিলজফির প্রফেসার। দীর্ঘদেহী, ফর্সা, সুপুরুষ মানুষ। যে কোন একটি কথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন। এমনিতে ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ।

বললাম, স্যার এ ছেলেটি কে? আমার কথাতে ছেলেটির কিন্তু কোঁন ভাবান্তর হল না। সে যেমন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়েছিল তেমনি চেয়ে রইল।

রবিবাবুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল। তিনি বললেন, এটি আমার আত্মজ। আমার ললাট সংলগ্ন চিরস্থায়ী একটি পাথর।

একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমি রবিবাবুকে এতখানি বেদনার্ত আর ভারাক্রান্ত হতে কোনদিনই দেখিনি।

বললেন, রঞ্জন, যখন আমার যৌবনের দিন ছিল তখন শুধু পুরুষকারের জয়ধ্বনি দিয়ে বেড়িয়েছি। ভাগ্যকে পরোয়া করিনি। জীবনকে ভোগ করেছি, মৃত্যু-ভাবনাকে ঠেলে সরিয়ে রেখেছি বিস্মৃতির আড়ালে। আজ সেই ভাগ্য, সেই অদৃশ্যচারী মৃত্যু আমার চরম শাস্তি বিধান করেছে।

রবিবাবু এখন অন্তরের গভীর থেকে কথা বলতে শুরু করলেন।

গ্রীক নাটকে রাজা সিসিফাসের কথা আছে। আমার মত তিনিও শুধু জীবনকে জেনেছিলেন, মৃত্যুকে ঘৃণা করতেন। দেবতারা তাই তাঁকে শাস্তি দিলেন।

একটা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সিসিফাসকে একখণ্ড ভারী পাথর তুলে রেখে দিয়ে আসতে হবে পাহাড়ের চূড়ায়। সে যত বারই পাথরটিকে তুলে নিয়ে যায়, মাঝপথে সিসিফাসের হাত থেকে ফসকে সে পাথর নিচে গড়িয়ে পড়ে। এমনি করে সিসিফাস নিরন্তর তাঁর ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

রবিবাবুর বেদনার উৎসটি আমার আর অজানা রইল না।

উনি একটু থেমে থেকে আবার বললেন, যতদিন বেঁচে আছি রঞ্জন, এ পাথর আমাকে ঠেলে যেতে হবে, কিন্তু আমার চলে যাবার পর, এই নির্বোধ, জড় পাথরটার কি হবে বলতে পার?

কিছুক্ষণ পরে ধাতস্থ হয়ে বললেন, আরে চল চল, বাজারের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অজিতকুমার ঘোষ আমাদের বাংলা ডিপার্ট-মেণ্টের অত্যন্ত নামকরা অধ্যাপক। আমার কয়েক বছর আগে ও'রা দুজনে একই দিনে এই কলেজে চাকরী পেয়েছেন। অজিতদা বাঙলা নাট্য-সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় রত আর অসিতদা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত। ঘণ্টা পড়লেই ছাত্রেরা এ'দের আগমনের প্রতীক্ষায় দরজার দিকে চেয়ে থাকত। অসিতদা যে কোন একটি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে নানা তথ্য সমাবেশে তাকে সজ্জিত করে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতেন। তাঁর অনায়াস প্রকাশ ক্ষমতা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তি ছাত্রদের মুগ্ধ বিস্ময় উৎপাদন করত। অন্যদিকে অজিতদা অত্যন্ত আনন্দময় এক মানুষ। পড়াতে পড়াতে রেফারেন্স হিসেবে নানা ধরনের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। সেগুলি ছেলেমেয়েরা খুব উপভোগ করত। দুজনেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কিন্তু দুজনের পড়ানোর ধরন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

এ'দের চেয়েও সিনিয়ার ছিলেন নৃপতিবাবু। অদ্ভুত চরিত্র ছিল তাঁর। পড়ানোর সুখ্যাতির চেয়ে মানুষ হিসাবে ছাত্রদের মনের মধ্যে তাঁর প্রতেষ্ঠা ছিল অনেক বেশী। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দেবার পরেই ছেলেরা তাঁর কাছে ঘুরত রোল নাম্বার নিয়ে। তিনি সেই নম্বরগুলি তাঁর ডায়েরিতে লিখে নিতেন। ইউনিভার্সিটি থেকে ঠিক বের করতেন কোন এগ্‌জামিনারের কাছে ছেলেদের খাতাগুলো গিয়েছে। তিনি তাঁদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে নিতেন। রোল নম্বর-গুলো তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে বলতেন ছেলেরা আপনার আমার মতো জ্ঞানী নয়। তাদের খাতাগুলো একটু সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন।

এমন একজন প্রবীণ অধ্যাপকের সুভদ্র আচরণ এবং কথাবার্তা শুনে এগজামিনাররা অনেক সময় ছেলেদের খাতাগুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিচার বিবেচনা করে দেখতেন।

নৃপতিবাবুকে তাঁর কোন কোন প্রবীণ বন্ধু এবিষয়ে সচেতন করে দিয়ে বলতেন, কার মনে কি আছে হিতে বিপরীত না হয়ে যায়।

উনি বলতেন, আমি তো তাঁদের কাছে ছেলেদের জন্য নম্বর প্রার্থনা করিনি, যাতে খাতাগুলো ঠিক মতো দেখা হয় সেজন্য অনুরোধ জানিয়ে এসেছি।

আমাদের বাঙলা বিভাগে যাঁর চরিত্রটি আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, তিনি আমাদের বিভাগীয় প্রধান বিভূতিবাবু।

প্রতিদিন বিভূতিবাবু ভোরবেলা ওঠেন। খিদিরপুরের বাসা থেকে দ্রুত

হেঁটে হাজির হন বাবুঘাটে। সেখানে সারা গায়ে জবজবে করে সরষের তেল মাখেন। তারপর বহুক্ষণ ধরে চলে গঙ্গাস্নান এবং সন্তরণ। সেখান থেকে আবার পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরে আসেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতেই তাঁর ওই এক আচরণ। খাওয়া-দাওয়ার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর ট্রামে চেপে শিয়ালদার সন্নিকটে রিপন কলেজে আগমন।

মানুষটি অত্যন্ত শৌখীন। কলার তোলা পাঞ্জাবী পরেন, ধুতি ভারী পরিপাটি করে কুঁচোন। হাতে একটি শৌখিন লাঠি থাকে। কলেজের সিঁড়ি বেয়ে প্রফেসারস রুমে উঠে এসে চেঁচিয়ে বলেন, গঙ্গা আমার লাঠি।

অর্থাৎ গঙ্গারামকে এখন বিভূতিবাবুর লাঠিখানা যথাস্থানে রেখে দিতে হবে।

উনি একটা বিশেষ চেয়ারে জমিয়ে বসতেন। ও'র রসিকতাগুলি ছিল উপভোগ্য।

অনেক বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন বিভূতিবাবু। নিজের স্বার্থের জন্য কখনও কলেজের কর্তাব্যক্তিদের বাড়ি যেতেন না। সেজন্য তিনি গভর্নিং বডির ডাকসাইটে সদস্যদের অত্যন্ত অপ্রিয়ভাজন ছিলেন। আর সেইজন্য তাঁর বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিল না। বরং তিনি ওইসব ব্যক্তিদের নিয়ে উপভোগ্য রসিকতায় মেতে উঠতেন।

কোন এক সময় বাঙলা বিভাগের একজন অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারে ও'কে ডাকা হয়েছিল। কর্তাব্যক্তিরা ও'কে প্রায় কোন কথা বলতেই দিচ্ছিলেন না। তাঁরাই প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন।

একজন ক্যাণ্ডিডেটের ইণ্টারভিউ হয়ে যাবার পর উনি ও'র লাঠিটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

কেউ বললেন, কোথায় যাচ্ছেন?

বাড়ি, ফালতু এখানে বসে কি হবে?

বিরক্তি প্রকাশ করে একজন বললেন, ফালতু বলছেন কেন?

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন, যেমন চালিয়ে যাচ্ছেন চালিয়ে যান। বেশ তো প্রশ্নট্রশ্ন করছেন।

একজন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, তার মানে আপনি উপহাস করছেন।

উনি বললেন, কিছু মনে করবেন না, প্রবাদবাক্যে আছে, একটি বিশেষ জীবকে দিয়ে ধান মাড়াইয়ের কাজ চলে না।

ও'রা এই ব্যক্তিটিকে উদ্ধত বলে জানতেন কিন্তু এতখানি তিক্তভাষী বলে জানতেন না।

চেয়ারম্যান ও'কে উঠে দাঁড়িয়ে বসতে অনুরোধ করলেন। উনি বসলে বললেন, এখন থেকে আপনি প্রশ্ন করবেন।

এমনি স্পষ্টবক্তা ছিলেন বিভূতিবাবু।

কিছুদিন পরে অসিতদা চলে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আর অজিতদা ঢুকলেন রবীন্দ্রভারতীতে।

ও'দের যাবার সময়ে বিভূতিবাবুর সেকি কান্না। বললেন, আমার দুটো

হাতই ভেঙে গেল। তবে ওরা আরও কৃতী হোক। উজ্জ্বল হোক ওদের দিক-দিগন্ত, আজ আমি এই কামনাই করব।

বিভূতিবাবু আমাকে স্নেহ করতেন বলে গভর্নিং বডি আমাকে কয়েক বছর ধরে পার্মানেণ্ট না করে রেখে দিলেন তখন আমি ডে আর মর্নিং মিলিয়ে ছাব্বিশ পিরিয়ড ক্লাস করছি।

বিভূতিবাবু একদিন আমাকে ডেকে বললেন, চিন্তা কর না, ভয় পেও না, তুমি বটবৃক্ষের আশ্রয়ে আছ। আমি যতদিন আছি তোমাকে আগলে রাখব, এবং যাবার আগে তোমাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যাব।

বিভূতিবাবুর ষাট বছর পূর্ণ হলে তিনি অন্য সবার মতো একস্টেনশানের জন্য দরখাস্ত করলেন না। তখন কেউ কেউ কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে সত্তরের কাছা-কাছি বয়সেও কলেজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের প্রধান কাজ ছিল গর্ভানিং বডির সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন্ প্রফেসার কি সমালোচনা করছেন তা উপযুক্ত জায়গায় জানিয়ে আসা এবং নিজের চাকরীটিকে আরও কিছুদিন পাকা করে রাখা।

বিভূতিবাবুর গুণমুগ্ধ অধ্যাপকেরা সাড়ম্বরে তাঁর বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করতে লাগলেন। খবরটি শুনেই বিভূতিবাবু বললেন, অসম্ভব, জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো আমি এখানে কাটালাম। তোমরা আমাকে এই কলেজ থেকে, তোমাদের হৃদয় থেকে বিদেয় করে দিতে চাইছ। আমি যেখানেই থাকি না কেন এখানেই থাকব।

একজন অভিভূত হয়ে বললেন, আপনার ক্লাস থাক না থাক প্রায়ই এখানে আসবেন। ইচ্ছে হলে দু'একটা ক্লাসও নেবেন।

বিভূতিবাবু বললেন, আর একটি দিনের জন্যেও এ কলেজে আসব না। তবে চিরদিনই তোমরা আমার হৃদয়ের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বিভূতিবাবু সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার আগে আমাদের সকলকে হাতজোড় করে বললেন, আপনারা কেউ আমার সঙ্গে নিচে নামবেন না।

আমরা প্রফেসারস রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। লাঠিটি হাতে নিয়ে সিধে একটি মানুষ সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন, একবারও পেছনের দিকে ফিরে তাকালেন না।

চলে যাবার কদিন আগে বিভূতিবাবু আমাকে বলেছিলেন, তোমার কনফার-মেশানের ব্যাপারে আমি কর্তৃপক্ষের কাছে কড়া নোট পাঠিয়েছি। এখানকার টিচার্স অ্যাসোসিয়েশান তোমার সপক্ষে। সবাই তোমাকে ভালবাসেন। তোমাকে চাকরী থেকে কেউ সরাতে পারবে না। শুধু দুঃখ, তোমার কনফারমেশানের চিঠিখানা আমি দেখে যেতে পেলাম না।

বললাম, আমি মাথা নিচু করে পেছনের দরজা দিয়ে যাতায়াত করলে কোন্ দিনে এ কাজটা হয়ে যেত। কিন্তু আপনার আশীর্বাদে সে আত্মবিলোপের পথ আমি ধরিনি।

উনি আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, পরে বুঝবে, মাথা উঁচু করে চলার আনন্দ কি। শুধু কলেজে নয়, বৃহৎ জগতের সব জায়গায় আত্মসম্মান অটুট রেখে চলবে। আমি কত জনকে দেখলাম, তোষামোদ করে আর উপঢৌকন দিয়ে কত ওপরে উঠে গেল, কিন্তু তারা নিজের আত্মার কাছে কৈফিয়ৎ দেবে কি ? অবশ্য তারা ব্যবহারিক জগতের লাভটাই শুধু জানে, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। তুমি দেখবে কত প্রতিভাবান, শিক্ষিত লোক পয়সাওলাদের পাশে পাশে ঘুরে তাদের কথার তারিফ করছে। নির্লজ্জের মত হেঁ হেঁ করে হাসছে। বাইরে ওরাই আবার যখন চলাফেরা করছে তখন দেখবে, কি ডাঁট। পৃথিবীতে যেন কাউকে তারা তোয়াক্কা করে না।

এইসব ছদ্মবেশীদের চিনে রাখবে। জানবে, সমাজের সবচেয়ে উঁচু তলায় ওরা উঠলেও, একটি চরিত্রবান, অকপট কৃষকের মেরুদণ্ড ওরা কখনও পাবে না।

এই মানুষটি চলে যাবার পর আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।

তখন 'গল্পভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি বয়সে শরৎচন্দ্রের চেয়ে ছোট হলে কি হবে সম্পর্কে ছিলেন বড়। এই বয়ঃকনিষ্ঠ মাতুলটি যখন 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদক তখন ঐ পত্রিকায় রবি শশীর মিলন ঘটেছিল, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র একই সঙ্গে ঐ পত্রিকায় ধারাবাহিক দুটি রচনা লিখছিলেন। বিভূতিভূষণের অমরগ্রন্থ 'পথের পাঁচালী' উপেন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকাতেই ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

আমি যখন কলেজে পড়াতে শুরু করি তখন উপেন্দ্রনাথ প্রবীণ সম্পাদক হিসেবে 'গল্পভারতীর' দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সে সময় আমার একটা লেখা 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। আমি তখন একান্তই তরুণ কিন্তু লেখা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অযাচিতভাবে দুই মহারথীর সাধুবাদ পেয়ে গেলাম। তাঁদের একজন উপেন্দ্রনাথ অন্যজন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

এই লেখাটি প্রকাশের সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস আছে। আমি একবার শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কুমায়ুনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওই ভ্রমণ-কাহিনীটি বেড়িয়ে ফেরার পর লিখে ফেলি। একটানা এত বড় রচনা এর আগে আমি লিখিনি। আশুদা আমাকে 'তরুণের স্বপ্ন' অফিসে নিয়ে গেলেন। সেখানে দোতলায় একটি ঘরের মধ্যে দুটি টেবিল এবং কয়েকখানি চেয়ার পাতা। একদিকের দেয়ালে যামিনী রায়ের আঁকা গণেশের ছবি। দক্ষিণ দিকে মুখ করে এক ভদ্রলোক টেবিলে মুখ গুঁজে কি যেন লিখে যাচ্ছিলেন, পাশের টেবিলে এক ভদ্রমহিলা বসে একটি পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন।

শিল্পী ঢুকতে ঢুকতেই বললেন, অজিত, নতুন একজন লেখককে নিয়ে এলাম।

চারটে চোখ আমার মুখের ওপর এসে পড়ল।

আশুদা আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, যে প্রফেসারের সঙ্গে আমি নৈনীতাল, রাণীক্ষেত, আলমোড়া আর কৌসানীতে গিয়েছিলাম তাকেই এখানে হাজির করেছি,

খালি হাতে নয়, দস্তুর মতো একখানা মোটা খাতাসহ।

পাতলা চেহারার ভদ্রলোকটি ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। আমি দেখলাম দেহের তুলনায় হাতের পাতা এবং কব্জি বেশ চওড়া।

আমি ভাবলাম উনি বসতে বলছেন, তাই আমি উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পড়লাম। ও'র হাত কিন্তু তেমনি শূন্যে প্রসারিত হয়ে আছে।

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। আশুদা হেসে বললেন, অজিত তোমার খাতাখানা চাইছে রঞ্জন! ও ব্যবসায়ী লোক, গন্ধ পেয়েই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। ব্যাগ থেকে মোটা দুখানা খাতা নিয়ে অজিতবাবুর হাতে তুলে দিলাম। উনি সেই দুখানা খাতা পাশের ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, মালবিকা, তোমার পত্রিকার নতুন খোরাক।

ভদ্রমহিলা খাতা দুখানা তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিলেন। সস্মিত মুখে আমার দিকে একবার তাকালেন। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত মুখচোখ। আমার চেয়ে বয়সে দুচার বছরের বড়ই হবেন।

হঠাৎ উনি বললেন, আপনি কোন কলেজে আছেন।

সুরেন্দ্রনাথে। 'রিপন' বললে আরো ভালভাবে চিনবেন।

উনি আবার বললেন, কোন সাবজেক্ট ?

বাঙলা।

আপনাদের সময় রামতনু চেয়ারে কে ছিলেন ? শ্রীকুমারবাবু ?

হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা বললেন, আমাদের সময়েও উনি ছিলেন। বাইরেটা বড় রুক্ষ কিন্তু হৃদয়বান মানুষ। আমাকে উনি রাজসাহীর দিকে একটা কলেজে চাকরী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

সেখান থেকে চলে এলেন কেন ?

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, কলকাতার মোহ আর পত্রিকার ভূত।

আমি আর আশুদা হেসে উঠলাম।

সেই থেকে 'তরুণের স্বপ্ন পত্রিকা' অফিসে আমার নিত্য যাওয়া আসা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তখন 'তরুণের স্বপ্নে'র সম্পাদক হিসেবে ছাপা হত। অজিতদা এবং মালবিকাদি পত্রিকায় কোন লেখা যাবে কি না যাবে সে সম্বন্ধে তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে নিতেন।

আমার লেখা মাসে মাসে বেরুতে লাগল। অত্যন্ত শোভন ও রুচিশীল পত্রিকা, 'তরুণের স্বপ্ন'।

এই লেখাটি 'গল্পভারতীর' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথের চোখে পড়ে যায়। উনি আমার লেখার প্রশংসা করে এবং উৎসাহ দিয়ে একটি চিঠি লেখেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রও লেখাটি সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহজনক আন্তরিক মনোভাবটি জানান।

আমি একদিন বুক পকেটে একটি কবিতা পুরে নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে হাজির হলাম।

প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার লেখাটি সম্বন্ধে আবার প্রশংসা করলেন। পথের কথা,

মানুষজনের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

অতি বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। অকৃত্রিম হাসি হাসেন। মুখ থেকে চোখে ছড়িয়ে পড়ে সে হাসি।

বসেছিলেন যে ঘরে সে ঘরটি বইয়েতে ঠাসা। নানা ধরনের বাংলা ইংরাজী বই। পড়ুয়া বলে তাঁর যথেষ্ট নামডাক আছে।

ওঠার আগে মাথা চুলকে বললাম, আপনি যদি আমার একটা কবিতা পড়ে দেখেন। খুব ছোট কবিতা।

উনি হাত বাড়াতেই কবিতাটা ওঁর হাত তুলে দিলাম।

উনি খুঁটিয়ে পড়লেন। একজায়গায় কি একটা শব্দ কেটে 'হিরণ্ময়' কথাটি বসিয়ে দিলেন।

তুমি আজই যুগান্তর অফিসে চলে যাও। পরিমল গোস্বামীকে এ কবিতাটা দিও। আমি পরিমলকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

উনি লিখলেন—

প্রিয় পরিমল

কবিতাটা বেশ ভাল লাগল, তাই পাঠালাম। শারদীয় সংখ্যায় জায়গা হলে দিও।

—প্রেমেন।

আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটলাম।

বাগবাজারের পত্রিকা অফিসে নিজের ঘরে বসেছিলেন পরিমলবাবু। অনেকেই কাজ করছিলেন।

পরিমলবাবু আমাকে দেখলেন কিনা বুঝতে পারলাম না। স্থির তাঁর দৃষ্টি। প্রাণহীন মাছের চোখের ভেতর দিয়ে যেন চেয়ে আছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিঠিখানা এগিয়ে দিলাম। নিবাসক্ত দৃষ্টিতে চোখ বোলালেন। হঠাৎ মানুষটির ভেতর থেকে একটা বাক্য বেরিয়ে এল, প্রেমেন কবিতা দিচ্ছে কবে?

মাথা চুলকে বললাম, আজ্ঞে তা তো জানি না।

ভূষণ, কবিতাটা ফাইলে রেখে দাও।

সে বছর প্রথম যুগান্তর শারদীয় সংখ্যায় আমার কবিতা বেরুল।

সূক্ষ্ম হাসির স্রষ্টা 'এককলমী' (পরিমল গোস্বামী) নিজে না হেসে আমাকে সেবার পুজোয় অফুরন্ত আনন্দ দিলেন।

গল্পভারতীতে গল্প লেখার অযাচিত প্রস্তাব এল সাহিত্যিক অনিল ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। পরে তাঁকে আমি অনিলদা বলে ডাকতাম।

আমার সঙ্গে হঠাৎ এক জায়গায় দেখা হয়ে গেল অনিল ভট্টাচার্যের সঙ্গে। দারুণ দিলদরিয়া মানুষ। হাসির সঙ্গে সম্পূর্ণ হৃদয়টিকে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে আমি খুব কম দেখেছি।

আমার সঙ্গে পরিচয় হতেই, আমি যেন ওঁর কতদিনের চেনা, এমনিভাবে বললেন, আরে রঞ্জন তোমাকেই তো আমি খুঁজছি। উপেনদা (উপেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়) তোমার লেখা পড়ে দারুণ খুশী। গল্পভারতীতে তোমার গল্প চাই। কবে গল্প দিচ্ছ বল ?

আমি নতুন লেখক। গল্পভারতীর নাম শুনেছি। ওখানে লেখা দিতে পারলে আমার তৃপ্তির শেষ থাকবে না।

ফিরে এসেই দীঘার পটভূমিতে স্মিথ সাহেবের বাংলোকে কেন্দ্র করে একটি গল্প লিখে ফেললাম। তখন আমরা কাঁথি থেকে দীঘা যেতাম, শেষের পথটা বালি ভেঙে। ওখানে সমুদ্রের ধারে খান তিনেক খড়ের বাংলোবাড়ি ছিল। আর ছিল স্মিথ সাহেবের একতলা কোঠা বাড়িটি। ওই বাড়িতে মিস্টার স্মিথ্ কখনো কখনো আসতেন নিজের প্লেনে চড়ে। শুনেছি, প্লেনটি দীঘার সমুদ্রসৈকতে নামত।

ওই স্মিথ সাহেবের মালীর মেয়ের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে গল্পটি লেখা। স্মিথ সাহেবের অতীত ভালবাসার একটা ছবি সেখানে ফুটে উঠেছিল।

গল্পটি উপেন্দ্রনাথ 'গল্পভারতী'তে ছেপেছিলেন এবং লেখককেও গল্পটি ছাপার মাসখানেকের মধ্যে একটি শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন। আমি তাঁর আদেশে দ্বিতীয় গল্পটি লিখে নিয়ে যাই। গল্পটি হাতে নিয়ে তিনি আমার হাতে একটি চেক তুলে দিলেন। বললেন, না, এটি গল্পভারতীর চেক নয়। গল্পভারতীর টাকা পরে পাবে। এটি এলাহাবাদের একটি পত্রিকা তোমার জন্যে আগাম পাঠিয়েছেন।

আমি তো অবাক।

উনি বললেন, এলাহাবাদ থেকে 'মনোরমা', 'মনোহর কহানিয়া' ইত্যাদি হিন্দিতে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাঁদের চোখে তোমার গল্পভারতীর লেখাটি পড়েছে। তারা ওই লেখাটি হিন্দিতে প্রকাশের অনুমতি চেয়ে তোমার নামে আগাম চেকটি পাঠিয়েছেন।

বললাম, এ আমার আশাতীত প্রাপ্তি।

উনি বললেন, এরকম আশাতীত প্রাপ্তি আরও ঘটতে পারে। সবে তো লেখার জীবন শুরু হল।

এর পর আমি গল্প লিখলেই আগে গল্পভারতীতে নিয়ে যেতাম। হিন্দিতে অনূদিত হবে বলে নয়, প্রথম প্রাপ্তির উজ্জ্বল স্মৃতিটুকুই আমাকে গল্পভারতী অফিসে টেনে নিয়ে যেত।

এই গল্পভারতীতে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয়। পরে উনি পত্রিকা অফিসে আর বড় একটা আসতেন না, বাড়িতে বসেই কাজ সারতেন। লেখার সূত্রে আমি তাঁর বাড়িতে পেঁছে যাই। কিছুকাল মেলামেশার পর আমি জেনেছিলাম এত বড় হৃদয়ের একটি মানুষ খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। লেখককে খুঁজে পেতে আবিষ্কার করে তাকে হৃদয়ের আন্তরিক উত্তাপে সম্বর্ধিত করার মতো মানসিক ঔদার্য বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। উপেন্দ্রনাথের অন্তরের সে ঐশ্বর্য ছিল।

ধীরে ধীরে উপেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে আমি যুক্ত হয়ে যাই। ওঁর ছেলেকে

আমি দাদা ডাকতাম, সেই সূবাদে ও'কে ডাকতাম জ্যাঠামশায় বলে।

একবার আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ সপরিবারে, এমনকি ঠাকুর চাকর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন দীঘা ভ্রমণে। সেখানে আমি তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলাম। অনিলদাও সপরিবারে সঙ্গে গিয়েছিলেন। আর. জি. করের ডাক্তার রূদ্রেন্দ্র পাল হার্ট পেশেণ্ট উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন।

সৈকতাবাসের ছাদের ওপরে প্রতিদিন গান বাজনার আসর বসত। উপেন্দ্রনাথ নিজে তো গান জানতেনই, সঙ্গে থাকত সুগায়িকা পুতুল আর হাসিদি। হাসিদি ছিলেন অনিলদার স্ত্রী আর পুতুল শ্যালিকা। সন্ধ্যার আসর গল্পে গানে মায়াময় হয়ে উঠত। উপেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ গোপাদির দুর্লভ একটি গুণ ছিল। সাধারণ কথাকেও চমৎকার শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করতে পারতেন তিনি। শুধুমাত্র কথা বলার আর্ট বললে ভুল হবে, মুখের হাসি গলার গাম্ভীর্য আর বলার বাঁধুনি এমন পর্যায়ে গিয়ে উঠত যাকে যথার্থই কথাশিল্প বলা যায়। একদিন ডাক্তার পাল এবং আমি অতি ভোরে সমুদ্রতীরে বেড়াচ্ছিলাম। সেখানে আমি ডাক্তার পালের মুখে বিধান রায় সম্বন্ধে একটি গল্প শুনি। ডাক্তার রায় সম্বন্ধে অনেক গল্পই আমার শোনা ছিল কিন্তু সেদিন ডাক্তার পাল তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে গল্পটি বলেছিলেন।

রোগের নামটি আমার মনে নেই। ডাক্তার পাল তখন মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট। তিনি সেই রোগে আক্রান্ত হন। সেই অসুখে কোন খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার ক্ষমতা রোগীর থাকত না। এমন কি জল পর্যন্ত বমি হয়ে বেরিয়ে আসত। এই রোগে তখন মৃত্যু ছিল অবধারিত।

ডাক্তার পাল তাঁর পরিণতির কথা জানতেন। ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা করছিলেন, কিন্তু সবই বৃথা, কোন কিছুই পেটের মধ্যে থাকছিল না। ঠিক হল ললিত বাঁড়ুজ্জে মশাই একবার অপারেশন করে দেখবেন। অপারেশনের ডেটও ঠিক হল, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে তিনি বিশেষ জরুরী একটা অপারেশন হাতে নিয়ে কুচবিহারের মহারাজার প্রাসাদে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে বিদেশ থেকে কলকাতায় ফিরেছেন ডাক্তার রায়। সবাই তাঁকে একবার ডাক্তার পালের রোগশয্যায় নিয়ে এল।

ডাক্তার রায় এ রোগের পরিণতি সম্বন্ধে জানতেন। তবু তিনি বললেন, কয়েকটা কচি ডাব নিয়ে এস।

ডাব আনা হলে তিনি সেগুলিকে দুফাঁক করে জল বের করে দিতে বললেন।

এরপর ডাবের মালায় যে নরম খোসা থাকে ছুরি দিয়ে সেই খোসা তুলে ফেলতে বললেন।

রোগীকে ডাক্তার রায়ের নির্দেশে সেই খোসা খাওয়ানো হল। দিব্যি থেকে গেল তা পেটের মধ্যে। বমি হয়ে আর বেরিয়ে এল না।

ডাক্তার পাল বললেন, আমি সে যাত্রায় মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম। পরে অবশ্য এবিষয়ে ডাক্তার রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বলেছিলেন, ছেলে-

বেলায় এক গ্রামের বৃদ্ধাকে এরকম অসুখে ওই পথ্য দিতে দেখেছি।

ডাক্তার রায় সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই প্রবাদের মতো হয়ে আছে। আমারও কয়েকটি কাহিনী জানা ছিল। ডাক্তার পালকে ছোট একটি কাহিনী বললাম।

গীতিকার, সুরকার হীরেন বসু মশায় একসময় বাংলা দেশকে তাঁর গানে গানে মাতিয়ে তুলেছিলেন। 'শেফালি তোমার আঁচলখানি বিছাও শারদপ্রাতে' অথবা 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে'; এইসব গান সেদিন বাঙালীর মুখে মুখে ফিরত। ভারী রসিক এই মানুষটি একদিন তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তার রায়কে দেখাতে গেছেন। স্ত্রী আলসারের রোগী। ডাক্তার রায় রোগীকে পরীক্ষা করে ওষুধ পথ্যের একটা ফিরিস্তি লিখে দিলেন। হীরেনবাবুর হাতে প্রেসক্রিপশানটি ধরিয়ে দিতেই হীরেনবাবু ঝুঁকে পড়ে সেটি দেখতে লাগলেন। ডাক্তার রায় বললেন, কি হল?

হীরেনবাবু বললেন, স্যার, আপনার ওষুধে রোগী ঠিক বাঁচবে কিন্তু তাকে বিধবা হতে হবে।

ডাক্তার রায় রসিকতাটি ধরতে পেরে হেসে উঠলেন। প্রেসক্রিপশানটি চেয়ে নিয়ে দুটুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে বললেন, এখন বাজারে অনেক বাঁধাকপি উঠেছে। প্রতিদিন বাঁধাকপি থেঁতো করে হাফ কাপ রস খেতে দিও। জ্বালা করবে, কিন্তু খাওয়াবে। ওষুধের খরচ বেঁচে যাবে।

উপেনবাবুর সাহচর্যে সেবার অনেকগুলো দিন ভারী আনন্দে কেটে গেল। এমন একটি আনন্দময় পুরুষ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি।

কলকাতায় ফিরে মহাজাতি সদনে উপেনবাবুর লেখা 'উট রোগ' নাটকটি মঞ্চস্থ হল। লেখকেরা অনেকেই অংশগ্রহণ করলেন। উপেনবাবু বড় কবরেজ আর আমি একেবারে কনিষ্ঠটি। আমাদের টিকি আছে। টিকি নেড়ে নেড়ে কথা বলছি। এমন সময় দর্শকদের ভেতর থেকে হৈ চৈ শব্দ উঠল। এ তো তারিফের আওয়াজ বলে মনে হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে অকালে ড্রপসিন পড়ে গেল।

উপেনবাবু বললেন, কি হল।

কে একজন বলল, আপনার কনিষ্ঠ কবরেজের টিকিটি খসে পড়ে গেছে। তাই এত হাসাহাসি।

আমি অপ্রস্তুতে পড়লাম। কিন্তু উপেনবাবু সহাস্যে বললেন, রঞ্জন, তুমিই জমিয়ে দিলে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছিল পুরোহিতের ভূমিকা। উনি মন্ত্র পড়তে লাগলেন—

কুমীর কুমীর
মহাকুমীর
কুম্ভীর তামসীবাসী—'

শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ানোর মতো এই মজার মন্ত্রটি শুনেও সেদিন দর্শকেরা দারুণ হাসিতে হল ভরিয়ে তুলেছিল।

সেদিন কি কারণে যেন কলেজ ছুটি ছিল। আমি দুপুরের খাওয়া শেষ করে বিছানায় গড়িয়ে বই পড়ছি এমন সময় পিওন একটি চিঠি দিয়ে গেল। খাম খুলে

দেখলাম, আমার পরিচিত অপূর্ব সুন্দর হস্তাক্ষর।

প্রিয় রঞ্জন,

এখন শিউলি ফোটার কাল। দীঘার রাস্তার দুধারে ধানগাছের শ্যামল হিল্লোল। আকাশের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। আমার ছোট্ট ঘরের জানালা দিয়ে শারদলক্ষ্মীর সোনালী আঁচল লুটিয়ে পড়ে। জ্যোৎস্নার শোভা মরি মরি। সামনের পূর্ণিমায় সব কাজ ফেলে চলে আয় আমার কুঁড়েতে। শিউলির মতো কোমল সুন্দর একটি মেয়ে তোর অভ্যর্থনার জন্য এখানে বসে থাকবে। তোর আসা চাই।

—হৃদিরঞ্জন।

ঠিক পূর্ণিমার দিনে জোয়ারের টানে কে যেন আমাকে কলকাতা থেকে টেনে নিয়ে চলল হৃদিরঞ্জনের খড়ে ছাওয়া ছোট কুঁড়েঘরটির দিকে।

আমি যখন দীঘার রাস্তায় বাস থেকে নামলাম তখন অমলিন সন্ধ্যা নেমেছে। শারদ পূর্ণিমার ঝকঝকে রুপোলী চাঁদ আকাশে। হৃদিরঞ্জনের ঘরের সামনে ছোট্ট একটি খাল। তার ওপর বাঁশের সাঁকো। হৃদিরঞ্জন তখন এই ছোট্ট ঘরটি ভাড়া নিয়ে থাকত। নির্জন এই এলাকাটি তার খুব পছন্দ ছিল।

আমি বাঁশের সাঁকোটিতে সাবধানে পা রেখে খাল পেরিয়ে গেলাম। তখনই সাঁকোর ওপর দুচার বিন্দু শিশির পড়েছিল। মনের ভেতর আমার তখন প্রবল এক কৌতূহল। কে সেই শিউলি ফুলের মতো মেয়েটি যে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে। কই, হৃদিরঞ্জনের কোন সাড়া পাচ্ছি না কেন? খেয়ালের বশে আমাকে চিঠি লিখেই কি সে সব কিছু ভুলে গেছে? মেয়েটি কি তাহলে হৃদি-রঞ্জনের নিরাকার কাব্যলক্ষ্মী?

সত্যিই ঘরের ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে এল না। আমি নিজেই দাওয়ায় উঠলাম। উঠোনে শিউলির গাছ। গন্ধ পাচ্ছিলাম।

ওই তো ঘরের দরজায় কে যেন দাঁড়িয়ে।

গাড়ি আসতে আজ বড় দেরী হয়েছে, ভেতরে আসুন।

একটি সুরেলা গলার আওয়াজ। তরুণী তখনও আধো আলোছায়ার লীলায় রহস্যময়ী।

ঘরে ঢুকে পড়েই বললাম, হৃদিরঞ্জন কোথায়?

আবছা আলো অন্ধকারেও ওর হাসিটুকু গোপন রইল না। ও বলল, বন্ধু নেই শুনলে এখুনি চলে যাবেন বুঝি?

বললাম, যাওয়া না যাওয়ার কথা পরে, আমি শুধু জানতে চাইছি হৃদিরঞ্জন এখন কোথায়?

আমিও তো সঠিক বলতে পারব না, তবে উনি যখন এতক্ষণেও এলেন না তখন মনে হয় স্কুলের বোর্ডিংয়েই আজকের রাত কাটিয়ে দেবেন।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, তুমি, একা, এখানে!

আমার জন্যে আপনি ভাববেন না। মাইল তিনেক দূরে আমার বাড়ি। আমি প্রায়ই ওঁর কাছে পড়তে আসি, পড়া শেষ হলেই বাড়ি চলে যাই। আজ আপনার

আসার কথা আমাকে বলে গেছেন। আর একটা কথাও বলেছেন।

বললাম, কি কথা ?

আগে আপনি বসুন।

আমি ওর নির্দেশ মতো পরিচ্ছন্ন চাদরপাতা একটি তক্তপোশের ওপর বসলাম। ও ভেতরের রান্নাঘরে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পরে এক চুমকী জল নিয়ে এসে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, মুখটা ধুয়ে আসুন।

আমি মুখ ধুতে দাওয়ায় বেরিয়ে গেলাম। বিছানায় কাগজ পেতে ততক্ষণে সে আমার জলখাবারের প্লেটটি বসিয়ে দিয়েছে। আমি ফিরে আসতেই ও আমার হাত থেকে চুমকীটা নিয়ে বলল, এখন এটুকু খেয়ে নিন, রাতের খাবার আমি বিকেলেই তৈরী করে রেখেছি। আপনাকে আমার হাতের রান্না খাইয়ে তবে আমি ঘরে ফিরব।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এত রাতে ঘরে ফিরবে ?

ও বলল, আমার অভ্যেস আছে।

মা বাবা কিছু ভাববেন না।

কিচ্ছু না। ও'রা তো জানেন, আমি পড়তে আসি।

ওর নিশ্চিন্ততা কিন্তু আমাকে খুব বেশী নিশ্চিন্ত করল না। রাতের বেলা একটি তরুণীর একাকী বাড়ি ফেরার কথা ভেবে আমি কিছুটা শঙ্কিত হলাম।

জলখাবারের প্লেটটা হাতে তুলে নিয়ে খেতে খেতে বললাম, একটু আগে তুমি বলছিলে, হৃদিরঞ্জন আর একটা কি কথা যেন বলে গেছে ?

তরুণীটি বলল, আজ আপনি আমাকে পড়াবেন। মাস্টারমশায় থাকলেও আজ আপনাকেই পড়াতে হোত।

কি পড়বে ?

আপনি অনার্সে যে বই পড়াচ্ছেন তার কোন একটা বিষয় নিয়ে আমাকে পড়াবেন।

বললাম, তুমি কলেজে পড়ো বুঝি ?

ও মাথা নাড়ল।

বললাম, তাই হৃদিরঞ্জন আমাকে এখানে ডেকেছিল।

ও বলল, আমার একটা অনুরোধ আছে।

বল।

আপনি আজ কোন কিছু না পড়িয়ে কেবল আমার সঙ্গে গল্প করুন।

পড়াতে হবে না শুনে আমি বেশ তৃপ্তিবোধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, বেশ গল্পই করা যাবে।

বাইরে চাঁদের আলো ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। মেয়েটি বলল, আমি হেরিকেনটা জেলে আনি।

গল্প করতে হলেও কি হেরিকেন লাগবে ?

ও বলল, একেবারেই না। যদি আপনার দরকার হয় তাই বলছিলাম।

এই আশ্চর্য সুন্দর জনপদে আমার জন্ম হয়েছিল। এখান থেকে দুমাইল দূরে

আমার মামার বাড়ি। অযোধ্যাপুর গ্রামে মামার বাড়িতেই আমি জন্মেছি। রাতে যখন চারদিক নিঝুম হয়ে আসত তখন আমি বিছানায় শুয়ে কান পেতে শুনেছি বাতাসে ভেসে আসা অদূর সমুদ্রের গর্জন। তারুণ্যের দিনগুলোতে সোনালী বালির পাহাড় পায়ে ভেঙে হেঁটে চলে গেছি সমুদ্রের ধারে। কত বাঁশ, বনঝাউ আর বুনোজামের গাছে ছায়াচ্ছন্ন, মায়াময় সেসব পথ। কখনো উঁচু পাহাড়ের মতো বালির স্তূপ ভেঙে অন্যপারে নামলেই দেখতাম চকচকে জলেভরা অগভীর জলাশয়। পুকুরের মাঝবরাবর নেমে যেতাম। পায়ে এতটুকুও কাদা লাগত না। সেখানে বালির চাদর পাতা। গরমের দিনে বালি যখন ভারী উত্তপ্ত হয়ে উঠত তখন এই বালি-চোঁয়ানো জলে পা ডুবিয়ে শীতল একটা শিহরনে সারা শরীর শান্ত হয়ে যেত। দুপুরের রোদে কোন কোন দিন ফেরার পথে আমরা বাদামের বনে ঢুকে পড়তাম। কাজুবাদামের মাথার ওপর সুপুষ্ট লাল হলুদ ফুলগুলো পেড়ে আনতাম। আঠা বাঁচিয়ে মিষ্টি সেই ফলগুলোকে বন্ধুরা বসে বসে কত যে খেয়েছি তার লেখাজোখা নেই। সেই মায়াময় দুরন্ত দুপুর, সেই বালির পাহাড়ের আড়ালে রাঙা সূর্যাস্ত, বালিতে আধডোবা মসজিদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ফুলে ভরা গোলাচ (কাঠচাঁপা) গাছের ওপরে লুটিয়ে পড়া চাঁদের আলো, মাঝরাতে ভেসে আসা সমুদ্রগর্জন আজও আমার অন্তরে ছবি হয়ে আছে।

আমার জীবনের নানা কথা সেদিন শরতের ফিনকি দেওয়া জ্যোৎস্নাধারার মতো আমার হৃদয় থেকে ঝরে পড়ছিল।

আমার কথা শেষ হলে দুজনে কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

একসময় তরুণীটি নীরবতা ভেঙে বলল, রঞ্জনদা তুমি আসবে কিনা এ নিয়ে মাস্টারমশায়ের মনে সন্দেহ ছিল।

ওর 'তুমি' বলাতে আমি খুশী হলাম। বললাম, সন্দেহের কারণ?

জানি না। তবে আমার মন বলছিল, তুমি নিশ্চয়ই আসবে।

এতক্ষণ মেয়েটির নাম জানা হয়নি। বললাম, কথায় কথায় তোমার নামটা জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি।

ও হেসে বলল, তোমার একটুও পছন্দ হবে না।

তবু শুনি?

ও মুখে কোন উত্তর দিল না। ওর খাতার পাতার একটা কাগজে আড়াল করে কিছু লিখল। কাগজটা আমার হাতে দিয়ে চকিতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

আমি ওর দেওয়া কাগজের ওপর চোখ বোলালাম।

প্রিয় কবি, তোমার লেখা পড়ে তোমাকে দেখতে ভারী ইচ্ছে হত। আমার সে ইচ্ছে তুমি পূর্ণ করেছ, সে জন্যে তোমাকে আমার প্রণাম জানাই।—হিমু (হৈমন্তী)।

আমি বাইরে বেরিয়ে দেখি সাঁকোর ধারে দাঁড়িয়ে হিমু দিগন্ত ছোঁয়া ধান-ক্ষেতের দিকে চেয়ে আছে।

সে রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমি ওকে ওর বাড়ির পথে খানিকটা এগিয়ে দিতে বেরুলাম।

বললাম, হৃদিরঞ্জন কখন আসবে বলে তোমার মনে হয় ?

ভোরের গাড়িতে চলে আসবেন বলে আমার মনে হচ্ছে।

কাল তো স্কুল কলেজ বন্ধ সে কি আসবে ?

আমার তো মনে হয় নিশ্চয় আসবেন।

ও যেন কোন ইস্কুলে কাজ করে ?

কালিন্দী।

ও যদি না আসে ?

আমি তো আসব।

তারপর আমাকে আশ্বস্ত করে হিমু বলল, উনি নিশ্চয়ই আসবেন। বন্ধুকে চিঠি দিয়ে কি পালাতে পারেন।

দু'চার পা এগিয়েছি, অমনি ও বলল, আজ চল না, আমার বাড়ি যাই।

তোমার বাড়ি! এত রাতে তুমি আমাকে নিয়ে তোমার বাড়িতে ঢুকবে, সাহস বলিহারি।

ও ভীষণ অবাক হয়ে বলল, তাতে কি হয়েছে। দেখো, বাবা মা একটুও কিছু ভাববে না। তবে আমাকে একটু বকুনি খেতে হবে।

কেন ?

তোমাকে আমার বাড়িতে না খাইয়ে এখানে খাইয়েছি বলে।

বললাম, আজ আমার পথিক বেশ, যেদিন রাজবেশে আসব সেদিন যাব তোমার গ্রামের বাড়ি।

হিমু বলল, রাজবেশটা তোমার কি রকম ?

হঠাৎ আমার চোখের ওপর একটা ছবি ফুটে উঠল। সুবর্ণরেখার ধারে শাল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে একটি আদিবাসী যুবক। খোলা গায়ে স্বাস্থ্যের শ্যামল লাবণ্য। কালো কারে বাঁধা একটা আধুলি বুকের মাঝখানে পূর্ণচন্দ্রের মত ঝকঝক করছে। হাঁটুর ওপরে উঠে এসেছে সদ্য হাটে কেনা মোটা কোরা ধুতিটা।

আমার দেখা সেই ছবিটা রাজবেশের নমুনা হিসেবে তুলে ধরতেই চলার পথে থমকে দাঁড়াল হিমু।

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এটাই তোমার রাজবেশ।

বললাম, তুমি কি ভেবেছিলে, মাথায় মুকুট, হাতে ধনুর্বাণ আর গায়ে ঝলমলে পোশাক চড়িয়ে তোমার বাড়ি গিয়ে হাজির হব ?

হিমু বলল, না, না, আমাকে অবাক করে দিয়েছে তোমার ঐ অর্ধ উলঙ্গ রাজার ছবিটি। এমন রাজবেশ সারা ধরিত্রীর সম্রাটরা শত চেষ্টা করেও যোগাড় করতে পারবে না।

বললাম, এ বেশ তোমার ভাল লেগেছে হিমু ?

ভাল লেগেছে মানে ? আমাদের হাটে মাঠে ঐসব রাজার রাজারাই তো ঘুরে বেড়ায়।

বললাম, যদি কোনদিন ঐ বেশে যেতে পারি তো যাব।

ও আমার দিকে চেয়ে সেই জ্যোৎস্নায় মিষ্টি হাসি হাসল।

এতক্ষণ বন্ধ ঘরের ভেতর হিমুকে আমি ভাল করে দেখতে পাইনি। এখন শরতের অবারিত জ্যোৎস্নার আলোকে ওকে দেখলাম। সুঠাম স্রোতস্বিনীর মত দেহভঙ্গীমা ওর। ফর্সা রঙ, তার ওপর পরেছে হলুদ একখানা শাড়ি। একমাথা কালো চুল বিনুনীর বাঁধন মানছে না।

অনেকটা পথ দুজনে হাঁটলাম, কথা বললাম, শিশিরে ভিজলাম।

আমি একসময় থমকে দাঁড়িয়ে ওর মাথায় হাত দিয়ে বললাম, তোমার মাথায় শারদলক্ষ্মী মুকুট পরিয়ে দিয়েছে হিমু। শিশিরের মুক্তোবিন্দু দিয়ে তৈরী হয়েছে সে মুকুট।

ও আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল পথের এক প্রান্তে। বড় বড় সবুজ ধানগাছগুলো পাতা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা একটু নেমে ধানের ছড়ানো পাতার ওপর শিশিরবিন্দু দেখতে লাগলাম।

পাতা ভরে কণা কণা শিশির মালার মত গাঁথা হয়ে আছে। চাঁদের আলো তার ওপর ভারী সুন্দর একটা দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ ও খানিকটা শিশির হাতে মেখে নিল। আমার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবল। তারপর আচমকা সেই ভেজা হাত আমার পায়ে বুলিয়ে নিল।

আমি ওকে ধরে তুলে বললাম, কি করছ?

শিশিরের জলে তোমার পা ধুইয়ে দিলাম।

আমিও শিশিরে হাত ভিজিয়ে নিয়ে ওর কপালে মাখিয়ে দিলাম।

সেই জ্যোৎস্নাধোয়া নির্জন পথে সবুজ ধানে ভরা প্রান্তরের মাঝখানে আমরা শিশির সিক্ত হয়ে দুজনকে অনুভব করলাম।

প্রান্তরের শেষে দূর কোন গ্রাম থেকে মাঝে মাঝে মন্দিরের মঙ্গল বাদ্যধ্বনি ভেসে আসছিল।

অনেকটা পথ এসে ও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ডানদিকে একটা মাটির পথ ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে। পথটি লম্বা ধানগাছের ভেতর প্রায় অদৃশ্য।

হিমু বলল, তুমি যখন রাজবেশ না পরে আমার বাড়ি আসবে না, তখন এখানেই আজ রাতের মত আমাদের যাত্রা শেষ। কাল ভোরবেলা মাস্টারমশায় আসার আগে আমি গিয়ে তোমার ঘুম ভাঙাব কিন্তু।

যদি অনাল ভোরে (সবেমাত্র ভোরের আভাস) পালিয়ে যাই?

তুমিই ঠকবে। আমার হাতে মাখা মুড়ি, গরম গরম ফুলুরি আর চা তো খাওনি। তাহলে পালাবার কথা মুখে আনতে না।

হেসে বললাম, কাল দিনটা অন্তত এ সবের লোভে থেকে যেতেই হবে।

ও ধানক্ষেতের ভেতর হারিয়ে যাওয়া পথটা ধরে এগিয়ে চলল। আমি বাঁধানো সরকারী পথের ওপর দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। ও মাঝে মাঝে পেছন ফিরে হাত নাড়ছিল।

অনেকটা দূরে চলে গেছে ও। ওর বুক অবধি ডুব গেছে ধানগাছের আড়ালে।

হঠাৎ দূর থেকে একটা সুর ভেসে এল।

'কোন্ দূর বনের পাখি
মোরে বারে বারে ডাক দেয়।'

আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম, সেই গান। সুরের ইন্দ্রধনুর মত সে তখন ছড়িয়ে পড়ছিল দিগন্তে।

হিমুর সঙ্গে কয়েক খানা চিঠির আদানপ্রদান হয়েছিল আমার।

ও বাংলা নিয়ে অনার্স পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিল, কিন্তু কোন চিঠিতেই ওর পরীক্ষা সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ প্রকাশ পেত না, কিংবা সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন উল্লেখ থাকত না।

আমার কোন লেখাটি কোথায় বেরিয়েছে, কেবল সেই খবরগুলো পেতে চাইত। ও কোনদিন আমাকে পত্র-পত্রিকাগুলো পাঠাতে বলত না।

আমি প্রকাশিত লেখাগুলোর হদিস দিতাম ওকে।

ও সমস্ত পত্রিকা সংগ্রহ করে নিয়ে আমার প্রতিটি লেখা পড়ত। এরপর কোন চিঠিতে আমার লেখাগুলো সম্পর্কে ওর মন্তব্য পেতাম। ভারী সরস, উপভোগ্য মন্তব্য সে সব।

বেশ কিছুদিন ওর চিঠি পাইনি। আমিও নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় হিমুর খোঁজ নিতে পারিনি।

হঠাৎ হৃদিরঞ্জনের একখানা চিঠি পেলাম।

মূর্খ, তুই মেয়েটাকে ধরে রাখতে পারলি না, মজে রইলি পচাগলা কলকাতার প্রেমে।

এদিকে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করার পর হিমুকে অনেক বুঝিয়েও তার অভিভাবকরা আর পড়ানোর ব্যাপারে রাজি করাতে পারেননি। তুই হয়ত বুঝতে পেরেছিলি হিমু কিছুটা স্বাধীনচেতা। কবিতার অনুভূতি দিয়ে তৈরী একটা মন বিধাতাপুরুষ ওঁর ভেতর রেখে দিয়েছেন। সেই মন নিয়ে ও যেখানে খুশী ঘুরে বেড়ায়। কেউ ওর চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

ও এখন কোথায় জানিস? পঞ্চ কেদারের পথে পথে ঘুরছে। মাঝে মাঝে দু' এক ছত্র চিঠি লেখে, তাতেই খবর পাই।

—তোর হৃদিরঞ্জন।

উত্তর দিলাম—

প্রিয় হৃদিরঞ্জন,

অধরামাধুরীকে ধরে রাখতে নেই, সে তো শুধু অনুভবের। তাই ওর লীলা দেখেই আমার আনন্দ।

আমি ওর খেয়ালী মনের কথা তোকে আগে লিখে জানিয়েছিলাম। এখন আমার ধারণাটা সত্য বলে প্রমাণিত হল।

এমন মেয়ে তো দুর্লভের দলে। ওকে ধরে রাখার কথা ওঠে কি করে। ওকে

বন্দী করার অর্থ হল, বনবিহারিণী হরিণীকে গলায় দড়ির প্যাঁচ দিয়ে সংসারের খুঁটোয় বেঁধে রাখা। আর যে পারে পারুক, সে কর্ম আমার নয়।

—তোর মূর্খস্য মূর্খ বন্ধু।

বেশ কিছুকাল পরে চেনা হস্তাক্ষরে লেখা একটা চিঠি পেলাম। তাড়াতাড়ি খুলে হিমুর সইটা দেখে নিলাম।

প্রিয় কবি,

গঙ্গোত্রীতে গৌরীকুণ্ডের ধারে বসে কেন জানিনা হঠাৎ তোমার মুখখানা মনে পড়ল। রাতের আস্তানায় এসে তোমাকে চিঠি লিখতে বসে তার কারণটা খুঁজে পেলাম।

গৌরীকুণ্ডের বুকে গঙ্গা ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। কোটি কোটি জলকণায় স্থানটি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল। আমি এপারে বসে সেই কণা কণা জলবিন্দুর স্পর্শে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। সেই মুহূর্তে তোমাকে মনে পড়ার কারণ, এক শিশির-ভেজা সন্ধ্যা তুমি ধানের ওপর ঝরে পড়া শিশিরবিন্দু নিয়ে আমার কপালে মাখিয়ে দিয়েছিলে। সেই রোমাঞ্চ গৌরীকুণ্ডে বসে অনুভব করলাম, তাই মনের থেকে ভেসে উঠল তোমার মুখ।

আমি এ যাত্রায় গোমুখ হয়ে তপোবন ঘুরে এসেছি। রাতে তপোবনে তুষার ঝড়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে। তুমি যদি রাজি থাক তাহলে তোমাকে নিয়ে আর একবার তপোবনে ঘুরে আসব।

—তোমার হিমু।

এরপর বিভিন্ন জায়গা থেকে হিমুর কয়েকখানা চিঠি আমি পেয়েছি। এক দুটো চিঠির উত্তর পাঠিয়েছি ওর বাড়ির ঠিকানায়।

শেষ চিঠি এসেছিল পঞ্চতরণী থেকে। ও তখন একটা দলের সঙ্গে চলেছিল অমরনাথের পথে।

ও লিখেছে, মহাগুনাস পেরোবার সময় আমি দারুণ অভিভূত হয়ে পড়ি। দুদিকে পাহাড় বরফে ঢাকা, মাঝের বিস্তীর্ণ পথটিও বরফের চাদরে মোড়া।

ডানদিকে বরফের ফাটল থেকে একটা নীল জলস্রোত হু হু করে বেরিয়ে আসছিল। কিছু পথ ছুটেই সে জলধারা আবার লুকিয়ে পড়ছিল কোন গুহার গোপনে। সূর্যের আলোয় তুষার পর্বতে রঙের খেলা।

যেমন স্বপ্নময় যাত্রা, তেমনি কষ্টকরও।

আমার একসময় মনে হল, নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে।

আমাদের এক সঙ্গী আমাকে ঐ বরফের ওপর শুইয়ে বুক পিঠ ম্যাসেজ করে দিলেন। কিছু পরে আমি অমরনাথের জয়ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে এসেছি। এখন আমার পাশে পঞ্চতরণীর জলধারা বইছে। আমি তাঁবুতে বসে কাহিল আঙুল-গুলোতে কলম জাপটে ধরে তোমাকে কয়েক কলম চিঠি লিখছি।

জীবনের যে মুহূর্তগুলোতে বিস্ময়ের অবধি থাকে না, ঠিক সেই সময়-গুলোতে তোমার কথা মনে পড়ে।

কবি, কিন্নর থেকে কিছুদিন আগে যখন বাড়ি ফিরি তখন বাবার সে কি

আক্ষেপ আর মায়ের বুক ভাসানো কান্না। বামুনের ঘরের মেয়ে সংসারী না হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি স্বাধীনভাবে।

সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, তোমাদের জ্ঞাতি-গোত্র, আত্মীয়-স্বজনের ভেতর সংসারী মানুষের কত ছবিই তো দেখলে, সেই যাঁতায় তোমার এই ভবঘুরে মেয়েটাকে আর নাই বা পিষলো। তোমাদের দেওয়া চোখ কান আর মন দিয়ে আমাকে বিধাতার গড়া দুনিয়াটা দেখতে দাও, তাতে তোমাদের জন্ম দেওয়া সার্থক হবে।

বলেছিলাম, আমার জন্য ভয় কর না, পথের সঙ্গীদের মত এমন নিঃস্বার্থ উপকারী সংসারী মানুষের ভেতর মিলবে না।

তোমাকে চিঠি লিখছি আর আমার বুকের ভেতর অনুভব করছি ব্রহ্মকমলের একটি পাপড়ির স্পর্শ। কেদারনাথে এক সাধুবাবা এটি আমাকে দিয়েছিলেন। তখন মন্দির বন্ধ করে পুরোহিত চলে গেছে। আমি মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি ভাবছিলাম, এত দুর্গম পাহাড় পেরিয়ে মানুষ পাথর বয়ে এনে কি করে এমন বিস্ময়কর মন্দিরটি তৈরী করেছে। সবচেয়ে যা বিস্ময়ের তা হল, এই পরিবেশ নির্বাচন। ঝকঝকে তুষার পর্বতের কোলে এই দেবমন্দিরটি।

আমি ঐ চাতালে দাঁড়িয়ে সেই মানুষকে প্রণাম করলাম, যাঁর মানসপটে প্রথম এই মন্দিরের পরিকল্পনাটি জেগে উঠেছিল।

নমস্কার শেষ করে মাথা তুলতেই দেখি এক সাধুবাবা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন।

আমি তাঁর দিকে হাতজোড় করে তাকাতেই তিনি এগিয়ে এসে আমার হাতে ব্রহ্মকমলের এই পাপড়িটি দিয়ে বললেন, বেটী, বড় পবিত্র এ জিনিস, বুকের মধ্যে রেখে দে। একদিন এর ছোঁয়ায় তোর হৃদয়কমল খুলে যাবে।

সেই থেকে ঐ পাপড়িটি বুকে ধরে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াই। যত ঘুরছি, ততই যেন রূপ দেখার চোখ খুলে যাচ্ছে আমার।

হৃষিকেশে অসুস্থ হয়ে এক ভদ্রমহিলা দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। যাবার সময় তিনি কেবলই আক্ষেপ করেছিলেন, আমার অসুস্থ ছেলের জন্য বদ্রীনাথে পুজো দিতে এসেছিলাম, নারায়ণ আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

কি কান্না তাঁর। ফেরার গাড়িতে ওঠার আগে বুক ভেসে যাচ্ছিল চোখের জলে।

আমি বললাম, একটি টাকা দাও মা আমার হাতে। তোমার ছেলেকে স্মরণ করে আমি যথাস্থানে পুজো দেব।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভদ্রমহিলার মুখ। আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন আমার মত সমস্ত দুঃখী মায়ের আশীর্বাদ তুমি পাবে মা।

বদ্রীনাথের দিকে তাকিয়ে এক টাকার কেনা ফুল অলকানন্দার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। উষ্ণ জলের প্রস্রবণ ঝাঁপিয়ে পড়ছিল অলকানন্দার হিমশীতল জলে। সেখানে তৈরী হচ্ছিল মেঘের জটা। সেখানেই ফেলেছিলাম ফুল। উষ্ণতাকে সেখানে স্পর্শ করছিল শীতলতা। আমি প্রার্থনা করলাম, সমস্ত তাপ যেন একদিন শীতলতার স্পর্শ পায়।

তুমি নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছ কবি, আমার এইসব দার্শনিকতার কথা শুনে।

বদ্রীনাথে 'মানা' নামের একটা গ্রাম আছে। শুনেছি, ওখানে ভারতীয় আর তিব্বতী রক্তের মিশ্রণে এক সম্প্রদায়ের মানুষ তৈরী হয়েছে। ভারী ইচ্ছে হল, ঐ পাহাড়ী গ্রামখানা দেখে আসি।

পথে যেতে যেতে এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম। সোনার মত রঙ, তবে সারা মুখে বার্ধক্যের বলিরেখা। নাকে, কানে, গলায় সোনার গয়না।

বৃদ্ধাটি পিঠে ঘাস বোঝাই একটা ঝুড়ি নিয়ে হাঁটছিল। বোঝা আর বার্ধক্যের ভারে ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছিল সে।

বললাম, বুড়ি মা, যাচ্ছ কোথায় ?

বৃদ্ধাটি ঈষৎ মাথা তুলে তার গ্রামটি দেখিয়ে দিল।

আমি বললাম, তোমার গ্রামেই তো আমি যাচ্ছি। দাও না বুড়িমা, তোমার বোঝাটা আমি বয়ে নিয়ে যাই।

বৃদ্ধা থেমে গেল। হাসল। হাতটা তুলে আশীর্বাদের একটা মুদ্রা করল।

মুখে বলল, এ তো আমার রোজকার কাজ বেটী। আজ তুমি বয়ে দেবে, কাল তো আমাকেই আবার বইতে হবে। একদিনের আরামে অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে বেটী।

খুব ভাল লাগল বৃদ্ধার কথা। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মানা গ্রামে এলাম।

ঐ বৃদ্ধা আর তার অতি বৃদ্ধ স্বামী ছাড়া সংসারে আর একটি মাত্র প্রাণী আছে। সেটি প্রায় বৃদ্ধ অক্ষম একটি ঘোড়া। তারই লালনপালনের জন্য রোজ বৃদ্ধাকে ঘাস সংগ্রহে বেরুতে হয়।

অনেক কথা হল। ওরা অতিথিকে সাধ্যমত আপ্যায়ন না করে ছাড়ল না।

আমি মন্দিরের কাছে এসে দেখি ফেরার বাস হর্ন দিচ্ছে। আমার আর মন্দিরে যাওয়া হল না। নীল আকাশের বুকে শুভ্র নীলকণ্ঠ শৃঙ্গে তখন সোনালী সূর্য অমৃত বর্ষণ করছে। আমি নীলকণ্ঠের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বাসে উঠলাম।

বাসে বসে আমার কেবলই সেই বৃদ্ধ দম্পতিটির কথা মনে হচ্ছিল, যারা নিজেরা বৃদ্ধ হয়েও অক্ষম বৃদ্ধ ঘোড়াটার পরিচর্যা করে চলেছে।

এই দেখ, কি বিরাট একখানা চিঠি লিখে ফেললাম। পঞ্চতরণীর তীরে তাঁবুর ভেতর বসে শুনছি পাঁচটি জলধারার অবিশ্রাম কল্লোল। এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের অনুভূতির কথা লিখে জানাচ্ছি। আসলে সুন্দরের অনুভূতি সব জায়গাতেই এক। সে রোমাঞ্চিত করে, মগ্ন করে।

—তোমার হিম।

আষাঢ় শুরু হয়েছে। আকাশে হালকা মেঘের আনাগোনা। সন্ধ্যার দিকে আশুতোষ কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখি সামনের দীর্ঘ দুটো

দেবদারু গাছ পাতা নেড়ে নববর্ষাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। উল্টোদিকে ক্যানসার হসপিটাল। সেদিকে তাকিয়ে রোগীদের শান্তি আর নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা জানাই ঈশ্বরের কাছে।

ভোরবেলা প্রভাতী কাগজের পাতা খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কাশ্মীরে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় লোকনায়ক শ্যামাপ্রসাদের মহাপ্রয়াণ হয়েছে।

কিছুকাল আগে শ্যামাপ্রসাদ আইন অমান্য করে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিলেন। সে কারণে তাঁকে ওই কাশ্মীরেই অন্তরীণ করে রাখা হয়। একটি ঘরের মধ্যে তিনি থাকতেন, সামনে ছোট বাগান। ক্ষুদ্র খাঁচার মধ্যে বন্দী এক বিক্রমকেশরী। তিনি মাঝে মাঝে বাড়িতে তাঁর বৌদিকে চিঠি লিখতেন। ভারী সুন্দর সেসব চিঠির বর্ণনা। এসব চিঠির খবর আমি কিছু কিছু পেতাম জাস্টিস রমাপ্রসাদের মধ্যম পুত্র শিবতোষদার কাছ থেকে। অসাধারণ কৌতুকী বাক্‌ভঙ্গী ছিল তাঁর রচনায়। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়।

শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুতে কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। পথে ঘাটে মানুষের মিছিল। তাদের মুখে একটি মাত্র আলোচনা, এ মৃত্যু কি স্বাভাবিক?

তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন, তখন তাঁকে গাড়ি করে দূরের কোন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পথেই তিনি মাতৃনাম উচ্চারণ করে মৃত্যুবরণ করেন।

সারা দেশব্যাপী শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল না। কলকাতার মানুষ বিহ্বল হয়ে প্রতীক্ষা করছিল তাঁর নশ্বর দেহটি দর্শনের জন্য।

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ক্যাওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্যন্ত সমস্ত পথটাই তরঙ্গসংক্ষুব্ধ এক বিশাল নদীর আকার ধারণ করেছে।

হাজার হাজার উদ্বাস্তু সেদিন চোখের জল আর ফুল নিয়ে শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করেছে। শ্যামাপ্রসাদ এই উদ্বাস্তুদের সকরুণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছিলেন লোকসভায়। তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য জোরালো ভাষায় আবেদন জানিয়েছিলেন সরকারের কাছে।

কেবল উদ্বাস্তু নয় মেদিনীপুরবাসীরা যখন বন্যা ও দুর্ভিক্ষে কাতর হয়ে পড়েছিল তখন শ্যামাপ্রসাদই নানাভাবে তাদের সাহায্য করেছিলেন। সেজন্য বিধানসভা নির্বাচনে মেদিনীপুরবাসীরা তাঁর প্রতিনিধিদের বিপুল ভোটে জয়ী করেছিল।

যেখানে অন্যায় সেখানেই সিংহ গর্জনে প্রতিবাদ জানিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ। কেবল লোকসভাতেই তাঁর বাগ্মিতা সীমাবদ্ধ ছিল না, বিভিন্ন জনসভায় সহস্র সহস্র লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারতেন তিনি। অকারণ বাক্যের উচ্ছ্বাস নয়, যুক্তি ও তথ্য শ্রোতাদের মনের মধ্যে পৌঁছে দেবার অসাধারণ এক ক্ষমতা ছিল তাঁর।

আমরা কয়েকজন স্যার আশুতোষের বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে শবদেহবাহী

শকটের প্রতীক্ষা করছিলাম। বড় বড় থামগুলোর তলায় অন্তরঙ্গ অনেকেই শ্যামাপ্রসাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ বাঁ দিকে চোখ পড়তেই দেখি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় খালি পায় একটি থামের তলায় বসে উদাস দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে আছেন।

অনেক দেরীতে বাড়ির সামনে শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ যখন এল তখন ভবানীপুর সমুদ্র হয়ে গেছে। জনসমুদ্র থেকে মাঝে মাঝে কল্লোলধ্বনির মতো উচ্চারিত হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদের নাম। সমুদ্রতরঙ্গে আবার এক সময় ভেসে চলে গেল সেই অমৃতপথযাত্রী পুরুষের নশ্বর দেহখানি।

শ্যামাপ্রসাদ দিল্লী থেকে দুচারখানি পত্র আমাকে লিখেছিলেন, অবশ্য আমার পত্রের জবাবে। কিন্তু স্বল্প দৈর্ঘ্যের সেসব চিঠিতে এমন স্নেহ এবং আন্তরিকতার স্পর্শ থাকত যা মনকে অভিভূত করে দিত। শীতকালে একবার একটা চিঠি পেয়েছিলাম যাতে পুনশ্চ দিয়ে লেখা ছিল ঠাণ্ডার ধাত তোমার, বেশ সাবধানে থাকবে।

এসব আন্তরিকতার কথা ভুলব না কোন দিনও।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর স্মরণীয় আলেখ্যটি কালের স্বাভাবিক নিয়মেই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। আমি সকাল দুপুর সন্ধ্যে শিয়ালদা থেকে ভবানীপুর দুটো কলেজ চষে বেড়াচ্ছি। দীর্ঘদিন বাড়ির দু'একখানা চিঠি ছাড়া আর কোন চিঠিপত্র পাইনি। অবশ্য আমিও কাজের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে বন্ধু-বান্ধব কাউকেই চিঠিপত্র লিখতে পারিনি।

আমি যা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি একদিন তাই ঘটল আমার চোখের সামনে। এক সন্ধ্যায় আশুতোষ কলেজ থেকে বেরিয়েই গেটের সামনে হৃদিরঞ্জনকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সে দারোয়ানের কাছে আমার সম্বন্ধে কি যেন জিজ্ঞেস করছিল। আমি তার হাত ধরে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, তুই এখানে!

হৃদিরঞ্জনের চেহারা দেখে আমি কিছুটা দমে গেলাম।

ও বলল, তোর কলেজ হয়ে গেছে?

বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু তুই এ সময়, এখানে? চল আমার বাসায়।

বিষন্ন গলায় হৃদিরঞ্জন বলল, হ্যাঁ তোর বাসাতেই যেতে হবে, না হলে কোন হোটেলে ঢুকতে হত।

আমি থাকতে তুই হোটেলে উঠতে যাবি কোন দুঃখে।

ও আমার হাত ধরে ফুটপাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল, দুঃখ কি একটা, দুঃখ অনেক রে।

টালিগঞ্জগামী একটা বাস আসতেই তাতে আমরা উঠে পড়লাম। বাসে আর কোন কথা হোল না। রাধা ফিল্ম স্টুডিয়োর কাছে নেমে কবরখানাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কবরখানার পাঁচিলের গা ঘেঁষে যে রাস্তাটা পূর্বে চলে গেছে প্রায় তার শেষপ্রান্তে আমার বাসা।

চলতে চলতে বললাম, তুই দুঃখের কথা কি বলছিলি রে ?

ঠিক সেই সময় আমরা কবরখানার গেটের সামনে এসে পড়লাম। ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে। ছোট বড় স্মৃতিসৌধগুলি অবগাহন করছে দুধের মতো সাদা জ্যোৎস্নায়। আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে হৃদিরঞ্জন কতক্ষণ অপলকে সেই কবরখানার দিকে চেয়ে রইল। পরে তন্ময়তা ভাঙলে ও বলল, বাসায় চল সব বলব।

ওর রহস্যজনক আচরণে আমি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। তবু সমস্ত কৌতূহল চেপে ওকে একসময় বাসায় এনে তুললাম।

আমার বাসায় একটি কাজের মেয়ে ছিল, তাকে ডেকে বললাম, নর্মদাদি এ আমার বন্ধু। দুচারদিন এখানে থেকে তোমার হাতের রান্না পরীক্ষা করবে।

নর্মদাদি আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করত। সে অমনি বলল, কি যে বল দাদা, আমার হাতের রান্না—তার আবার পরীক্ষা।

হৃদিরঞ্জন বলল, আমাকে কালই চলে যেতে হবে, স্কুলের অ্যানুয়েল পরীক্ষা চলছে। তবে কলকাতায় বার বার ফিরে ফিরে আসতে হবে।

ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে বললাম, ততক্ষণ থেকে আমাকে রহস্যে রেখেছিস, এখন খুলে বল ত ব্যাপারটা ?

হৃদিরঞ্জন বলল, হিমু কলকাতায় এসেছে। আমি আর তার বাবা তাকে নিয়ে এসেছি।

হঠাৎ মনে হল, হিমুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কলকাতায় আনা হয়েছে হয়ত পাত্রস্থ করার জন্য। এত দিন পরে বিয়ের ব্যাপারে হয়ত হিমু মত দিয়েছে। এই ঘটনায় আমি দুঃখ পেতে পারি ভেবে হৃদিরঞ্জন প্রথম দেখাতেই দুঃখের কথা তুলছে না।

আমি বললাম, হিমু এতদিনে তাহলে সংসারী হতে চাইছে, কি বল ?

গম্ভীর হয়ে হৃদিরঞ্জন বলল, না, তোর কলেজের উল্টোদিকে তাকে রেখে এসেছি।

কথাটা কানে যাওয়া মাত্রই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। বললাম, কোথায় বললি ?

আজ সারাদিন ওকে ভর্তি করানোর ব্যাপারে বহু হ্যাঙ্গামা পোহাতে হয়েছে।

আমি তখন থরথর করে কাঁপছিলাম, ওকে দুহাতে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললাম, তুই কি বলছিস হৃদিরঞ্জন ! ওকে কোথায় ভর্তি করেছিস ?

ক্যানসার হসপিট্যালে।

মূর্ছাহতের মত আমার দুটো হাত ওর গা থেকে খসে পড়ল।

কতক্ষণ পরে বললাম, কোথায় ক্যানসার, কবে ধরা পড়ল ?

হৃদিরঞ্জন বলল, আমাদের ওখানকার এক ডাক্তারের সঙ্গে ও কয়েকবার এখানে এসে পরীক্ষা করিয়েছে। লাংসে ক্যানসার। দিন পনেরো আগে এসেছিল, সে সময়ই জেনে গেছে। বেডটা আজই পাওয়া গেছে।

বললাম, এতদিন যখন আমাকে খবর দিসনি, তখন খবরটা না দিলেই তো পারতিস।

ও এ কথার কোন জবাব দিল না। শুধু বলল, কাল রাতে প্রথম আমি এলাম ওকে ভর্তি করতে।

খবরটা জেনে হিমু নিশ্চয় ভেঙে পড়েছে?

তুই গেলেই বুঝতে পারবি।

দারুণ অভিমানে বললাম, আমাকে যখন ও জানাতে চায়নি তখন আমার যাবার কি দরকার।

আমার গলার স্বর ভেঙে গেল দেখে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুই কি ছেলেমানুষ হলি রঞ্জন। এ সময় কার ওপর অভিমান করছিস তুই?

আমি ভাবতে পারছি না হৃদয়, আমাদের হিমু এমন একটা দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়েছে।

সে রাতে দুবন্ধু একই শয্যায় শুয়েছিলাম, কিন্তু দুচোখ এক করতে পারিনি। কত স্মৃতি ছায়াছবির মত চোখের সামনে ফুটে উঠছিল। ওর প্রত্যেকটা চিঠির প্রতিটা অক্ষর আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। ওর শিশিরসিক্ত হাত আমার পায়ে লাগতেই আমি চমকে বিছানায় উঠে বসলাম। কবরখানা সংলগ্ন শিমুল গাছের ডালে বসে কটা কাক কলরব করে উঠল। নতুন প্রভাতের সংকেত।

সেদিন কলেজ যাবার মত মনের অবস্থা ছিল না। দুবন্ধু একসঙ্গে শুধু হিমুর কথা বলেই সারাটা দুপুর কাটিয়ে দিলাম।

বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারে হসপিট্যালে ঢুকতে পা কাঁপছিল।

দশ নম্বর জেনারেল বেডে ও জানালার দিকে মুখ করে শুয়েছিল। আমাকে হিমুর বেডের হদিস দিয়ে হৃদিরঞ্জন ওর জন্যে কয়েকটা ওষুধ আর পথ্য আনতে গিয়েছিল। হয়ত আমাকে হিমুর সঙ্গে কিছুক্ষণ একা থাকার সুযোগ দিয়েছিল সে।

আমি পেছন থেকে হিমুর কপালে হাতটা বুলিয়ে বসে পড়লাম। আশ্চর্য! হিমু একবারও ফিরে তাকাল না। আমার হাতখানা ওর দুহাতের মুঠোয় ধরে চুপচাপ পড়ে রইল।

চুপি চুপি বললাম, আমি রঞ্জনদা হিমু।

তোমার হাতের ছোঁয়াতেই আমি জানতে পেরেছি রঞ্জনদা। এ ছোঁয়া কি কোনদিন ভোলা যায়।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সেদিন শিশির ছিল এ হাতে।

ও এতক্ষণ পরে আমার দিকে ফিরে বলল, আজ এ হাতে শুধু উত্তাপ।

কথাটা বলেই হিমু আমার হাত তার তপ্ত গালের ওপর চেপে ধরল।

কিছুক্ষণ পরেই ও বিছানার ওপর উঠে বসল।

তোমার সঙ্গে মুখোমুখি না বসলে ভাল করে দেখা কিংবা কথা বলা যাবে না।

জনরঞ্জন মুখে হাসিটি ফুটে উঠেছে।
আমি ওর অসুস্থতা নিয়ে একটি কথাও তুললাম না।
ওর পাশে বসে বললাম, কতদিন পরে তোমাকে দেখছি।
ও উৎসুক হয়ে বলল, কি পরিবর্তন চোখে পড়ছে তোমার সত্যি করে বল?
কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, সেই জ্যোৎস্না রাতে প্রথম দেখেছিলাম তোমাকে, আর আজ দ্বিতীয়বার দেখছি। তুমি আরও সুন্দর হয়েছ।
ও আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, তুমি কিন্তু খানিকটা বোকা হয়ে গেছ রঞ্জনদা। আমাকে চিঠিতে সব খবর দাও না, কিন্তু আমি তোমার সব খবরই রাখি।
বল কি খবর রাখ? আমি যে বিয়ে করে বসে আছি তা তুমি জান?
আবার রঙ্গ শুরু করে দিলে। আর যাকে জানাও না জানাও আমাকে খবরটা তুমি আগাম নিশ্চয়ই জানাতে। আমি বলছিলাম, তুমি তিন সিফ্‌টে কাজ কর তাই রোগা হয়ে গেছ।
বললাম, তোমার মত আমার পায়ে তো চাকা বাঁধা নেই হিমু। সংসার পাততে হবে, তাই চারদিক থেকে অর্থ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি।
তুমি এমন করে কথা বলছ, যেন তোমাকে আমি একটুও চিনি না। যা রোজকার কর খোলামকুচির মত তা উড়িয়ে দাও, এ খবর আমি পেয়ে গেছি।
মুখে আঙুল দিয়ে বললাম, চুপ, হবু শ্বশুর বাড়ির কেউ শুনতে পেলে বাউণ্ডুলের গলায় বরমাল্য জুটবে না।
ও আমার পিঠের ওপর আলতো একটা চাপড় মেরে বলল, তোমার দৌড় আমার জানা আছে। শ্রাবস্তী আর পুষ্পিতাদির কথা আমি ভুলিনি।
ঐ রাস্কেল হৃদিটাই সব ফাঁস করে দিয়েছে নিশ্চয়।
ও হেসে বলল. সূর্যকে নিভানো যায় না, সে প্রকাশিত হবেই।
তুমি পড়াশোনা চালিয়ে গেলে এতদিনে উল্টোদিকের কলেজে পড়াতে পারতে।
ও বলল, আমি তোমার কলেজ দেখেছি। দুটো পাতাভরা দেবদারু গাছ আমার খুব ভাল লেগেছে। সোজা মাথাগুলো আকাশের দিকে তুলে রেখেছে।
ও অনেকক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই ওকে চুপচাপ বসে থাকতে বললাম।
ও আস্তে বলল, এই তো ভিজিটিং আওয়ারটুকু, তারপর দীর্ঘ দিন রাত শুধু শুয়ে বসে থাকা। একটু কথা বলতে দাও লক্ষ্মীটি।
ওর কণ্ঠের সকরুণতা আমাকে স্পর্শ করল। বললাম, তোমার সব কথা আমি কি একাই শুনব, হৃদয়কে আসতে দাও।
ও কালো পল্লবভরা চোখে কৌতুকী হাসি হেসে বলল, যা তোমার কাছে বলতে পারব তা কি মাস্টারমশায়ের কাছে বলা যাবে?
কথা শেষ হতে না হতেই হৃদিরঞ্জন ফল আর হরলিক্‌সের শিশি হাতে

নিয়ে ঢুকল। যথাস্থানে সেগুলো রেখে দিয়ে আমাদের দিকে তাকাল।

বললাম, দেখছিস কি, বসে পড়।

হিমু বলল, আমার পাশে বসুন মাস্টারমশাই।

হৃদিরঞ্জন হিমুর আন্তরিক আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারল না। সে হিমুর গা ঘেঁষে বসল।

হিমু বলল, মাস্টারমশায় কতদিন আপনার ঐ ছোট ঘরটায় আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এ বছর পুরো শরৎকালটা বাইরে বাইরে ঘুরে কাটালাম, তাই আর আপনার শিউলি গাছটায় ফুল ফোটা দেখতে পেলাম না।

হৃদিরঞ্জন বলল, দেখার দিন আবার আসবে হিমু।

অপরাহ্নের আলোর মত ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল হিমুর মুখে। বলল, মানুষের আয়ু যদি এতই কম তাহলে ঈশ্বর তাহলে এই পৃথিবীকে এত ঐশ্বর্যে ভরে দিলেন কেন?

হৃদিরঞ্জন বলল, সবকিছু পেয়ে গেলে পাওয়ার ইচ্ছে যে আর থাকবে না হিমু। তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিধাতা ইচ্ছেটাকে অনির্বাণ রেখে দেন।

হিমু বলল, জান রঞ্জনদা আমার এক জ্ঞাতি ঠাকুর্দাকে মরবার সময় জিজ্ঞেস করা হল, তোমার শেষ ইচ্ছে কি বল?

একটি সুপক্ক ল্যাংড়া আম।

সর্বনাশ, তখন সবে শীতকাল, আম পাওয়া যাবে কোথায়?

পাওয়া গেল না। শেষে আমের দিনে একটা স্মৃতিবাসর করে কিছু লোককে ডেকে ল্যাংড়া আম খাওয়ানো হয়েছিল।

কথা শেষ করে হিমু হাসতে লাগল। হাসি থামলে বলল, সত্যি ইচ্ছার শেষ নেই।

আমি ওর দিলখোলা হাসি আর কৌতুক কথার ভেতর দিয়ে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম। মৃত্যুকে শিয়রে জেনেও কোন কোন মানুষ তাকে কিভাবে উপেক্ষা করতে পারে।

হিমুর ব্যাপারে স্কুল থেকে অনেকগুলো ছুটি নিতে হয়েছিল হৃদিরঞ্জনকে। তাই সে আমার জিম্মায় হিমুকে রেখে দিয়ে দেশে চলে গেল। ইতিমধ্যে বার দুয়েক এলেন হিমুর বাবা। হিমুর একমাত্র দাদা বোম্বেতে থাকেন স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে। মা বাবার সঙ্গে সামান্য আর্থিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু ছিল না। মা চিররুগ্না। হিমুর অসুখের খবরে নিজেই ঘন ঘন মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সেবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

আমি হিমুর বাবাকে বললাম, প্রতিদিন একবার করে অন্তত আমি হিমুর কাছে আসব। যেদিন ডাক্তার দেখা করতে বলবেন, সেদিন কলেজ থাকলেও আমি ঠিক চলে আসব। আপনি কিছু ভাববেন না। যখন সুযোগ পাবেন চলে আসবেন। দরকার হলে টাকা পয়সার যোগাড় আমি এখানেই করে ফেলতে পারব। এক দুদিন অন্তর আমার চিঠিও পাবেন।

হিমুর বাবা আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে কান্নাভেজা গলায় বললেন, রঞ্জু

সম্পর্কের হলেই সে আত্মীয় হয় না বাবা। সম্পূর্ণ দূরের জনও আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠে। তোমার হাতেই আমি হিমুকে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। আমার যত দুঃখই হোক আমি জানব হিমুর কাছে আমার আর একটি ছেলে আছে।

হিমুর বাবা চলে গেলেন, আমি প্রতিদিনই যথাসময় নিয়মমাফিক হিমুর কাছে আসতে লাগলাম।

একদিন হিমু বলল, জান রঞ্জনদা আমার উত্তর দিকের বেডে যে ভদ্রমহিলাটি রয়েছেন তাঁকে আমি শোভাদি বলে ডাকি। বছর তিরিশ বয়েস হবে। আট বছরের একটি ছেলে আর পাঁচ বছরের একটি মেয়ে। ভদ্রমহিলা অসম্ভব গল্প করতে ভালবাসেন (হিমু ফিসফিস করে বলল, তুমি এখন ওর দিকে তাকিও না কিন্তু)। উনি আমাকে বলেছিলেন, আর দশ বারোটা বছর যদি বাঁচতে পারতাম তাহলে ছেলে মেয়ে দুটোকে কিছুটা স্বাবলম্বী দেখে যেতে পারতাম। আমি চলে গেলে ওদের বাবা কি আর ছেলে মেয়ে দুটোকে তেমন করে লক্ষ্য নজর করতে পারবে।

আর একদিন এসে শোভাদি বললেন, ছেলে মেয়ে দুটো কিছুই বোঝে না। আমার চোখে জল গড়াচ্ছে দেখে ছেলেটা হাত দিয়ে মুছে দিলে। মেয়ে বলল, তুমি কাঁদছ কেন মা, আমরা একটুও দুষ্টুমি করি না।

বললাম, আমি জানি তোমরা ভারী লক্ষ্মী। বাবাকে একটুও বিরক্ত করবে না।

মেয়েটা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তোমাকে কেন ঘরে দেখতে পাই না মা, আমার খুব কষ্ট হয়।

বলতে বলতেই মেয়েটা আমার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ছেলে অমনি বোনের মাথাটা তুলে দুহাতে জড়িয়ে আদর করে বলল, দূর বোকা কারু অসুখ করলে কাঁদতে নেই। তুই কাঁদলে মায়ের অসুখ বেড়ে যাবে।

শোভাদি বললেন, ভাই বোনে বড় মিল, এটুকুই আমার সান্ত্বনা।

আমি ধীরে ধীরে মাথাটা ঘুরিয়ে দেখলাম। শোভাদির কাছে দুটি ছেলে মেয়ে আর তাদের বাবা বসে বসে গল্প করছেন।

নতুন বিয়ে করা একটি মেয়ে হলের কোণের সীটটাতে রয়েছে। ছমাস বিয়ের পরে রোগ ধরা পড়ে। কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। মাথায় একটা টকটকে লাল সিঁদুরের টিপে দেহের যেন সমস্ত রক্তটুকু জমাট বেঁধে আছে। স্বামীটি বসে বসে গল্প করছিল।

হিমু বলল, মেয়েটা আজ সকালে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদছিল। বলছিল, আমরা ভালবেসে বিয়ে করেছি। আমি মারা গেলে ও আর কাউকে ভালবাসবে এ আমি সইতে পারব না।

সতের বছরের একটি মেয়ে তার পাশে রাখা রেডিওটা চালিয়ে দিয়েছিল। 'ডাক্তার' ফিল্মে পঙ্কজ মল্লিক যে গানটি গেয়েছিলেন, সেটি বাজছিল—'দিনগুলি মোর কোথায় গেল, চৈত্র দিনের ঝরা পাতার শেষে।'

হিমু বলল, মেয়েটির মা নেই। বাবা দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছেন। স্কুলের নামকরা ছাত্রী। সুন্দর কবিতা লিখতে পারে। আমি ওর কাছে বসে অনেক-গুলো কবিতা শুনে এসেছি। মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায় কোন কোন কবিতায়। একটি কবিতায় ওর প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আমি ওকে বলেছিলাম, তোমার কোন ছেলে বন্ধু আছে নাকি? ও বলেছিল, এমনি কেউ নেই তবে কবিতায় থাকতে দোষ কি।

ওকে দেখতে ওর ইস্কুলের মেয়েরা আসে, কখনো কখনো দিদিমণিরাও।

হিমু বলল, কাল সাত নম্বর বেডের মহিলাটি ছাড়া পেয়ে স্বামীর সঙ্গে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। আমরা আয়াকে দিয়ে গোলাপফুল আর মিষ্টি আনিয়ে ওকে উপহার দিয়েছি। ওই কিশোরী টুসি মেয়েটা গান গেয়েছিল। ভারী মিষ্টি গলা ওর। ও গাইছিল—'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো'।

রবীনদা একদিন আমার হিমুকে দেখতে এসেছিলেন। ফেরার পথে আমাকে বললেন, এমন মনের শক্তি আমি আর কারুর ভেতর দেখিনি। কিরকম হেসে আনন্দ করে কথা বলছিল। সমস্ত হলঘরটা ভরে যাচ্ছিল ওর খুশীর জোয়ারে।

হিমু একদিন আমাকে বলল, জান রঞ্জনদা জীবনে দুবার আমি অন্তর থেকে মৃত্যুকে চেয়েছিলাম। অমরনাথের পথে শেষনাগে রাত কাটাবার জন্য তাঁবুতে ছিলাম। বাইরের জ্যোৎস্না পাগল করে দিল। আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে একটু দূরে ঘোড়াওয়ালাকে ডেকে তুললাম। তাকে বললাম তুমি আমাকে শেষনাগের কাছে নিয়ে চল, আমি ঘোড়ায় চেপে যাব। সেজন্যে তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবার কথা কবুল করলাম। শেষনাগের কাছে গিয়ে দেখি বরফের পাহাড় থেকে গ্লেসিয়ার অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। মনে হচ্ছিল জ্যোৎস্নার দুধ অদৃশ্যালোক থেকে কেউ যেন ঢেলে দিয়েছে পাহাড়ের সর্বাঙ্গে। নীচে কালচে সবুজ জল তার ওপর ঝকঝকে সাদা বরফের টুকরো ভেসে আছে। মনে হল ওগুলো শেষনাগের মাথার মণি। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঝড়ের হাওয়া বইল। একটা মেঘ উড়ে এসে চাঁদটাকে ঢেকে ফেলল। সেই মেঘের কিনারে চাঁদের জ্যোৎস্নার রূপটি দেখে এমনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে আমার মনে হল বহু নিচে শেষনাগের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

বললাম, আমাকে তুমি চিঠিতে কবি বলে লেখ। কিন্তু আসল কবি তোমার ভেতরেই লুকিয়ে আছে। এখন বল তোমার দ্বিতীয় মৃত্যু-ইচ্ছাটির কথা?

সেটি আমি বলতে পারব না রঞ্জনদা।

সে কি! আমার কাছে তোমার না বলার তাহলে অনেক কিছুই আছে।

না তা নয় রঞ্জনদা, এটা তোমার কাছে বলতে আমার কেমন বাধছে।

ঠিক আছে, তাহলে শুনতে চাই না।

ও আমার হাতটা ধরে ফেলে বলল, খুব রাগ হল বুঝি ?

রাগ হবে কেন ? সব কথা তো সকলকে বলা যায় না।

আমি বলব, তুমি কিছু ভেবে বস না কিন্তু।

আমি কোন কথা না বলে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

হিমু বলল, সে আর এক জ্যোৎস্না রাতের কথা, সেদিনও আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছিল, তুমি যখন শিশিরমাখা হাতটা আমার কপালে বুলিয়ে দিয়েছিলে।

আমি নিবিড় করে ওর হাতটাকে ধরে রইলাম।

দুমাস কেটে যাওয়ার পর ও ছাড়া পেল ক্যানসার হসপিট্যাল থেকে। না, নিরাময়ের ছাড়পত্রে ও পায়নি, মৃত্যুর আগে শান্তিতে আর কটা দিন ঘরে কাটাবার অনুমতিপত্র পেয়েছিল। সেদিন আমার সঙ্গে হৃদিরঞ্জন আর হিমুর বাবা ছিলেন। সবার কাছ থেকে ও হাসিমুখে বিদায় নিচ্ছিল। কারুর হাতে হাত মেলাচ্ছিল, কারু কপালে চুম্বন চিহ্ন এঁকে দিচ্ছিল, কারু গায়ে হাত বুলিয়ে আদর জানাচ্ছিল। ও কিন্তু সেদিন কোন ফুল পায়নি।

হসপিট্যাল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ও বলল, বাব্বা, এতদিনে বাঁচলাম। দম যেন আমার বন্ধ হয়ে আসছিল।

শেষ কটি দিনের জন্য ওর তিনটি আশ্রয় ছিল। একটি তার পিতৃগৃহ, অন্যটি হৃদিরঞ্জনের সেই কুটীর, আর তৃতীয়টি আমার কলকাতার বাসাবাড়ি।

আশ্চর্য ঘটনা, ও কলকাতাতেই থাকতে চাইল। বাবাকে বলল, মা আমার দুঃখ সইতে পারবে না, তাই ওখানে আর যাব না। মাস্টারমশাই আমার জন্য অনেককিছু করেছেন, তাঁকে আর কষ্ট দিতে চাই না। বিশেষ করে এই গরমের দিনে মাস্টারমশায়ের উঠোনে শিউলিগাছটায় ফুল দেখতে পাব না, এ আমি সইতে পারব না। তাই রঞ্জনদার অসুবিধে না থাকলে কটা দিন তার বাসাতেই আমি কাটাতে চাই।

হিমু সুস্থ থাকলে এসব কথা নিয়ে নানারকম আলোচনা হতে পারত, কিন্তু ওর শেষ ইচ্ছায় কেউ বাধা দিল না। হিমু আমার ঘরে এল।

আমি ওর জন্যে একটি আয়া রাখতে চেয়েছিলাম। আমার কাজের মেয়ে নর্মদাদি বলল, আমার মেয়ে চলে যাবার সময় আমি তাকে নিজের কোলে শুইয়ে সেবা করেছি, কত রাত্তির জেগেছি। আমি থাকতে আবার একটা লোক ঢোকাবে কি গো। দিদিমণি তো আমার মেয়ের মতন।

হিমুকে সে কি সেবাযত্ন নর্মদাদির।

আমি কলেজ থেকে ফিরে এসে রাত্রে ওর সঙ্গে গল্প করতাম। আমার পাশের ঘরে নর্মদাদির সঙ্গে ও থাকত। দোতলার দক্ষিণ দিকের ব্যালকনিতে দুটো বেতের চেয়ার পড়ে থাকত। ওই চেয়ারে বসলেই কবরখানাটা দেখা যেত। আমি ওখানে বসেই 'ডাক্তার জনসনের ডায়েরী' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলাম। জ্যোৎস্নারাতে নিমফুলের গন্ধ ভেসে আসত। কবরখানাটি মায়াময় হয়ে উঠত।

হিমু আসার পর আমি ব্যালকনিতে যাবার দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। আমি চাইছিলাম না যে হিমু তার শেষের কটা দিন কবরের দিকে চেয়ে থাকে।

এক রাতে নটার পর কলেজ থেকে আমি বাড়ি ফিরলাম। সে রাতটি পূর্ণিমার। আমি কবরখানার পাশ দিয়ে আসতে আসতে দূরে আমার বাসার দিকে চেয়ে দেখলাম। বারান্দার চেয়ারে কে যেন বসে আছে! কাছে এসে দেখলাম হিমু। আমি তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে ওর কাছে চলে গেলাম।

হিমু আমার পায়ের সাড়া পেয়ে বলল, রঞ্জনদা এতদিন তুমি আশ্চর্য একটা জগতের দরজা আমার চোখের সামনে বন্ধ করে রেখেছিলে, দেখ আজ সে দরজা খুলে আমি বেরিয়ে এসেছি। তুমি বস আমার পাশে।

কতক্ষণ ও চুপচাপ কবরখানার দিকে চেয়ে বসে রইল। আজ আমি এই প্রথম জ্যোৎস্নালোকে কবরখানার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিবোধ করলাম।

একসময় ও বলল, রঞ্জনদা দেশে নয়নজলিতে এখন পদ্ম ফুটেছে আমি এখানে বসে সে পদ্ম দেখতে পাচ্ছি।

হঠাৎ বুকের ভেতর থেকে একটা মাখন রঙের পাপড়ি বের করে ও আমাকে দেখিয়ে বলল, এটি ব্রহ্মকমল। এর ছোঁয়াতেই তো আমার হৃদকমল ফুটেছে।

রাতশেষে নর্মদার আকুল ডাকে হিমুর ঘরে ছুটে গেলাম, চাঁদের শেষ আলোটুকু পশ্চিমের জানালা দিয়ে হিমুর বিছানা আর বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। হিমু নিস্পন্দ। তার বুকের ওপরে রয়েছে সেই ব্রহ্মকমলের পাপড়িটি।

কিরে কেমন আছিস?

পেছন ফিরে দরজার দিকে চেয়ে দেখি, মেজদা।

ভারী আনন্দ হল মনে। অনেক দিন পরে মেজদার সঙ্গে দেখা। বললাম, কোত্থেকে উদয় হলি রে?

কর্ণিকা থেকে আসছি। বাড়ি যাইনি। ভাবলাম, বছর তিনেক তোর সঙ্গে দেখা হয়নি, একবার দেখা করে যাই।

বোস, বোস, এই খাটের ওপরেই বসে পড়।

মেজদা একটু ইতস্তত করতে লাগল। দেখে বললাম, কি হল?

না রে, একেবারে জামাকাপড়গুলো নোংরা হয়ে গেছে। স্নানের জায়গাটা দেখিয়ে দে, একেবারে স্নান সেরে ধোয়া জামা কাপড় পরে বাবু হয়ে বসি।

বললাম, তোর যেমন মর্জি, তুই তো জানিস, আমার পরিষ্কার বাতিক আর ছুঁই ছুঁই বাই নেই।

নর্মদাদিকে ডাক দিয়ে বললাম, তোমার আর এক দাদা এসেছে, আমার মেজদা।

রান্নাঘর থেকে মাছ সাঁতলানোর ছ্যাঁকো ছ্যাঁকো শব্দ আসছিল। এবার

সম্ভবত কড়াটা নামিয়ে নর্মদাদি খুশি হাতে নতুন মানুষকে দেখতে এল।

সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য হল, তোমার পানা তো নয়গো।

আমার মেজদা লম্বা আর শ্যামবর্ণ। গলায় গণ্ডমালার দাগ।

পাণ্ডববর্জিত লোনামালে জমি দেখাশোনার ব্যাপারে মাকে বছরের অনেকগুলো মাস থাকতে হত। সে সময় আমি আর মেজদা প্রায় তাঁর কাছে থাকতাম। দাদা কিছু বড় বলে মামার বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করত।

মেজদা তখন সাত বছরের আর আমি পাঁচ। দিব্যি মনে আছে, মেজদার গলায় মালার মত গ্ল্যাণ্ড ফুলে গেল।

মা ওকে কাজের লোকের কাঁধে চাপিয়ে পাঁচ মাইল দূরে এক ডাক্তারখানায় পাঠালেন।

ওখানকার ডাক্তারবাবু প্রথম দিনেই একটি অপারেশান করে ছেড়ে দিলেন। তারপর আবার কবে যেতে হবে তাও লিখে পাঠালেন।

আশ্চর্য! অজ্ঞান করে অপারেশান করা হয়নি, তবু ছেলে গলা দিয়ে একটুখানি স্বর কিংবা চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বের করল না।

সারা রাস্তাটা চুপচাপ কাঁধে বসে এল। যেই মার মুখোমুখি হয়েছে অমনি লাফ দিয়ে নেমে মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কান্না, চীৎকার, কীল চড় চলল কতক্ষণ, শেষে দাঁত দিয়ে মায়ের কাপড়ের সামান্য অংশ বিদীর্ণ করে সেদিনের মত ক্ষান্ত হল।

সবকটি অপারেশানের বেলাতেই তার এই রূপ।

ডাক্তারবাবু এতটুকু ছেলের সহ্যশক্তির জন্য প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষদিন ডাক্তারের অগোচরে তাঁর অপারেশানের ছুরিটি পেশেণ্ট বাড়ি নিয়ে চলে আসে। সম্ভবত পেশেণ্টের ধারণা হয়েছিল, ডাক্তারবাবুর হাতে এই ছুরিটি থাকলেই কারু না কারু বিপদ ঘটবে।

পরের দিন মা ডাক্তারবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ছুরিটি ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন।

নর্মদাদিকে স্নানের ঘরে তোয়ালে, তেল, সাবান দিতে বললাম। মেজদা তার পোঁটলা কাম ব্যাগ থেকে গেঞ্জি, কাপড় বের করে নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকল।

অনেকদিন পরে মেজদাকে কাছে পেয়ে ভারী আনন্দ হল।

বড়দা মামার বাড়িতে মানুষ, ওর ধাত একটু আলাদা। ও পরিশ্রমী, হিসেবী, মা অন্ত প্রাণ। মায়ের কাছ থেকে ছেলেবেলা দূরে দূরে থাকত বলেই মায়ের ওপর ওর তীব্র একটা আকর্ষণ ছিল। চাকরী জীবনে মামার বাড়ি ছেড়ে যখন মায়ের কাছাকাছি এল, তখন সামান্য ছুটিছাটাতেও মায়ের হাতের রান্না আর আদর খাবে বলে পালিয়ে আসত। দুজনে সুখ-দুঃখের গল্প করত ওপরের বারান্দায় বসে। মায়ের সামান্য অসুখ করলেও দাদা কেঁদে কেটে সারা হত।

নিজের খরচের মত টাকা রেখে প্রতি মাসে দাদা সব টাকাটাই পাঠিয়ে দিত

মায়ের নামে মণি-অর্ডার করে। কানাকড়ি দরকার ছিল না লেখার তবু দৈনন্দিন খরচের একটা হিসেব প্রতিমাসে চিঠির মাধ্যমে দাখিল করত মায়ের কাছে।

দুঃখের দিনে অনেক বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখত মাকে। বাড়ি এলে আমরা দেখেছি, মা যতক্ষণ না খেতে বসছে ততক্ষণ দাদা খাবেই না। তাই প্রতিদিন আমাদের খাবার পর দাদা মায়ের সঙ্গে খেতে বসত। আস্তে আস্তে খাওয়া আর গল্প করতে করতে খাওয়া ছিল দাদার স্বভাব।

অসম্ভব জেদী আমার বড়দা। ক্লাশ এইটে পড়ার সময় মামার বাড়ি থেকে চলে আসে নিজের বাড়িতে। এখানেই স্কুলে ভর্তি হয়।

ষাণ্মাসিক পরীক্ষার পর ফল দেখে মাস্টারমশাইরা একবাক্যে রায় দেন, এটি আস্ত একটি গর্দভ।

আমাদের জ্ঞাতিদের ভেতর দুজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের একজনকে ধরাধরি করে দাদাকে মা ক্লাশ টেন অব্দি তুললেন। সে যা নম্বরের ছব্বা। এগারো, পাঁচ, হাইয়েস্ট সতের।

মা গেলেন আমাদের এক জ্ঞাতি মাস্টারমশায়ের কাছে। আমাদের চেয়েও গরীব হয়ে গিয়েছিলেন ওঁরা। কিন্তু আমাদের ঐ দাদাটি পড়াশোনায় চিরদিনই সেরা ছেলে ছিল। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ আর অঙ্ক, সংস্কৃতে লেটার পেয়ে পাশ করেছিলেন।

মায়ের কাতরতা দেখে বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি ওর ভার নিলাম। যদি ও আমার সঙ্গে সহযোগিতা করে তাহলে ওকে পাশ করাবই।

মা বলল, আমি দরিদ্র তবু বিনি পয়সায় পড়াব না। আপনি বলুন, কতটুকু আমার দিলে চলবে?

হেসে বললেন উনি, একান্ত না দিয়ে যদি শান্তি না পান তাহলে মাসে একটি করে টাকা দেবেন।

মা প্রতি মাসে টিউশান ফি বাবদ দশটা করে টাকা দাদার হাতে পাঠিয়ে দিত।

টেস্টে দাদা প্রতি বিষয়ে ষাটের ওপর নম্বর পেল। হৈ হৈ পড়ে গেল মাস্টারমশাই আর ছেলেদের ভেতর।

দাদার তখন পড়ার ঘোর লেগে গেছে। সারাদিনে নিতান্ত দরকারী কাজকর্মটুকু ছাড়া দাদা সারাক্ষণ বই খুলে বসে আছে। রাত বারোটাতে শুতে যাবে, এলার্ম ঘড়ি ঠিক চারটেতে বেজে উঠবে।

মায়েরও ঘুম হত না। দাদা জেগে উঠলে মা তার পাশে গিয়ে বসত। হাত বুলিয়ে দিত পিঠে। দাদা মুখেই মাকে ঘুমুতে যেতে বলত কিন্তু আমরা জানতাম মা কাছে বসে থাকলে দাদার পড়া ভাল হত।

যে জিনিসটি খেতে ভালবাসত দাদা সেটি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মুখের কাছে যুগিয়ে যেত মা।

দাদার একটি আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। কোন

বইএর তিন পৃষ্ঠা পর্যন্ত দাদা চোখ বুলিয়ে যেত। মাঝে তিন চার বার ওপর দিকে চোখ তুলে কিছু ভেবে নিত। তারপর বইখানা দিয়ে দিত আমাদের কারু হাতে। গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেত তিন পৃষ্ঠা অব্দি। ইংরাজী, বাংলা যে কোন বইএর যে কোন তিন পৃষ্ঠা।

আমাদের জ্ঞাতিগুষ্ঠি ছিল অনেক। যিনি আমার দাদাকে টিউশনি পড়াতেন, তিনি সম্পর্কে ছিলেন আমাদের ঠাকুর্দা। যদিও আমার মায়ের চেয়ে তার বয়েস ছিল অনেকখানি কম। আমরা তাঁকে মাস্টারমশাই ডাকতাম না, অধরদা বলে ডাকতাম। তিনি সব কটি সাবজেক্ট দক্ষতার সঙ্গে পড়াতে পারতেন। আমাদের মত তাঁদেরও পূর্ব ঐশ্বর্যের তলানিমাত্র ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের ঐশ্বর্য তাঁর অটুট ছিল। আমি একবার কলকাতায় টাকার অভাবে খুব বিপদে পড়ে যাই। উনি কথাটা জানতে পেরে স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখে বেশ কিছু টাকা আমাকে পাঠিয়ে দেন।

উনি বলতেন, বুদ্ধি আছে, পরিশ্রমের ক্ষমতা আছে, সে ছেলে সাইন করবে না কেন। ঠিকমত একটুখানি গাইড করে দিলেই তরতর করে এগিয়ে যাবে।

আমার দাদার শিক্ষাজীবনের প্রথম সেতুবন্ধনের গোড়াপত্তনটি যিনি করে দিয়েছিলেন তিনি আমাদের অধরদা। আমরা তিন ভাই-ই তাঁর কাছে ঋণী। দক্ষ ডাক্তার যেমন রোগীর লক্ষণ দেখামাত্র রোগনির্ণয় করতে পারেন, একজন কৃতি শিক্ষকও একটি ছাত্রকে কতকগুলি প্রশ্ন করে জানতে পারেন তার ত্রুটিগুলো কোথায়। সেইমত শিক্ষার মেডিসিন প্রয়োগ করলেই সে সুস্থ হয়ে উন্নতির সোপানে অবলীলায় উঠে যেতে পারবে। দেশের উন্নতির জন্য ব্যবসায়ী নয়, একজন হৃদয়বান শিক্ষকের দরকার।

সেদিন দেশে গিয়ে অধরদাকে দেখলাম। রিটায়ার্ড করেছেন, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ থেকে। বাস্তুজমি আর জলজমির আয়ে সংসারটি স্বচ্ছন্দে চলে যায়।

প্রণাম করতেই বললেন, কেমন লাগছে বৃত্তিটি ?

বললাম, আপনার কাছে পড়েছি, তাই ঢ়া আর পড়ানো আমার প্রথম ভালবাসা।

এখনও সেই সহজ জীবনের মানুষটি আছেন। ছোট কাপড়টি পরেন। সুপুরুষ, মুখে হাসিটি লেগে আছে।

বললেন, সকালে এসেছ, নারকেল মুড়ি আর বাড়ির গুড় দিয়ে জলযোগ কর।

দুজনের জন্যেই ঐ খাবার এল।

খেতে খেতে গল্প করছিলেন, ওঁর জ্যেঠামশায় নীলমণিবাবুর গল্প।

নব্বই বছরের নীলমণিবাবু বসে থাকতেন মাটিতে পাতা একটি আসনে। অপূর্ব সুন্দর গঠন, পাকা আম আর দুধে মেশা রঙ। জীবনের বেশ খানিক পথ পেরিয়ে এসে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁর উত্তরোত্তর

বেড়ে গিয়েছিল। যৌবনে ইস্কুলের পড়া শেষ করে আশেপাশে কোন কলেজ দেখতে না পেয়ে ছুটেছিলেন বহরমপুর কলেজে। সেখানকার অধ্যাপকদের সম্বন্ধে যখন কথা বলতেন তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন আবেগে। অধরদার পড়াশোনার গোড়াপত্তন ওঁর কাছেই। অধরদা যখন কোন ছুটির শেষে বাড়ি থেকে কলকাতায় তাঁর কলেজে পড়তে বেরুতেন তখন জ্যাঠামাশায় তাঁর হাতে ধরিয়ে দিতেন একটা ফর্দ। সেই ফর্দে এক দুই করে নম্বর দেওয়া থাকত। প্রতি নম্বরের পাশে লেখা থাকত একটি করে প্রশ্ন। তিনি বসে বসে সে সব প্রশ্ন ভাবতেন অথবা যে সব বই পড়ে তাঁকে শোনানো হত সে সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসাগুলো ওই ফর্দে তিনি লিখে দিতেন। সংস্কৃত, ইংরাজী, বাংলা, অঙ্ক, সব বিষয়েরই প্রশ্ন থাকত তাতে। আবার যখন কোন ছুটিতে অধরদা বাড়ি ফিরতেন তখন তাঁকে ওইসব প্রশ্নের উত্তর জেনে অথবা লিখে নিয়ে যেতে হত। এই জ্ঞানতৃষ্ণা নীলমণিবাবুর আমৃত্যু মেটেনি।

মৃত্যুর সময় ডাক্তার নাড়ী দেখে বুক পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশান লিখছিলেন, নীলমণিবাবু অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, কি অসুখ?

তরুণ ডাক্তার বললেন, আপনার জেনে দরকার কি?

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল নীলমণিবাবুর ঠোঁটের কোণায়। বললেন, জানার দরকার ফুরিয়ে গেলেই তো মৃত্যু।

স্নানের ঘর থেকে ফিরে মেজদা বলল, গালে হাত দিয়ে কি ভাবছিস?

বললাম, তোদের সকলের কথা।

মেজদা হেসে বলল, আমরা সবাই কি রকম যুদ্ধ করছি সেই কথা ভাবছিস?

বললাম, মা তো আমাদের তিনজনকে কেবল যুদ্ধ করতেই শিখিয়েছে, ভাগ্য কি দেবে না দেবে সেকথা ভাবতে একদম বারণ করে দিয়েছে।

মেজদা বলল, তাই তো ভাগ্যের সঙ্গে রোজ মুখোমুখি লড়াই করে চলেছি।

এখন কি খাবি বল?

তুই কলেজ যাবি না।

আজ দুপুরে আমার কলেজ নেই। একেবারে সেই ইভনিং কলেজে যাব।

আমাদের বলতে না বলতেই নর্মদাদি একবাটি করে মুড়ি আর তার সঙ্গে পেঁয়াজি ভেজে নিয়ে এল। একটা প্লেটে চারটে লেডিকেনি। বলল, মিষ্টি দুটো করে দুভাই ভাগ করে খেও।

আমরা মুড়ি খেতে খেতে গল্প করছিলাম।

কর্ণিকার খবর বল।

মেজদা বলল, জমি উদ্ধারের কাজ প্রায় হাসিল। এবার বর্ষায় ধুম চাষ শুরু করে দেব ভাবছি।

বললাম, কতটা জমি পরিষ্কার হয়েছে?

দশ একরের মতো।

দাদা ইতিমধ্যে যায়নি ?

এই তো মাসতিনেক আগে গিয়েছিল। খুব মজার একটা ঘটনা ঘটেছে।

কি ব্যাপার ?

কর্ণিকার রাজার যে জঙ্গলটা আমরা কাটাচ্ছি সেটা দেখলে তোর খুব ভাল লাগত। জঙ্গলের ধার দিয়ে ধামরা নদী বয়ে যাচ্ছে। যে ঢিবির ওপরে আমি চালা বেঁধে আছি। তার চারদিকে অন্তত চার পাঁচ মাইলের ভেতর একটিও জনমনিষ্যি নেই। রোজ সন্ধ্যেবেলা শয়ে শয়ে হরিণ নদীতে জল খেতে আসে। আমি ওই ঢিবির ওপর বসে বসে দেখি। আমাকে ওরা পরোয়া করে না। কোন কোন সময় দু'একটা একেবারে কাছাকাছি এগিয়ে এসে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। জ্যোৎস্নারাতে আমি একা হাতে একখানা লাঠি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঘুরে বেড়াই। শুয়োরগুলো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। আমি লাঠি ঠুকে একটু-খানি তেড়ে গেলেই ওরা দৌড় লাগায়। কিছুক্ষণের ভেতরেই ঝিমন্ত বনটা হঠাৎ চমকে জেগে ওঠে। শুয়োরের পায়ের শব্দে অন্য প্রাণীরা জেগে উঠে ছুটতে থাকে। পাল পাল হরিণ, মোষ, বনবরা, আরও কত কি। ওরা বন ছেড়ে ফাঁকা মাঠের দিকে ছুটে চলে। আবার মাঠ পেরিয়ে অন্য একটা বনে ঢুকে পড়ে। সে বনের জন্তু-জানোয়ারগুলোও চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। পাখীতে প্রাণীতে সেকি চিৎকার !

বললাম, দারুণ তো।

ওখানে তো তুই যাসনি, গেলে তার ভৌগোলিক অবস্থানটা দেখে তোর ভালই লাগত। হয়ত একটা জঙ্গল পড়ল, তারপর মাইলখানেক ঘাসভর্তি মাঠ, তারপর আবার জঙ্গল আবার মাঠ। এবার শোন যে ঘটনাটা ঘটেছিল তার কথা বলি—এই শীতকালে কর্ণিকার রাজস্টেটে দেখা করে দাদা আসছিল আমার কাছে। বন পেরিয়ে একটুখানি এগিয়েই সে পেছনে কতকগুলো পায়ের সাড়া শুনতে পেল। পেছনে তাকিয়ে দেখে গোটা কুড়ি পঁচিশ বুনো মোষ। দাদাকে থামতে দেখে ওরাও থেমে দাঁড়াল। দাদা তখন ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু বুদ্ধি করে না ছুটে হন হন করে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। পেছনে আবার সেই পায়ের সাড়া, মোষগুলো দ্রুত এগিয়ে আসছে। দাদা তখন দারুণ আতঙ্কে পড়ে গেছে। সামনে একটা বটগাছ। দাদা বটগাছ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। মোষগুলোও পেছনে ছুটে আসছে। সেই অবস্থাতেই দাদার মনে হল, ওর গায় রক্তের মতো লাল একটা চাদর জড়ানো আছে। মোষগুলো আবার লাল রঙ সইতে পারে না, দেখলেই ক্ষেপে ওঠে। ও তার লাল চাদরখানা মোষ-গুলোর দিকে ছুঁড়ে দিলে। তারপর দৌড়ে এসে উঠে বসল বটগাছের একটা মোটা ডালে। সেখান থেকে দেখল লাল চাদরখানাকে সিংয়ের গুঁতোয় ফর্দাফাঁই করে দিয়েছে। এরপর বট গাছের তলায় এসে দাদার দিকে তাকিয়ে ফোঁসফাঁস করতে লাগল আর সিং ঘষতে লাগল গাছের গোড়ায়। ঘণ্টা তিনচার শুয়ে বসে রইল সেখানে। তারপর শত্রু নির্জীব ভেবে ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ

করে দূরে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, এত কাণ্ড ঘটেছে আমি তো কই জানি না।

তোর সঙ্গে দেখা হল কোথায় যে এসব বলব।

বললাম, এবার আমি নিশ্চয়ই জায়গাটা দেখতে যাব।

তুই যেরকম বাবু হয়ে উঠেছিস, একদিনও থাকতে পারবি না ওখানে।

দেখিস খুব পারব।

আরে আমার গল্প শোন না। রাতে তো বাঁশের দরজা লাগিয়ে শুই। একদিন শুনি কি দরমার দেয়ালের বাইরে ফোঁসফোঁস গর্জন। আমি ছোট্ট ঝোরকা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি একটা বিরাট অজগর সাপ পেট ফুলিয়ে শুয়ে পড়ে আছে, আর ফোঁসফোঁস আওয়াজ তুলছে। মনে হল বন থেকে শুয়োর জাতীয় কোন প্রাণী ভক্ষণ করে আমার কুঁড়েতে শোবার জন্য এসেছে। দরজা খোলা পায়নি বলে এমন ফোঁসফোঁসানি। সকালে কাজের লোকগুলো এসে কাহিল সাপটাকে ধরাধরি করে বাঁশে বেঁধে নিয়ে চলে গেল।

বললাম, সত্যি রে, তুই বলে ওই ভয়ঙ্কর রহস্যপুরীতে থাকতে পারিস।

মেজদা বলল, বর্ষা বসন্তের রূপ দেখলে তুই পাগল হয়ে যেতিস। বনে যে কত রকমের ফুল ফোটে, পাতা গজায়, কীটপতঙ্গ, পাখপাখালি ওড়ে তার লেখাজোখা নেই। শুধু ঘুরে ঘুরে দেখে যা, সারা জীবন মোজ হয়ে থাকবি। ওই ধামরা নদীটারই বা কত রূপ। ভরা বর্ষায় ঘোলাজলে যৌবনের ঢল। নাভিকুণ্ডে যেন ঘূর্ণির পাক দিচ্ছে। ভাটায় জল নেমে গেল পলিপড়া পিচ্ছিল চরে কাঁকড়াগুলো খিরখির করে ছুটে বেড়ায়। গর্তের ভেতর ঢোকে আবার বেরোয়। ডাখুর মাছগুলো ড্যাবডেবে চোখ মেলে জল থেকে উঠে আসে তাদের দেখতে। সে এক অন্য জগৎ অন্য প্রাণ!

মেজদা, আমাদের কুঁড়েটার সামনে কোন গাছ রাখিসনি?

গাছ কি রে একটা ছোট জঙ্গলই রেখে দিয়েছি। যদি ঐ ঢিবিটার ওপরে কোনদিন বাড়ি তুলি তাহলে ঐ জঙ্গলটাই হবে আমাদের বাড়ির প্রাণ। ধামরা নদীর চরে যেসব বক আর পাখপাখালি ঘুরে বেড়ায় তাদের যদি দেখতিস সন্ধ্যেবেলা!

কেন রে?

ঠিক যেন লাল সাদা ফুল ফুটে আছে গাছে গাছে। বিশেষ করে গোখুঁটো বকগুলো তো ধবধবে সাদা। তাদের ঝাঁকড়া গাছের ডালে ডালে দেখলে মনে হবে, রাশি রাশি সাদা ফুল ফুটে আছে।

বর্ষায় কি রকম দেখায় রে?

সে দৃশ্যের বর্ণনা ঠিক মত দেওয়া যাবে না। দূরের বনগুলোর কালচে সবুজ মাথায় কুয়াশার মত জলের ঘোমটা টানতে টানতে বৃষ্টি আমার পাশের জঙ্গলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর কুঁড়েখানাকে ভিজিয়ে, চুবিয়ে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেল ধামরা নদীর সঙ্গে টুপুর টাপুর কথা বলতে।

ঐ নির্জন জঙ্গলে থেকে তুই একেবারে কবি হয়ে গেছিস মেজদা। এবার

যাবার সময় তোকে আমি কটা প্যাড তৈরী করে দেব, তুই ওখানে বসে বসে যা দেখবি, তাই লিখবি।

ঠিক আছে, পরে তোকে ওগুলো দিয়ে যাব। তুই তোর উপন্যাসের মাল-মশলা পেয়ে যাবি।

এই আমার সেই মেজদা, বুকভরা অফুরন্ত সাহস আর উদ্যম। হাস্যমুখে যাঁরা অদৃষ্টকে পরিহাস করতে পারে তাদের পুরোভাগে চলার ক্ষমতা রাখে মেজদা।

দশ বছরের ছেলে গাঁয়ের লোকের মুখে কলকাতার গল্প শুনেছে। নৌকোয় করে কাউকে না বলে পালিয়ে এসেছে কলকাতা। উঠেছে পুরোসুন্দরী ধর্মশালায়। কলকাতা দেখে ভায়ের জন্য কেক কিনে নিয়ে দেশে ফিরেছে। ছোট ভাইয়ের কথা ভোলেনি সে।

এই মেজদা ছেলেবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে আধসের রসগোল্লা বাজি রেখে খালের ধারে মাঝরাতে মহাশ্মশানে একা গিয়েছে। সেদিন সদ্য দাহ করা হয়েছিল যে মানুষটিকে তার শ্মশানচুল্লির ওপর থেকে তুলে এনেছে আধপোড়া একখানা কাঠ। ঐ কাঠ দেখিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে আদায় করেছে রসগোল্লা।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, সামান্য একটুকরো লাঠি নিয়ে ফণা তোলা বিষাক্ত গোখরো সাপের সঙ্গে মেজদা লড়াই করছে। আমি দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধটা দেখেছিলাম।

মেজদা পুরোনো ইঁটের স্তূপের পাশ দিয়ে ঘুরে ঢুকতে যাচ্ছিল। এমন সময় সামনে ফোঁস করে ফণা তুলে দাঁড়াল তঁপ (গোখরো) সাপটি।

দেখলাম, মেজদা বেজির মত ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে সরে গেল। সাপ ওর উদ্দেশ্যে যে ছোবলটা মেরেছিল, তা মাটিতেই পড়ল।

ইতিমধ্যে একটা খেজুরের ছোট শুকনো ডাল হাতের নাগালে পেয়ে গেছে মেজদা। তাই নিয়ে চোদ্দ বছরের ছেলেটা বেজির মত ঘুরে ফিরে লড়াই চালাল কতক্ষণ। শেষে ঐ তেজী সাপটাকে ফণা নামিয়ে পিছু হটতে হল। মেজদা কিন্তু ঐ ভয়ংকর শত্রুটিকে ছেড়ে দিল না। ইঁটের পাঁজায় যেই মুখ ঢুকিয়েছে অমনি ধাঁই করে লাঠির বাড়ি পড়ল তার ঘাড়ে। এরপর লেজ ধরে আস্ত সাপটাকে সজোরে বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগল মেজদা। নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ক'পাক ঘুরে নিল। তারপর এক সময় ধাঁই করে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল সাপটাকে।

আমি মেজদাকে ঐ লড়াইএর সময় যাতে চেঁচিয়ে সাবধান করতে না যাই সেজন্যে মা আমার মুখে তার হাতটা চাপা দিয়ে রেখেছিল।

মেজদা সাপটাকে পোড়াল। দাউ দাউ করে খড়ের আগুন জ্বলছিল। মেজদা লাঠি খুঁচিয়ে আগুনকে উসকে দিচ্ছিল। মায়ের মুখে শোনা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের কথা মনে হচ্ছিল আমার।

এই আমার সেই মেজদা যে বৃষ্টির ভেতর চোদ্দ পনেরো মাইল পথ হেঁটে গিয়ে রুই কাতলার পোনা সংগ্রহ করে একটা ভারীর কাঁধে চাপিয়ে আবার

এতখানি পথ হেঁটে ফিরত। সারা রাত জেগে পোনাগুলো বাঁচাতে ঢেউ দিত হাঁড়ির জলে। পরদিন সকালে পুকুরে ছেড়ে দিত সে পোনা।

একবার শুনল, সুবর্ণরেখার কোথায় যেন মাছ ডিম ছাড়ে। ব্যস, অমনি চলল, উড়িষ্যার দিকে। বাসের মাথায় চেপে, বালি ভেঙে হেঁটে, নৌকো করে এসে পৌঁছল তালচুয়া গ্রামে। সুবর্ণরেখার এপারে তালসারি আর অন্য পারে তালচুয়া গ্রাম। এক উড়িষ্যাবাসীর কুটিরে পয়সা কড়ি দিয়ে রইল কয়েকদিন। সেই আশ্রয়দাতা সময়মত ওকে একদিন নিয়ে গেল নদীর ধারে। বালির চর পেরিয়ে দাঁড়াল নদীর স্রোতের কাছাকাছি। ডেলা ডেলা ডিমের চাক ভেসে আসছে স্রোতে। নদীর উজানের দিকে উঠে গিয়ে মাছ ডিম পাড়ছে। সে ডিম স্রোতে ভেসে চলেছে। তার থেকে ফুটবে চারা পোনা।

সব বিষয়ে অসীম কৌতূহল মেজদার। ডাক্তারবাবুদের চিকিৎসাবিদ্যা কিছুকাল লক্ষ্য করল। তারপর একদিন গিয়ে আমাদের চাষবাড়ি চকে জমিয়ে বসল। চাষাভুষো আর জেলে বাগ্দী ছাড়া সেসব অঞ্চলে বিশিষ্ট কোন লোকের বাস ছিল না। শুরু হয়ে গেল ডাক্তারী। জ্বর-জারিতে ওষুধ প্রেসক্রাইব করা হচ্ছে। নরুণ পুড়িয়ে বড় বড় ফোঁড়া অপারেশান হচ্ছে।

ডাক্তারবাবুর বাড়িতে অঢেল মাছ, কলা মুলো, পেঁপে। ফি নেন না, তাই খাদ্যবস্তুর ভেট।

আমি একবার চকে গিয়ে ডাক্তারবাবুর টিকির দেখা পেলাম না। শুনলাম, চিকিৎসার ব্যাপারে ডাক্তারবাবু দূরের একটা গ্রামে গেছেন। তিনচারদিন সেখানেই আছেন।

হয়ত ভারী কোন রোগকে তাড়াবার জন্য সবরকম অস্ত্র প্রয়োগ করে দেখছেন ডাক্তারবাবু। তাই দেরী হচ্ছে ডেরায় ফিরতে।

একটি লোক সঙ্গে নিয়ে খোঁজ করে গেলাম। দেখা হল ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। এক কৃষকের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছেন। ডাক্তারবাবুকে দেখাবার জন্য রোগীদের সে কি ভীড়।

আমাকে দেখে মেজদা যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত। মেজদার সঙ্গেই আমার ভোজন, শয়ন চলল দুদিন।

অপরাহ্ণে মেজদা আমাকে নিয়ে যেত একটা খালের ধারে বটগাছের কাছে। সেখানে অনেকখানি জায়গা লোনামাটির দৌলতে ধবধবে সাদা। সেখানে এক কুচি তৃণও জন্মায়নি।

আমাকে নিয়ে একটা ঢিবির ওপর বসত মেজদা।

শত শত কাক পড়ন্ত বেলায় উড়ে এসে বসত ঐ ফাঁকা জায়গাটায়।

মেজদা বলত, কাকেদের বিচার সভা দেখ।

দুদিকে ভাগ হয়ে সারি সারি কাক বসল। তারা দর্শক। গোটা পাঁচেক কাক বিচারক হয়ে বসল মাঝখানে। দুটো করে কাক উড়ে এসে বসতে লাগল বিচারকদের কাছাকাছি। কিছুক্ষণ দু'পক্ষের কলরব চলল। তারপর বিচারক-দের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হল ওদের একজন। অমনি কিছু কাক তাড়া করে

মহা কলরবে গ্রামছাড়া করে দিয়ে এল তাকে।

প্রতিদিন এমনি বিচার সভা বসে কাকেদের। কাকচরিত্রে অভিজ্ঞ মেজদা আমার কাছে ওদের আচার-আচরণ, ভাব-ভাবনার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে যায়।

সেখান থেকে মেজদা ভাগ্যপরীক্ষার জন্য চলে গিয়েছে উড়িষ্যার কর্ণিকা রাজের জমিদারীতে। রাজার বাড়িতে কি করে যেন টিউবওয়েল বসানোর কাজটি যোগাড় করে। সুপেয় জল পেয়ে রাজামশায় ভারী খুশী। পুরস্কার দিতে চাইলেন কলির অর্জুনকে।

অর্জুন, কিছু জমি চাইলে রাজা বাহাদুর ধামরা নদীতীরের ঐ জঙ্গলটি বন্দোবস্ত দিলেন। মেজদা এখন সেখানেই লড়াই করছে তার ভাগ্যের সঙ্গে।

মায়ের কাছ থেকে মেজদা পেয়েছে দুর্জয় সাহস, কিন্তু পায়নি সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধ আর সাংসারিক হিসেব বুদ্ধি। মায়ের শেষের গুণটি একমাত্র আমার বড়দাই পেয়েছে। আর দুটি গুণ বড়দা পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে। লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ আর পড়াশোনার প্রতি অনাগ্রহী ছেলেদের উৎসাহ দিয়ে আগ্রহী করে তোলা।

অনেক সময় মাকে দেখেছি, গ্রামের কোন লোককে কাছে ডেকে বলছে, হারু, ছেলেটাকে এই বয়সে মাঠে নামিয়ে দিলি ?

কি করব মা, গরীবের সংসার। পড়ছিল ইস্কুলে, বেতন, বই কিছুই যোগাতে পারি না।

মা সাহস দিয়ে বলল, আমি বই কিনে দেব, কিছু মাইনের ব্যবস্থাও করে দেব, আর দুটো একটা বছর পড়ুক।

হারু বলল, বড়মা, তাই হবে।

দাদাকে দেখা যেত কোন ছেলের পেছনে তাড়া করতে। তাড়া করার অর্থ হল, পড়াশোনা যে কত সহজ কর্ম, তা তার মগজে ঢোকান। হয়ত নিজেই তাকে নিয়ে পড়াতে বসে গেল। ঘরের খেয়ে এমন বনের মোষ তাঁড়াতে দাদার মত আমি অন্তত আর কাউকে দেখিনি।

আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল কম বয়সে। দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে মা আর ইস্কুলমুখো হয়নি। কিন্তু মায়ের বিদ্যোৎসাহী বাবা মাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। অকারণে দেব দ্বিজে ভক্তি না করতে শিখিয়েছিলেন। কোন রকম কুসংস্কার যাতে মনকে আচ্ছন্ন করতে না পারে, সে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নিজে ছিলেন নামকরা কবিরাজ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির খবরে তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। মায়ের ভেতর সেই তৃষ্ণা সঞ্চারিত করেছিলেন। মায়ের বিশ্ব-ইতিহাস পাঠের আগ্রহ তাঁর বাবার কাছ থেকেই এসেছিল।

মায়ের মুখে গল্প শোনার জন্য অনেকেই অবসর সময়ে জড়ো হত। বিষাদ-সিন্ধু, নন্দকুমারের ফাঁসি, ভাওয়াল মামলা, বিলাতি গুপ্তকথার গল্প যে সব শ্রোতা শুনেছে মায়ের মুখে তারা তা ভুলতে পারবে না কোনদিন। শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস থেকে মা যখন গল্প করত তখন ডায়লগগুলো মুখস্থের মত বলে যেত। বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের।

মা তিন চারখানা উপন্যাস লিখেছে। আমি দেখে অবাক হয়েছি তার বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে। মায়ের বাপের বাড়ির কাছাকাছি সমুদ্র। সেখানকার জেলেদের নিয়ে মা উপন্যাস লিখেছে। আমাদের চকের বাগ্‌দীদের জীবনযাত্রা নিয়ে লেখা মায়ের উপন্যাসটি আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে। তাছাড়া ছোটবেলায় মা তার বাবার সঙ্গে পালকিতে করে মুসলমান দেওয়ান বাড়িতে চিকিৎসার জন্য যেত। দেওয়ান বাড়ির মেয়েরা মায়ের বন্ধু ছিল। তাদের নিয়েও মা উপন্যাস লিখেছে।

মায়ের কোন গুণই আমি পাইনি, তবে তার এই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতাটি কিছু পরিমাণে আমার ভেতর সঞ্চারিত হয়েছে।

খেতে বসে কথা হচ্ছিল।

তোর খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা করেছিস রে মেজদা ?

জঙ্গল কাটতে যারা আসে তারা অনেক দূরের হাট থেকে চাল কিনে এনে দেয়। তোরা সেই মোটা চালের ভাত খেতে পারবি না, আমার কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেছে।

তরি-তরকারি ?

আমাদের ঘর তোলার সময় জমিটা উঁচু করার জন্যে একটা টবনা (ডোবা) খুঁড়তে হয়েছিল। ঐ মাটিতেই ভিত উঁচু হল আর একটা মোটামুটি সব্জি ক্ষেত হয়ে গেল।

মাছ পাস কোথায় ?

টবনায় বঁড়শি ফেলে ছোট ছোট মাছ ধরি। কোনদিন ইচ্ছে হলে নদীর ধারে যাই। বাহার গাঙ থেকে যখন জেলে নৌকোগুলো ফেরে, তখন তাদের কাছ থেকে বড় মাছ কিনি। তাছাড়া জঙ্গল-কাটিয়েরা কোথা থেকে মাঝে মাঝে কচ্ছপ যোগাড় করে আনে। একদিন ওরা হরিণ মেরে বেশ খানিকটা মাংস দিয়ে গেল।

বললাম, তাহলে বেশ রাজভোগে আছিস বল ?

তা বলতে পারিস।

ওখানে থাকতে তোর কোন অসুবিধে হচ্ছে না ?

একটুও না। বই আর পত্রপত্রিকা নিয়ে গেছি একরাশ। তাই পড়ে সময় কাটে। তাছাড়া বনের গাছগাছালির ভেতর ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে। গভীর অন্ধকার রাতে আমি অনেক সময় বিছানার ওপর উঠে বসে থাকি। জঙ্গল থেকে কীটপতঙ্গ, পশুপাখির কত রকম যে আওয়াজ ভেসে আসে তার লেখাজোখা নেই। হঠাৎ হয়ত এক ঝাঁক জোনাকী নাচতে নাচতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে উড়ে এল আমার কুঁড়েটার দিকে। ঝোরকা দিয়ে দেখি ওরা নাচছে। পাশে, ওপরে নিচে ঘুরে ঘুরে সে কি নাচের মহিমা। তুই তো কবিতাটবিতা লিখিস, তোর মনে হত, আকাশ থেকে আলোর একটা পরী নেমেছে। তার গায়ে হীরের গয়নাগুলো ঝলমল করছে।

মেজদার যেমন উদয় তেমনি অন্তর্ধান। যাবার সময় আমি তাকে অনেকগুলো পুরোনো শারদীয় পত্রিকা যোগাড় করে দিই। একটা নতুন টর্চ আর কয়েকটা ব্যাটারি দিতে গেলে নিতে চাইল না। বলল, অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে। এই দুটো চোখে অন্ধকারেও দেখতে পাই, টর্চ ব্যবহার করলে অল্প দিনেই কাণা হয়ে যাব। ভগবানের দেওয়া ইন্দ্রিয়গুলোকে যত কাজে লাগান যায় ততই ভাল।

বললাম, ঠিক আছে, তোর হিসেব মত তুই চল।

আমি হয়ত দুঃখ পেয়েছি ভেবে ও বলল, তুই তো জানিস, ছোটবেলা থেকেই আমি সাপের গন্ধ পাই। সাপের সরসরানি চলার আওয়াজ ঠিক আমার কানে এসে বাজবেই। ওকে আমি ছাড়ব না। ওকে আমি কি ভয় পাব রে, ও আমার ভয়ে পালাবে।

আমি মেজদার চরিত্র জেনেও ওকে বোকার মত সাহায্য করতে গিয়েছিলাম।

মেজদা বলল, এখন আমি প্রায় পুরোপুরি আরণ্যক জীবনের ভেতরে রয়েছি। ওর স্বাদটা আমাকে নির্ভেজাল পেতে দে।

বললাম, তোর ঢিবিতে যে অজগরটা বেড়াতে এসেছিল তার খোঁজখবর আর রাখিস ?

আরে তোকে বলাই হয়নি তার কথা।

উৎসুক হয়ে বললাম, কি রকম ?

এক অন্ধকার রাত্রে জঙ্গল থেকে একটা শব্দ ভেসে আসতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। কান খাড়া করে শুনলাম, কোন একটা বড় ধরনের জানোয়ারের আর্তনাদ। সেই শব্দটা ধীরে ধীরে কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল। অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আর্তনাদটা শোনা গিয়েছিল। ভোরবেলা জঙ্গল সাফাইকাররা এসে আমাকে একটা খবর দিলে। আমি দেখতে ছুটলাম। গিয়ে দেখি, একটা অজগর আস্ত একটা হরিণের কিছু অংশ গিলেছে। পুরোটা গেলার ক্ষমতা ছিল না তার। আবার উগরে দেওয়াও অসম্ভব ছিল তার পক্ষে। দেখলাম, মাঝারি ধরনের একটা 'ধ' গাছের গুঁড়িতে দু'পাক লেজ জড়িয়ে অজগরটা তার শিকার ধরেছে। তখন সাপটার বীভৎস মূর্তি। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। হাঁখানা দেখার মত।

সবকটা জঙ্গল-কাটিয়ে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। কিন্তু তারই ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে কখন যেন সাপটাকে টাঙি চালিয়ে কোপাতে শুরু করে দিয়েছিল। মালকোচা মারা কাপড়টাকে নেংটির মত গুঁজে নিয়েছিল কোমরে। আমার দিকে পেছন ফিরে সে টাঙি চালাচ্ছিল। সেই ভোরবেলাতেই দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ছিল তার পিঠ বেয়ে।

অবশেষে অজগরটা বেঁকেচুরে চিৎ হয়ে গেল। লেজের পাকটা শিথিল হয়ে খুলে পড়ল গাছ থেকে।

সাপটা নিশ্চিত মরেছে জেনে সবাই ছুটল সেদিকে। এখন তারা টেনে হিঁচড়ে অজগরের মুখ থেকে বের করে আনল হরিণটাকে। টেনে নিয়ে গেল

খানিক দূরে। শুরু করে দিল ছাল ছাড়াতে।

এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। সাড় ফিরে আসতে আমি ভাল করে সেই লোকটার দিকে তাকালাম। লোকটা তখন তার কাজ শেষ করে টাঙি হাতে নিয়ে ওদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল।

গাছের ফাঁক দিয়ে ভোরের আলোটা এসে পড়ল লোকটির মুখে।

এখন আমার চোখ গিয়ে পড়ল স্পষ্ট তার মুখের ওপর। আমি ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। আবার ভাল করে চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে তাকালাম। ভুল দেখছি না তো?

না, ঠিক সেই।

এবার মেজদা সিধে আমার দিকে চেয়ে বলল, বল তো, আমি কাকে দেখলাম?

আমি সবিস্ময়ে বললাম, কি করে জানব!

মেজদা রহস্যটাকে আরও ঘনীভূত করে বলল, তুই তাকে খুব চিনিস।

আমি স্মৃতির অন্ধকার কোঠায় একবার হাতড়ে নিলাম। সেই মুহূর্তে কাউকে দেখতে পেলাম না।

বললাম, কে সে। আমি একেবারে ভাবতে পারছি না।

তুই এক সময় ঐ মানুষটার সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরতিস।

আমি ভূত হাঁ করে আছি দেখে মেজদা বলল, গোবর্ধনদা রে গোবর্ধনদা।

আমার বিস্ময় তখন সত্যিই তুঙ্গে। বললাম, সত্যি বলছ? গোবর্ধনদা ঐ জঙ্গলে টাঙি চালিয়ে অজগর কুপিয়ে মারছে!

আমিও প্রথমে তোর মত বিশ্বাস করতে পারিনি। পরে যখন পুরোপুরি খেয়াল হল তখন ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, গোবর্ধনদা, তুমি এখানে?

আমাকে ওখানে দেখে গোবর্ধনদা ততোধিক বিস্মিত। বলল, তুই এখানে হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হল মণ্টু?

আমি বললাম, এখানে কথা হবে না, চল আমার ডেরায়।

হাত তুলে আমার খড়ে ছাওয়া প্রাসাদটা দেখিয়ে দিলাম।

বললাম, সত্যি, ভারী অবাক লাগছে ব্যাপারটা।

মেজদা বলল, সারাদিন আমার সঙ্গে ছিল গোবর্ধনদা। দুজনে শুধু গল্প করেই দিনটা কাটিয়ে দিলাম।

অধীর হয়ে বললাম, ও ওখানে গেল কি করে?

মেজদা বলল, গোবর্ধনদার মুখে যা শুনলাম, তা হল, বোর্ডিংএ আর মন টিকছিল না গোবর্ধনদার। ওর পরিচিত মাস্টারমশাইরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তাই ফাঁকা মনটা নিয়ে সেখানে আর কাজ করতে ভাল লাগছিল না তার।

বোর্ডিং ছেড়ে দিয়ে কি কাজে যেন ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে পড়েছিল খড়্গপুরে। সেখানে একটা চটিতে রাত কাটাতে গিয়ে পরিচয় হয় এক

ঠিকাদারের সঙ্গে। লোকটি কর্ণিকা রাজার কাছে বনের কিছুটা অংশ ইজারা নিয়ে গাছ কেটে চালান দিচ্ছিল। গোবর্ধনদার সঙ্গে কথা বলে তার খুব ভাল লেগে গেল।

লোকটি বলল, জঙ্গল-কাটিয়েদের তদারকীর জন্য একজন লোক চাই আমার। তুমি কি করবে এ কাজটা ?

গোবর্ধনদা সঙ্গে সঙ্গে রাজি। চলে এল আমার পাশের জঙ্গলে।

আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি গোবর্ধনদা তিন তিনটে মাস আমার এত কাছে রয়েছে।

বিকেলের দিকে গোবর্ধনদার ডেরায় গেলাম। প্রাসাদ দেখে আমি মোহিত। পাশাপাশি তিনটে গাছের কাণ্ডে বাঁশ বেঁধে একটা কুঠি তৈরী করা হয়েছে। বাঁশের মই বেয়ে আমরা সেই বৃক্ষ-নিকেতনে ঢুকলাম। জঙ্গলের অনেকখানি আর নদীটা ওখান থেকে বেশ ভালই দেখা যাচ্ছিল।

আমি আর গোবর্ধনদা সে রাতে ঐ কুঠিতেই কাটিয়েছিলাম। কচ্ছপের মাংস আর মোটা চালের ভাত খেয়ে, গল্প করে রাতটা বড় আনন্দে কেটেছিল।

মেজদার কথা শুনে মনটা আমার ভারী হয়ে উঠেছিল। যে গোবর্ধনদাকে আমি আমার ছোটবেলার হিরো বলে জানতাম, যাকে আমি আমার মাস্টার-মশাইদের ওপরেও যদি কোন স্থানে থাকে সেই স্থানে বসিয়েছিলাম, তার এই হঠাৎ পরিণতি প্রথমটা মেনে নিতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। পরে মনে হল, গোবর্ধনদা যে ধরনের চরিত্রের মানুষ, তাতে এই আদিম বৃক্ষে পূর্ণ জঙ্গলেই তাকে মানাবে ভাল।

আমি মেজদার দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির মত বলে উঠলাম, তোমার রাজ্যে আমি নিশ্চয়ই যাব, আর যত শীঘ্র পারি।

নীরবতার একটা ভাষা আছে। সঙ্গীতার মতো কাউকে না দেখলে তা বোঝা যাবে না। ঘন কালো দুটো ভ্রূর তলায় কালো ভ্রমরের মতো দুটো চোখের তারা তুলে সে যখন তাকায় তখন তার ওই নীরব চাউনির ভেতর দিয়ে হাজার কথার ফুল ফুটে ওঠে। তার সমস্ত মুখে আশ্চর্য এক সরলতার শ্রী আছে, কিন্তু সে সরলতা নির্বুদ্ধিতা নয়। ওর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সারল্য মিশে ওকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তোলে।

আষাঢ়ের শেষ দিনগুলোতে মাঝে মাঝে বর্ষণ শুরু হচ্ছিল, আবার মেঘগুলো পাতলা হয়ে কোন এক দিগন্তে উধাও হয়ে যাচ্ছিল। আমি 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকা অফিসে যাবার পথে বৃষ্টি পেলাম। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। আমি এক গাড়িবারান্দার নিচে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আমার আগেই এক আশ্রয়প্রার্থিনী এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ পায়ে একটা হাতের ছোঁয়া লাগতেই ফিরে দেখি সঙ্গীতা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মনের আনন্দটুকু চোখের ভাষায় উপচে পড়ছিল। সেই জীবনানন্দের কবিতার ছত্রটি যেন তার চোখের ভাষায় মুখর হয়ে উঠল—

'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'

চোখে তার পাখীর নীড়ের মতো উত্তপ্ত আশ্রয়ের আভাস ছিল না, প্রিয়জন দর্শনের এক অনুচ্চার আনন্দ-বিহ্বলতা ছিল। বনলতা সেনের মতো শ্রাবস্তীর কারুকার্য কোনদিনই দেখিনি তার মুখে, তবে কলিঙ্গ ভাস্কর্যের রমণীয় রমণী-মূর্তির সঙ্গে আশ্চর্য মিল ছিল তার। হাজার বছরের পথ চলার পর কবির সঙ্গে তাঁর প্রেয়সীর দেখা নয়, মাত্র দুবছর পরে আমি সঙ্গীতাকে দেখলাম।

ওর প্রথম কথা, আমার দেওয়া সূর্যমুখীর বীজগুলোতে কি ফুল ফুটেছে ?

হেসে বললাম, আমার টবের গাছে এখনও ফুটে আছে সূর্যমুখী। যদি যাও দেখাতে পারি।

ও মৃদু হেসে মুখ নামাল।

পরক্ষণেই চোখ তুলে বলল, আপনি কেমন আছেন ?

বললাম, দেখে কি মনে হচ্ছে ?

ও এবার এমনভাবে চোখমুখের ভাবটি করে আমার দিকে তাকাল, যেন ও বলতে চাইছে মুখে কি সবসময় মনের ছবি ধরা পড়ে ?

বেশ পেটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রাস্তার দুই কিনার ঘেঁষে হু হু করে বয়ে চলেছে জলের স্রোত। দু'চার সেকেণ্ড থেমেই আবার চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামছে।

বললাম পাশেই আমাদের পত্রিকা অফিস, যাবে নাকি সেখানে ?

ও মুখে কিছু বলল না, ঘাড়টি কাত করে সম্মতি জানাল। বৃষ্টির কয়েক সেকেণ্ড বিরতির ভেতরেই আমরা পাশের গলিতে ঢুকে দোতলার ওপর চলে গেলাম।

অজিতদা টেবিলে কাজ করছিলেন হঠাৎ মুখ তুলে আমাদের দেখে বললেন, এই সুন্দরী কন্যাটিকে আমি আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

বললাম, আমার পূর্ব-পরিচিত। এখন না হলেও একসময়ে কিছুদিন আমার কাছে পড়েছে।

অজিতদার মুখ সব সময়েই অনর্গল। তিনি বললেন, বৃষ্টির দিন, সুন্দরী তরুণী, নব মেঘদূত রচনার সব আয়োজনই সম্পূর্ণ।

আমি কিংবা সঙ্গীতা আমাদের পূর্ব সম্পর্ক বিবেচনা করে হাসি ছড়িয়ে অজিতদার কথার উত্তর দিতে পারলাম না।

অজিতদা সঙ্গীতার দিকে চেয়ে বললেন, এখন কি পড়ছ ?

সংস্কৃত নিয়ে এম. এ.-তে অ্যাডমিশান নিয়েছি।

অজিতদা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ছোট্ট ঘরটি ভরিয়ে তুলে বললেন, তবে তো আমি ঠিকই ধরেছি, মেঘদূতের নায়ক-নায়িকা হাজির।

আমি কপট একটু গাম্ভীর্য গলায় এনে বললাম, আপনার মুখে কোনকিছু আটকায় না অজিতদা।

অজিতদা বলল, আটকাবে কেন হে ? সুদর্শনা তরুণী, পাত্রটিও হেলা-

ফেলার নয়। তাহলে বাধাটা কোথায় শুনি ?

আমি এবং সঙ্গীতা দুজনেই তখন খুব বিব্রত হয়ে পড়েছি। সেই মুহূর্তে বৃষ্টিটা থেমে গেলে ও নিশ্চয়ই উঠে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে বলত, এখন তাহলে আমি আসি।

কিন্তু সঙ্গীতাকে বিশেষ বিব্রত অবস্থায় ফেলে দিয়ে বৃষ্টি ঝেঁপে এল।

এতক্ষণে অজিতদা আমাদের অবস্থাটা বোধ হয় উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি সজোরে হাঁক দিয়ে বেয়ারা শিউপুজনকে ডাকতে লাগলেন। শিউপুজন এসে গেলে তাকে মার্কেট থেকে মুড়ি, আলুর চপ আর নারকেল আনতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতার দিকে তাকিয়ে বললেন, কোন মিষ্টি তোমার পছন্দ বল, আনিয়ে নেব।

ও মাথা নেড়ে মিষ্টি করে হেসে জানাতে চাইল মিষ্টি ও খেতে চায় না।

আমি জানি মিষ্টিতে অধিকাংশ মেয়েরই রুচি কম, তবু প্রথম দিন এলে, মিষ্টি মুখ না করিয়ে তো ছাড়ব না। সন্তোষের দোকান থেকে চারটে চিত্রকূট এনো।

ও করুণভাবে একবার আকাশের দিকে, একবার অজিতদার দিকে তাকিয়ে মুখ নিচু করল।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া, গল্প-স্বল্পের পর আমরা পত্রিকা অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। আসার সময় সঙ্গীতা অজিতদার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

অজিতদা সস্নেহে বললেন, আবার আসা চাই কিন্তু, অধ্যাপকের সঙ্গেই এসো মানাবে ভাল।

সঙ্গীতা চোখেমুখে অদ্ভুত হাসি মাখিয়ে মাথা নাড়তে লাগল। অর্থটা এই, এমন করে বললে, আর আসব না এখানে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। সজল বর্ষার ছোঁয়ায় আবহাওয়াটি বেশ মনোরম। বললাম, আষাঢ়ের শেষ, সূর্যমুখী আর কতদিনই বা থাকবে। একদিন তোমার ফুল দেখে আসবে না ?

ও বড় বড় দুটো চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। মনে হল বিশেষ কোন অর্থ আছে ওই চোখের ভাষায়। ও হয়তো বলতে চাইছে, একটি কুমারী মেয়ে কি করে একজন অবিবাহিত পুরুষের ডেরায় গিয়ে উঠতে পারে।

আমি সেই কথা ভেবেই তাড়াতাড়ি বললাম, থাক, পরের বছর আবার তো ফুল ফুটবে, তখন সময় পাও তো দেখে আসবে।

ওর মুখে কথা ফুটল, আমার ফুলগুলো দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

আমি বললাম, আজ তো বেলা পড়ে এলো, অন্য কোনদিন দুপুরের দিকে চল।

ও বলল, আপনার দুপুরের দিকে ক্লাস নেই ?

রুটিনটা বের করে দেখে নিলাম। বললাম, বুধবার দুটোর পর ছুটি, সেদিন আমরা যেতে পারি। তুমি কি আগামী বুধবার পত্রিকা অফিসে আসবে ?

ও বলল, তাহলে ফিরতে দেরী হয়ে যাবে। আমি ঠিক দুটোয় প্রেসিডেন্সী

কলেজের গেটের বাঁ দিকে পুরনো বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকব।

বললাম, তাই হবে।

বুধবার ও আমার টালিগঞ্জের বাসায় এল। আমি একটু আড়াল থেকে দেখলাম, ছাদে উঠে ও সূর্যমুখীর ফুলগুলোকে গালে ছুঁইয়ে আদর করছে। মেঘভাঙা আলোটা অতি মনোরম লাবণ্য ছড়িয়ে দিচ্ছিল ফুলগুলোর ওপর। সঙ্গীতাও সে স্পর্শ লাভ করে আরও উজ্জ্বল আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার বাদল ছায়া নামল। দুচার ফোঁটা বেল কুঁড়ির মতো বৃষ্টি পড়তেই ও ঘরের ভেতর চলে এল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ওই দেখেছেন কদম গাছে ফুল ফুটেছে!

কবরখানার কোণায় একটা মাঝারি ধরনের কদমগাছ ছিল। বর্ষার ছোঁয়ায় সে রোমাঞ্চিত হয়ে ফুল ফুটিয়েছে।

বললাম, বর্ষাদিনের একটা গান শোনাবে না?

ও কিন্তু কোন ওজর আপত্তি করল না। ওর চোখমুখ দেখে মনে হল ও ভাবনার সুন্দর একটা জগতে প্রস্থান করেছে। ও বাঁ হাতে জানালার একটা গরাদ ধরে গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে একটা সুর গুন-গুনিয়ে উঠল ওর গলায়। ও গাইল—

'বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান,
আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান॥
মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে
এই যে আমার সুরের ক্ষেতের প্রথম সোনার ধান॥'

গান শেষ হলে ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, প্রশংসা করে তোমার গানের মূল্য আমি কমিয়ে দেব না। তবে এই মুহূর্তে বর্ষার অতিথিকে কিছু উপহার দিতে প্রাণ চাইছে।

ও যেন অন্য এক জগৎ থেকে আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল। আমার কথায় ও খুশী হল কি বিস্মিত হল বুঝতে পারলাম না।

আমি আমার সদ্যপ্রকাশিত প্রথম বই 'শৈলপুরী কুমায়ুন'টি ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, এটি কালই হাতে এসেছে। আর মাত্র চারদিন আগে একটি মেয়ের নামে বইটি উৎসর্গ করেছি, যদিও স্পষ্ট করে নামটি লেখার সাহস পাইনি।

ও দারুণ কৌতূহলী হয়ে উঠল। অজিতদা বইটি প্রকাশ করেছিলেন। শেষ মুহূর্তে আমি উৎসর্গের পাতাটিতে 'রাজকুমারীকে' বলে লিখে দি। অজিতদা খুব দ্রুততার সঙ্গে বইটি বাঁধিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমার হাতে তুলে দেন।

ও প্রথমেই বইয়ের উৎসর্গ পাতাটিতে চোখ বুলিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, রাজকুমারী কে?

বললাম, রাজার মেয়ে, যাকে সাধারণের পক্ষে লাভ করা দুর্লভ।

ও আরও কৌতূহলী হয়ে উঠল, সত্যি বলুন না রাজকুমারী কে?

বললাম, আমার প্রথম প্রকাশিত বইটি প্রথম যার হতে তুলে দিলাম উৎসর্গ পাতাটিতে তারই নাম উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

ও ভীষণ অভিভূত হয়ে বইখানা ওর বুকের ওপর চেপে ধরল।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেলাম। উঁকি দিয়ে দেখি নর্মদাদি উঠছে। কদিন দেশের বাড়ি গিয়েছিল, আজ ফিরল। হাতের ব্যাগে দেখলাম, শাকপাতা উঁকি মারছে।

উঠে এসেই ডানদিকে রান্নাঘরে ঢুকল। মেঝেতে ব্যাগটা উজাড় করে দিয়ে বলল, দেখ দাদা, কি এনেছি !

আমি আমার পড়ার ঘর থেকে সঙ্গীতাকে রান্নাঘরে পাঠালাম। চুপি চুপি নর্মদাদির পরিচয় দিয়ে বললাম, দেখে এসো, দেশ থেকে কি এনেছে নর্মদাদি।

ও অসংকোচে রান্নাঘরে ঢুকে বলল, কি এনেছ নর্মদাদি ?

নর্মদাদি পেছন ফিরে তাকাল সঙ্গীতার দিকে।

চেঁচিয়ে বলল, এমন সোন্দর দিদিমণিটাকে কোথা থেকে নিয়ে এলে দাদা ?

সঙ্গীতা সম্ভবত লজ্জা পেয়েছিল। সে নিচু হয়ে বসে বলল, একেবারে কাঁচা সবুজ সব তরকারি। শশাগুলো নিশ্চয়ই তোমাদের গাছের ?

হাঁগো দিদিমণি। ঐ যে ছোট থলেটা, ওর ভেতর কটা কই মাছ আছে। পুকুর থেকে তালগাছে উঠছিল, আমার মেয়েটা দেখতে পেয়ে ধরেছে।

সবিস্ময়ে সঙ্গীতা বলল, তালগাছে উঠেছে কই মাছ !

একেবারে পুকুরের জল ছুঁয়ে গাছ গো দিদিমণি। ওরা কানকো ঠেকিয়ে কেতরে কেতরে অনেকখানি উঠে যেতে পারে।

আমি ওদের কথার ভেতর ঢুকে পড়ে বললাম, দিদিমণি এখুনি চলে যাবে। তোমার কইমাছগুলো দেখালে, ভেজে খাওয়াবে না ?

নর্মদাদি ঝংকার দিয়ে বলল, তুমি বসত দিদিমণি, এখুনি কোথায় যাবে। আমি তাড়াতাড়ি তোমার খাবার তৈরী করে দিচ্ছি।

হেসে বললাম, কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, ও নিজের রান্না নিজেই করে নেবে।

সঙ্গীতা ওর সেই অর্থভরা চোখের দৃষ্টি ফেলল আমার মুখের ওপর। ওখানে একটা সূক্ষ্ম ব্যথা কচি পাতার বুকে ঝরে পড়া বৃষ্টির বিন্দুর মত কাঁপছিল।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, দিদিমণিকে ফিরতে হবে অনেক দূর, তুমি যা খাওয়াতে চাও তা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি তৈরী করে দাও।

নর্মদা বলল, তুমি বস দিদিমণি, আমি এখুনি তোমার খাবার তৈরী করে আনছি।

এখন আমার পড়ার ঘরে বসলাম দুজনে।

ও চুপচাপ বসে রইল দেখে বললাম, যাওয়া-আসার পথ এতখানি দীর্ঘ না হলে গল্প করার জন্যে আরও অন্তত একঘণ্টা সময় বেশী পেতাম।

ও বলল, আপনার আস্তানাটা কিন্তু ভারী সুন্দর।

গল্পের আকর্ষণে না হলেও এই আস্তানার আকর্ষণে রাজকুমারী হয়ত

আর একবার আসবে।

ও কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আমার দেওয়া বইখানা বুকসেলফের ওপর থেকে তুলে নিয়ে নিজের বইয়ের ব্যাগে পুরল। সম্ভবত আমার রাজকুমারী সম্বোধনে ওর বইয়ের কথাটা মনে পড়ে গিয়ে থাকবে।

ও আবার নিজের জায়গায় গুছিয়ে বসতে বসতে বলল, আমার জীবনে আমি যত উপহার পেয়েছি তার ভেতর আজকের উপহারটিই আমার শ্রেষ্ঠ ধন।

আমি বললাম, হৃদয় উজাড় করে দিতে পারলাম কই ? সাঙ্কেতিকতার রহস্যে নিবেদনটি সাজিয়ে দিতে হল।

ও বলল, প্রকাশ এর চেয়ে বেশী নাই বা হল।

তবু প্রিয়জনের নামটিকে নিরাবরণ করে দেখতে কার না ইচ্ছে হয়।

ও কোন উত্তর দিল না। ধীরে ধীরে খোলা দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেল। রেলিংএর এক কোণায় দেহের ভর রেখে ও মেঘের আবরণে ঢাকা আকাশটার দিকে চেয়ে গুণগুণ করে গান ধরল।

'এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল ॥
শিউলিসুরভি রাতে বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্মরগানে তব মর্মের বাণী বোলো ॥
বিষদ-অশ্রুজলে মিলুক শরমহাসি—
মালতীবিতান তলে বাজুক বঁধুর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে বিজড়িত আলোছায়ে
বিরহ-মিলনে-গাঁথা নব প্রণয়দোলায় দোলো ॥'

ও খুব আস্তে আস্তেই গাইছিল গানটি, যেন নিজেকেই শোনাতে চাইছিল। আর কাউকে শোনাবার ইচ্ছে অন্তত তার অনুচ্চ স্বরে ধরা পড়ছিল না।

গানটি আমার প্রিয় গানের একটি তাই গুণগুণ ধ্বনিটাই উচ্চগ্রামে বাজছিল আমার বুকের মধ্যে। আমি ওর কাছে উঠে গেলাম। হাত ধরে বললাম, তুমি অনুচ্চে যে গানটি গাইলে সেটি আমার অতি প্রিয় গান। প্রিয়জনের গলায় সে গান প্রিয়তর হয়ে উঠল। ঘরের ভেতর এসো, ঝড়ো হাওয়ার মতো সময়টা উড়ে চলে যাচ্ছে।

আমি ওর হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে এলাম। অসংকোচ পদক্ষেপে ও আমার পেছন পেছন এল। মুখখানা নব বধূর মতো নত।

ও আমার পাশে বসে মুখ না তুলেই বলল, আমি বাড়ি ফিরব।

ওর গলার স্বর কেন কাঁপছে !

বললাম, নিশ্চয়ই যাবে এত তাড়া কিসের ?

ও তেমনি নতমুখে বলল, বড় কষ্ট হচ্ছে।

আমি ওর কষ্টের কারণ বুঝেছি। অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও। আজকের এই পরিবেশ, এই উত্তপ্ত সান্নিধ্য ওর গোপন মনটিকে স্পর্শ করেছে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই নর্মদা প্লেটভরা লুচি, আলুভাজা, আর পেঁয়াজ-লঙ্কাবাটা মাখানো কইমাছের ভাজা নিয়ে এলো।

ধর দিদিমণি।

সঙ্গীতা ওর হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিল।

কি হল? আমাকে নর্মদাদি দেবে না ভেবেছ?

নর্মদাদি ততক্ষণে আর একখানা প্লেট আনতে চলে গেছে।

ও বলল, বাড়ির ছেলেদের খাবার আগে দিতে হয়। আপনি খাওয়া শুরু করুন। সেই কত আগে দুপুরের খাওয়া হয়েছে আপনার। নিজে রান্না করে খেয়ে গেছেন তো?

সকাল দুপুর দুবেলাতেই ক্লাস ছিল, রান্নার সময় পেলাম কই।

তবে!

না, না, তা বলে অভুক্ত থাকিনি, পম্প হোটেলে যা হোক কিছু খেয়ে নিয়েছি।

সে এমন কিছু নয়, এখন নর্মদাদির হাতের খাবার খান।

আর এক প্লেট খাবার ইতিমধ্যে নর্মদাদি ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। ও কেন জানি না আমার পাশে বসে না খেয়ে বারান্দার দরজায় হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে খেতে লাগল।

প্লেট নিয়ে এক সময় ও ঢুকে গেল রান্নাঘরে। সেখানে নর্মদাদির সঙ্গে খেতে খেতে আলাপ চলল ওর। আমার কানে ওদের কথাগুলো ভেসে আসছিল।

বাড়ি কোথায় তোমার দিদিমণি?

কলেজ স্ট্রীটে।

দাদার সঙ্গে আলাপ হল কোথায়?

ওইখানে।

তুমি দাদার কাছে পড় বুঝি?

অনেকদিন আগে পড়তাম, এখন আর পড়ি না।

তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

ও বলল, তোমার কইমাছের ভাজা দারুণ। তোমাকে কোনদিনই ভুলতে পারব না।

এরপর নিচু গলার কথা আমার কানে এল না।

কিছুক্ষণ পরে নর্মদাদির গলা শোনা গেল, আর দুখানা ভেজে দি খাও, সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছ।

খুব খেয়েছি, আর পারব না নর্মদাদি।

সম্ভবত নর্মদাদি ওর প্লেটে আর দু একখানা লুচি ফেলে দিয়েছে।

ও বলে উঠল, আর তুমি আসতে দেবে না আমাকে।

কেন দেব না দিদিমণি, এ তো তোমার বাড়ি।

আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু ওদিক থেকে কোন উত্তর শুনতে

পেলাম না। ওর মুখের ছবিও আমার উৎসুক চোখের আড়ালে থেকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ও আমার কাছে এল। আমার খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে।

বললাম, তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলে যেতে পারবে তো? না আমি তোমার সঙ্গে যাব?

ও বলল, আপনি বিশ্রাম করুন, সকাল থেকে অনেক ধকল গেছে। আমি একাই যেতে পারব।

অতিথিকে অন্তত গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার সুযোগটুকু থেকে বঞ্চিত কোর না।

অতিথি যখন ভেবেছেন তখন চলুন সঙ্গে। অতিথি আর কোন দিনও আসবে না।

এ শাস্তি কেন রাজকুমারী?

ও হেসে বলল, ঠিক আছে, রাজকুমারী যখন ডেকেছেন তখন সে আসবেই।

তবু তোমার সঙ্গে অন্তত রাসবিহারী পর্যন্ত যেতে দাও, তারপর টু. বি. তে তুলে দিয়েই আমি ফিরে আসব। এর চেয়ে বড় বিশ্রাম আমার কিছুতেই হবে না।

আমরা রাসবিহারীর মোড়ে পৌঁছলাম। পথে পথে, দোকানে দোকানে সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। আমরা স্টপেজের একটু দূরে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওর হাত কখন আমার হাতের ভেতর এসে গেছে। দূর থেকে নির্দিষ্ট গাড়িটিকে আসতে দেখলাম। ওকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছিল না।

ও বলল, আমি আবার আসব। বুধবার দুটোর পর আপনি বাসায় ফিরে আসবেন। আমি ঠিকই পথ চিনে চলে আসব। তার আগে কিন্তু শুক্র আর সোমবার অজিতদার ওখানে চারটের পর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। বুধবার আপনার বাসায় আসার খবরটা কারু কাছে জানাবেন না কিন্তু।

বললাম, বইটা পড়ো। ওর ভেতর যে মেয়েটির কথা আছে সে আমার মনে বড় দাগ কেটেছিল। তার দুঃখের কথা লিখেছি। ভাগ্যের বিচিত্র আবর্তের কথা ওতে লেখা আছে।

ও হঠাৎ বলল, পড়ব না! এ বই তো আমার।

মুগ্ধ চোখে ওর দিকে চেয়ে বললাম, আরো কিছু তোমার হাতে তুলে দেবার জন্যে রইল।

ও গাড়িতে উঠে গিয়ে জানালার পাশে বসে পড়ল। গাড়ি ছেড়ে দিল। ও বসন্তের হাওয়া-লাগা পাতার মতো ওর হাতের পাতাখানা নাড়তে লাগল।

শুক্রবার আমি 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকা অফিসে অজিতদার চোখের আড়ালে ওকে আমার লেখা একটি কবিতা উপহার দিলাম।

'তোমার হাতের ওই পাঁচটি অঙ্গুলি
সবে বলে চম্পকের কলি,

আমি কিন্তু বলি তারে
সিন্ধুর পাঁচটি শাখা নদী—
আমার দেহের সীমা ছুঁয়ে
অশান্ত প্রলাপ তার চলে নিরবধি।
আষাঢ়ের নীল মেঘে
ছোঁয়া তার পঞ্চমুখী বিদ্যুতের শিখা
অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী আর মধ্যমা, কনিষ্ঠা, অনামিকা।
সে ছোঁয়ায় মেঘের সঞ্চয়
সে ছোঁয়ায় ভোরের উদয়
সে ছোঁয়ায় বৃষ্টি ঝরোঝর
বনময় মনময় শিহরিত কদম্ব কেশর।'

পত্রিকা অফিসে ও ঢুকলেই আবহাওয়া বদলে যায়। অজিতদার স্নেহের সবকটি উচ্চারণই ওকে কেন্দ্র করে বর্ষিত হয়। ও ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছে তাই ওর একটা হেভি টিফিন বরাদ্দ থাকে। অবশ্য আমিও বঞ্চিত হই না।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে বারান্দার চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছি হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়া একটা হাওয়ার মতো একটা ভাবনা কোন এক রন্ধ্রপথে ঢুকে পড়ল আমার মাথার মধ্যে। একটি ফুলের চারদিকে নিরন্তর গুঞ্জনরত ভ্রমরের মতো আমার মাথার মধ্যে ঘুরে ঘুরে একটি সুরই কেবল তুলতে লাগল। কেন সঙ্গীতা আমাকে নিবেদন করল তার নীরব ভালবাসা। সে আমার ভেতর এমন কি পেল যা তার শিক্ষা-দীক্ষা ঐশ্বর্য সৌন্দর্যকে অতিক্রম করেও এতখানি বড় হয়ে উঠল। একশো পঞ্চাশ টাকা মাইনের একজন অধ্যাপক আর উঠতি সাহিত্যসেবীর পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া সহজ হল না। মনের মানুষ কি এমন নীরব নিভৃত চরণপাতে ঘরে এসে ঢোকে?

কবিগুরুর একটি কবিতা মনে পড়ল,—

'আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয়, মিলায় পলকে,
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।'

ওর এই উজ্জ্বল উপস্থিতি কি আমার সমস্ত চিত্তকে উতল হাওয়ায় আকুল করে হঠাৎ মিলিয়ে যাওয়ার মতো?

ও কখন নিঃশব্দে খোলা দরজা দিয়ে ওপরে উঠে এসে জানালা ধরে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আমি তা জানতে পারিনি। জানলাম যখন ও তার আঙুলগুলো আলতো করে আমার চুলের ভেতর চালিয়ে দিলে। আমি ফিরে ওর চোখে মুখে কৌতুকের বদলে একটা মুগ্ধতা লক্ষ্য করলাম।

বললাম, তুমি বাইরে আসবে না আমি ভেতরে যাব?

ও কোন কথা না বলে ওর চাঁপাফুলের মতো আঙুলগুলো আমার চুলের ভেতর চালাতে লাগল।

আমি চেয়ার ছেড়ে ঘরের ভেতর এসে ঢুকলাম। এখন পাশাপাশি বসেছি দুজনে।

ও বলল, কি ভাবছিলেন বসে বসে? আমি ওপরে উঠে এলাম আপনি একটুও জানতে পারলেন না।

বললাম, আমার ভাবনার ভ্রমর এখন তো শুধু একটি পুষ্পিত লতাকে কেন্দ্র করে সারাক্ষণ আপন মনে গুঞ্জন করে চলেছে।

ও মিষ্টি করে একটুখানি হেসে দুচোখ নামাল।

ওর দুটো হাত আমার হাতের মুঠোয় ধরে বললাম, সত্যি, আজ একটা কথা বার বার মনে ঘুরে ঘুরে বাজছে, সেকথা সে শুধু তোমাকে নিয়েই।

ও চোখ তুলল। ওর সারা মুখ ভরে কৌতূহল।

বললাম, সে কথার উত্তর আমার কাছে নেই, তোমার গোপন মনের মণি-মঞ্জুষার কোথায় যে তুমি তাকে লুকিয়ে রেখেছ তা আমি জানি না।

আমার হেঁয়ালীতে ওর চোখে এখন বিস্ময়।

বললাম, তাহলে সহজ করে বলি, আমার মতো একজন সাদামাটা আট-পৌরে মানুষের ওপর তুমি হঠাৎ আকর্ষণবোধ করলে কি করে এই ভাবনাই আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

আমার হাতের ভেতর থেকে ওর দুটো হাত ও টেনে নিল।৷ মুখে আঙুল রেখে অস্ফুটে বলল, এখন নয় এর উত্তর পরে দেব।

এখন ও প্রসঙ্গ নিয়ে আমি আর ওকে পীড়াপীড়ি করলাম না।

হালকা কথা, গান, নর্মদাদির বেগুনী আর মুড়ি খেতে খেতে সময় চলে গেল। ওকে সেদিন যথাস্থানে ওর বাসে উঠিয়ে দিয়ে এলাম। আবার এক শুক্রবার ওর আসার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে।

তিনদিন পরেই কলেজ থেকে ফিরে এসেই ওর একখানা চিঠি পেলাম। খামখানা হাতে তুলে দেখলাম বেশ ভারী। নিউ মার্কেট থেকে কেনা কোণায় ছোট্ট একগুচ্ছ ফুলের ছবি আঁকা খাম। চিঠির কাগজ বের করে দেখলাম নীলাভ বিলিতি কাগজ। সেই মুহূর্তে মনে হল এক বাণ্ডিল একশো টাকার নোট পেলেও আমি এত খুশী হতাম না। গুণে গুণে দেখলাম প্রায় পাঁচখানা কাগজ ও খামে পুরেছে। সবকটা পাতাই মিষ্টি আতরের গন্ধে সরভিত। আমি প্রথমেই পিয়নকে বাহবা না দিয়ে পারলাম না। এমন একখানি চিত্রিত সুগন্ধী খাম হাতে পেয়েও যে ব্যক্তি লোভ সংবরণ করতে পারে তার সাধুতাকে নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

ও লিখেছে,—

প্রিয় কবি,

আমার কলেজের খাতায় বিদায় দিলে আপনি যে চার ছত্র কবিতা লিখে দিয়েছিলেন তা আজও আমার মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে। তারপর আপনার

দেওয়া 'শৈলপুরী কুমায়ুনে'র পাতা কতবার যে ফিরে ফিরে পড়েছি তা বলে শেষ করতে পারব না। ওই বইটির শেষ অধ্যায়ের নাম দিয়েছিলে, 'কৌসানীর কাব্য'। ওই অধ্যায়ের নায়িকা অহল্যার আবর্তিত জীবনের কথা পড়ে কত যে চোখের জল ফেলেছি তা বলে বোঝাতে পারব না।

এই লেখাগুলোর মধুর স্মৃতি লেখককে ঘিরে এক মুগ্ধ পাঠিকার ভালবাসাকে গভীর করে তুলেছিল।

এরও আগে আপনাকে কিছুদিনের জন্য পেয়েছিলাম এক তরুণ অধ্যাপকের ভূমিকায়। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি আমি আজও স্পষ্ট দেখতে পাই।

শুনেছিলাম, এক তরুণ অধ্যাপক আজ আমাদের ক্লাস নেবেন। ঘণ্টা বাজলে আমরা সেই নবাগত মানুষটিকে দেখবার জন্য উৎসুক আগ্রহে দরজার দিকে চেয়ে রইলাম।

কেন জানি না সেদিন আপনি যখন ঢুকলেন তখন আপনার ঐ প্রবেশকে আমার আবির্ভাব বলে মনে হয়েছিল।

আপনি ডায়াসের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। রোল কলের পর বললেন, আমরা আজ রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতাটি পড়ব।

প্রথমেই আপনি অতি সুন্দর ভাষায় কবি রবীন্দ্রনাথের একটি ভাবমূর্তি আমাদের চোখের সামনে এঁকে দিলেন। তারপর শুরু করলেন 'সাগরিকা' কবিতাটি।

সুনীল সমুদ্র থেকে স্নান শেষ করে উঠে আসছে কান্তিময়ী এক কন্যা। তার সজল এলোচুল ছড়িয়ে পড়েছে অনাবৃত দেহে। সে এসে বসল উপলাস্তৃত সাগরবেলায়। পীতবর্ণের বালুকা স্খলিত বসনের মতো লুটিয়ে পড়ে আছে তার চারদিকে। ঊষার চিকন সূর্য তার নিরাবরণ বক্ষে আশ্চর্য আলোর আলপনা এঁকে দিচ্ছে।

আমরা এতগুলি তরুণী বসে আছি কিন্তু সেদিন এ চিত্রটুকু আঁকতে আপনার কণ্ঠস্বরে একটুও কাঁপন জাগেনি।

পরক্ষণেই আপনি কবিতার এক ছত্র আবৃত্তি করলেন,—

'সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচুলে,
বসিয়াছিলে উপল উপকূলে,
শিথিল পীতবাস
মাটির পরে কুটিল রেখা লুটিল চারি পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা লিখন ঊষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।'

এই অমৃত প্রতিমাকে দেখতে হবে শিল্পীর দৃষ্টিতে। এখানে আছে আশ্চর্য আনন্দের ঘোর।

তারপর আপনি ভারতের মন্দির-ভাস্কর্যের ওপর চমৎকার কতকগুলি কথা বললেন। শিল্পীরা কি অসীম দক্ষতায় ভুবনেশ্বর, কোনারক, খাজুরাহো, বেলুড়ের মন্দিরগাত্রে আশ্চর্য সব ভাস্কর্যের নিদর্শন রেখে গেছেন। নগ্ন অলস

কন্যার স্মিত হাসি, বঙ্কিম সুঠাম অঙ্গের নৃত্যলীলা, নরনারীর চুম্বনরত মোহমুগ্ধ মহিমা। অপার দক্ষতায় জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁরা। আমরা, সহস্রবর্ষের উত্তরপুরুষরা সেই নগ্ন নায়িকা মূর্তি দেখে চলেছি অপার বিস্ময়ে।

তেমনি কবিও সাগরিকার এই নিরাবরণ চিত্রটি এঁকে আমাদের উপহার দিয়েছেন, এখানে মানুষের কামনাকে পরাভূত করেছে কবির সৌন্দর্য-সৃষ্টির মহিমা।

সেদিন আপনি সঙ্গে সঙ্গে কবির আর একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। কবিতাটির নাম আজও মনে আছে, 'বিজয়িনী'।

আপনি ঠিক এমনি একটি কন্যার অনাবৃত দেহের ছবি সেদিন আবৃত্তি করে আমাদের শুনিয়েছিলেন।

অচ্ছোদ সরসী-নীরে রমণী বেশবাস শিলাতলে পরিত্যাগ করে স্নানলীলায় নেমেছেন। চতুর্দিকে বিহ্বল বসন্তের বৈভব। প্রেমের দেবতা মদন এসে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পুষ্পধনু নিয়ে। স্নানলীলা শেষে রমণী যখন উঠে আসবেন তখন প্রেমের দেবতা তাঁর বক্ষ লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করবেন পঞ্চ ফুল-শর।

'জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী—
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে, তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু 'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।'

কামনার দেবতা যে নারীদেহের সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ হয়ে তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, এবার লক্ষণীয় তাঁর পরিবর্তন।

'ত্যাজিয়া বকুল মূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়নে
ক্ষণকাল-তরে। পরক্ষণে ভূমি 'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভাবে
নত শিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশর ভার

সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপাচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।'

এই পরাভব সংযমের শান্তশ্রীর কাছে অসংযত কামনার পরাভব।

এর পরই আপনি হেসে বললেন, আমরা আসল কবিতা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেছি। সমুদ্রকন্যা সাগরিক একা তার অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে বসে আছে সাগরবেলায়। এখন আমরা প্রতীক্ষা করছি কোন এক রাজপুত্রের। রাজপুত্র কন্যার সামনে এসে দাঁড়াল। তার মাথায় মকর-চূড় মুকুট, দক্ষিণ করে ধনুর্বাণ। কবির ভাষায়,—

'মকর-চূড় মুকুটখানি পরি ললাট 'পরে
ধনুর্বাণ ধরি দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী
কহিনু আমি এসেছি পরদেশী।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজে উঠল। বই বন্ধ করে আপনি ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন।

আমার মনে হল আমি সুনীল সাগরতটে বসে আছি কিন্তু এই মুহূর্তে যে রাজপুত্র মকরচূড় মুকুট পরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন।

সংযমের সৌন্দর্যলীলার যে কথা আপনি সেদিন বলেছিলেন তা আজও আমি ভুলিনি। তাই রূপ, ঐশ্বর্য, জাতি, কুল, মান, সব তুচ্ছ করে আমি আজ আপনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। আপনার অন্তরের উজ্জ্বল দীপগুলির একটি শিখাও যদি আমি আপনার পাশে থেকে কোনদিন জেলে দিতে পারি তাহলে আমি সেদিন সত্যিই ধন্য হব।

—আপনার রাজকুমারী।

বুধবার কলেজ থেকে ফিরেই মুখ হাত ধুয়ে পড়ার ঘরে বসে আছি ওর প্রতীক্ষায়। নর্মদাদি জানে, আজ ওর আসার দিন। ভালমন্দ খাবার তৈরী করেছে। ও এলে একসঙ্গে খাব। তাই চুপচাপ বসে আছি। ঠিক চুপচাপ বসে নেই। অনার্সের পাঠ্য রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থটির পাতা ওল্টাচ্ছি। বসন্তের ফাগে রঙিন এর প্রতিটি পাতা। ওর যে কোন ছত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায় আছি যার জন্য তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সে আসছে পুষ্পিত অশোক, শিমুল, কিংশুকের বনপথ দিয়ে। সেই বন-লক্ষ্মীর জন্য আমার ছোট্ট ঘরটি আজ ভরে উঠেছে আনন্দের আয়োজনে।

কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি রক্তে ছড়িয়ে পড়েছে। নর্মদাদির দরজা খোলার শব্দ পেলাম। ধীরে ধীরে সে উঠে আসছে। আমি দরজার দিকে তাকিয়ে আছি। তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আমার দুটো চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সে দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আমরা দুজনে দুজনের

মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছি।

হঠাৎ কাজল ছুটে এসে আমার পায়ের কাছে নত হয়ে বসে আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে বলল, বোনটাকে একেবারে ভুলে গেলে দাদা!

যার প্রতীক্ষা করছিলাম তার বদলে এলো তিন বছরের অদেখা আমার বড় প্রিয় একটি মেয়ে। কাজল আমার স্নেহে, ভালবাসায় মিশ্রিত এক আশ্চর্য অনুভূতি।

আমি কাজলের দুটো হাত ধরে তুলে আমার পাশে বসিয়ে বললাম, তোমাদের ভুলে যাব, এমন দুর্ভাগ্য যেন আমার না আসে কাজল। তবে কাজের প্রবাহ কখন মানুষকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার হদিস পাওয়া যায় না। সেই যে সূর্যের হঠাৎ বিয়ের খবর পেয়ে এক রাতে সবাই মিলিত হলাম, তারপর আমারই দোষে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ।

কাজল বলল, আমি তোমার কলেজে গিয়েছিলাম। তোমাকে না পেয়ে ঠিকানা নিয়ে বাড়ি খোঁজ করে এসেছি।

হ্যাঁরে কাজল, তুই আমাকে এত ভালবাসিস ?

ও আমার হাত ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

কি ব্যাপার! আমি তো ওর কান্নার ধরন দেখে বিস্ময়ে হতবাক।

ওকে ধরে বললাম, কি হয়েছে কাজল ? বাবা, মা সুস্থ আছেন তো ?

ও তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বলল, দাদা, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে কোথায় চলে গেছে। আজ চার মাস দেশ ছাড়া, একটিও চিঠি নেই। বুঝতেই পারছ সারা বাড়ির অবস্থাটা কি রকম।

সূর্য কি তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেছে ?

তাহলে তো রক্ষে ছিল দাদা। মেয়েটা প্রথম প্রথম কান্নাকাটি করত, এখন একেবারে চুপচাপ।

বাবা মা ?

অনেক খোঁজাখুঁজি করে হদিস না পেয়ে এখন পাথর। এদিকে বৌদি কনসিভ করেছে।

সূর্য এ খবরটা জেনে গেছে তো ?

না, ওর চলে যাবার ঠিক পরেই ব্যাপারটা জানা গেছে।

জানলে ও হয়ত যেতে পারত না, আর গেলেও তাড়াতাড়ি ফিরে আসত।

তোমার কাছে দাদা কোন চিঠি পাঠিয়েছে কিনা তাই জানতে এখানে চলে এসেছি। আমার আসার কথা কাউকে জানিয়ে আসিনি।

বেশ করেছিস, কিন্তু কাজল, তোকে কোন খবর দিতে পারলে আমি সবচেয়ে খুশী হতাম, কিন্তু তোর মুখে খবরটা শুনে আমি একেবারে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি।

কাজল বলল, তুমি তো জান, বাবা দাদা-অন্ত প্রাণ। এখন বাবা নিতান্ত দরকার ছাড়া একটিও কথা বলে না।

সান্ত্বনার কোন কথাই মুখে আসছিল না, তবু অকারণ আশ্বাস দিয়ে

বললাম, দেখিস, স্ত্রীকে ফেলে বেশীদিন বাইরে থাকতে পারবে না।

তুমি তো জান, দাদা বি. এ. পাশ করার আগেই নিজের ইচ্ছে মত বিয়ে করেছে!

বললাম, মায়ের কাছে তাই শুনেছি।

সূর্য হঠাৎ তাদের পরিচিত একটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি লেখাপড়াতে বেশী দূর এগোতে পারেনি। রূপের দিক থেকেও সুন্দরীদের পর্যায়ে পড়ে না। তবু একটা পারিবারিক জেদের বশে ও মেয়েটিকে বিয়ে করে বসল। আবার নির্দোষ মেয়েটিকে একা ফেলে চলে যেতেও তার মনে কোন দ্বিধা এল না।

কাজল বড় কোমল স্বভাবের মেয়ে। সে যেমন আনন্দময়ী তেমনি বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে একেবারে বিষাদের প্রতিমূর্তি। শিশুর সারল্য আর পবিত্রতা মাখা তার মুখের ছবি।

বললাম, কাজল অনেকদিন পরে এসেছ, যতই খারাপ পরিস্থিতি হোক সামান্য কিছু না খাইয়ে তো তোমাকে ছাড়তে পারব না।

কাজল বারান্দার দরজা খুলে চারদিকটা দেখে নিল। ফিরে এসে বলল, বৌদি ঘরে আসুক তখন পেট ভরে খেয়ে যাব। এখন ব্যাচিলারের আস্তানায় বেশী কিছু জোটার সম্ভাবনা কম।

বললাম, ভুরিভোজ না হোক, দাদার বাড়ি কিছু লঘু পথ্যই না হয় হল।

এবার সেদিক দিয়ে গেল না কাজল। বলল, তোমার বাসাটি কিন্তু খুব সুন্দর। দক্ষিণের ওই কবরখানাটার দিকে তাকালে মনটা উদাস হয়ে যায়।

ওইদিকে তাকিয়ে তাকিয়েই তো আমি উদাসী হয়ে গেছি। তাই তো সাধের বৌদি এখনও ঘরে এল না।

নীচে আবার কড়া নড়ে উঠল। অল্প পরেই নীচ থেকে নর্মদাদির গলার আওয়াজ পেলাম, ছোড়দাবাবু দিদিমণি।

আমি কাজলকে বললাম, এখন যে আসছে তাকে তোমার পছন্দ হয় কিনা তা আমাকে যাবার আগে বলে যেও।

কাজল বিস্মিত হল সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলীও।

দরজার কাছে এসে ঘরের ভেতর চোখ ফেলে থমকে দাড়াল সঙ্গীতা। ওর চোখে অপরিচিত ছবিটাকে না বোঝার বিস্ময়।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এস সঙ্গীতা কাজলের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি।

সংক্ষেপে আমি কাজলদের সঙ্গে আমার পরিচয়ের যোগসূত্রটা বর্ণনা করলাম।

কাজল সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে সঙ্গীতার দুটো হাত ধরে বলল, আমার দাদার পছন্দ আছে বলতে হবে। এস আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি।

ওরা দুজনে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়টা নিবিড় করতে লাগল আর আমি পড়ার ঘরে বসে একটার পর একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে এবং বন্ধ

করতে লাগলাম।

নর্মদাদি খাবার নিয়ে এল। দুটো প্লেট ধরিয়ে দিয়ে এল ওদের হাতে। পরে আমারটাও নিয়ে এল। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে নর্মদাদি। কিন্তু কৌতূহল চেপে রাখার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে তার। সে কাউকে কোন প্রশ্ন না করেও আমার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক তা সহজেই বুঝে নিয়েছিল।

খাওয়ার শেষে ওরা দুজনেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। সঙ্গীতার গলা পেলাম। খুব চমৎকার হয়েছে তোমার খাবার।

সঙ্গে সঙ্গে কাজলও বলে উঠল, তোমার হাতখানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মতো।

আমি ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বললাম, আর যাই কর না কেন ও কাজটি কর না, তাহলে আমার দানাপানি বন্ধ হয়ে যাবে।

কাজল হেসে উঠে বলল, তুমি বোঝ না কেন দাদা, এটা একটা কথার কথা। এত সোনা আমার কাছে থাকলে আমি কবে কুইন এলিজাবেথ হয়ে যেতাম।

কিছুক্ষণ আমরা তিনজনে ঘরের ভেতর কথা বললাম। একসময় কাজল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এবার আমাকে যেতে হবে দাদা। ওর অফিস থেকে ফেরার সময় হয়ে গেছে।

আমি সঙ্গীতাকে একটুখানি বসতে বলে কাজলকে খানিকটা এগিয়ে দিতে গেলাম।

ঘর থেকে দুচার পা যেতে না যেতেই কাজল আমার হাত ধরে বলল, খুব ভাল লেগেছে আমার সঙ্গীতাকে। ও কথা কম বলে কিন্তু যখন বলে তখন ভারী সুন্দর করে বলে। ওর মুখচোখ দুটোই সুন্দর। আমি ডাকে নেমন্তন্ন চিঠি নেব না, তুমি নিজে গিয়ে আমাকে নিয়ে আসবে। আমি বরযাত্রী যাব।

মারধোর খাবার জন্য পিঠে কুলো বেঁধে যেতে হবে কিন্তু।

ও যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চোখ ফেলে বলল, কেন ?

আরে আমি একেবারে চাষাভুষো মানুষ, আর ওরা হল কুলীন ব্রাহ্মণ।

ও জোরের সঙ্গে বলল, কেন আমরাও তো কুলীন। আমার দাদা অকুলীন হতে যাবে কোন দুঃখে।

আমি কাজলের হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

ও আমাকে বলল, প্রাণের টান থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এখন যাও তো, আমি চলে যেতে পারব।

কাজলকে ট্রামে তুলে দিয়ে আমি ফিরলাম।

ও বসে বসে 'মহুয়া'র কবিতাগুলো পড়ছিল। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বইখানা সেলফের ওপর রেখে দিল।

আমি ওর পাশে বসতেই ও বলল, আপনার ওই কবিতাটা আমি অনেকবার পড়েছি। আমার মুখস্ত হয়ে গেছে। কার হাতের আঙুলের কথা কল্পনা করে আপনি কবিতাটা লিখেছিলেন।

তোমার সঙ্গে দেখা হবার পরে লেখা হয়েছে ও কবিতাটা। এখন বুঝে নাও, কার আঙুলের ছোঁয়ায় বনময়, মনময় শিহরিত হয় কদম্ব কেশর।

ও চোখ নিচু করল। আমি ওর হাত ধরে বললাম, তোমাকে উপহার দেওয়া আমার প্রথম বইয়ের সমালোচনা কিন্তু এখনও শুনতে পাইনি।

ও চোখ তুলে বলল, ওটা আর এখন আপনার নেই, ওর সবটুকুই আমার। ওর ভালমন্দ আনন্দ বেদনা সবই আমার গভীর অনুভূতির সঙ্গে মিশে গেছে। নিজের জিনিসকে সমালোচনা করার শক্তি কিংবা সাধ্য কোনটাই আমার নেই।

বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার পর ও বলল, আমরা পুজোর ছুটিতে কার্শিয়াং বেড়াতে যাচ্ছি।

তোমরা কে কে ?

দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে আমি।

কার্শিয়াং! দার্জিলিঙ নয় কেন ?

দার্জিলিঙয়ে বেশ কয়েকবার থেকেছি, এবার কার্শিয়াং-এর ডাওহিলে থাকব।

খুবই আনন্দ-সংবাদ। তবে এ হতভাগ্যকে সঙ্গীহীন অবস্থায় পচা কলকাতায় পড়ে থেকে পুরো ছুটিটা কাটাতে হবে।

সঙ্গীতা বলল, আপনিও বেরিয়ে পড়ুন।

কোথায় ?

যেখানে মন চায়।

তাহলে তো আমাকে কার্শিয়াংয়েই যেতে হয়।

তাই যাবেন।

বললাম, যত সহজে যেতে বলছ তত সহজে রেলের টিকিট, থাকার জায়গা পাওয়া যাবে না। এখন বল কবে যাচ্ছ ?

সাতই অক্টোবর।

ফিরছ কবে ?

পুরো তিন সপ্তাহ কাটিয়ে।

হেসে বললাম, ফিরে এলেই দেখতে পাব একটি বাঙালী মেয়ে একেবারে নেপালী হয়ে গেছে।

ও আনুনাসিক গলায় প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, আমার নাকটা মোটেই নেপালীদের মতো নয়।

বললাম, নেপালীদের ভেতরে কিন্তু অনেক ঋজু এবং উঁচু নাকওয়ালা লোকও আছে।

ও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। বলল, আজ আর বসা চলবে না। পরের বুধবার দেখা হবে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, সেই রাসবিহারীর মোড় অব্দি আমাকে তোমার সঙ্গে যাবার অধিকারটুকু দাও।

ও মিষ্টি চাউনি আমার মুখের ওপর রেখে বলল, এসো।

আমি ওর হাত ধরে বললাম, তোমার শেষ শব্দটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ একটি কবিতার মতো আমার কানে এসে বাজছে।

ও আবার বলল, তাড়াতাড়ি এসো, ফিরতে বেশ সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

শুক্রবার 'তরুণের স্বপ্ন' অফিসে যখন ওর সঙ্গে দেখা হল তখন ও আমাকে একটি চমকপ্রদ সংবাদ দিল। রাশিয়ান সার্কাস কদিন ধরে শহর কাঁপাচ্ছিল। এসপ্ল্যানেডের কাছাকাছি একটা মাঠে বিরাট তাঁবু পড়েছিল। যাওয়া আসার পথে আমার চোখে পড়েছে কিন্তু লাইনে ধাক্কাধাক্কি করে টিকিট কেনার সাধ্য আমার ছিল না তাই গোড়াতেই বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম।

সঙ্গীতা বলল, আমরা সোমবার রাশিয়ান সার্কাস দেখতে যাচ্ছি।

টিকিট পেলে কি করে?

সে ব্যবস্থা জামাইবাবুই করেছেন।

ভাগ্যবান বলতে হবে।

সোমবার দিনটা আমাদের স্বল্পকালীন সাক্ষাতের দিন। সে দিনটা সার্কাসের ধাক্কায় মারা গেল দেখে আমার মনের মধ্যে মিশ্র এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। ও একটা ভাল জিনিস দেখতে পাবে সেজন্য একদিকে আনন্দ হল অন্যদিকে আমার না দেখার দুঃখটাও হঠাৎ তীব্রভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

পত্রিকা অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে হঠাৎ বাস থেকে নেমে পড়লাম এসপ্ল্যানেডে। লাইটহাউসের দিকে কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে এক গেটকীপারকে পাকড়ালাম, সে বলল আপনি ওই কোণার পানের দোকানটায় খোঁজ করুন। ছুটলাম পানের দোকানে। চার খিলি পানের অর্ডার দিলাম। যদিও এগুলি পরার্থে উৎসর্গ করা হবে। ভীড় পাতলা হলে টিকিটের কথা জিজ্ঞেস করলাম। লোকটি দয়ালু। চারটে পানের খদ্দেরকে নিরাশ করতে চাইল না। বলল, আপনি নিউএম্পায়ারের কাছে একটু দাঁড়ান। ছোকরাটা এখানেই ঘুরছিল। এখুনি এসে পড়বে, আপনাকে আমি ডেকে নেব।

পাঁচ মিনিটের ভেতরেই ছোকরাটি এসে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে পান-দোকানী আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

আমি সেদিন দশ টাকার একখানা টিকিট পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম।

সার্কাসের সীটগুলো সাজান হয়েছিল অর্ধচন্দ্রাকারে। আমি ওখান থেকে সার্কাসের টিকিট সংগ্রহ করে যথাসময় সোমবার সন্ধ্যার শোতে তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়লাম। তখন সাড়ে তিন ভাগ দর্শকই সীটে বসে গেছেন।

অর্ধবৃত্তের মাঝখান দিয়ে কোনরকমে হেঁটে গিয়ে নিজের সীটটি আবিষ্কার করলাম। বসে পড়া মাত্র আলো নিভে খেলা শুরু হয়ে গেল।

হঠাৎ সেই সংকীর্ণ জায়গায় অন্ধকারে সামনে থেকে একটা হাত পিছিয়ে এসে আমার হাতটাকে ছুঁয়ে দিলে। আমি লক্ষ্য করিনি, আমার ঠিক সামনের রোতে ও অন্যদের সঙ্গে বসে আছে একটা ধারের চেয়ারে। আমি যখন ঢুকি ও আমাকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধে দুজনে হাতে হাত

বেঁধে বসতে পারব এ কল্পনা কখনও করেনি। সেদিন যথার্থই ভেবেছিলাম, অঘটন আজও ঘটে।

ওর হাত দিয়ে ওদের ডালমুট আর সন্দেশ আমার হাতে আসতে লাগল। সেদিনের মজা রাশিয়ান সার্কাসের মজার চেয়ে কম ছিল না।

পরের বুধবার দুজনের দেখা হতে দুজনেই অবাক। আমি আমার টিকিট কাটার কাহিনী বললাম। তারপর একেবারে সামনে পেছনে কি করে যে সীট পেলাম সে কথা ভেবে আমরা দুজনেই বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। সত্যি, এ অলৌকিক ব্যাপারটা ঘটল কি করে!

আমি বললাম, এ অসম্ভব যদি সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে আমাদের আর কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

ও হয়ত আমার মতো আশাবাদী ছিল না তাই আবেগহীন চোখে শুধু আমার দিকে চেয়ে রইল।

নির্দিষ্ট দিনে ও দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে কার্শিয়াং চলে গেল। নিঃসঙ্গ একটা পাখীর মতো নিরুত্তাপ ছোট একটা বাসায় আমি দিন কাটাতে লাগলাম। সপ্তাহের বিশেষ দুটি দিনে ওর জন্য আমার কোন প্রতীক্ষা নেই। সেই উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে থাকার যে আকুলতা তার কোন সুযোগই আর নেই। দিন যেন কাটতেই আর চায় না। যথার্থই বৈষ্ণব কবি লিখেছিলেন, 'তিল এক হয় যুগচারি'।

কি করি কি করি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাথায় একটা প্লট এসে গেল। অনেক আগে আমি কার্শিয়াং-এর সেণ্ট মেরী হিল্‌সের একটা বাংলোতে কয়েকদিন কাটিয়েছিলাম। সেই ছবিগুলোর ভেতর আমি ওকে নিয়ে একটা কল্পনার রম্য কাহিনী তৈরী করলাম। কাহিনীটি এরকম—

স্বপ্নের স্টেশান কার্শিয়াং-এ পৌঁছে কুলির পিঠে বেডিং চাপিয়ে নির্দিষ্ট বাংলোটির দিকে উঠতে লাগলাম। আস্তানায় উঠে এসে কুলি বিদায় আর চৌকিদারের সঙ্গে ব্যবস্থাদি চুকিয়ে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসলাম।

চৌকিদার খানাপিনার বন্দোবস্তে লেগে গেল। আমি ওকে স্নানের জন্য গরম জল দিতে বললাম।

চৌকিদার বলল, খানা পাকাতে কিছু দেরী হবে। স্নান সেরে আপনি তাহলে কিছু নাস্তা করুন।

বললাম, স্টেশানে নেমে আমি হেভি ব্রেকফাস্ট করে এসেছি। একেবারে দুপুরে লাঞ্চ খাব।

স্নানের জল এল। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় গরম জলে স্নান সেরে দারুণ তৃপ্তি পেলাম।

আমার নির্দেশে চৌকিদার লনে একটা চেয়ার পেতে দিল। সামনে একটা টিপয়ও রাখল সে।

বললাম, এটা কি হবে?

সাহেব, চা তৈরী হয়ে গেছে।

অতএব চা খেতে খেতে কার্শিয়াং-এর দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে লাগলাম।

বসার ঘরটি অর্ধবৃত্তাকার। কাচ লাগানো দেয়াল। লনের চারদিকে সিজন ফ্লাওয়ারগুলো যেন নতুন অতিথিকে দেখে ঈষৎ মাথা দোলাতে দোলাতে হাসছে। লনের মাঝখানে নিঃসঙ্গ একটা পাইন গাছ।

সামনের পাহাড়গুলো ক্রমে ঢালু হয়ে উপত্যকার দিকে নেমে গেছে। ঐ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলে গেছে আঁকাবাঁকা ট্রেন লাইন।

ট্রেন আসছিল কুক্‌ কুক্‌ শব্দ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। একবার পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু শব্দটা ভেসে আসতে লাগল। পরক্ষণেই আবার দৃশ্যমান। সেই কুক্‌ কুক্‌ শব্দে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসা। চমৎকার মনোহরণ একটা খেলা।

পেছন ঘুরে বসলাম। 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ।' আমাদের বাংলোর ঠিক পেছনেই সেই পাহাড়। সারি সারি পাইন পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে ওপরের দিকে। অনেক ওপরে একটা পথ দেখা যাচ্ছিল। বীর-বাহাদুরকে জিজ্ঞেস করতে বলল, ওটা ডাওহিলের পথ সাহেব।

পাইন বনের ভেতর তখন চলছিল আলোছায়ার খেলা। তারই ভেতর আর একটা পথ দেখা গেল। ঢেউ খেলানো পাহাড়ের গায়ে উঁচুনিচু রাস্তাটার ওপর পাইনের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছিল। আমি সেদিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, খোলা বাইবেল হাতে নিয়ে সাদা পোশাক পরা কয়েকজন ফাদার ঐ উঁচুনিচু পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন।

ওঁদের পথ অনুসরণ করে আমার দৃষ্টি আরও দূরে এগিয়ে গেল। দেখলাম, সাদা একটা চার্চ পাইন বনের মাথা টপকে নীল আকাশের কোলে আশ্চর্য মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে।

পরের দিনের পরের দিন ওকে চমকে দিলাম।

পাইন বনের পথ ধরে ও এদিকে নেমে আসছিল। সম্ভবত স্টেশান বাজারই ছিল ওর গন্তব্যস্থল। সঙ্গে ভারী মিষ্টি দুটি মেয়ে, সালোয়ার কামিজ পরা। দোপাট্টা দুলছে পিঠের দুদিকে। একটি বছর দশেক, অন্যটি সাত বছরের বেশী হবে না।

ওরা পাইন বনে প্রজাপতির পেছনে ছুটছে কখনো, আবার সঙ্গীতার তাড়া খেয়ে সুশীলা বালিকার মত ঠিক পথ ধরে চলছে।

নিশ্চয় মেয়ে দুটি ওর দিদির। ও কথাপ্রসঙ্গে একদিন তাই বলেছিল।

ওরা আমার বাংলোর ঠিক পেছনের রাস্তায় এসে নামামাত্র আমি একটি বুনো গোলাপ আলতো করে ওর দিকে ছুঁড়ে মারলাম।

ও দারুণভাবে চমকে উঠে পেছনে তাকাল।

গোলাপের ছোঁয়ায় যতটা না চমকে উঠেছিল, আমাকে দেখে তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী।

মেয়ে দুটি তখন এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ধারে। তাদের দৃষ্টি ছিল লতানে গোলাপের ঝাড়ে উড়ে বেড়ানো এক ঝাঁক নীল আর হলুদ প্রজাপতির দিকে।

ও বলল, ভীষণ চমকে গেছি।

খুশী হওনি?

আনন্দে ওর চোখ ছোট হল, মুখে ফুটে উঠল অপার বিস্ময় আর আনন্দের ছবি।

এবার মাথাটা শুধু কাত করে ও ওর খুশীর খবরটুকু আমাকে জানাল।

চলে যাওয়ার সময় জানিয়ে গেল ও আবার আসবে।

ফেরার পথে?

ও নীচে নামতে নামতে বলল, যখন হোক।

কথাটা পেছনের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই ও দুটি প্রজাপতিকে দু পাশে নিয়ে হুড়মুড়িয়ে নীচে নেমে গেল।

আমি ওর প্রতীক্ষায় রইলাম। কিন্তু ও যে পথ দিয়ে গিয়েছিল সে পথ দিয়ে আর ফিরে এল না।

সারাদিন প্রতীক্ষার শেষে অপরাহ্ন এল। আমি বিরহী যক্ষের মতো লনের পাইন গাছটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হালকা এক একটা মেঘ নীচ থেকে ওপরের দিকে উঠছে। একটা মেঘ আমাকে একটুখানি হিমেল পরশ দিয়ে পাইন বনের ভেতর ঢুকে পড়ল।

ও কি ডাওহিলের দিকে যাচ্ছে? সেখানে পৌঁছে আমার মতো ও কি যক্ষ-প্রিয়াকেও স্পর্শ দিয়ে যাবে?

নিশ্চয় ও এখন ওদের লনে চায়ের আসর সরগরম করে বসেছে। দিদি জামাইবাবু বসেছে পাশে আর সেই দুটি প্রজাপতি উড়ে ফিরছে লনের ফুলে ফুলে। এক মুহূর্ত মেঘটা ওকে ছুঁয়ে দিয়ে চলে গেল। ভাবতে গিয়েই আমি রোমাঞ্চিত হলাম।

পরের দিন দশটা নাগাদ দেখলাম, ওরা সপরিবারে নেমে আসছে। এবার আসছে পাকদণ্ডীর পথে মাদার মেরীর মূর্তিটিকে ডানদিকে রেখে।

ওর দিদি জামাইবাবুকে এই প্রথম দেখলাম। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ভদ্রলোকের। দুই মেয়েকে দুহাতে সামলে নীচে নামছেন। পেছনে সঙ্গীতার দিদি। আকর্ষণীয় মুখশ্রী। উনি মেয়েদের সাবধান করতে করতে নামছিলেন।

আমার দিকে তাকিয়ে ও হাসল। বাঁ হাতখানা দক্ষিণের হাওয়া লাগা নব পল্লবের মতো নাড়তে লাগল।

ওরা চলে গেল। কিন্তু ও আমার লনে ফেলে দিয়ে গেল একটা কি বস্তু। আমি ছুটে গিয়ে সেটি হাতে তুলে নিলাম। একটি খাম। খামটি খুলতেই একটি ছোট্ট রঙিন পালক আর এক টুকরো চিঠি বেরিয়ে এল।

চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই। শুধু লিখেছে—

কাল এ পথে ফিরতে পারিনি। তুমি নিশ্চয় অনেকক্ষণ আমার জন্যে

অপেক্ষা করেছিলে। দিদি জামাইবাবু বাঁধানো রাস্তা ধরে আগেই স্টেশান বাজারে চলে গিয়েছিলেন। তাই তাঁদের সঙ্গেই ফিরতে হল।

এই রঙিন পালকটি আমাদের লনে কালই পেয়েছি। কোন অজানা অচেনা পাখী কখন ওটি ওর পাখা থেকে ঝরিয়ে দিয়ে গেছে। আমার কুড়িয়ে পাওয়া এই পালকটি তোমাকে উপহার দিলাম। আসা যাওয়ার পথের ধারেই তো তোমার নিবাস। আমি হঠাৎ হাওয়ায় যে কোন সময়ে ভেসে আসতে পারি।

স্বাক্ষরহীন চিঠি হলেও, ওর হস্তাক্ষরের ছন্দটি আঁকা রয়েছে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি বাংলোটিকে কেন্দ্র করে আমার দিব্যি কেটে যায়। পাইন বনে সেতারের আওয়াজ শুনতে শুনতে ভেসে আসা মেঘের খেলা দেখতে দেখতে আমার সময়গুলো সেই অচেনা রঙীন পাখীটির মতো কোথায় যে উড়ে চলে যায় কে জানে। একটি আশ্চর্য পালকের উপহার নিয়ে ও চকিতে এসে দাঁড়ায়, পরক্ষণে চলে যায় চোখের আড়ালে।

'অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে
কবে কখন একটুখানি পাওয়া
সেই পাওয়াতে জাগায় দখিন হাওয়া।'

আমার গোনাগুনতি দশটি দিনের ভেতর চারটি দিন মাত্র চকিত দর্শন মিলল। এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলো অক্ষয় সঞ্চয় হয়ে রইল আমার জীবনে। মাত্র একটি দিন গুণে গুণে একশো কুড়িটি মিনিট ওকে কাছে ধরে রাখতে পেরেছিলাম।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সেদিন পাহাড়ী শহরের একটি সিনেমা হাউস প্রায় ভেঙে পড়ছিল দর্শক সমাগমে। নামকরা কি যেন একটা হিন্দি বইয়ের উদ্বোধন সমারোহ ছিল সেদিন। ঈশ্বরকে আরও ধন্যবাদ সঙ্গীতার দিদি সেদিন অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন সপরিবারে ঐ বইটি দেখার জন্য। তিনি হোটেলের ম্যানেজারকে বলে টিকিটও সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। শেষ মুহূর্তে মাথার যন্ত্রণার দোহাই দিয়ে নিষ্কৃতি পেল সঙ্গীতা। এই ছলনার শাস্তি হিসেবে তাকে দিদির হাত থেকে খেতে হয়েছিল অকারণে একটি সারিডন ট্যাবলেট।

দিদিরা মহোৎসাহে হিন্দি সিনেমা দেখতে চলে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের ঘরে তালা বন্ধ হল, ম্যানেজারের হাতে চাবি জমা পড়ল, সঙ্গীতা সবচেয়ে শর্ট-কাট রাস্তাটি ধরে চলে এল একেবারে আমার ঘরে।

সেদিন মেঘে হালকা হিমের পরশ ছিল না। মাঝে মাঝে বাদল মেঘের ইলশেগুঁড়ির বর্ষণ হচ্ছিল। ও নীল রঙের একটা ওয়াটার প্রুফে সারা অঙ্গ ঢেকে এসেছিল আমার ঘরে।

ওয়াটার প্রুফখানা খুলে রাখল ও। আমি সবিস্ময়ে বললাম—

আজি ঝড়ের দিনে তোমার অভিসার
পরাণপ্রিয় বান্ধবী আমার!

ও বলল, বিধাতা পুরুষকে ধন্যবাদ যে তিনি এমন একটি সুযোগ আমার

জন্য তৈরী করে পাঠিয়েছেন।

কি রকম ?

দিদিরা সকলেই সিনেমায় গেছে দারুণ একটা হিন্দি ছবির আজ প্রিমিয়ার শো।

বললাম, এবার বুঝেছি কেন বীরবাহাদুর এ বেলাটা কাজে ছুটি নিয়েছে।

ও কোন কথা না বলে এ ঘর ও ঘর ঘুরে দেখতে লাগল, শেষে নিজের হাতে দু কাপ গরম চা বানিয়ে নিয়ে এলো শোবার ঘরে।

আমার দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বর্ষার দিনে গরম চায়ের সঙ্গে গল্প জমবে ভাল।

ও একটু দূরে একটা চেয়ারে বসে চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকাল।

আমি চা খেতে খেতে ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলাম।

ও শান্ত গলায় বলল, হাসলে যে ?

বললাম, এ কাপগুলোর কি সৌভাগ্য যে প্রাণহীন হয়েও আমার প্রিয়ার উত্তপ্ত ওষ্ঠের স্পর্শ পাচ্ছে।

ও কিন্তু এর উত্তরে কিছু বলল না, চুপচাপ চা খেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ স্বগতোক্তির মতো বলল, যার যেমন ভাগ্য।

বললাম, বইখানা কত রিলের কি জানি ? ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেন সুদীর্ঘ হয়, লোকের পরিশ্রম সার্থক হবে, দেখে তৃপ্তি পাবে।

ও চা খেতে খেতেই মুখ টিপে হাসল।

এবার আমি বললাম, হাসলে যে ?

অকারণে।

অকারণে কেউ কখনো হাসে ?

ও বলল, কবিই তো বলেছেন, মেয়েরা অকারণে হাসে।

চা খাওয়া শেষ হলে ও দুটো কাপ হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি বিছানায় বসে জানালা দিয়ে পাইন বনে মেঘের খেলা দেখছিলাম। কখনো বা উপত্যকা থেকে উঠে আসা মেঘগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল পাল পাল ধূমল রঙের হাতি পাহাড়তলী থেকে উঠে আসছে ওপরের দিকে। ধীরে ধীরে পাহাড়ের চূড়াগুলো অদৃশ্য হচ্ছিল, মুছে যাচ্ছিল পাইন বনের মাথাগুলো।

ওর পায়ের সাড়ায় এক সময় ফিরে দেখি, ও সাদা একটা কাপে চমৎকার কয়েকটা লাল গোলাপ সাজিয়ে এনেছে। ও কাপটাকে একটা টি-পয়ের ওপর রেখে বলল, এগুলো তোমার জন্যে আমার উপহার।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তার থেকে একটা আধ ফোটা গোলাপ তুলে নিয়ে ওর চুলের ভেতর গুঁজে দিয়ে বললাম, ভালবেসে তুমি যা দিয়েছ তাই দিয়ে তোমাকে সাজালাম অতি ভালবাসার দাবীতে।

ও হাসল। সরলতা, মাধুর্য আর ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে ও ছিল অনন্যা। প্রিয়জনের হাত থেকে ওর উপহার প্রাপ্তির হাসিটি আমাকে অভিভূত করল।

আমি সেই মেঘচ্ছায়াঘন দিনে ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে অন্তরঙ্গ হতে চাইলাম।

ও আমার বুকের ভেতরে থেকেই দুটো বড় বড় চোখ মেলে তাকাল। সে চোখের ভাষায় সকরুণ মিনতি ছিল, আমন্ত্রণ ছিল না।

আমার বুকে তখন ঝড় তুলেছে অগ্নি-অশ্ব। আমি ওকে বল্গাহীন যাত্রায় প্রলুব্ধ করলাম।

এত সংযম একজন নারী কোন শক্তির বলে লাভ করে! ও আমার হাতে কোনভাবেই নিজেকে উজাড় করে দিল না। আমার হাত ধরে বিছানায় এনে বসাল।

আমি তখন সত্যিই লজ্জিত। এতদিনের ঘনিষ্ঠতায় কোন দুর্বল মুহূর্তেই আমি ওকে কাছে টানার চেষ্টা করিনি, কিন্তু আজ নিজের কাছেই হার মানতে হল।

অনুতাপের ছবি হয়ত ফুটে উঠেছিল আমার চোখে মুখে। ও তাই অনুমান করে আমার দুটো হাত ধরে দোলাতে লাগল।

নরম আলোর মত মৃদু গলায় বলল, কষ্ট পেলে?

কথা না বলে মাথা নেড়ে জানালাম, না।

ও এবার কবিতার ভাষায় কথা বলল, দেখ, ঐ মেঘগুলো ওদের সারা শরীরে বৃষ্টির জল ভরে রেখেছে। সময় হলে অনুকূল বাতাস বইবে। সে বাতাসে ওরা ভর করে ভেসে আসবে। তারপর ওরা ওদের সমস্ত সঞ্চয় উজাড় করে দিয়ে ধন্য হবে।

অত্যন্ত গভীর গলায় আবেগ মেশা সুরে ও কথাগুলো বলে গেল।

আমিও শান্ত গলায় মৃদু হেসে ওর হাত ধরে বললাম,—

'চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
করিও ক্ষমা,
হে নিরুপমা।'

ও চমৎকার একটি হাসি উপহার দিয়ে ওর মাথাটা আমার বুকে ছুঁইয়ে রাখল। যাকে আমি আকর্ষণ করতে গিয়ে কাছে টানতে পারিনি, সে এই মুহূর্তে গভীর বিশ্বাসে আমার বুকে ধরা দিল। বললাম, চারুহাসিনী, চল দেখি বাইরে, একটু বৃষ্টি উপভোগ করি।

ও মাথা তুলে ভয় মেশান গলায় বলল, বৃষ্টিতে ভিজলে বিপদে পড়ে যাবে।

হেসে বললাম,

'বিপদ আছে, জানি আঘাত আছে
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে।'

ও বলল, যদি একান্তই যেতে চাও তাহলে আমার ওয়াটার প্রুফটা অন্তত গায়ে চড়াও।

তুমি!

আমার এত ঠাণ্ডা লাগে না।

বললাম, আমার জন্যে তোমার এটুকু 'উদ্বেগ' আমার চিরদিনের রক্ষাকবচ হয়ে রইল। এবার শোন, আমি চাঁদনী থেকে নতুন একটি ওয়াটারপ্রুফ কিনে এনেছি। অতএব নির্ভয়ে দুজন বাইরে দাঁড়িয়ে আজ মেঘের খেলা দেখব।

আমরা কয়েক মিনিটের ভেতর তৈরী হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমি পাইন গাছটার তলায় এসে দাঁড়াতেই ও আমার হাত ধরে টেনে বলল, চল, পেছনের পাইন বনটাতে যাই। ঐ ঘন বনের ভেতর দাঁড়িয়ে বর্ষা দেখতে দারুণ ভাল লাগবে।

আমরা সাবধানে কখনো পাথর ডিঙিয়ে, কখনো বা পাথরের পাশ কাটিয়ে অনেক ওপরে উঠে এলাম।

এখন পাইন বনের মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে পড়েছি আমরা। বর্ষাধোয়া বড় একটা শিলাখণ্ড আমাদের পাশে। কিছু ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ শিলাদেহের ছিদ্রপথ দিয়ে উঁকি মারছিল। শিলাটির গায়ে নাকছাবির আকারে নানা রঙের তারাফুল।

বসার এমন চমৎকার একটা রাজাসনের নীরব আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলাম না।

বললাম, এসো, এখানে বসা যাক।

আমরা ভেজা পাথরের আসনে বসলাম বটে, কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ থাকায় একটুও জল লাগল না গায়ে।

পাশ দিয়ে ক্ষীণ একটা জলস্রোত বয়ে যাচ্ছিল। বৃষ্টি তাকে মুখর কলধ্বনি তোলার মত পুষ্ট করতে পারেনি। তবু আঁকাবাঁকা জলধারাটির প্রায় অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি কান পাতলেই শোনা যাচ্ছিল।

ও এমন একটা পরিবেশে মুহূর্তে বিভোর হয়ে গেল।

গুণগুণ করে একটা সুর ভাঁজছিল ও। কোন রাগের পাখায় ভর করে সেই সুরের মধুকরটি গুঞ্জন করছিল তা আমি জানতে পারিনি, তবে সে সুর যে ঐ আঁকাবাঁকা স্রোতধারার কলধ্বনির সঙ্গে, সেতারের তারের মত পাইনের পাতার শন শন ধ্বনির সঙ্গে ঐকতানে বাজছিল তা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয়নি।

ধীরে ধীরে সুরের সরোবরে ফুটে উঠল কথার কমল, বর্ষার বিন্দুতে সিক্ত হয়ে দূরপ্রবাসী প্রিয়তমের জন্য বিরহে আকুল।

'গগন গরজত দমকত দামিনি
পবন চলত শন ন ন ন ন রস
বুঁদন বরষে মনুয়া লরজে
পিয়া বিন কছু ন সুহাবে।'

ওর গলায় ক্ল্যাসিকেল গানের সুরটি আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল। গান শেষ হলে বললাম, আজ নিরবচ্ছিন্ন বাদলের গান শুনতে বড় ইচ্ছে করছে, তোমার খুশীমতো অন্তত আর দু'একখানা শোনাও।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অতুলপ্রসাদের একটি গান ধরল।

'বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে।
আমিও একাকী, তুমিও একাকী
আজি এ বাদল-রাতে।
... ...
গগনে বাদল, নয়নে বাদল,
জীবনে বাদল ছাইয়া ;
এসো হে আমার বাদলের বঁধু,
চাতকিনী আছে চাহিয়া।'

ওর গানে সেদিনের বাদল-অপরাহ্ণটি বিরহের ছোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠেছিল। আমি ওর একটা হাত আমার দু'হাতের করতলে ধরে নিয়ে বসেছিলাম।

কতক্ষণ পরে ও বলল, চল ঘরে যাই।

বললাম, যে ঘরে তুমি শুভলক্ষ্মী সে ঘরে কবে তোমার পদার্পণ হবে কল্যাণী ?

ও কোন কথা না বলে আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরল।

বললাম, মেঘ-মেদুর আকাশ, শেষ-বিকেলের আলোটুকু মুছে গেছে, চল তোমাকে তোমার কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ও বলল, ফেরার পথে যদি দিদিদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে কি পরিচয় দেবে ?

হেসে বললাম, বাদল দিনের বন্ধু।

ও বলল, বাহাদুরিতে আর কাজ নেই, সামনের ঐ পাইন বনটা পার করে দিলেই চলবে। তারপর প্রশস্ত রাজপথ ধরে বর্ষা দিনের অভিসারিকা অতিথি-নিবাসে একাই ফিরে যাবে।

রাজপথের ধারে ঘন পাইন বন। ওকে একা পথে ছেড়ে দেবার আগে আমরা কতক্ষণ হাত ধরাধরি করে সেই বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম। নীরবতার ভাষা যে কত মুখর হতে পারে তা একান্ত প্রিয়জনের সান্নিধ্য ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়।

আমার কলকাতা ফেরার দিন ও স্টেশানে এসেছিল। ওর সঙ্গে ছিল সেই দুটি চঞ্চল প্রজাপতি। স্টেশানেই ওরা এদিক ওদিক ছুটে ফিরছিল। এক ফাঁকে ও আমার হাতে দুটো ডিম সেদ্ধ আর এক প্যাকেট নোনতা বিস্কুট ধরিয়ে দিয়ে বলল, সাবধানে যেও। আমি দুদিন পরেই পৌঁছচ্ছি। আগামী শুক্রবার ইউনিভার্সিটি না করে সিধে টালিগঞ্জের বাসায় গিয়ে উঠব।

ট্রেন ছেড়ে দিলে ও হাত নাড়তে লাগল। আমি জানালার ধারে বসে যতক্ষণ না গাড়ি স্টেশান পেরিয়ে বাঁক নিল ততক্ষণ হাত নেড়ে চললাম। ও অদৃশ্য হওয়া মাত্রই গভীর একটা দুঃখ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেঘের মতো আমার বুকের মধ্যে জেগে রইল।

এখানেই আমি আমার গল্পতে ছেদ ফেলে দিলাম।

ওর কলকাতায় ফেরার নির্দিষ্ট দিনটি আসতেই আমি মনে মনে ভারী একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। দার্জিলিং মেলের শিয়ালদা পৌঁছনর সময় থেকে আমার মনের পর্দায় ছবির পর ছবি ফুটে উঠতে লাগল।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, রাতের ট্রেন ভ্রমণের কিছুটা ক্লান্তির ছাপ পড়েছে ওদের চোখেমুখে। তবু হাওয়া বদলের একটা উজ্জ্বলতা ফুটে উঠছিল ঐ রাতের ক্লান্তি ছাপিয়ে।

কুলির মাথায় সুটকেশ আর ব্যাগের বোঝা চাপিয়ে ওরা এল ট্যাক্সির জায়গাটাতে। কিছুক্ষণের ভেতরেই ওরা একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

ও উঠে বসার আগে চারদিকে একবার স্টেশান চত্বরটাতে চোখ বুলিয়ে নিল।

ওকি ওর বিশেষ কোন পরিচিত জনের মুখ খুঁজছিল ? সে কি আমি ?

কথাটা ভাবতে গিয়ে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করলাম।

গাড়ী বেরিয়ে গেল যাত্রী নিয়ে।

ওরা চলে যাবার পর যাত্রীর স্রোত, হকারের ডাক, কুলিদের তৎপরতা সব যেন স্তিমিত হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, ওদের আগমনের জন্যেই যেন স্টেশান জুড়ে চাঞ্চল্যের জোয়ার বইছিল। এখন ভাঁটার টানে স্রোতের জল নেমে গেল।

মাঝে একটা দিনের ব্যবধান, তারপরেই বুধবার ওর আসার কথা। কিন্তু ঐ একটি দিনের ব্যবধানও আমার কাছে দুঃসহ বলে মনে হচ্ছিল। বিধাতা কি মঙ্গলবারকে পুরো চব্বিশ ঘণ্টার পরিবর্তে কিছুটা কমিয়ে আঠারো ঘণ্টা করে দিতে পারতেন না।

এইসব উদ্ভট ভাবনার শেষে সত্যিই বুধবার এল ভোরের সোনালী আলো ছড়িয়ে। ওর খুশী যেন সেই আলোয় আমি ঝলমল করে উঠতে দেখলাম।

দুপুর যত বিকেলের দিকে গড়াচ্ছিল, আমার অধীরতাও স্পর্শ করছিল, কার্শিয়াং-এর শৈল-শিখর।

ওকি আজ আসবে ? কোন কারণে কি ট্রেন ফেল করে বসে আছে শিলিগুড়িতে। ঠিক দিনে আসতে পারেনি ?

ভাবনা আর এগোল না, ওকে নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে এগিয়ে আসতে দেখলাম।

ও ঘরে ঢুকে এসে একমুখ হাসি উপহার দিল।

আমি হেসে ওকে পাশে বসতে ইঙ্গিত করলাম।

ও বসতে বসতেই বলল, আমার একটুও ভাল লাগেনি কার্শিয়াং।

সে কি !

ও বলল, তুমিই বল, একা একা কারু ভাল লাগে ?

বললাম, একা কোথায়, জামাইবাবুদের সঙ্গেই তো গেলে ?

ও মাথা নেড়ে বলল, সে তুমি বুঝবে না।

বললাম, বুঝেছি। সুন্দর ছবিগুলো একা দেখে একটুও তৃপ্তি পাচ্ছিলে না। আর কাউকে সেগুলো দেখাতে ভারী ইচ্ছে করছিল তাইতো ?

ও মাথা নাড়ল।

আরও দু' চারটে এলোমেলো কথার পর ও ডাওহিলে ওদের বাসার প্রসঙ্গে এসে পড়ল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি কিন্তু তোমার কাছাকাছিই ছিলাম কার্শিয়াং-এ।

ও অবিশ্বাসের একটা হাসি ফুটিয়ে তুলল।

আমি আমার কার্শিয়াং-এর লেখাটি ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, বিশ্বাস না হয় পড়ে দেখ। আর দেখ তো আসল ছবির সঙ্গে কতটা মেলে।

লেখাটির একটি শিরোনাম দিয়েছিলাম 'যদি এমন হত'।

ও মুখ নীচে করে লেখাটা গভীর আগ্রহে পড়তে লাগল, আর আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনের প্রতিটি ছবি লক্ষ্য করতে লাগলাম।

পড়া শেষ হলে ও অবাক চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এ যেন কার্শিয়াং-এর সত্যিকারের একটা ছবি। তুমি নিশ্চয়ই কখনো সেখানে গিয়েছিল, আমার কাছে গোপন করে গেছ। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, তোমাকে চমকে দেব বলেই আগে কোন কথা বলিনি।

ওর চোখ দুটোতে আনন্দ ঝিলিক দিয়ে উঠল। ও বলল, তুমি আজ আমার কার্শিয়াং ভ্রমণের সব আনন্দকে পূর্ণ করে দিলে। তোমার এ লেখাটি কিন্তু আমার।

হেসে বললাম, এ তো তোমাকে উপহার দেব বলেই আমি সৃষ্টি করেছি। আজ থেকে তোমার আর আমার আনন্দ এক হয়ে মিশে গেল।

টালিগঞ্জের বাসায় বসে কথা হচ্ছিল।

আমি বললাম, বিয়ের আগে আমরা অন্তত দুটো জায়গায় যাব। সেখানে গিয়ে দুটি মানুষের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ চেয়ে নেব।

ও আমার দিকে অর্থভরা চোখের দৃষ্টি মেলে চাইল।

হেসে আমি বললাম, দুই গাঙ্গুলী। প্রথম জন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিতীয় জন বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

এক একজন মানুষ আছেন যাঁদের রক্তে মানুষের প্রতি ভালবাসা প্রবাহিত হয়। এঁরা দুজন সে জাতের মানুষ। উপেন্দ্রনাথ কত নতুন লেখককে যে আবিষ্কার করেছেন তার লেখাজোখা নেই। সাহিত্যের প্রতি, যথার্থ মানুষের প্রতি উদার ভালবাসা না থাকলে এমনটি হয় না। অন্যদিকে বিনয়বাবু সম্বলহীন মানুষ তবু মানুষের উপকার করার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। এঁদের ছাড়া আর কাদের প্রণাম জানাব।

আমি তোমার মুখে তো ওঁদের কথা শুনেছি। তুমি যেদিন বলবে, আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে ওঁদের আশীর্বাদ নিয়ে আসব।

ইউনিভার্সিটি থেকে একদিন ও শিশুসাথী অফিসে এসে হাজির হল। আমি আগে থেকেই ওর জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছিলাম। ও সিধে ওপরে উঠেই 'মধুকরের আসরে' চলে এল। বিনয়বাবুর ঘরে তখন কেউ ছিল না।

আমি ওকে নিয়ে ওঁর ঘরে ঢুকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

দুজনকে এক সঙ্গে প্রণাম করতে দেখে বিনয়বাবু বললেন, কি ব্যাপার ! তোমাকে তো চিনি কিন্তু একে তো চিনতে পারলাম না। নতুন লেখিকা নাকি ?

ও মুখটা নীচু করল।

আমি বললাম, লেখিকা নয় জ্যাঠামশায়, ওকে গীত-শিল্পী বলতে পারেন।

উচ্ছ্বসিত হয়ে বিনয়বাবু বললেন, অত্যন্ত আনন্দের খবর। কি নাম তোমার মা ?

ও মুখ তুলে বলল, সঙ্গীতা।

বাঃ, নামের সঙ্গে তোমার শিল্প-সাধনার মিলটি তো ভারী সুন্দর !

আমি সলজ্জ বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আমরা দুজনে আজ আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি।

উনি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনকে অসংকোচে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলেন।

আবেগরুদ্ধ গলায় বললেন, রঞ্জন আমার ছেলে, তুমি আমার বৌমা।

আমার দিকে ফিরে বললেন, আমি মুখ দেখেই বলে দিচ্ছি এ মেয়ে যে ঘরে যাবে সে ঘরে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা হবে। তুমি ভাগ্যবান রঞ্জন।

এর চেয়ে বড় কোন আশীর্বাদ আমার প্রত্যাশায় ছিল না। আমি বললাম, আমার মা দূরে আছেন, আপনিই আমাদের প্রথম আশীর্বাদ করলেন।

আমরা চলে আসতে চাইলে উনি কিছুতেই ছাড়লেন না। খাবার আনিয়ে ঠিক মায়ের মতো স্নেহে পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন।

ওর বাড়িঘর সম্বন্ধে কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, ওকে দেখে বড় বেশী স্নেহ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন বিনয়বাবু।

চলে আসার সময় শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করলেন, পড়াশোনা চলছে তো ?

ওর হয়ে আমি বললাম, এম. এ. পড়ছে।

ভারী খুশী হলাম। যখন ইচ্ছে এখানে চলে আসবে।

আমরা আবার প্রণাম করলাম। সেই নিঃস্বার্থ পরোপকারী মানুষটির পায়ে হাত দিয়ে মনে হল, আমরা পবিত্র হয়ে গেলাম।

বুধবার 'তরুণের স্বপ্ন' অফিসে গিয়ে দেখি আসর জমজমাট। ও আগেই এসে বসে আছে। অজিতদার মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছেন ইন্দ্রদা (শিল্পী ইন্দ্র দুগার)।

আমাকে ঢুকতে দেখেই ইন্দ্রদা বললেন, এ পুষ্পটিকে পেলে কোথা থেকে ?

আমার আসার আগেই সঙ্গীতার সঙ্গে নিশ্চয়ই ওঁর আলাপ হয়েছে।

সঙ্গীতা মৃদু মৃদু হাসছিল।

ঘরের দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, ইন্দ্রদা, আপনি ঋতুরাজ বসন্ত। এমন চমৎকার ফুল ফুটিয়েছেন পলাশের ডালে ডালে। অনুরাগের লাল রঙটি ছুঁইয়ে দিয়েছেন প্রদীপের মতো ফুলের পাপড়িতে, এর পরও কি বলে দিতে হবে, পুষ্পটিকে কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ইন্দ্রদা শিশুর মতো সরল হাসিটি হেসে বললেন, তোমার হৃদয়ের অনুরাগের পথটি ধরে ও এসেছে, এই কথা বলতে চাও তো কবি ?

আমি হেসে মাথা নাড়লাম।

ইন্দ্রদা মাঝে মাঝে আমাকে 'কবি' বলে ডাকতেন। অবশ্য এ ডাকার পেছনে একটা ছোট ইতিহাস ছিল।

একদিন পত্রিকা অফিসে গল্পগুজব সেরে বেলা শেষের মুহূর্তটিতে দোতলা একখানা বাসে চেপে দক্ষিণ কলকাতার দিকে রওনা হলাম। চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে যেতে যেতে ডানদিকে বড় বড় মহা নিমগাছের ফাঁকে আশ্চর্য এক আকাশ দেখলাম। সমুদ্রের মতো নীল আকাশে মেঘের সে কি তরঙ্গলীলা! বিচিত্র রঙের ছোঁয়ায় সে তরঙ্গ ভারী মনোহর।

কতক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল, পুরীর সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখছি।

অমনি মাথায় ভূত চেপে বসল। আমি বাসায় পৌঁছেই একটা ব্যাগে দু'একখানা কাপড়জামা ভরে নিয়ে পুরী এক্সপ্রেস ধরার জন্যে হাওড়া স্টেশানে ছুটলাম।

টিকিটের যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা হল। আমি স্টেশান থেকেই 'তরুণের স্বপ্ন' অফিসে একটা ফোন করলাম। ফোনটা ধরলেন ইন্দ্রদা।

বললাম, আমি রঞ্জন বলছি।

ইন্দ্রদার গলায় বিস্ময়ের সুর, কি ব্যাপার কোথা থেকে ফোন করছ ?

হাওড়া স্টেশান থেকে।

হাওড়া স্টেশান! এখানে তো বলে গেলে বাসায় ফিরছ!

বাসায় গিয়ে আবার স্টেশানে এলাম। ময়দানের পেছনে এমন একটা সূর্যাস্ত দেখলাম না ইন্দ্রদা, ঠিক পুরীর সমুদ্রের কথা মনে হল। তাই পুরীর টিকিট কেটে ফেললাম। দু'চারদিন পরেই আড্ডার আসরে হাজির হচ্ছি।

ফিরে আসার পর থেকেই মাঝে মাঝে ইন্দ্রদা আমাকে কবি বলে ডাকতেন।

সেদিন ওর সামনেই ইন্দ্রদা আমার এই পাগলামির গল্পটি ফাঁস করলেন।

অজিতদা বললেন, রঞ্জন কেবল কবিই নয় ভোলাবাবাও।

ও আমার ভোলাবাবা খেতাবটির পরিচয় পাবার জন্য মৃদু হেসে অজিতদার মুখের দিকে তাকাল।

অনেক রঙটঙ চড়িয়ে অজিতদা আমার ভোলাবাবাঘটিত কাহিনীটি বলে গেলেন।

আসলে ঘটনাটি এরকম :

আমার প্রিয়বস্তুর অন্যতম হল ফাউনটেন পেন। অনেক দামী ও সেরা ফাউনটেন পেন আমি সংগ্রহ করে থাকি। কিন্তু সে ফাউনটেন পেনগুলি আমি বেশীদিন কাছে রাখতে পারি না। পকেটমারের ভানুমতীর খেলায় সে পেনগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই লোপাট হয়ে যায়। কলেজ থেকে ট্রামে বাসে চিৎপুর অবধি যাই, তারপর একটা বাস ধরে টালিগঞ্জের দিকে রওনা হই। এরই ভেতরে আমার অন্তত আট দশখানা দামী পেন পকেটমারের পকেটে চলে গেছে।

সেবার পার্কার সিক্সটিওয়ান পেন এল কলকাতায়। মেজদা ভালবেসে আমাকে পার্কার সিক্সটিওয়ান উপহার দিল। দোয়াতে নিবটা ডুবিয়ে রাখলেই পরিমাণমতো কালিটি চলে আসত পেনের ভেতরে।

আমি বুকে ধরে সেই পেনটিকে কলেজে নিয়ে এলাম। সবাইকে দেখিয়ে ভারী তৃপ্তি পেলাম আমি। ফেরার পথে বন্ধুরা সাবধান করে দিল, এটি আবার হারিও না যেন, খুব হুঁশিয়ার।

কলেজ স্ট্রীট পৌঁছবার আগেই কলম থেকে মন সরে গেল। চিৎপুরের বাস ধরার আগেই টের পেলাম আমার ঝর্ণা কলমটি অপহৃত হয়েছে।

মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আমি ফিরে এসে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের একটা পরিচিত রেস্টুরেন্টে বসলাম। চায়ে মন ছিল না, খাবারে তো নয়ই। আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন হোটেলের মালিক। তিনি কাছে এসে বললেন, রঞ্জনবাবু, আপনাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে?

আমি চুপি চুপি পেন হারানোর কথাটি তাঁকে খুলে বললাম।

উনি বললেন, কিছুক্ষণ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।

কথা কটি বলেই তিনি রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর আবার তাঁর আবির্ভাব। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে বাইরে ডেকে নিলেন।

রেস্টুরেন্টের আড়ালে দুটো লোক আধময়লা কাপড়জামা পরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজনের মুখে গভীর বসন্তের দাগ।

ওদের দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আপনি যখন ট্রামে যাচ্ছিলেন তখন এদের কাউকে দেখেছেন?

আমি ওদের কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। তাই নেতিবাচক মাথা নাড়লাম।

ওরা দুজন কিন্তু নিবিষ্ট হয়ে আমাকে দেখছিল। ওদের একজন বলে উঠল, না স্যার, আমাদের ডিউটি ছিল বটে কিন্তু আমরা ওঁর পকেট মারিনি।

ভদ্রলোক হাতের ইঙ্গিতে ওদের চলে যেতে বলে পরের দিন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

পরের দিন যথানির্দিষ্ট সময়ে দুরু দুরু বক্ষে রেস্টুরেন্টে পৌঁছতেই মালিক নিরাশার গলায় বললেন, না মশায়, গুবলেট হয়ে গেছে। গ্যাং-লিডার বলল,

সিল্কটি ওয়ান পেন জমা পড়েনি। আজকাল কর্মীগুলো ভারী ডিজনেস্ট হয়ে গেছে। ভাল জিনিস হাতে পেলেই জলের দামে হাওড়া স্টেশানে ঝেড়ে দেয়।

আমি হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না। পকেটমারের লিডার সত্যি কথাই বলেছে। সমাজের কোন ক্ষেত্রেই অনেস্টি বলে কিছু নেই।

অজিতদা এবার বললেন, রঞ্জন তোমার পকেটমার ধরার গল্পটা এবার বল?

সেদিন কলেজ স্ট্রীটের ট্রামে ভীষণ ভীড়। গুঁতোগুঁতি করে উঠেছি, তারপর সেঁধিয়ে গেলাম ভেতরের দিকে। বাঁ হাতে দুটো বড় বড় কেতাব বগলে চেপে ধরে আছি। ডান হাতখানা পাকড়ে ধরেছে মাথার ওপরের হ্যাণ্ডেলটি।

এমন সময় বুকের মধ্যে একটা সুড়সুড়ি অনুভব করলাম। হঠাৎ চোখ গিয়ে পড়ল বুকের ওপর। আমি দেখলাম আমার পিঠের পাশ দিয়ে পকেটমার হাত চালিয়ে দিয়ে পেনটা প্রায় তিন ভাগ তুলে নিয়েছে।

আমি চোর বলে চেঁচিয়ে পেছন ফিরে পকেটমারটাকে জাপ্টে ধরলাম। তখন সকলের চোখ আমাদের দিকে।

পকেটমারকে এমন হাসতে কখনও দেখিনি। বিশাল বলিষ্ঠ চেহারার ইন্দ্রদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার কতটা হুঁশ আছে তাই পরীক্ষা করছিলাম। তুমি পাশ করে গেছ।

আমি হেসে বললাম, এতে হুঁশের কোন পরীক্ষা হল না ইন্দ্রদা, চোর একেবারেই কাঁচা।

সারা অফিস ঘর তখন হাসছে।

আমাদের চলে আসার সময় ইন্দ্রদা বললেন, একদিন দুজনে এসো আমাদের বাড়ি, ছবি দেখাব।

আমি বললাম, লোভ দেখাবেন না ইন্দ্রদা।

উনি বললেন, এতে লোভের কথা এল কোথা থেকে?

বললাম, ভাল ছবি দেখলেই নিতে ইচ্ছে হবে। কিন্তু রেস্তো নেই কেনার।

ইন্দ্রদা হেসে বললেন, আরে সে হবে এখন। আগে তো ছবি দেখ।

পথে নেমে ও জানাল, অজিতদা আর ইন্দ্রদাকে ওর খুব ভাল লেগেছে।

বললাম, এসব মানুষকে আমি বেশ কিছুদিন ধরে দেখেছি, তাই নির্ভয়ে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি এখানে।

ও বলল, আমি ভাবতে পারিনি এই কদিনের ভেতর ওরা আমাকে এতখানি স্নেহের বাঁধনে বেঁধে ফেলেছেন।

সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ তখন থাকতেন বালিগঞ্জ প্লেস ইস্টে। একদিন তিনটের সময় ওকে নিয়ে হাজির হলাম। দরজা খুলে দিলেন ওঁর পুত্রবধূ গোপাদি। ভারী আমুদে মহিলা, সম্প্রতি গল্প ছাপা হয়েছে রবিবারের আনন্দবাজারে, তাই কিছুটা গরবিনী।

আমাদের দেখে বললেন, কোনদিন তোমার বোন আছে বলে তো শুনিনি। অনুমান করতে অসুবিধা হচ্ছে না এটি তোমার কে ?

গোপাদিকে প্রণাম করতে যেতেই উনি প্রণাম করতে দিলেন না। বললেন, বাবা চারটের সময় ঘরে ফিরবেন বলে গেছেন। তাঁকে আগে প্রণাম করবে তারপর যত পার আমাদের পায়ের ধুলো নিও।

আমি বললাম, আচ্ছা গোপাদি, আপনার কি থার্ড আই আছে ?

হেসে বললেন গোপাদি, প্রতিটি মেয়েরই একটা করে তিন নম্বর চোখ থাকে। তোমাদের মতো বাঁদরদের বাঁদরামি ধরবার জন্যে।

ওর দিকে ফিরে বললেন, তুমি ভাই এসো আমার সঙ্গে, রঞ্জন ততক্ষণ বাইরের ঘরে বসুক।

আমি বুঝলাম, গোপাদি আমাদের কিছু গোপন কথা ওর মুখ থেকে শুনতে চান।

ও-বাড়ির বাইরের ঘরটি আমার খুব প্রিয় ছিল। নানা রকম পত্র-পত্রিকাতে ঠাসা সে ঘর। আমি ঘরের ভেতর বসে একটা একটা করে পত্রিকা টেনে টেনে ওলটাতে লাগলাম।

'বিচিত্রা'র বাঁধানো সেটটি একটা সেল্‌ফে ছিল। একটা একটা করে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলাম। পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। লিখছেন তাঁর ভাগ্নে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। পত্রিকাটিকে চিত্রে সুশোভিত করছেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। এমন শিল্প সাহিত্যের সমন্বয় কে কবে কোথায় দেখেছে।

গোপাদি ঘরে এসে ঢুকলেন। আমার হাত ধরে বললেন, বাপু তোমাকে যতটা হাঁদারাম ভেবেছিলাম আদপেই তুমি তা নও, এক নির্বাচনেই তুমি তোমার হাঁদারামত্ব ঘুচিয়েছ।

হাত ধরে টানতে টানতে ওপরে নিয়ে চললেন। বলতে লাগলেন, খুব ভাল লেগেছে আমার। এতক্ষণ আমার সঙ্গে ও লুচি বেলে ভাজল। ভায়ের বৌ কর্মী কেমন হবে সেটা পরখ করে নিতে হবে তো ?

আমাদের দুজনকে গোপাদি পাত পেড়ে খাওয়ালেন। থালায় হাত দেবার আগে সঙ্গীতা একটা সন্দেশ জোর করে গোপাদির মুখে ঢুকিয়ে দিল।

আমাদের খাওয়া প্রায় শেষ, এমন সময় বেল বাজল। গোপাদি উঠে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন, ততক্ষণে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি।

গোপাদি বললেন, সঙ্গীতা, তুমি বাবার জন্যে খান চারেক গরম গরম লুচি ভাজ। বেগুন ভাজা তো রয়েছে। ওই সঙ্গে ছোটো সন্দেশ দিয়ে থালাটা সাজিয়ে দেবে। আজ তুমিই বাবাকে জলখাবার দেবে।

আমি বললাম, আমি এখন তাহলে জ্যাঠামশায়ের ঘরে যাচ্ছি।

গোপাদি ধমক দিয়ে বললেন, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক এখানে, যুগলে নিয়ে যাব।

ভারী চমৎকার একটি দৃশ্যের অবতারণা করলেন গোপাদি। সঙ্গীতার হাতে খাবারের প্লেট। লজ্জানম্র পদক্ষেপে সে চলেছে। গোপাদি তাকে আগলে নিয়ে চলেছেন। আমি ওদের পেছনে।

নিচে উপেন্দ্রনাথের লেখার ঘরের সামনে এসেই গোপাদি একটু আড়ালে সরে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে এগিয়ে দিলেন আমাদের দুজনকে।

ও গিয়ে শ্বেত পাথরের ছোট্ট একটা টিপয়ের উপর খাবার প্লেট আর জলের গ্লাস রাখল। ও প্রথমে তারপর আমি ও'কে প্রণাম করলাম।

আমি ও'র অনেক দিনের পরিচিত, কিন্তু সঙ্গীতাকে দেখে উনি মধুর একটি হাসি হাসিলেন।

তুমি কে মা লক্ষ্মী? তুমি আমার জন্যে জলখাবার আনলে, বৌমা কই?

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর গোপাদির প্রবেশ।

বাবা, আজ আপনার নতুন বৌমার হাতে খাবার খান। ও নিজের হাতে লুচি ভেজে প্লেট সাজিয়ে এনেছে।

উপেন্দ্রনাথ বললেন, দুজনের প্রণাম থেকে কিছু একটা আঁচ করেছিলাম, এখন ব্যাপারটা একটু খোলসা করেই বল?

আমরা কেউ আর মুখ খুলি না গোপাদি শেষে ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, এটি আমাদের রঞ্জনের ভাবী বধূ।

উপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতের আঙুল ওর চিবুক স্পর্শ করে বললেন, লক্ষ্মীপ্রতিমা, তোমার নির্বাচনের প্রশংসা না করে পারছি না রঞ্জন।

উনি গোপাদির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার একখানা বই আন তো বৌমা, এদের আশীর্বাদ করি।

গোপাদি ও'র লেখা একটি বই এনে দিলেন। উনি দুজনের নাম লিখে আশীর্বাদ জানিয়ে ও'র নামটি সই করে দিলেন।

গোপাদি সঙ্গীতাকে বললেন, তুমি আজ বাবার পাশে বসে জলখাবারটা খাওয়াও। আমি ওপর থেকে আসছি।

সঙ্গীতাকে উনি তাঁর পাশে বিছানায় বসালেন। প্লেটটা নিজের হাতে তুলে ধরে বললেন, একটা মিষ্টি আগে তোমাকে খেতে হবে।

ও বলল, আমি এখুনি খেয়ে এলাম জ্যাঠামশায়।

ও আমি দেখিনি। নিজের চোখে তোমাকে মিষ্টি মুখ করতে দেখব।

সঙ্গীতা বলল, আপনি আমার হাতে তুলে দিন।

উপেন্দ্রনাথ তাই করলেন। ও মিষ্টিটা মাথায় ছুঁইয়ে খেতে লাগল।

উপেন্দ্রনাথ বড় পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে দৃশ্য দেখলেন।

এবার তিনি খেতে শুরু করে বললেন, তোমার নামটা আমার শোনা হয়নি।

ও বলল, সঙ্গীতা চট্টোপাধ্যায়।

হাতের খাবার আর উপেন্দ্রনাথের মুখে উঠল না। উনি বললেন, তোমরা দেব মন্দিরের একেবারে দ্বারে এসে পৌঁছে গেছ। ওখানে দাঁড়িয়ে যথার্থ মনুষ্যত্বের মহিমা ঘোষণা করবে তোমরা। সামাজিক অনুশাসনকে না মেনে তোমরা যে

হৃদয়ের বন্ধনকে বড় করে দেখেছ এজন্যে আমার আন্তরিক সমর্থন পাবে চিরদিন। তোমাদের সিদ্ধান্তে আমি খুব খুশী হয়েছি সঙ্গীতা।

আমার দিকে ফিরে বললেন, কবে বৌমাকে ঘরে আনছ ?

আমি মাথা চুলকে বললাম, যত শীঘ্র পারি।

না, না শুভ কাজে কালক্ষয় করতে নেই।

তারপর দু'একটা গ্রাস মুখে তুলে সকৌতুকে বললেন, আমার 'উটরোগ' আবার মঞ্চস্থ হবে। নাটকের পাত্রপাত্রী প্রায় সবই ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু উপযুক্ত 'রানী'র খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তোমাদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে আমার নাটকে রানীর সমস্যা মিটে যায়। আর শুনে রাখ রঞ্জন, তোমাকে এবারও ছোট কবরেজের পার্ট করতে হবে। আর সেবারের মত তোমার টিকিটাও খুলে পড়া চাই।

কতকগুলো সমস্যা একসঙ্গে আমাদের তাড়া করে ফিরছিল। ওর আসন্ন পরীক্ষা, ওর বাড়ির কৌলিন্য সংস্কার, তাছাড়া স্বল্পকালের জন্যে হলেও ও আমার কাছে পড়াশোনা করেছে।

আমরা এসব সমস্যার মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

আমি জেনেছিলাম, বাবার কাছে ওর একটা গভীর বন্ধন আছে। ছোট মেয়েটিকে বাবা অসম্ভব ভালবাসেন। বাবার ওপর মেয়েরও অসম্ভব টান। বাবার প্রতিদিনের অনেকগুলো কাজই ও নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। সে সব কাজে সঙ্গীতার হাতের ছোঁয়া না থাকলে বাবা বড় কষ্ট পান। এর ওপর কৌলিন্য সংস্কার ওদের বংশে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলা হয়। সেখানে অসবর্ণ বিয়ে ওঁদের প্রায় কল্পনার বাইরে।

এই জটিল সমস্যাটির সমাধান খুব সহজসাধ্য ছিল না। তাছাড়া স্নেহের এত বড় একটা বন্ধনকে জোর করে ছিঁড়ে ফেলার মতো নিষ্ঠুরতা ওর চরিত্রধর্মে আমি একেবারেই দেখতে পাইনি। এদিকে পরীক্ষা যত আসন্নই হোক এদের তুলনায় সে সমস্যাটির ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। আর এককালের ছাত্রীকে জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করতে চলেছি, এতে কোন অন্যায়ের স্পর্শ আছে বলে মনে করতে পারিনি আমি। তবু মুখোমুখি হতে হবে প্রবীণ সহ-কর্মীদের। তাঁদের দৃষ্টিতে হয়তো তিরস্কার ঝলসে উঠবে। এসব পার হয়ে যাবার মতো মানসিক জোর সঞ্চয় করতে হবে আমাকে।

আমি জানতাম ও বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ। স্বল্প কথা বলে, সেগুলি তার অন্তরের গভীর থেকে উচ্চারিত হয়। তাই ওর মনটাকে বুঝে নিতে আমার কিছু সময় লাগছিল।

নিয়মমতো এক শুক্রবারে ও আমার বাসায় এল। সেদিন নর্মদাদিকে ও খাবার তৈরি করতে দেয়নি এমন কি রাতের খাবারের কয়েকটা পদ ও নিজেই রান্না করল।

আমি বললাম, বেশ মানিয়েছে আজ তোমাকে। একেবারে কর্মকুশলা বধূটির মতো। ও হেসে বলল, তোমাকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াব এর চেয়ে বড় সুখ আর আমার কিছু নেই।

আমি আপত্তি তুলে বললাম, তোমার হাতে খাব এ তো খুব সুখের ব্যাপার, কিন্তু এটাই আমার সব পাওয়া নয়। তোমার গান শোনার জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকব। তোমার কথা শোনার জন্য আমার আগ্রহের শেষ থাকবে না। তাছাড়া তোমার হাতে হাত রেখে আমি আকাশ দেখব, সাগরকে স্পর্শ করব।

ওর মুখে সুন্দর একটা হাসি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ও রান্না শেষ করে বারান্দাতে এসে আমার পাশে চেয়ারটি টেনে নিয়ে বসল। আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল।

আমি বললাম, যাবার আগে একটা গান শুনিয়ে যাবে না।

ও অমনি গুণগুণ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে একটি গান ধরল :

'আমি তোমারি সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ
সুরেরই বাঁধনে
তুমি জান নাই আমি পেয়েছি তোমারে
অজানা সাধনে।'

গান শেষ হলে আমি বললাম, তোমার চলে যাবার সময় কিন্তু অনেক আগে পেরিয়ে গেছে। চলো তোমাকে ট্যাক্সি করে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ও আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অত্যন্ত গভীর গলায় বলল, এ বাড়ি ছেড়ে আমাকে তুমি আর কোথাও যেতে বোল না।

আমি ওর এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ বুঝলাম না। আমি খুব নরম গলায় বললাম, এ বাড়ি থেকে তোমাকে চলে যেতে বলি, এমন শক্তি আমার নেই। কেবল অনুকূল সময়ের অপেক্ষায় আছি। তোমাকে সেদিন সম্মানের সঙ্গে ঘরে এনে তুলব।

ও যেন স্বগতোক্তির মত করে বলল, এলোমেলো ঘূর্ণির হাওয়া বইছে আমাদের ঘিরে, এর ভেতর থেকে অক্ষত বেরিয়ে আসা বড় শক্ত। ঝড়ের সময়, সে যত ছোটই হোক, নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয় বড় দরকারী।

আমাদের চারিদিকের প্রতিকূল পরিবেশ আমাদের অজানা ছিল না। আমি ওর এখানে থেকে যাবার পরিকল্পনাকে খেয়ালিপনা বলেই মনে করলাম।

সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নেমেছে। বাড়িতে দেরী করে ফেরার জন্য যতগুলো কৈফিয়ৎ ছিল, সব ভোঁতা আর অকেজো হতে বসেছে। ওর কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। পরম নিশ্চিন্তে বসে আছে আমার হাতে হাত রেখে।

একসময় ওর খেয়ালিপনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, বড় দেরী হয়ে গেছে, তুমি একটুখানি বস, সামনের ট্রাম রাস্তা থেকে আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনছি।

ওকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আমি ট্যাক্সি ডাকতে বেরিয়ে গেলাম।

ট্যাক্সি পেতে দেরি হল। ওর বাড়ি ফেরার বিলম্বের কথা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন হলাম।

আমাকে আর নামতে হল না। ট্যাক্সির হর্ন শুনেই ও নিচে নেমে এল।

আমি দরজা খুলে দিতেই ও উঠে এসে বসল। গাড়ী চলল। আমি ওর একখানা হাত চেপে ধরে বসে রইলাম। কোন উত্তাপই ছিল না ঐ করতলে। আঙুলগুলোতে যেন কোন সাড় ছিল না।

চিরদিনই ও অনুভূতিপ্রবণ আর গভীর। আমি অকারণ কথা বলে ওর মগ্নতাকে ভাঙতে চাইলাম না।

মেডিক্যাল কলেজের কাছে ও নেমে গেল। তখন আমার ঘড়িতে আটটা।

ও বাড়ি ফিরে ওর বাবা মার কাছে কি অজুহাত দেখাবে, সেই ভাবনায় আমি সারা পথ জর্জরিত হয়েছি। ও কেন একটিও কথা বলেনি সে বিষয়ে তলিয়ে দেখা কিংবা প্রশ্ন করার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। ও বাড়ি ফিরে আপাততঃ উদ্বেগমুক্ত করুক ওর অভিভাবকদের, এই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা।

দশদিন ওকে দেখিনি। আমার দিন আমার রাত্রি অশান্ত হয়ে উঠেছে। ইউনিভারসিটিতে ও অনুপস্থিত, পত্রিকা অফিসে তো বটেই।

ও কি সেদিন আমার বাসা থেকে ফিরে বিশেষ বিশেষ কোন অসুখে গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে? অথবা সেদিনের বিলম্বের জন্য অভিভাবকেরা কোন কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন? তাঁদের ভর্ৎসনার জন্যেই কি ও অভিমানে ঘরের বাইরে পা বাড়ানো একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে?

কোন জিজ্ঞাসার উত্তরই আমি মনের ভেতর থেকে পেলাম না।

শেষে একটা ছত্র বার বার আমার কানে ফিরে ফিরে বাজতে লাগল, 'এ বাড়ি ছেড়ে তুমি আমাকে আর কোথাও যেতে বোল না'।

ও কি আমার ওপর অভিমান করে চলে গেল। সে সন্ধ্যায় সে সন্ধ্যাতারার মত করুণ মিনতি মাখা দুটো চোখ মেলে আমার কাছে চিরদিনের আশ্রয় চেয়েছিল। আমি পরিস্থিতির দাস, তাই তাকে সেদিন আশ্রয় দিতে পারিনি। এই বেদনা আমার দিন রাত্রিকে আচ্ছন্ন করে রাখল। কোন কাজে একটুও মন বসাতে পারছিলাম না। বুকের ভেতর অনুভব করছিলাম বিরাট শূন্যতা।

সেদিন কলেজটুকু শেষ করেই ঘরে ফিরে এসে বারান্দার চেয়ারে গা এলিয়ে বসলাম। শীতের কদমগাছটায় কি একটা পাখি ডাকছিল। তার দিকে মনঃসংযোগ করতে পারলাম না। মাঘের সূর্য কবরখানার ওপর থেকে তার রোদ্দুরের আলোয়ানখানা গুটিয়ে নিচ্ছিল। তাপ ছিল না রোদ্দুরে। একটা সন্তাপ ছড়িয়ে পড়ছিল তার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে।

কবরখানার ভেতর কে একজন ঘুরছিল, রক্ষী, মালী অথবা কোন শোকাতুর। শীতল ছায়া ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে স্মৃতিস্তম্ভগুলি।

আমার উজ্জ্বল স্মৃতিগুলো কি এমনি করে ছায়ার গ্রাসে বিলীন হয়ে যাবে।

ভাবনার মাঝে চমকে নড়েচড়ে বসলাম।

আশ্চর্য! এই মুহূর্তগুলোতে আমি ওর সম্বন্ধে ভাবতে চাইছিলাম না। কিন্তু আমার চিন্তার ভেতর ওরা প্রবল কোলাহলে ঢুকে পড়তে লাগল।

চাঁপাফুলের সুরভি ছড়ানো আমার বিছানায় ও কতদিন বসেছে। বর্ষার

কেয়া আমার ফ্লাওয়ার ভাস থেকে সারা ঘরে গন্ধের ঢেউ তুলেছে। ও হাত বুলিয়ে আদর জানিয়েছে নরম সবুজের স্পর্শমাখা সাদা কেয়াফুলকে।

কোথা থেকে হঠাৎ কানে এসে বাজল একটা শব্দ কুক্-কুক্-কুক্। আমারই রচিত সৃষ্টির পুরো ছবিটা ফুটে উঠল চোখের ওপর। পাহাড়ের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে কার্শিয়াং-এর ট্রেনটা। ও এসে দাঁড়িয়েছে লনে। মাথায় আমার দেওয়া আধফোটা গোলাপটি গোঁজা। বাঁ হাতে পাইন গাছটা জড়িয়ে ধরে ও ট্রেনের খেলা, মেঘের খেলা দেখছে তন্ময় হয়ে।

দমকা হাওয়ায় যেমন ঝরঝর করে গাছের পাতা থেকে ঝরে পড়ে জমে থাকা বৃষ্টির জল, তেমনি করে আমি উঠে দাঁড়িয়ে মন থেকে ঝরিয়ে ফেলতে চাইলাম কল্পনার জলবিন্দুগুলো।

পত্রিকা অফিসে যেতেই অজিতদা বললেন, কি ব্যাপার বল তো তোমাদের? এ কদিন ডুব মেরেছিলে কোথায়? মেয়েটা আসছে না কেন?

বললাম, প্রায় দশদিন হতে চলল আমি তার কোন খবর পাচ্ছি না।

সেকি। অসুখ বিসুখে পড়ে গেল নাকি? ওর বাড়ির ঠিকানা তোমার জানা আছে?

বললাম, জানি।

অজিতদা বললেন, এই ডায়েরীর পাতায় লিখে দাও।

লিখে দিলাম। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম, অজিতদা আবার না একটা কান্ড বাধিয়ে বসেন।

ভাবলাম, কিন্তু মুখে কোন কিছু প্রকাশ করতে পারলাম না।

এর ঠিক দুদিন পরে রাত দশটায় অজিতদার আবির্ভাব। কোনদিন আসেননি আমার বাসায়, ঠিকানা খোঁজ করে এসেছেন। মাঘ মাস, রাত দশটা মানে গভীর নিশুতি রাত।

আমি বিছানা থেকে উঠে অজিতদাকে হাত ধরে এনে বসালাম।

অজিতদার প্রথম কথা, এ অবস্থায় ঘুম হয় কি করে।

বিছানা ছেড়ে যে বেরিয়ে গেছি সেটা ও'র চোখে পড়েছে।

আমি চুপ করে রইলাম। কোন একটা গুরুতর সংবাদ না হলে অজিতদা এত রাতে আসতেন না। আমি তাঁর মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

অজিতদা বললেন, ব্যবসা আর তোমার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত বিব্রত আছি। কাল সন্ধ্যা পাঁচটায় গাড়ি নিয়ে আমি এখানে আসব। তুমি নতুন কাপড় আর পাঞ্জাবি পরে তৈরী থাকবে। মাসখানেক আগে নতুন একটা শাল কিনেছিলে না, ওটাও কাঁধে চাপিয়ে নিও।

মাথা নেড়ে জানালাম, ঠিক আছে।

অজিতদা বললেন, কিছু বুঝলে?

আপনার সঙ্গে কোন অনুষ্ঠান বা সভায় যেতে হবে আমাকে।

অজিতদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হাতে আমার একটুও সময় নেই। কাল একটা

অনুষ্ঠানেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, সেটা তোমার বিয়ের অনুষ্ঠান।

সেই রহস্যময় মানুষটি আর একটি কথাও না বলে শীতের রাতে নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

কিছু বিপর্যয়, কিছু বেদনার ভেতর দিয়ে ও এলো আমার ঘরে। শীতের একটি সন্ধ্যা মনোরম আলোয় ভরে গেল ওর আবির্ভাবে।

বৌভাতের দিনটি স্মরণীয় হয়ে রইল আমাদের জীবনে।

ভারতলক্ষ্মী ফিলম্ স্টুডিওর মালিক বাবুলাল চোখানী বড় স্নেহ করতেন আমাকে। ওঁর নির্দেশে ওঁর ছেলে জগদীশ পুরো একটি স্টুডিও আলোর মালায় সাজিয়ে দিলে। স্টুডিও ঘিরে 'ডালিয়া' চন্দ্রমল্লিকার পুষ্পিত সমারোহ। ফোয়ারার মুখ থেকে জলকণা ছড়িয়ে পড়ছে মুক্তোবিন্দুর মত।

নববধূর উপবেশনের জন্য আলাদা একটি সুসজ্জিত স্টেজ তৈরী করে দেওয়া হয়েছে।

লালপাড় হলুদ বেনারসী পরে, ফুলের অলংকারে সর্বাঙ্গ ঢেকে লাজনম্র বধূ অতিথিদের নম্রনমস্কারে অভ্যর্থনা করছে।

মীরাদি (অধ্যক্ষা মীরা দত্তগুপ্তা) ওর পাশে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। মীরাদি ওকে খুবই স্নেহ করতেন। মায়ের মত আগলে বসে গল্প করতে লাগলেন।

আমার দুই কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপকরা এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন। পরিচিত শিল্পী সাহিত্যিকরা এলেন সপরিবারে।

সবশেষে একটু রাত করেই এলেন সস্ত্রীক শিবতোষদা (স্যার আশুতোষের নাতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক শিবতোষ মুখার্জী)।

চারদিকে তাকিয়ে শিবতোষদা বললেন, বেশ বোকা বানালে রঞ্জন। বৌভাতে খাবার নেমন্তন্ন করে এখন খালিপেটে স্যুটিং দেখাবার তাল। তোমার কোনটা মিথ্যে, কোনটা সত্যি, বোঝা ভার।

জোরালো ফ্লাড লাইটে প্লাবিত হচ্ছিল ঘর।

অঞ্জলি বৌদি রক্তগোলাপের স্তবকটি নববধূর হাতে তুলে দিতেই শিবতোষদা চেঁচিয়ে উঠলেন, দেখো ভাই রঞ্জন, স্যুটিং থেকে আমরা যেন বাদ না পড়ি।

শিবতোষদার কথা শুনে হাসির কলরোলে স্টুডিও ভরে উঠল।

নতুন বিয়ের পর বিবাহিত দম্পতি হানিমুনে যায়। অন্তত কয়েকটা দিন অলৌকিক আনন্দের জগৎ রচনা করে। কিন্তু সে সময় আমার হাতে এমন অর্থ ছিল না যা দিয়ে আমি এমধরনের আনন্দের স্বর্গ রচনা করতে পারি।

বন্ধুদের মুখে শুনলাম, একটা চমৎকার বই চলছে—'হারানো সুর'।

ওর সঙ্গে আমার কথা হল, ইউনিভার্সিটি থেকে ও আগেভাগে বেরিয়ে আসবে। আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে নির্দিষ্ট সময় ওর সঙ্গে মিলিত হব কলেজ স্কোয়ারে। দুজনে ম্যাটিনি শোতে 'হারানো সুর' দেখব।

হাউসের সামনে প্রচণ্ড ভীড়। টিকিটের জন্যে দারুণ হাহাকার। আমি

আগেভাগেই টিকিট যোগাড় করে রেখেছিলাম। আমরা ঢুকতে যাচ্ছি অমনি আশপাশ থেকে হতাশ গলার শব্দ উঠছে, এক্সট্রা টিকিট আছে দাদা? এক্সট্রা টিকিট আছে দাদা?

আমি মাথা নেড়ে দুখানা হলুদ টিকিট হাতে নিয়ে সগর্বে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

সত্যি বইখানা ভাল লাগার মতো।

কাহিনীর অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলো যখন আসছিল তখন অন্ধকারে ও চেপে ধরছিল আমার হাত। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ওর সমস্ত মন থরথর করে কাঁপছে। হল থেকে বেরিয়ে এসেও ও কতক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। আমি ফুটপাথ ধরে টালিগঞ্জের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। ও আমার পাশে পাশে হেঁটে চলল।

শীতের সূর্যাস্তের আয়োজন চলেছে ময়দানের ওপরে পশ্চিম দিগন্তে। আমরা সেই সাড়ে নটা নাগাদ খেয়ে বেরিয়েছি, এখন কিছু না খেলেই নয়। একটা লোক গোলাপ ফুল বিক্রী করছিল। সঙ্গীতার আগ্রহ দেখে আমি বেশ কিছুটা চড়াদামেই পুরো গুচ্ছটাই কিনে ফেলে ওর হাতে তুলে দিলাম। ও ভারী খুশী হয়ে উঠল, কিন্তু তখন আমাদের হাতে ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসেও যাবার মতো পয়সা নেই।

ওকে বললাম, হেঁটে টালিগঞ্জ যেতে পারবে?

ও মিষ্টি হেসে বড় বড় দুটো চোখ আমার মুখের ওপর ফেলে বলল, তোমার সঙ্গে যত দূরে বল যেতে পারি।

দু' এক আনা যা অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে ছোলা ভাজা কিনলাম। ওর হাতে ঠোঙাটা তুলে দিয়ে বললাম, অন্নপূর্ণার ভান্ডার থেকে পথ চলতে ভিক্ষা চেয়ে নেব।

ও হেসে আমার হাতে কিছুটা ছোলাভাজা ঢেলে দিল। সেই ছোলাভাজা আমরা কৃপণের ধনের মতো খরচ করতে লাগলাম। বেশ কয়েক পা করে এগোই আর একটি করে দানা মুখে ফেলি।

কত মানুষ পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করছে, তাদের আমরা দেখও দেখেছি না। দুজনের চোখ ভরে আছে দুজনের ছবিতে। চারদিকে কত শব্দ, কিন্তু আমাদের কানে এসে সেতারের ঝঙ্কারের মতো বাজছে শুধু আমাদেরই দুজনের কথা। হাঁটছি, ক্লান্তি নেই।

ও বলল, বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে, তুমি চাদর আননি কেন? কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুবার সময় তো তোমার হাতে দেখেছি।

আমি ফুটপাথেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাথায় হাত দিয়ে বললাম, এই যাঃ, ভুলে কলেজে আমার বইয়ের সেলফে ফেলে এসেছি।

ও বলল, সত্যি, এমন ভুলো তুমি।

বীরত্বের সঙ্গে বললাম, একটুও শীতকাতুরে নই আমি। হাঁটতে হাঁটতে শরীর গরম হয়ে যাবে। চাদরের আর দরকারই হবে না। কিন্তু তোমার সে কাশ্মীরী ক্লোকটা কই?

তোমার মতো ভুলো আমি নই, ব্যাগে ভরে এনেছি।

ওই পিণ্ডের কাজ করা ক্রীম রঙের কাশ্মীরী ক্লোকটা পরলে ওকে ভারী সুন্দর দেখায়। আমার নতুন বৌ ওটা পরে আমার পাশে পাশে হাঁটুক আর পাঁচজনের মুগ্ধ চোখ এসে পড়ুক ওর ওপরে, এমনি একটা বাসনা আমার মনে জেগে উঠল।

বললাম, মহারানী ভিক্টোরিয়ার পোশাকখানা এবার ব্যাগ থেকে বেরুক, দেখে আমার নয়ন সার্থক হোক।

ও হাসল।

হাসি নয়, আমি নিজেই ব্যাগ থেকে ক্লোকটা ওর হাতে দিলাম।

আমার হাতে ব্যাগটা দিয়ে ও ক্লোকটা পরল।

সত্যি ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে। না, না, কোন পথচারীকেই আমি ওর দিকে হাঁ করে তাকাতে দেব না।

বললাম, রাস্তা পেরিয়ে চল ময়দানের দিকে। ট্রাম লাইন ধরে ধরে হাঁটব।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, মাহানিম গাছগুলোর পাতা ঝরা দেখব।

বললাম, সূর্যাস্তও।

আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে মহানিমগাছগুলোর তলায় শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগলাম। আমাদের পাশ দিয়ে কয়েকটা ট্রাম সুঁই সুঁই শব্দ করে যাওয়া আসা করল। আমরা দুটো গাছের ফাঁকে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে অপূর্ব সূর্যাস্ত দেখতে লাগলাম। ময়দান থেকে ধীরে ধীরে কুয়াশার মেঘ ঘনিয়ে উঠছিল। চৌরঙ্গীর দিকে বড় বড় প্রাসাদগুলোতে দীপান্বিতার সারি সারি আলো জ্বলে উঠেছে।

ও বলল, শীতে এই বিরাট গাছগুলোর পাতা ঝরে গেলে আমার কেমন কান্না পায়।

ওর একখানা হাত চেপে ধরে বললাম, বসন্ত আসতে দেরী নেই, তখন ওর ডাল ভরে নতুন পাতা শিউরে উঠবে।

পূর্বদিকে দুটো বাড়ির ফাঁকে রুপোর থালার মতো একটা চাঁদ উঠেছে।

শন্ শন্ আওয়াজে ময়দানের দিকে তাকিয়ে দেখি দুটো পাখি পাখা টানতে টানতে তরল অন্ধকারের সমুদ্র সাঁতরে উড়ে চলেছে কোন নির্জন আশ্রয়ের সন্ধানে।

আমরা আলোছায়া আঁকা পথের ওপর দিয়ে দ্রুত পা ফেলে হাঁটতে লাগলাম।
